

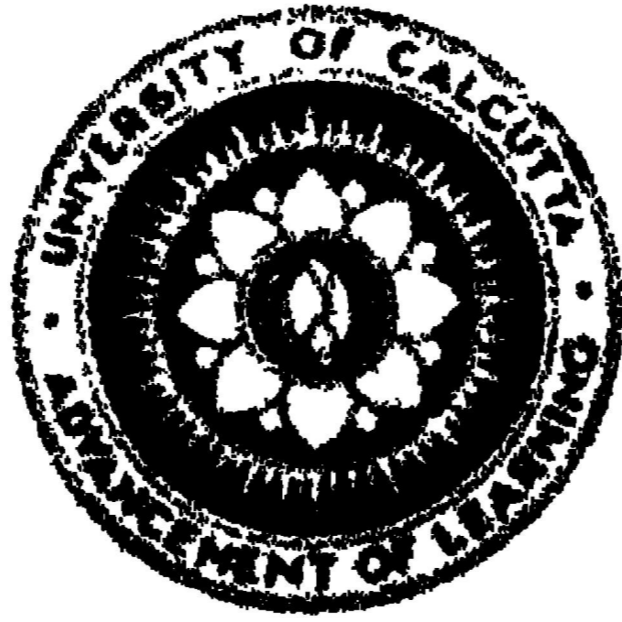
শিরাজী উপন্যাসসমগ্র

সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী

রাজসাহী কলেজের অধ্যাপক

যুহ্মদ যনসুর উদ্দীন, এম. এ.,

কর্তৃক সংগৃহীত ও সম্পাদিত



কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত

১৯৪২

PRINTED IN INDIA

**PUBLISHED BY THE CALCUTTA UNIVERSITY AND PRINTED BY S. N. GUHA
RAY, B.A., AT SREE SARASWATY PRESS LTD., 32, UPPER CIRCULAR ROAD,
- CALCUTTA.**

সূচি

.....

রায়-নন্দিনী	১—১১২
তারাবাগ্নি	১—৫৬
কিরোজা বেগম	১—৭২
নূরউদ্দীন	১—৬৪
বঙ্গ ও বিহার বিজয়	১—৮
আহামারা	৯—১৪

পরিশিষ্ট :

গ্রন্থকারের জীবন-কথা ও সাহিত্য-কীর্তি	১৫—৩২
---------------------------------------	-------

বায় নন্দিনী

‘ উদ্বোধন, ’ ‘ উচ্ছ্বাস, ’ ‘ নব উদ্দীপনা, ’ ‘ স্ত্রীশিক্ষা, ’ ‘ স্পেনীয়
মুসলমান সভ্যতা, ’ ‘ সুচিন্তা, ’ ‘ আদব কায়দা শিক্ষা, ’
‘ তুরস্ক ভ্রমণ, ’ ‘ তুর্কী নারীজীবন, ’ ‘ সঙ্গীত-
সঞ্জীবনী, ’ ‘ স্পেনবিজয় কাব্য,
’ প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা-

গাজী

সৈয়দ আবু মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন সিরাজী

(কবি সোলতান ও ওয়ায়েজল এসলাম)

প্রণীত।

গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত।

জুন ১৯১৬ খৃঃ।

মূল্য ১/০ আনা

PRINTER—K. C. DASS.

METCALFE PRINTING WORKS.

34, Mechuabazar Street, Calcutta.

উপক্রমণিকা

বঙ্গালী লেখকগণের যত্ন এবং চেষ্টায় বাংলা ভাষা আজ ভারতের সর্বপ্রধান ভাষায় পরিণত। বাংলা ভাষায় ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞানের গ্রন্থ যত সামান্যই হউক, কিন্তু উপন্যাস এবং নাটক-নভেলে বাংলা ভাষা আজ ভারাক্রান্ত। আর সেই সমস্ত গ্রন্থের পড়ে-পড়ে ছড়ে-ছড়ে মুসলমানের অলীক কলঙ্ক, কুৎসা এবং বিজ্ঞাতীয় বিদ্বেষ এবং ঘৃণা পরিপূর্ণ। উপন্যাসগুলি মোস্লেম বিদ্বেষের অনলকুণ্ড। সে অনলকুণ্ডে বিরোট-কীর্তি, বিপুল-যশা, সিংহতেজা মুসলমান জাতির গোলাম হইতে স্ম্যাট নবাব এবং বেগম ও শাহজাদীগণ পর্যন্ত নিতান্ত নিষ্ঠুরভাবে নিক্ষেপ হইয়াছে! বঙ্গালীদিগের পূর্বপুরুষগণ অবলুপ্তিত মন্তকে যাঁহাদের পদধূলি শিরে ধারণা করিয়া ধন্য হইয়াছিল, নিখিল জগৎ যে মুসলমানের পদতলে লুপ্তিত হইয়াছিল, যাঁহাদের চরিত্র-প্রভায়, জ্ঞান-গরিমায় এবং বীর্য-মহিমায় সমস্ত জগৎ মুগ্ধ হইয়াছিল—হায়! আজ সেই বিশ্বপূজ্য মুসলমান, বঙ্গালী লেখকদিগের অপার কৃপায় অতি ঘৃণিত পিশাচ এবং অশুশ্য কাম-কুকুররূপে চিত্রিত এবং বর্ণিত! হায়! যে নূরজাহান, রেজিয়া সোলতানা, জেবুন্নেছা, জাহানারা, মমতাজ মহল, দৌলতুনিসা প্রভৃতি বেগম ও শাহজাদী-গণের পুণ্যপ্রতিভায় ইতিহাসের পৃষ্ঠা আলোকিত হইয়া রহিয়াছে, যাঁহাদের নামকরণেও পুণ্য সঞ্চার হয়, হায়! সেই সব বিদূষী পূতচরিত্রা সম্মানিতা মহিলা-দিগকেও যার-পর-নাই হীন চরিত্রা এবং হিন্দু-শ্রেয়োনাদিনী রূপে অঙ্কিত করা হইয়াছে! এ অভ্যাচার, এ অবিচার একেবারেই অসহ্য! এ যন্ত্রণা একেবারেই মর্মস্ফুট!

ইহা ঐতিহাসিক স্রবসত্য যে, মুসলমানদিগকে পৃথিবীর সকল জাতিই কন্যাদান করিয়াছিলেন এবং করিতেছেন, কিন্তু মুসলমান কখনও অমুসলমান বা কাকেবকে কন্যাদান করেন নাই। যে সমস্ত আরব, তুর্কী, ইরানী এবং পাঠান ও মোগল ভারতবর্ষে বিজয়ী বেশে ভরবারি হস্তে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রায়ই সপত্নীক আসিয়াছিলেন না। সুতরাং বাধ্য হইয়াই তাঁহাদিগকে হিন্দু ললনার পাণিগীড়ন করিতে হইয়াছিল। প্রথম অবস্থায় ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানের যুদ্ধবিগ্রহ হইলেও পরে মুসলমান বিজয়ের পরে ভারতের হিন্দু-

মুসলমানের গভীর শাস্তি ও সম্ভাব্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ভারতের সর্বত্রই অল্পবিস্তর হিন্দু-মোসলেমে বৈবাহিক সম্পর্ক পর্যন্ত স্থাপিত হইয়াছিল। "রাজপুত্রেরা মুসলমানের মাতুল কুল"—ইহা আজিও প্রবাদ-বাক্যের ন্যায় প্রচলিত আছে। ফলতঃ উদনীস্তন হিন্দু রাজরাজড়ারা পর্যন্ত মুসলমানকে কন্যাদান করা অগৌরব বলিয়া আন্দোঁ বোধ করেন নাই। বাদশাহদিগের জীবনী এবং ইতিহাস পঠ করিলে দেখা যায় যে, হিন্দু নরপতিরা বাদশাহ নবাব এবং বিজয়ী বীরদিগকে বেছায় উপঢৌকন স্বরূপও কন্যা প্রদান করিয়াছিলেন। আর ইহা ভারতবর্ষের অতীব প্রাচীন প্রথা।

কিন্তু আধুনিক নব্য-শিক্ষিত বাঙ্গালী লেখকেরা কল্পনায় ইহাকে জাতীয় কলঙ্ক মনে করিয়া নিদারুণ রোষাবেশে অতুল গৌরবান্বিতা পুণ্য-শ্রোকা মুসলমান মহিলাগণকে অন্তঃপুর হইতে টানিয়া বাহির করিয়া হিন্দু নায়কের প্রেমোন্মাদিনী-রূপে চিত্রিত করিতে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছেন! কার্যতঃ যাহা কখনও ঘটে নাই, কল্পনায় তাঁহারা লেখনী পরিচালনা করিয়া সেই চিত্র অঙ্কিত করিতে একেবারে আদাজল খাইয়া লাগিয়াছেন। নীচমতি বঙ্কিমচন্দ্র এবং রসলাল বন্দ্যোপাধ্যায় হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক উদ্ভট ঔপন্যাসিক লেখকই এই অতি জঘন্য চিত্র অঙ্কিত করিয়া বিশ্বপূজ্য মুসলমানের মুণ্ডপাত এবং মর্মবিদ্ধ করিতে অসাধারণ প্রয়াস স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। আমি নিজে এবং আরও কতিপয় মুসলমান লেখক এ সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ নানা পত্র-পত্রিকায় তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্র ফলোদয় হয় নাই। উত্তর-বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের বণ্ডার অধিবেশনে আমি অতি তীব্র এবং যুক্তিসঙ্গত তুমুল আন্দোলন করিয়াছিলাম। দেশের শান্তি ও মঙ্গলের জন্য, হিন্দু-মুসলমানের সখ্য ও সম্ভাব্যের জন্য হিন্দু সুধীমণ্ডলের নিকট মুসলমান চরিত্রকে কুৎসিত না করিবার জন্য বিনীত অনুরোধ করিয়াছিলাম। কিন্তু হায়! আমার সে অনুরোধ বিফল হইয়াছে! বাঙ্গালার ছাপাখানা হইতে আজও শতধারে বর্ষাব প্রাবনের ন্যায় রাশি রাশি ফ্লাহলপূর্ণ নাটক-নটেল বাহির হইয়া জীষণ অশান্তির সৃষ্টি করিতেছে। অন্যদিকে আবার কলিকাতা এবং মফঃস্বলের শত শত স্থানে যাত্রা ও থিয়েটারের এই সমস্ত অলীক কলঙ্ক-কুৎসা-পরিপূর্ণ ঘটনার অভিনয় হইয়া মুসলমান ছাত্র ও সাধারণ লোকের মনে হীনতা ও নীচতার বীজ বপন করিয়া মুসলমানের আত্মবিশ্বাস ও আত্ম-মর্যাদার মূলে এমন নিদারুণ কুঠারঘাত করিতেছে যে, তাহাতে মুসলমানদের উন্নতি বা জাতীয় কল্যাণের

আশা সুদূরপর্যায় হইয়া পড়িতেছে।

বীর্যবান মহাপরাক্রান্ত শত্রুর সহস্র সহস্র তোপ-বন্দুকে লক্ষ লক্ষ মুসলমান নিহত হইলে যে ক্ষতি না হইত, দুর্বল বাঙ্গালীর ক্ষুদ্র লেখনী সঙ্কালনে তাহার অধিক ক্ষতি হইতেছে। পক্ষান্তরে বাঙ্গালী লেখকের এই কাপুরুষোচিত হীন আক্রমণে শিক্ষিত মুসলমানদের অন্তর্ভুক্তকরণে যে সংকোচ ও তীব্র প্রতিহিংসার আগুন প্রজ্বলিত হইতেছে, তাহার পরিণামও অতীব মারাত্মক। এ বিদেহ যেকোন দ্রুতগতিতে বর্ধিত হইতেছে, তাহার ফল উভয়ের পক্ষে নিশ্চয়ই সাংঘাতিক।

একই দেশের অধিবাসী হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সম্ভাব্য ঠাকা সর্বদা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাঙ্গালী ভ্রাতারা কাল্পনিক আর্থামীর গৌরবগানে বিভোর হইয়া কাণাকাণ্ডজ্ঞানহীন অবস্থায় লেখনীয় পরিচালনায় দারুণ অসম্ভাবের বীজ রোপণ করিতেছেন। দেশমাতৃকার কল্যাণের নিমিত্ত তাঁহাদের সাবধানতার জন্য এবং মুসলমানদের আত্মবোধ জন্মাইবার জন্যই, উপন্যাসের ঘোর বিরোধী আমি, কর্তব্যের নিদারুণ তাড়নায় “রায়-নন্দিনী” রচনা করিয়াছি। ইহাতে হিন্দু ও মুসলমানের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছি, তাহাই অতীতের স্বাভাবিক চিত্র। মুসলমানের চরিত্রবল, মহত্ত্ব এবং স্বজাতি-প্রেমের উন্মাদনা সকল জাতি অপেক্ষা বেশি ছিল, ইহা সকলকে স্বীকার করিতেই হইবে। নতুবা সহস্র বৎসর পর্যন্ত মুসলমান কখনও নিখিল ধরণীর একমুহুরে অধিপতি, ধর্মগুরু ও সভ্যতার শিক্ষক-রূপে বিরাজ করিতে পারিতেন না। আজও বিশ্বব্যাপ্ত হইতে তাঁহার প্রভাব ও প্রভাবের জ্যোতিঃ নিবিয়া যায় নাই।

বাঙ্গালীদিগের রচিত উপন্যাস পাঠ করিয়া যাহারা নিদারুণ মর্মজ্বালা ভোগ করিয়াছেন, তাঁহারা এই উপন্যাস পাঠে কথঞ্চিৎ শান্তি পাইলেও শ্রম সফল জ্ঞান করিব। পক্ষান্তরে আশা করি, বাঙ্গালী লেখকগণ তাঁহাদের মোসলেম কুৎসাপূর্ণ জঘন্য উপন্যাসগুলির পরিবর্তন করিয়া সুমতির পরিচয় দিবেন এবং ভবিষ্যতে মুসলমানের বীর্যপুষ্ট গৌরববিমণ্ডিত আদর্শ চরিত্র অঙ্কিত করিতে চেষ্টিত হইবেন। নতুবা তাঁহাদের চৈতন্য উৎপাদনের জন্য আবার ঐসলামিক ভেজঃদীও অপরায়েয় বক্তৃতা লেখনী ধারণ করিতে বাধ্য হইবে।

বাণীকৃষ্ণ, সিরাজগঞ্জ

সৈয়দ শিরাজী

২০শে ফাল্গুন, ১৩২২ সন

রায়-নন্দিনী

প্রথম পরিচ্ছেদ

মন্দিরে

যখন আসমুদ্রহিমাচল সমগ্র ভারতবর্ষের প্রতি নগরে, দুর্গে ও শৈলশৃঙ্গে ইসলামের অর্ধচন্দ্র-শোভিনী বিজয়-পতাকা গর্ব-ভরে উড্ডীয়মান হইতেছিল,— যখন মধ্যাহ্ন-মার্তণ্ডের প্রথর প্রভায় বিশ্বপূজ্য মুসলমানের অতুল প্রতাপ ও অমিত প্রভাব দিগ্দিগন্ত আলোকিত, পুলকিত ও বিশোভিত করিতেছিল,— যখন মুসলমানের লোক-চমকিত সৌভাগ্য ও সম্পদের বিজয়-ভেরী, জলদম্ভ্রে নিনাদিত হইয়া সমগ্র ভারতকে ভীত, মুগ্ধ ও বিস্মিত করিয়া তুলিতেছিল— যখন মুসলমানের শক্তি-মহিমায় অনুদিন নিবৃদ্ধমান শিল্প ও বাণিজ্য, কৃষি ও কারুকার্যে ভারত-ভূমি ধনধানো পরিপূর্ণ এবং ঝঙ্কিত্তিতে বিমগ্নিত হইতেছিল— যখন প্রতি প্রভাতের মন্দ সমীরণ কুসুম-সুরভি ও বিহগ-কাকলীর সঙ্গে, মুসলমানের বীর্যশালী বাহুর নববিজয়-মহিমার আনন্দসংবাদ বহন করিয়া ফিরিতেছিল— যখন মুসলমানের সমুন্নত শিক্ষা ও সভাতায় সুমার্জিত রুচি ও নীতিতে ভারতের হিন্দুগণ শিক্ষিত ও দীক্ষিত হইয়া কৃতার্থতা ও কৃতজ্ঞতা অনুভব করিতেছিল—

যখন ব্রহ্মতেজঃ-সন্দীপ্ত দরবেশদিগের সাধনায় ইসলামের একত্ববাদ ও সাম্যের নির্মল কৌমুদীরামি, কুসংস্কারাঙ্কন শতধাবিচ্ছিন্ন তেত্রিশ কোটি দেবোপাসনার তামসী-ছায়ায় সমাবৃত ভারতের প্রাচীন অধিবাসীদিগের হৃদয়ে এক জ্যোতির্ময় অধ্যাত্মরাজ্যের দ্বার প্রদর্শন করিতেছিল— যখন মুসলমানের তেজঃপুঞ্জ মূর্তি, উদার হৃদয়, প্রশস্ত বক্ষ, বীর্যশালী বাহু, তেজস্বী প্রকৃতি, বিশ্ব-উদ্ভাসিনী প্রতিভা, কুশাগ্রসূক্ষ্ম বুদ্ধি, জ্বলন্ত চক্ষু, দোর্দণ্ড প্রতাপ, প্রযুক্ত করুণা, নির্মল উদারতা, মুসলেমেতর জাতির মনে বিশ্বয় ও ভীতি, ভক্তি ও প্রীতির সঞ্চার করিতেছিল— যখন উত্তরে শ্যাম-কাননাবরণ গগন-বিচূষী তুম্বারকি-দ্বীপ হিমগিরি তাহার গভীর মেঘ-নির্ঘোষে ও চপলা-বিকাশে এবং দক্ষিণে অনন্ত-বিস্তার ভারত-সমুদ্র স্ননস্ত কলকল্লোলে ও অনন্ত-তরঙ্গ বাহুর বিচিত্র ভঙ্গিমায়, মুসলমানের অবদান-পরিপূরণের বিস্তৃত-যশোগাথা কীর্তন করিতেছিল, — যখন পৌরাণিক বংশমর্গাদাতিমানী চন্দ্র, সূর্য, অনল বংশীয় এবং রাঠোর ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, শক, রাজপুত্র, জাঠ গোত্রীয় অসংখ্য জাতি, মহিমাবিত মুসলমানের গিরিশৃঙ্গ-বিদলনকারী চরণতলে তুণ্ড-জ্ঞানু ও বিনত-মস্তক হইতে কুষ্ঠার পরিবর্তে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিতেছিল— যখন নগরীকুলসম্রাজ্ঞী বিপুল বীর্য ও ঐশ্বর্যশালিনী

দিল্লীর ওখতে অধাবসায়ের অবতার প্রধিও-যশা আকবরশাহ উপবেশন করিয়া
 স্বকীয় শ্রভাব বিস্তার করিতেছিলেন। যখন বীরপুরুষ দায়ুদ শাঁ, সুজলা-সুফলা
 হিন্দুস্তানের রমা-উদ্যান বঙ্গভূমির রাজধানী দিল্লীর গৌরব-স্পর্ধিনী গৌড় নগরীতে
 রাজত্ব করিতেছিলেন - সেই সময়ে একদিন বৈশাখ মাসের কৃষ্ণা দশমীতে রাত্রি
 দেড় লহরের সময় শ্রীপুর ও ষিঞ্জিরপুরের মধ্যবর্তী রাস্তার এক খণ্ডে কতকগুলি
 রক্ষীসহ একখানি পাঙ্কী আসিয়া উপস্থিত হইল।

পাঙ্কীখানা বিবিধ কারুকার্যে অতি চমৎকাররূপে সজ্জিত। পাঙ্কীর উপরে
 ঝালবযুক্ত জরীর চাদর শোভা পাইতেছে। পাঙ্কীর সঙ্গে দুইজন মশাল্চী।
 তাহাদের হস্তস্থিত প্রকাণ্ড মশাল কৃষ্ণা দশমীর অন্ধকাররাশি অপসারিত এবং
 সেই বৃক্ষ-সমাকীর্ণ চটির বহুস্থান আলোকিত করিয়া শাঁ শাঁ করিয়া জ্বলিতেছিল।
 বারজন রক্ষী, আটজন বেহারা এবং তদ্যতীত তিনজন ভারী ও একজন সজ্জাস্ত
 যুবক পাঙ্কীর সঙ্গে ছিল। রক্ষী বারজনের মধ্যে তিনজনের হস্তে বন্দুক,
 পাঁচজনের হস্তে রামদা এবং চারিজনের হস্তে তেল-চুক্চুকে রূপা দিয়া গাঁট-বাঁধা
 বাঁশের পাকা লাঠি। সকলেই পদাতি; কেবল সজ্জাস্ত যুবকটি একটি বলিষ্ঠ অশ্বের
 আরোহী। যুবকের গায়ে পিরহান, পরিধানে ধুতি, মস্তকে একটি জরীর টুপী,
 কটীতে চাদরের দড় বেটনী, পায়ে দিল্লীর সুন্দর নাগরা জুতা। যুবকের কটীতে
 একখানি কোষবদ্ধ ক্ষুদ্র তরবারি দুলিতেছিল। যুবকের বয়স অন্যান্য বিংশতি বর্ষ।
 চেহারা বেশ কমনীয় ও পুষ্ট; গঠন দোহারা; অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেরূপ মাংসল সেরূপ
 পেশীযুক্ত নহে। যুবক যে সজ্জাস্ত বংশের, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

বেহারারা চটির একটি প্রকাণ্ড শাখা-প্রশাখাশালী ঘন পত্রযুক্ত বটবৃক্ষের মূলে
 পাঙ্কী নামাইয়া কাঁধের গামছা দিয়া দুই চারিবার হাওয়া খাইয়া গাছের নিকটেই
 ঘুরিতে লাগিল। যুবকটি ঘোড়া হইতে নামিয়া একটি রক্ষীর কোমরে আবদ্ধ ক্ষুদ্র
 বিড়িদান হইতে পান লইয়া চিবাইতে চিবাইতে পায়চারী করিতে লাগিল।
 একজন রক্ষী একটি আমগাছের চারার সহিত ঘোড়াটিকে আটকাইয়া রাখিল।
 ভারী ভার নামাইয়া ঘাম মুছিতে লাগিল। তারপর তামাক সাজিয়া সকলেই
 তামাক খাইতে লাগিল। একটি রক্ষী ভার হইতে একটি ভাল কাল-মিশ্রমিশে
 নারিকেলী হুঁকা বাহির করিয়া একটু ভাল তামাক যুবককে সাজিয়া দিল। যুবক
 দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই হুঁকা দেবীর মুখ চুম্বন করিতে এবং মধ্যে মধ্যে কুণ্ডলীকৃত
 ধূমরাশি ছাড়িতে লাগিলেন। মুহূর্ত মধ্যে বট গাছের তলা হকার সুমধুর ওড় ওড়
 ধ্বনিতে ও কুণ্ডলীকৃত ধূমে সজ্জাগ ক্ষুর্ত ও মূর্ত হইয়া উঠিল।

বৈশাখ মাসের নির্মেষ আকাশ, স্থির প্রশান্ত সাগরের ন্যায় পরিদৃষ্ট হইতেছে।
 অসংখ্য সমুজ্জ্বল নক্ষত্র নীলাকাশে, নীল সরোবরে হীরক-পঙ্খের ন্যায় দীপিয়া
 দীপিয়া জ্বলিতেছে। কৃষ্ণা দশমীর অন্ধকার, তাহার আলোকে অনেকটা তরল
 বলিয়া বোধ হইতেছে। বাতাস নিকর। উচ্চশির বৃক্ষের পাতা পর্বস্ত কাঁপিতেছে

না। বেজায় গরম! অত্যন্ত শীতল-রক্ত ব্যাঙের গা দিয়াও দরদর ধারায় ঘাম ছুটিয়াছে। চটির পূর্ব পার্শ্বের রাস্তার অপর দিকস্থ সবুজ জঙ্গলে অসংখ্য জোনাকী অগ্নি-স্কলিন্সের ন্যায় অথবা প্রেমিক-কবিচিত্তের মধুময়ী কল্পনা-বিদ্যাসের ন্যায় জুলিয়া জুলিয়া এক চিস্তাবিনোদন নয়ন-মোহন শোভার সৃষ্টি করিয়াছে। দূরে একটি উন্নত আমগাছের শাখায় বসিয়া একটি পাখিয়া তাহার সুমধুর স্বরস্বরীতে নীরব-নিথর পবন-সাগরে একটি অমৃতের ধারা ছুটাইয়া দিতেছিল। সেই স্বরের অমৃত-প্রবাহ, কাঁপিয়া কাঁপিয়া দূরে—দূরে—অতি নূদূরে—নীলাকাশের কোলে মিশাইয়া যাইতেছিল। কিছু পরে দূরবর্তী গ্রামের বংশকুঞ্জের মধ্যে আদও একটি পাখিয়া, আম্রশাখায় উপবিষ্ট পাখিয়াটির প্রত্যস্তরঙ্গলে গাহিতে লাগিল। উহা স্বপ্নরাজ্যের সাগর-পারস্থ বীণাধারিনির ন্যায় মধুর হইতে মধুরতর বলিয়া বোধ হইতেছিল। তাহার সেই ঝঙ্কারও কাঁপিয়া কাঁপিয়া শ্রুতি-মূলে প্রেম-স্মৃতি জাগাইতেছিল। সকলের তামাকু সেবন শেষ হইলে যুবকটি বলিল, “শিবু, আর দেৱী করা সম্ভব নয়। পাঙ্কী উঠাও। সাদুল্লাপুর এখনও প্রায় দু'ক্রোশ। অনেক রাত্রি হচ্ছে, স্বর্গের বোধ হয় ক্ষুধাও লেগেছে।” শিবনাথ বলিল,—“কর্তা! আমরা এতক্ষণ সাদুল্লাপুরের ঘাঁটে যেয়ে পহঁছতাম; কেবল ঘাট-মাঝির দোষেই এত বিলম্ব হল। বেটা অমনতর ভাসা নৌকায় খেয়া দেয় যে, আমার তো দেখেই ভয় করে। যাবার সময় ঐ নৌকায় কিছুতেই পার হব না।”

যুবক : যাবার সময় ভাল নৌকা না পেলে বেটার হাড়টী চূর করে দিব। আজ ভাসা নৌকার জন্য ক্রমে ক্রমে পার হতে প্রায় দুই ঘণ্টা সময় নষ্ট হয়েছে।

এমন সময় পাঙ্কীর দ্বার খুলিবার খস্ খস্ শব্দ শোনা গেল। যুবক মুখ ফিরাইয়া পাঙ্কীর দিকে চাহিয়া বলিল, “কি স্বর্গ! বড় গরম বোধ হচ্ছে! বাইরে বেরুবি?”

পাঙ্কীর ভিতর হইতে মধুর ঝঙ্কারে উত্তর হইল, “হাঁ দাদা! বড় গরম! সমস্ত শরীর ঘেমে ভিজে গেছে। পাঙ্কীর ভিতরে বসে বসে হাত-পা একেবারে লেগে গেছে।”

যুবক : শিবু! পাঙ্কীর দরজা খুলে দাও। আর একখানি গালিচা ঐ ঘাসের উপর বিছিয়ে দাও। স্বর্গ একটু বাইরে শরীর ঠাণ্ডা করুক। বড় গরম পড়েছে। স্বর্গ একটু ঠাণ্ডা হলে তোমার পাঙ্কী উঠাও।

শিবনাথ যুবকের আদেশ মত ডার হইতে একখানি গালিচা লইয়া গাছ হইতে একটু দূরে খোলা আকাশের নীচে, যেখানে খানিকটা জায়গা ঘাসে ঢাকা ছিল, সেইখানে বিছাইয়া দিল। তারপর পাঙ্কীর দরজা খুলিয়া ডাকিল, “দিদি ঠাকরণ! বাইরে আসুন। বিছানা পেতেছি।”

সহসা পাঙ্কীর ভিতর হইতে বহুমূল্য পীতবর্ণ বাণারসী শাড়ী-পরিহিতা, রত্নালঙ্কারজাল-সমালঙ্কিতা এক উজ্জ্বল-যৌবনা অপূর্ব ষোড়শী সুন্দরী বহির্গত

হইল। তাহার রূপের প্রভাষ মশালের উজ্জ্বল আলোকও যেন কিঞ্চিৎ মগ্ন হইয়া পড়িল। তাহার অলঙ্ক-রাগরঞ্জিত রক্তকমল-সদৃশ পাদ-বিচূষী মঞ্জীর-শিঞ্জনে মেদিনী পুলকে শিহরিতা হইল। তাহার বিশাল নেত্রের মাধুর্যময়ী উজ্জ্বল দৃষ্টিতে দৃষ্টি-পথবতী দূরব্যাপী অক্ষকার তরল ও চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাহার নিঃশ্বাসে বায়ুতে মনোহর মৃদু কম্পন উপস্থিত হইল।

যুবতী যখন পাণ্ডীর ভিতর হইতে নির্গত হইল, তখন মনে হইল, যেন পুষ্পকুম্বলা রক্তাক্ষরা বিচিত্রবর্ণশোভী-অম্বুদাকলা বিশ্ববিনোদনী হাস্যময়ী উষাদেবী পৃথকাক্ষের দ্বার উদঘাটনপূর্বক ধরণীবক্ষে নবজীবনের পুলক-প্রবাহ সঞ্চারের নিমিত্ত, নীলিম প্রশান্ত সাগরের শ্যামতটে আবির্ভূত হইলেন। যুবতী এমনি সুন্দরী! এমনি বিনোদিনী!! এবং এমনি মাধুর্যময়ী!!! যুবতী ধীরে ধীরে যাইয়া গালিচার উপর উপবেশন করিল। যুবতীর রূপের ছটায় সে জায়গাটা যেন নিভস্তই বিশোভিত হইয়া উঠিল। যুবতীর অঙ্গ হইতে উৎকৃষ্ট আতরের গন্ধ চতুর্দিকে ছড়াইয়া চটিটাকে আমোদিত করিয়া ভুলিল। যুবতী সেখানে বসিয়া জ্বল-করত হইতে তাঙ্গুল লইয়া কয়েকটি যুবককে দিয়া নিজেও দুই একটি চর্বণ করিতে লাগিল। চটিতে লোকজন তখন কেহ ছিল না। একখানা বাংলা ঘরে একটি মুদি দোকান। তাহাতে একজন মুদি ও একটি ছোকরা মাত্র ছিল। গরমের জন্য ছোকরাকে ঘরে রাখিয়া মুদি বাহিরে আসিয়া গাছের নিকটে ষড়ম পায়ে গামছা কাঁধে দাঁড়াইয়া বেহারা ও রক্ষীদিগের হাবভাব কৌতূহলভরে দেখিতেছিল। যেখানে চটি, তাহার নিকটেই প্রকৃতি দেবীর সুবিশাল শ্যামস্বরূপ কয়েকটি প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের নীচে একটি বড় হাট বসিয়া থাকে। হাটের দক্ষিণ পাশেই একখানি বৃহৎ ঘর। তার চারিদিকে মাটির দেয়াল। যে কেহ রাত্রিকালে এখানে আশ্রয় লইতে পারে। মুদির দোকানে চাল, ডাল, চিড়া, মুড়ী, গুড়, হাঁড়ি, ঝড়ি সমস্তই কিনিতে পাওয়া যায়। ইচ্ছা হইলে রান্না করিয়া খাইয়া থাকিতে পারা যায়।

নিকটে একটা বড় ইদারা আছে। মুদি কেবল গরমের জন্যই বাহিরে আসিয়াছিল, তাহা নহে। অনেক লোক দেবিয়া সে আজ অনেক চাল, ডাল, হাঁড়ি, ঝড়ি বিক্রয়ের আশায় আশ্বস্ত হইয়া বাহির হইয়াছিল। কিন্তু সে যখন বাহিরে আসিয়া দেখিল যে, বিক্রমপুরের প্রবল প্রতাপান্বিত রাজা কেদার রায়ের লোকজন তাহার কন্যা বর্গময়ীকে লইয়া শ্রীপুর হইতে সাদুল্লাপুরে যাইতেছে, তখন তাহার উজ্জ্বল মনটা হঠাৎ দমিয়া গেল। পাছে রাজার লোকেরা তাহার দোকান হইতে জিনিষপত্র বা লুটিয়া লয়।

যুবক রাস্তার ধারে গুন গুন করিয়া গান করিতে করিতে পায়চারী করিতেছিল। বেহারা, রক্ষী ও ভারীরা গাছের তলায় তামাকু সেবন এবং নানা প্রকার গল্প-গুজব করিতেছিল। পশ্চিমদিক হইতে সহসা একটু ঠাণ্ডা হাওয়া প্রবাহিত হইয়া

যুবকের বাবরী চুল দোলাইয়া গেল। যুবক পশ্চিমদিকে তাকাইয়া দেখিল, একখণ্ড কাল মেঘ গগন-প্রান্তে মাথা তুলিয়া দৈত্যের মত শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া উঠিতেছে। মেঘের চেহারায় বুঝা যাইতেছিল যে, উহা ঝটিকা-গর্ভ।

যুবক মেঘ দেখিয়া একটু ব্যস্ত কণ্ঠে বলিল,—“শিবু! পশ্চিমে মেঘ করেছে! সকালে পাক্কী তোল।” মেঘের কথা শুনিয়া সকলে গাছের নীচ হইতে বাহিরে আসিয়া দেখিল, সত্য সত্যই একখানা মেঘ দ্রুত গতিতে বাড়িয়া উঠিতেছে। শিবু মেঘ দেখিয়া যুবকের উদ্দেশ্যে বলিল,—“দাদা মশায়! মেঘ তো খুব বেড়ে চলেছে। পাক্কী এখন চটিতে রাখা যাক। মেঘটা দেবেই যাওয়া যাবে।”

যুবক : “মেঘ আসতে আসতে আমরা অনেক দূর যেতে পারব। যেক্ষণ হাওয়া দিচ্ছে, তাতে মেঘখানা উড়েও যেতে পারে।” বলিতে বলিতে হাওয়া একটু জোরেই বহিতে লাগিল এবং মেঘের উপরের অংশটা ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। তখন সকলে অনুমান করিল যে, মেঘ আর জমাট বাঁধিতে পারিবে না।

একটু হাওয়া ব্যতীত আর কোনও আশঙ্কা নাই। তখন বেহারারা “জয় কালী” বলিয়া পাক্কী কাঁধে তুলিয়া “হেই হেই” করিতে করিতে সাদুল্লাপুরের দিকে ছুটিল। শীতল বাতাসে তাহাদের বড় স্কৃতি বোধ হইতেছিল। দুইটি মশাল অগ্র ও পশ্চাতে বায়ু-প্রবাহে শা শা করিয়া তীব্র শিখা বিস্তারপূর্বক অন্ধকার নাশ করিতেছিল। কিন্তু কয়েক রশি যাইবার পরেই কড় কড় গড় গড় করিয়া মেঘ একবার ডাকিয়া উঠিল এবং তারপর মুহূর্তেই সমুদ্রের প্রমত্ত প্লাবনের ন্যায় আকাশ-রূপ বেনাভূমি যেন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। দিগাঙ্কল নিবিড় অন্ধকারে সমাবৃত হইল। মাথার উপরে ক্রুদ্ধ মেঘের স্তর ক্রমাগতই গড়াইতে ও গর্জন করিতে লাগিল। পবন হুঙ্কার দিয়া চতুর্দিকের গাছপালার সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি আরম্ভ করিল এবং দেখিতে দেখিতে চটাপট বৃষ্টির ফোঁটাও পড়িতে আরম্ভ করিল। যুবক অশ্বারোহণে অগ্রে অগ্রে যাইতেছিল। উচ্চৈঃস্বরে সকলকে ডাকিয়া বলিল,—“ওরে, তোরা সকলে আয়! চক্রবর্তীদের শিব-মন্দির সম্মুখেই, রাস্তার ধারে। সেখানে আশ্রয় নেওয়া যাবে।” বেহারা ও সর্দারের তাড়াতাড়ি ছুটিতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

লুণ্ঠন

শিব-মন্দির প্রায় নিকটবর্তী হইয়াছে, এমন সময় চতুর্দিকে “রি-রি-রি-মার-মার” শব্দ উখিত হইল। সর্দার ও রক্ষীগণ প্রস্তুত হইবার পূর্বেই ভীষণ ব্যাঘ্রের ন্যায় পর্ভুগীজ ও বাঙ্গালী দস্যুগণ তাহাদের উপর লাঠি ও সড়কি বর্ষণ করিতে লাগিল। বেহারারা পাল্কা ফেলিয়া, রক্ষীরা অস্ত্র ফেলিয়া, সেই ভীষণ অন্ধকারে

দ্বিধ্বিদিকে বৃক-ভাঙিত শূন্যালেখ ন্যায় ছুটিয়া পলাইল। অন্ধকারে আছাড় পড়িয়া, হোঁচট খাইয়া গাছের বাড়ি খাইয়া যাহারা পলাইল তাহাদেরও অনেকে সাংঘাতিকরূপে আহত হইল। পাঁচজন গ্রহরী, দস্যুদের বিষম প্রহারে প্রাণত্যাগ করিল।

একজন মশালপারী মালী আক্রান্ত হইয়া, জ্বলন্ত মশালের আলনে আততায়ীকে দৃষ্ট করিবার জন্য প্রস্তুত হইলে একজন পর্তুগীজ দস্যু তাহাকে তরবারির ভীষণ আঘাতে কুখাণ্ডের ন্যায় দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিল। কয়েকজন সাংঘাতিকরূপে জখম হইল। দূরে অশ্বারোহী যুবকের কণ্ঠ হইতে একবার আর্ত চিৎকার শ্রুত হইতেছিল। কিন্তু এই ভীষণ দুর্যোগ ও পবনের মাতামাতির হুঙ্কারে সেই আর্ত চিৎকার গ্রামবাসী কাহারও কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। বৃষ্টিও যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া মুম্বলধারে পড়িতে লাগিল। যেমন সূচিভেদ্য অন্ধকার, তেমনি মেঘের ঘন ভীষণ গর্জন এবং তুমুল বর্ষণ। মাঝে মাঝে চকলা দামিনীলতা স্বর্ণকালের জন্য রূপের লহরী দেখাইয়া করাল জ্বলন্তীতে এই দুর্যোগের কেবল ভীষণতাই বৃদ্ধি করিতেছিল। দস্যুরাও সেই ভীষণ দুর্যোগে দ্রুত হইয়া পড়িল। তাহারা পালকীখানা তুলিয়া লইয়া নিকটবর্তী শিব-মন্দিরের বারান্দায় ঘাইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু সেখানেও বৃষ্টির ঝাণ্টা তাহাদিগকে সিন্ত ও বিপন্ন করিয়া তুলিল। তাহারা সেই অন্ধকারের মধ্যেই প্রস্তরের আঘাতে রুদ্ধ ঘরের তাল ভাঙ্গিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিল। তারপর চকমকি ঠুকিয়া আগুন জ্বলাইয়া মন্দিরের প্রদীপ জ্বলাইল। প্রদীপের আলোকে সমস্ত মন্দির উদ্ভাসিত হইল। মন্দিরটি নিতান্ত ক্ষুদ্র নয়। ভিতরের চূণকাম ধব্ ধব্ করিতেছে। একটি কাল প্রস্তরের বেদীর উপরে এক হস্ত অপেক্ষা দীর্ঘ সিন্দুরচর্চিত বিষ্ণুপদ্ম ও পুষ্প-পরিবেষ্টিত শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। পার্শ্বে একটি কুলঙ্গীর মধ্যে পঞ্চপ্রদীপ, কোষাকোষি, কতকগুলি সলিতা প্রভৃতি পূজার উপকরণ রহিয়াছে। দস্যুদের মধ্যে পনের জন শিবলিঙ্গ দেখিয়া “জয় শিব শঙ্কর বোম ভোলানাথ” বলিয়া একেবারে মাটিতে লুটাইয়া শিবলিঙ্গকে প্রণাম করিল। তারপর একজন বলিয়া উঠিল,—“বাবা ভোলানাথ! আজ তোমার আশীর্বাদেই আমরা সিদ্ধিলাভ করিয়াছি। এ দারুণ দুর্যোগে তুমি আমাদের আশ্রয় দিয়াছ।” অবশিষ্ট পাঁচজন পর্তুগীজ দস্যু, তাহারা প্রস্তরের এই বীভৎস লিঙ্গকে ভক্তি করিতে দেখিয়া অবাক হইয়া গেল! তাহারা আরও বিবিধ প্রকারের সুন্দর ও ভীষণ মূর্তির সম্মুখে হিন্দুদিগকে গড় করিতে দেখিয়াছে বটে, কিন্তু এমন উৎকলিঙ্গও যে উপাস্য দেবতা হইতে পারে, ইহা কখনও তাহাদের ধারণা ছিল না। একজন কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—“তোমাদের এ লিঙ্গ পূজার মটলব কি আছে?” তখন সেই বাঙ্গালী দস্যুদের মধ্য হইতে একজন হুটপুট বলিষ্ঠকায় উজ্জ্বল-চক্ষু যুবক বলিল,—“গডফ্রে! তুমি ক্রেস্তান, তুমি কি তাহা বুঝিতে পারিবে? লিঙ্গই যে

পরম বস্তু, লিঙ্গই তো স্রষ্টা, লিঙ্গ হইতেই তো আমরা জন্মিয়াছি। তাই লিঙ্গ পূজা করিতে হয়।”

গডফ্রে : হাঃ! হাঃ! হাঃ! লিঙ্গ হইতে জন্ম, বেশ কটা আছে। কিন্তু আমি মনে করি, লিঙ্গ পূজা টোমাডের... পক্ষে ভাল হয়। টোমরা পুরুষ মানুষ আছ,...টোমরা শিবের লিঙ্গটা পূজা করিতে যাইবে কেন? হাঃ! হাঃ! হাঃ! লিঙ্গ পূজা!!

এমন সময় পাক্কীর মধ্যে ফিক্রিয়ে ফিক্রিয়ে কাঁদিবার শব্দ শোনা গেল। সেই বলিষ্ঠকায় যুবকটি তখন পাক্কীর দরজা খুলিয়া প্রদীপটা লইয়া সম্মুখে ধরিয়া বলিল, “ঠাকুরাণি! ক্রন্দন করবেন না। ভয়ের কোনও কারণ নাই। আমরা আপনার কোন অনিষ্ট করবো না। আমরা যশোহরের অধীশ্বর প্রবল-প্রতাপ মহারাজ প্রতাপাদিত্যের লোক। মহারাজ আপনাকে বিবাহ করবার জন্য আপনার পিতা রাজা কেদার রায়ের নিকট পুনঃ পুনঃ প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু আপনার পিতা বহু সপত্নীর ভয়ে আপনাকে প্রতাপাদিত্যের করে সমর্পণ কোর্তে রাজি হননি; আপনি অবশ্য তাহা অবগত আছেন। তাই আপনাকে আমরা লুঠে নেওয়ার জন্য এক বৎসর পর্যন্ত সুযোগ অনুসন্ধান করছিলাম। আপনার কোনও ভয় নাই। আপনি আমাদের মহারাজের সর্বাপেক্ষা পেয়ারের রাণী হবেন। চল্লিশ রাণীর উপরে আপনি আধিপত্য কোর্বেন। আর একরূপ লুঠে নেওয়ায় আপনার পিতার পক্ষে কোন কলঙ্কের কথা নাই। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের তর্গী সুভদ্রা দেবীকে মহাপুরুষ অর্জুন হরণ করেছিলেন। তাহাকে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের প্রতি ক্রুদ্ধ হওয়ার পরিবর্তে বরং অনুরাগীই হয়েছিলেন।” এমন সময় দরজায় যুগপৎ ভীষণ পদাঘাত ও বীর কণ্ঠে “কোন হ্যায়! দরওয়াজা খোল” শ্রুত হইল। ভীষণ পদাঘাতে দ্বারের ভিতর দিকের হাড়কা ডাঙ্গিয়া দ্বার খুলিয়া গেল। সহসা কম্পিত শিখা-প্রদীপের ক্ষীণালোক সেই আগন্তুকের মুখের উপর পড়ায় দস্যুরা কম্পিত হৃদয়ে দেখিল,—এক তেজঃপুঞ্জ-বীরমূর্তি, উলঙ্গ-কৃপাণ-পাণি উষ্ণীষ-নীর্ষ মুসলমান যুবক, রোষ-কষায়িত-লোচনে মন্দির-প্রবেশে উদাত। যুবকের প্রশস্ত ও উজ্জ্বল চক্ষু হইতে কালানলজ্বালা নির্গত হইতেছে। দস্যুরা মুহূর্তমধ্যে লাঠি তরবারি লইয়া প্রহার-উদাত-বাহু হইয়া হুঙ্কার করিয়া কহিল,—“কে তুমি? তুমি এখানে কেন? পলায়ন কর, এ শিব-মন্দির, এখানে মুসলমানের আশ্রয় নাই।” দস্যুদের কথা শেষ হইবার পূর্বেই যুবকের ভীষণ তরবারি-আঘাতে একজন দস্যুর বাহু ছিন্ন এবং অপরের স্বক ভীষণরূপে কাটিয়া গেল। তখন দস্যুগণ প্রমাদ গণিয়া সকলে ভীষণ তেজে এক সঙ্গে তাঁহার উপর বন্ধের ন্যায় নিপতিত হইবার উপক্রম করিল। যুবক কৌশলে দ্বারের বাহিরে আসিয়া একপার্শ্বে তরবারি তুলিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। আক্রমণোদাত-দস্যু-মস্তক দ্বারের ভিতরে আসিবামাত্রই তাঁহার শাণিত কৃপাণের বস্ত্র প্রহারে ছিন্ন হইতে লাগিল। লাঠি ও

ঐশ্বর্যের দর্শনে ওরবারির আঘাতে খণ্ড খণ্ড হইয়া ছুটিয়া পড়িল। অল্প সময়ের মধ্যেই পাচজন নিহত এবং সাতজন ভীষণরূপে জখম হইল। রক্তধারা আসিয়া বাহিরের বৃষ্টিধারার সঙ্গে মিশিতে লাগিল। যুবকের বীর বিক্রম এবং অল্প সংজ্ঞালনের অযোগ্যতা দর্শনে অবশিষ্ট গভুগীজ ও হিন্দু দস্যুগণ ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। সকাল বীর যুবকের পদে নিব্বীহ মেঘের ন্যায় আত্মসমর্পণ করিবার জন্য আকুল হইয়া উঠিল। কিন্তু গড়ফ্রে তাহার বন্ধকণ্ড নিনাদিত করিয়া কহিল, “কভি নেই, আভি হাম তটে করে গা।” সে এই বলিয়া যুবককে লক্ষ্য করিয়া পিস্তল ছুঁড়িল। যুবক চকিতে মাটিতে বসিয়া পড়িলেন। পিস্তলের গুলী মাথার উপর দিয়া বোঁ করিয়া চলিয়া গেল। যুবক পর মুহূর্তে চকিতে লক্ষ্য প্রদান করিয়া প্রসারিত করে ওরবারি আক্ষালন করিলেন। ওরবারি নামিবার সঙ্গে সঙ্গেই মহাকায় গড়ফ্রে মস্তকটি গ্রীবাচ্যুত হইয়া পক্ষু তালের মত সশব্দে ভূপতিত হইল। অবশিষ্ট দস্যুগণ ভয়ে আড়ষ্টপ্রায় হইয়া মন্দিরের মধ্যে কাঁপিতে লাগিল। শিব-মন্দিরে মাত্র একটি দ্বার, সুতরাং দস্যুদিগের পলায়ন করিবার উপায় ছিল না। এক সঙ্গে সকলে মিলিয়া আক্রমণ করিবারও সুবিধা ছিল না। যুবক দ্বার অবরোধ করিয়া দণ্ডায়মান। দুইজনের বেশী একসঙ্গে দ্বারের ভিতরে পাশাপাশি দাঁড়ান যাইতে পারে না।

যে দ্বারের নিকটবর্তী হইতেছিল, তাহারই মস্তক যুবকের অসি-প্রহারে ভূ-চূষন করিতেছিল। দস্যুগণ প্রাণ-ভয়ে আতঙ্কিত হইয়া প্রদীপ নির্বাণিত করিয়া অন্ধকারে সমস্ত অবস্থায় মন্দিরের মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিল। প্রদীপ নির্বাণিত হওয়ায় সমস্তই ভীষণ অন্ধকারে ডুবিয়া গেল। চতুর্দিকে কেবল অন্ধকার—আর অন্ধকার! নিজের শরীর পর্যন্তও দেখা যাইতেছে না। দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া যুবক অবিরল বারিধারায় সিক্ত হইতেছিলেন। বৃষ্টি তখনও ঘন ধারায় আবরায় বর্ষিতেছিল। বাতাস ছড়ার দিয়া এক একবার বড় বড় গাছের মাথা দোলাইয়া পাতা উড়াইয়া প্রবাহিত হইতেছিল। যুবক অন্ধকারে দাঁড়াইয়া ভাবিলেন, “দ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে, সুতরাং অন্ধকারের মধ্যে অলক্ষ্যে আসিয়া দস্যুগণ সহসা আক্রমণ করিতে পারে।” এজন্য দরজা টানিয়া বাহির হইতে বন্ধ করায় দস্যুরা আরও ভীত হইয়া পড়িল। রাত্রি প্রভাত হইবা মাত্র অথবা বৃষ্টি ও দুর্যোগ ধামিয়া গেলে আরও লোকজন আসিয়া পড়িতে পারে। তাহার বন্দী হইলে কেদার রায় যে জীবন্ত প্রার্থিত করিবেন, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তখন দস্যুরা মন্দিরের ভিতর হইতে অতীব কক্ৰণ কর্তে বলিয়া উঠিল, “হুজুর! আমাদিগকে আন্তাহর ওয়াস্তে মাফ করুন। আমরা নরাধম প্রতাপাদিতের প্ররোচনায় বড়ই অন্যায় কার্যে হস্তক্ষেপ করেছিলাম। আমাদের সমুচিত শিক্ষা ও দণ্ড হয়েছে। দোহাই আপনার, আমাদিগকে রক্ষা করুন। আমরা মা কালীর নামে শপথ করছি, জীবনে কদাপি আর এমন কার্যে লিপ্ত হব

না।”

দস্যুদের কাতরোক্তি শুনিয়া বীর যুবক হস্তার করিয়া উঠিলেন। তাঁহার হস্তারে ঝটিকা যেন ক্ষণকালের জন্য ত্তিত হইয়া গেল। যুবক বলিলেন, “রে নব্বাধম পাষণ্ডগণ, তোদের মত কাপুরুষগণকে বধ করে কোন মুসলমান কখনও তাঁর তরবারিকে কলঙ্কিত করেন না। কিন্তু সাবধান! আর কখনও পরত্রী বা কন্যা হরণ-রূপ জঘন্য কার্যে লিপ্ত হস না। এখন তোরা মন্দিরের প্রদীপ জ্বলে অস্ত্রশস্ত্রে রেখে আমার সম্মুখ দিয়ে একে একে বের হয়ে চলে যা। আমি তোদের অভয় দিচ্ছি। খোদা তোদের সুমতি দিন। খোদা সর্বদা জেগে আছেন, ইহা বিশ্বাস করিস। আমি খিজিরপুরের ইসা খাঁ। বিশেষ কোনও প্রয়োজনে মুরাদপুরে যাচ্ছিলাম। কিন্তু পরমেশ্বরের কি অপূর্ব কৌশল! তিনি আমাকে পঞ্চ ভুলিয়ে এদিকে নিয়ে এসেছেন। তাই আজ কেদার বায়ের কন্যা পেল এবং তোরা সমুচিত শিক্ষা লাভ ও শাস্তি ভোগ করলি!”

দস্যুরা বারভূইয়ার অধিপতি প্রবলপ্রতাপ নবাব ইসা খাঁ মসজিদ-ই-আলীর নাম শুনিয়া আরও বিস্মিত, চমৎকৃত এবং ভীত হইয়া পড়িল। কক্ৰণ কণ্ঠে কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল, “হজুর! আমাদের বেআদবী মাফ করুন! হজুরকে আমরা চিনতে পারি নাই। হজুরকে চিনতে পারলে, আমরা তখনই হজুরের পায় আত্মসমর্পণ করতাম। তা আমাদের মত ছোটলোক হজুরকে চিন্বে কি করে, হজুর! আমরা এ কাজে প্রথমে কিছুতেই রাজী হচ্ছিলাম না। মহাপাতক মনে করে ভীত হয়েছি। কিন্তু আমাদের দেশের রাজসভার সেই বড় বামুন ঠাকুর আমাদের সামনে তার লম্বা টিকি নেড়ে তালপাতার কি এক সংহিতা না পুঁধি খুলে বলে যে, ‘কন্যা চুরি করে বিবাহের ব্যবস্থা শাস্ত্রে আছে। এতে কোন পাতক নেই।’ তাই আমরা রাজী হয়ে এক বৎসরকালে দাঁও খুঁজে বেড়াচ্ছি। আজ সুযোগ পেয়েছি! কিন্তু খুব শিক্ষা হল।”

ইসা খাঁ স্বাভাবিক মিষ্ট স্বরে তেজের সহিত বলিলেন, “সে বামুন ঠাকুর হয়ত শাস্ত্রের কিছু জানে না। শাস্ত্রে এমন পাপ-কথা লেখা থাকে না। যদি থাকে তবে তা শাস্ত্র নয়।”

দস্যু : আজ্ঞে, আমাদের শাস্ত্রে নাকি সেরূপ বিধি আছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কল্মষীকে হরণ করেছিলেন। অর্জুন আবার ভগবানের শুগ্নী সুভদ্রাকে নাকি হরণ করে বিয়ে করেছিলেন।

ইসা খাঁ : আরে, সে গর্ভস্রাব ব্রাহ্মণ তোদের ফাঁকি দিয়েছে। সে বেটা দেখছি তোদের শাস্ত্রের মর্ম বোঝে নাই। অথবা টাকার লোভে কুটার্থ করেছে। বর ও কনে যদি উভয়ে উভয়কে নিজ ইচ্ছায় স্বামী-স্ত্রীরূপে বরণ করে থাকে, আর কনের পিতামাতা যদি কনের সেই বিবাহের প্রতিবাদী হয়, তবে সেই কন্যাকে হরণ করে নিলে পাপ হয় না। কিন্তু সে যে প্রাচীন কালের ব্যবস্থা।

দস্যু : “আজ্ঞে এতক্ষণে বুঝুন। হজুর ঠিক বলেছেন। হজুর দেখছি সেই বামুন ঠাকুরের চেয়ে আমাদের শত্রু ভাল বুঝেন। হজুর! আমরা আর এমন পাপকর্ম কখনই করবো না।” দস্যুরা এই বলিয়া প্রদীপ জ্বালাইল এবং অস্ত্রশস্ত্র বাধিয়া কক্ষিত পদে বাহির হইল। ইসা খাঁ প্রদীপের আলোকে দেখিলেন, পাঁচজন আহত ওখনও জীবিত আছে। দরদর ধারায় তাহাদের রক্তস্রাব হইতেছে। তাহাদের শোচনীয় অবস্থায় প্রাণে বড়ই ক্রেশ বোধ করিলেন। দুঃখে বলিলেন, “হা হতভাগারা! এমন কার্য কেন কোর্তে এসেছিলি!” তৎপরে নিজের বহুমূল্য উজ্জীর্বা ছিড়িয়া স্বহস্তে তাহাদের আহত স্থানে পটী বাঁধিয়া দিলেন। দস্যুরা ইসা খাঁর মহত্ব দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া পড়িল। একজন রাজার যে এতখানি বীরত্বের সহিত এতখানি দয়া থাকিতে পারে, তাহা প্রতাপাদিত্যের মত পাষাণ দস্যু-বাবসায়ী রাজার রাজ্যবাসী লোকের পক্ষে ধারণা করিবারও শক্তি ছিল না। ইসা খাঁ পটী বাঁধিয়া দিয়া বলিলেন, “যা, এখন তোরা শীঘ্র শীঘ্র পালা। রাত্রি প্রভাত হলে কেদার ঝায়ের এলাকায় থাকা নিরাপদ নহে।”

দস্যুরা দ্রুতপদে বর্ষাপ্রাবন-তাড়িত শৃগালের ন্যায় যারপর নাই শোচনীয় অবস্থায় দ্রুতপদে সেই দুর্যোগের মধ্যে প্রস্থান করিল।

ইসা খাঁ অতঃপর মন্দিরের মধ্যে সেই জলসিক্ত অবস্থায় প্রবেশ করিলেন। প্রদীপের আলোতে দেখিলেন পাঁচ জন পর্তুগীজ দস্যু এবং দুইজন হিন্দু দস্যু নিহত হইয়া বীভৎস অবস্থায় সেই মন্দিরের তলে পড়িয়া রহিয়াছে। সমস্ত মন্দির রক্তে ভাসিতেছে। ইসা খাঁ সেই সাতটি দেহ লইয়া বাহিরে দূরে রাস্তার পার্শ্বে একটা গর্তে ফেলিয়া দিলেন। তারপর বাহির হইতে অঞ্জলি করিয়া জল সৈঁচিয়া মন্দিরের ভিত্তর যথাসম্ভব ধুইয়া ফেলিলেন। বর্ণময়ী পান্ডীর ভিতর হইতে বাহির হইয়া ইসা খাঁর পদস্পর্শ করিল। তাহার পর হাস্যমুখে বলিল, “ভাগ্যে আপনি এসে পড়েছিলেন।”

ইসা খাঁ বলিলেন, “সে জন্য পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দাও। সমস্তই তাঁর কৃপা।”

বর্ণ : তা কি আর বলতে আছে। তাঁর কুদরতের সীমা নাই। আমি যে আজ উদ্ধার পাব, তা স্বপ্নেও ভাবি নাই। আমি আতঙ্কে আড়ষ্ট হয়ে আত্মহত্যার সঙ্কল্প এঁটে বসেছিলাম; সমস্ত শরীর ঘৃণা, ক্ষোধ ও ভয়ে কাঁপিতে ছিল, হয়ত এতক্ষণ আমি মৃতদেহে পরিণত হতেম। ধন্য ষোদাতালা! কবি সত্যই বলেছেন—

‘কাদেরা কুদরত তু দারী হরছে বাহি ঝাঁকুনী,

মোরদারা তু জানে ববশি, জেন্দারা বে-ঝাঁকুনী।

হে মহিমাময়! ধন্য তোমার মহিমার অল্পত কৌশল! তুমি মৃতদেহে জীবিতকে মৃত ও মৃতকে জীবিত কর।”

ইসা খাঁ : আজ্ঞা, তোমাদের এত রাত হল কেন? সঙ্গে কত লোক ছিল?

স্বর্ণ : প্রথমতঃ মাথাভাঙ্গা নদীর ঘাট পার হতে অনেক বিলম্ব হয়। বেয়া নৌকাখানি ভাঙ্গা ছিল। তারপর হরিশপুরের চটির কাছে এসে গরমের জন্য সকলেই বিশ্রাম করতে থাকে। সঙ্গে আট জন বেহারা, বার জন রক্ষী, তিন জন ভারী, দুই জন মশালচী এবং দাদা ছিলেন।

ঈসা খাঁ : তোমার দাদাও ছিলেন? তিনি কোথায়? তিনি কি ঘোড়ায় ছিলেন?

স্বর্ণ : হাঁ, তিনি ঘোড়ায় চড়ে আগে আগে যেতেছিলেন।

ঈসা খাঁ : তাঁকে তো দস্যুরা আক্রমণ করে নাই?

স্বর্ণ : কেমন করে বলব? কয়েকবার তাঁর উচ্চ চীৎকার শুনেছিলাম। সম্ভবতঃ তিনি ঘোড়া হাঁকিয়ে দূরে চলে গিয়েছেন।

ঈসা খাঁ : তোমাদের এতগুলি লোক থাকতে, বিশেষতঃ বার জন রক্ষী, তাহাতে দস্যুরা আক্রমণ করিল কোন্ সাহসে?

স্বর্ণ : আমাদের সকলেই অপ্রস্তুত ও গাফেল ছিল। দস্যু আক্রমণ করবে এ কখনও ভাবি নাই। সর্দার সঙ্গে আনা, কেবল ভড়ঙের জন্য। রক্ষীদের মধ্যে সকলেই চাঁড়াল, পর্তুগীজ ও বাগ্দি। ওরা যতই লক্ষ্যবশত করুক না, হঠাৎ বিপদে পড়লে ওরা একেবারেই হতবুদ্ধি হয়ে যায়। ওদের পাঁচ জনের কাছে বন্দুক ছিল। কিন্তু বন্দুকের নলের উপর লাঠি পড়বামাত্রই বন্দুক ফেলে পালিয়েছে। যা হউক, আপনি আর ভিজ্জে কাপড়ে থাকবেন না, অসুখ কোর্তে পারে। আপনি বড়ই শ্রান্ত হয়েছেন। কাপড় বদলান। পাক্কীর ভিতরে আমার কয়েকখানি শাড়ী আছে।

স্বর্ণময়ী এই বলিয়া তাড়াতাড়ি পাক্কীর ভিতর হইতে কাপড় বাহির করিয়া দিল। ঈসা খাঁর সমস্ত বস্ত্রই ভিজিয়া গিয়াছিল। তিনি তাহা পরিত্যাগ করিয়া স্বর্ণময়ীর প্রদত্ত শাড়ী দুই ভাঁজ করিয়া তহবন্দের মত পরিধান এবং আর একখানি লইয়া গায়ে দিলেন। স্বর্ণময়ী তাহার সিন্ধু ইজার, পাগড়ী, চাপকান, কোমর-বন্ধ প্রভৃতি নিংড়াইয়া দেওয়ালের গায়ে শুকাইতে দিল এবং পাক্কীতে যে গালিচাখানা বিছানো ছিল, তাহাই বাহির করিয়া মন্দির-তলে বিছাইয়া দিল। ঈসা খাঁ গালিচায় ফরাগৎ মত বসিয়া একটু আরাম বোধ করিলেন। স্বর্ণময়ী পাক্কী হইতে পানদানী বাহির করিয়া ঈসা খাঁকে দুইটি পান দিল। ঈসা খাঁ আনমনে পান চিবাইতে লাগিল। স্বর্ণময়ী গালিচার এক প্রান্তে বসিয়া ঈসা খাঁর তেজোজ্বল সুন্দর বদনমণ্ডল পিপাসার্ত নয়নে পুনঃ পুনঃ দেখিতে লাগিল।

বাল্য ও কৈশোরের সেই সুপরিচিত মুখখানায় আজ যেন কি এক মর্দিনাময় সৌন্দর্য দেখিতে পাইল। তাহার শরীরের প্রত্যেক অণু-পরমাণুর নিকট ঈসা খাঁ আজ যেন কি প্রিয়তম, মিষ্টতম এবং সুন্দরতম বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তাহার হৃদয় ঘন ঘন স্পন্দিত হইতে লাগিল। লজ্জায় তাহার মুখমণ্ডল আরক্তিম হইল। প্রাণের ভিতরে ঈসা খাঁর জন্য কি এক তীব্র চৌকক আকর্ষণ অনুভব

কাঁতে লাগিল। স্বর্ণময়ী হৃদয়ে অনেকের কথা আলোচনা করিল, অনেকের মূর্তি
 মানসপটে অঙ্কন করিল, কিন্তু ঈসা খাঁর কাছে সকলেই মলিন হইয়া গেল। ঈসা
 খাঁর নায় হৃদয়বান সুন্দর বীরপুরুষ, যুবতী আর কাহাকেও পৃথিবী অনুসন্ধান
 করিয়াও দেখিতে পাইল না। ঈসা খাঁ বাল্যকাল হইতেই তাহাকে আনন্দ দিয়া
 আসিয়াছে। কিন্তু আজ যেন সে আনন্দ শতগুণে উর্ধ্বলীয়া উঠিয়াছে। স্বর্ণময়ী
 ঈসা খাঁর সম্বন্ধে অনেক চিন্তা করিল। কত উজ্জ্বল স্মৃতি তাহার মনে পড়িল।
 সেই পাঁচ বৎসর হইল, একদিন স্বর্ণময়ী শ্রীপুরের কৃষ্ণদীঘিতে সাঁতরাইতে গিয়া
 মাঝখানে ডুবিয়া মরিতেছিল! শত শত লোক পাড়ে দাঁড়াইয়া আতর্কণ্টে চীৎকার
 করিতেছিল। ঈসা খাঁ তাহাদের বাটীতে পুণ্যাহ উপলক্ষে নিয়ন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত
 ছিলেন। তিনি মুহূর্ত মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন।
 কতদিন রাজবাড়ীর গুল্লাদ মৌলানা ফখরউদ্দীনের নিকট নিজামীর সেকান্দর-
 নামা, জামীর জেলেকা এবং ফেরদৌসীর শাহনামার যে সমস্ত অংশ ভাল করিয়া
 বুঝিতে পারে নাই, ঈসা খাঁ তাহাকে তাহা কত সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন।
 সেই একবার রাজবাড়ীর নিকটবর্তী জঙ্গলে একটি ভীষণ বাঘ আসিয়া কত
 লোককে খুন জ্বম করিতেছিল। বড় বড় শিকারীরাও হাতীতে চড়িয়া শিকার
 করিতে সাহস পাইতেছিল না। তারপর ঈসা খাঁ আসিয়া সকলের নিষেধ ও ভীতি
 অগ্রাহ্য করতঃ একদিন প্রাতঃকালে তরবারি-হস্তে যাইয়া বিনা হাতীতে সেই বাঘ
 একাকী মারিয়া আনিয়া সকলের বিশ্বয় উৎপাদন করিয়াছিলেন। ইত্যাকার বহু
 সুখ ও আনন্দময় স্মৃতি একে একে তাহার মনে পড়িতে লাগিল এবং ঈসা খাঁকে
 তাহার হৃদয়ের সম্মুখে এক অপূর্ব সৌন্দর্য ও ক্ষমতালী হৃদয়বান পুরুষরূপে
 প্রতিভাত করিল। উষার আলোক যেসন তাহার অপূর্ব যাদুকরী তুলিকায়
 অক্ষরাক্ষর পৃথিবীর চক্ষুর সম্মুখে নীলাকাশের নীরদমালাকে বিবিধ বিচিত্র
 মনঃপ্রাণ-বিমোহনরূপে সাজাইয়া দেয়, তেমনি অতীতের স্মৃতি বর্তমান ঘটনার
 তুলিকায় বিচিত্র উজ্জ্বল রং ফলাইয়া যুবতীর মানস-চক্ষে ঈসা খাঁকে তাহার
 হৃদয়ের প্রিয়তম, সুন্দরতম এবং শেষে আকাঙ্ক্ষিতজনরূপে অঙ্কিত করিল! যুবতী
 শিহরিয়া উঠিল। তাহার আপাদমস্তকে কি এক বিদ্যুতের তরঙ্গ প্রবাহিত হইল।
 যুবতী প্রতর্কণ পর্যন্ত ঈসা খাঁর অনিন্দ্যসুন্দর তেজোদ্ভীর্ণ বদনমণ্ডল এবং সুদীর্ঘ
 কৃষ্ণভারা সমুজ্জ্বল ভাসা ভাসা চক্ষুর সৌন্দর্য-সুধা পান করিতেছিল। কিন্তু আর
 পারিল না, লজ্জা আসিয়া তাহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও চক্ষুকে নত করিয়া দিল।

যুবতীর হৃদয়ের উপর দিয়া কত কি চিন্তার তুফান ও ভাবের তরঙ্গ প্রবাহিত
 হইয়া যাইতেছে, কিন্তু ঈসা খাঁ আনমনে পানই চিবাইতেছেন। পান চিবান শেষ
 হইলে—ছিবড়া ফেলিয়া যুবক একবার নেত্র ফিরাইয়া যুবতীর দিকে তাকাইয়া
 কহিলেন, “স্বর্ণ! এখন কি করা যায়? বৃষ্টি ও তুফান এখনও তো সমানভাবে
 চলেছে, তুমি পাণ্ডীর ভিতরে গুয়ে পড়, অনেক রাত হয়েছে। শেষে অসুখ করতে

পারে। বৃষ্টি ধামলে যা হয় একটা বন্দোবস্ত করবো।”

যুবকের আহ্বানে পুনরায় কি যেন একটা তড়িৎ স্রোত যুবতীর হৃদয়ে প্রবাহিত হইল। যুবতী গলাধরা-স্বরে বলিল, “আমার ঘুম আসছে না। আপনি অনেক হয়রান হয়েছেন, আপনি বরং ঘুমান।” তারপর একটু ধামিয়া যুবতী আবার বলিল, “আচ্ছা, আপনি কোথায় যাচ্ছিলেন, এখানে এ সময় কেমন করে এলেন?”

যুবক : কেন? সে কথা তুমি এতক্ষণে জিজ্ঞাসা করছ যে?

যুবতী : আপনাকে পরিশ্রান্ত ভেবেই প্রথমে কিছু জিজ্ঞাসা করি নাই। তবে আপনি যে মুরাদপুরে যাচ্ছিলেন, তখন তা দস্যুদিগকে বলেছিলেন।

যুবক : হাঁ, মুরাদপুরেই যাচ্ছিলেম। সেখানে একটা গ্রামের সীমা নিয়ে, আমার অধীন দুইজন জমিদারের মধ্যে ঝগড়া হয়েছে। সেখানে পূর্বেই লোক পাঠিয়েছি। আরো লোক সঙ্গে ছিল। ঝড় উঠে এলে, আমি ভট্টচার্যদের বাড়িতে আশ্রয় নেবার জন্য দ্রুতগতিতে অশ্ব চালনা করায় তারা পিছনে পড়েছে। অন্ধকারে পথ হারিয়ে ঘুরতে ঘুরতে এই রাস্তায় এসে পড়ি। মন্দিরের নিকটবর্তী হলে, বহু লোকের কোলাহল শব্দ শুনে ও গবাক্ষের ভিতর দিয়ে গৃহের আলো দেখে এখানে আশ্রয় নেব মনে করে ঘোড়া হতে নামি। এটা যে শিবমন্দির তা অন্ধকারে কিছু টের পাইনি। আমি বৈঠকখানা মনে করেছিলাম। মন্দিরের দ্বারের সম্মুখবর্তী হইবামাত্রই প্রতাপাদিত্যের লোকেরা তোমাকে লুঠ করে নিয়ে যাচ্ছে, তা তাদের কথা থেকে বেশ বুঝতে পেলাম। ব্যাপার গুরুতর মনে করে আমি ঘোড়াটাকে তাড়াতাড়ি এই সম্মুখের গাছের নীচে রেখে বিদ্যুতালোকে মন্দিরটি একবার বেশ ভাল করে দেখে নিলাম। দেখলাম যে, একটি ব্যতীত মন্দিরের দ্বিতীয় দ্বার নাই। দস্যুদের পালাবার কোন উপায় নাই। তখন দ্বারে পদাঘাত করি।

যুবতী : ধন্য আপনার হৃদয়! ধন্য আপনার সাহস ও বীরত্ব!! আপনি একাই অতগুলি দস্যুকে আক্রমণ করে জয়লাভ করলেন। ভগবান আপনার দীর্ঘজীবন ও মঙ্গল করুন।

যুবক : এ আর বেশী সাহসের বা বীরত্বের কথা কি, স্বর্ণ! দস্যুরা বলশালী হলেও, অস্তুরে তারা অত্যন্ত ভীক। যারা পাপকার্য করে, তারা মানসিক বলশূন্য। বাহিরে তারা যতই আশঙ্কান করুক না কেন, ভিতরে অত্যন্ত ভীত ও কণ্ঠিত। আর তোমাকে বিপদগ্রস্ত দেখে, তোমাকে উদ্ধার করবার জন্য আমার এমন উদ্বেগজনক এসে পড়েছিল যে, আমি তখন আমার নিজের কোনও বিপদের বা দস্যুদের সংখ্যার বিষয় আদৌ খেয়াল করি নাই।

যুবতী : আপনি আমাকে দু'বার রক্ষা করলেন।

যুবক : আমি কে, যে রক্ষা করব? খোদা রক্ষা করেছেন। আর দু'বার

কোথায়?

যুবতী : খোদাই বন্ধা করবেন সভা, কিন্তু আপনি তো উপলক্ষ বটেন। দু'বার নয় কেন? এই একবার, আর সেই যে কৃষ্ণদীঘি থেকে; ভুলে গেছেন নাকি?

যুবক : না, ভুলে যাইনি। কিন্তু সেবার আরো লোক তো তোমাকে তুলবার জন্য জলে ঝেঁপ পড়েছিল।

যুবতী : পড়েছিল বটে, কিন্তু সে অনেক পরে, আপনি তখন আমাকে তুলে নিয়ে দীঘির প্রায় কেনারায় এসেছিলেন। আপনি না তুললে সেদিন আর এতদূরেই ডুবে যেতাম।

যুবক : তুমি যাতে ডুবে না যাও, সেই জন্যই খোদা আমাকে তখন ওখানে রেখেছিলেন। কেন? সে কথা এখন তুললে যে!

যুবতী : না, এমনি মনে প'ল। তবে আমি যখন বিপদে পড়ি, তখনই যে খোদা আপনাকে আমার উদ্ধারকর্তা করে পাঠান এ এক চমৎকার রহস্য।

ইহা বলিয়া যুবতী মন্দিরস্থ শিবলিঙ্গের দিকে আনমনে একবার দৃষ্টি করিল এবং মনে মনে কি যেন ভাবিয়া একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল।

যুবক : তাঁর সবই রহস্য। তাঁর কোন্ কার্যে রহস্য নাই? তাঁর সবই বিচিত্র। ভাবলে অবাক হতে হয়।

যুবতী : যা হক, আপনি না এলে, উঃ! কি একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার সংঘটিত হত! আপনাকে দেখে আমার বড়ই সুখ ও আনন্দ হচ্ছে। আপনার কথা আমরা সর্বদাই শ্রবণ করি। এবার পুণ্যাহে কত বিনয় করে আপনাকে নিমন্ত্রণ করা হল; তথাপি এলেন না। আপনি না আসায় পুণ্যাহের আমোদও তেমন হয় নাই। আপনি আসবেন বলেই মালাকরেরা কত ভাল ভাল বাজি তৈয়ার করেছিল। বাবা আপনার জন্য কত দুঃখ প্রকাশ করলেন।

যুবক : কি করবো স্বর্ণ! তোমাদের ওখানে আসতে আমারও খুব আনন্দ ও ইচ্ছা হয়, কিন্তু কেবলা সাহেবের মৃত্যুর পর হতে বিষয়কর্ম নিয়ে এমনি ফ্যাসাদে পড়েছি যে, একটু ফরাগৎ মত দম ফেলবারও আমার অবসর নাই। সর্বদাই মহালে বিদ্রোহ হচ্ছে। সীমা নিয়ে জমিদারের সঙ্গে প্রায়ই লড়াই চলছে। দায়ুদ খাঁর পতনের পরে বাঙ্গালা দেশ কেমন অরাজক হয়ে পড়েছি। এদিকে আকবর শাহ সমস্ত বাঙ্গালা এখনও দখল করতে পারেননি।

যুবতী : যাক, সে সব কথা। আপনার বিবাহের কি হচ্ছে?

যুবক : এখনও বিবাহের কিছু হয়নি। কিছু হলে তোমরাও জেয়াকতই পেতে। যা মাঝে মাঝে বিবাহের কথা বলেন। তবে আমি এখনও বিবাহ সম্বন্ধে বড় একটা কিছু ভাবি নাই।

যুবতী : এত বয়স হয়েছে। এখনও বিয়ে করবেন না?

যুবক : তা আর বেশী কি? এই তো সবে পঁচিশে পড়েছি। আমাদের মধ্যে

৩০ বৎসর বয়সের পূর্বে প্রায় বিয়ে হয় না। হিন্দুদের মত আমাদের মধ্যে বাল্য-বিবাহ নাই।*

যুবতী : বাল্য-বিবাহটা বড়ই খারাপ!

যুবক : নিশ্চয়ই। তাতে দম্পতির স্বাস্থ্য যে কেবল নষ্ট হয়, তা নয়। তাদের সন্তানেরাও অত্যন্ত দুর্বল, ক্ষীণ-জীবী এবং রোগপ্রবণ হয়। যে সব দোষের জন্য তোমাদের হিন্দুরা মুসলমানের অপেক্ষা দুর্বল, সাহসহীন ও ভীর্ণ, তাহার মধ্যে এও একটি প্রধান কারণ।

যুবতী : কিন্তু আপনার এখন বিবাহ করা উচিত।

যুবক : তা দেখা যাবে।

যুবতী : খুব সুন্দরী ও প্রেমিকা দেখে বিয়ে করবেন।

যুবক : সুন্দরী ও প্রেমিকা তো চাই-ই বটে। কিন্তু বিয়ে করলে বলিষ্ঠা ও সাহসিনী দেখেও করা চাই।

যুবতী : কেন?

যুবক : তাহলে সন্তানাদিও বলিষ্ঠ ও বীরতাবাপন্ন হবে।

যুবতী : আপনার ছেলে এমনি বীরপুরুষ হবে। আপনার সাহস ও বীরত্বের চার ভাগের এক ভাগ পেলেই সে ছেলে বাঘ আছড়িয়ে মারবে।

যুবক : কেবল পিতা বীরপুরুষ হলেই হয় না, মাতাও বীর্যবতী ও সাহসিনী হওয়া চাই।

যুবতী : তা'হলে স্ত্রীলোকদিগেরও শারীরিক নানাপ্রকার ব্যায়াম এবং অস্ত্রচালনা-কৌশল শিক্ষা করা চাই।

যুবক : নিশ্চয়ই।

যুবতী : তা'হলে আপনাদের মধ্যে স্ত্রীলোকেদেরও ব্যায়াম-চর্চা করে?

যুবক : হাঁ, সম্রাট বংশের সকল স্ত্রীলোককেই যুদ্ধ শিখতে হয়। আগে এ প্রথা আরও বেশী ছিল। কিন্তু বাঙ্গালা দেশে এসে মুসলমানেরাও কেমন বিলাসী, অলস ও দুর্বল হয়ে পড়ছে।

যুবতী : আমি তো একটু তীর ও তরবারি চালনার অভ্যাস করেছি। কিন্তু বাবা ব্যতীত আর সকলেই তার জন্য আমাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে—বলে যে, “মর্দামী শিখছে।”

যুবক : তবে তা আজ দস্যুরা বড় বেঁচে গেছে!

যুবতী : আপনি বিদ্রূপ কচ্ছেন, কিন্তু আমার হাতে অস্ত্র থাকলে আমি দস্যুদিগের সঙ্গে নিশ্চয়ই যুদ্ধ করতাম।

যুবক : বেশ কথা! আমি শুনে খুশী হ'লেম। এইবার একটা বীর পুরুষ দেখে বিয়ে দিতে হবে। দেখা শেষে কোনো কাপুরুষকে শাদী না কর।

*: ৭০/৮০ বৎসর পূর্বে বাঙ্গালা দেশে মুসলমান সমাজে বাল্য-বিবাহ অস্তিত্ব ছিল।

যুবকের কথা শুনে যুবতীর গোলাপী গণ্ড লজ্জার আক্রমণে পক্ষ বিধ্বংস রক্তিম হইয়া উঠিল। যুবতীর গণ্ডে ও চক্রে লজ্জার আবির্ভাব হইলেও, মনটা কেমন যেন একটা আনন্দ-রসে সিক্ত হইয়া গেল।

এদিকে বৃষ্টি ধরিয়া যাওয়ার, ঈসা বাঁ যুবতীকে বলিলেন, “স্বর্ণ! তুমি এখন শোও। আমি বাইরে ঘেয়ে আকাশের অবস্থাটা দেখে আসি।”

যুবক এই বলিয়া দ্বার খুলিয়া বাইরে গেলেন। দেখিলেন মেঘ-বিমুক্ত আকাশ নিম্নলিখিত মালিন্য ছুটাইয়া তারকা-হায়ে সজ্জিত হইয়া হাস্য করিতেছে। পূর্বদিকে নশমীর চন্দ্র ক্ষুদ্র একষণ্ড কক্ষ জলদের শিরে চড়িয়া বৃষ্টিশ্রাতা পৃথিবীসুন্দরীর পানে চাহিয়া হাসিয়া উঠিয়াছে। নববধু অতি প্রত্যাষে গোপন স্নানান্তে ঘাট হইতে ঘাটী ফিরিবার পথে নশমীর সহিত দেখা হইলে যেমন লজ্জায় ও হৃদয়-চাপা-আনন্দে ইধং আরক্ত ও প্রকৃত হইয়া উঠে, সদাশ্রাতা ধরণীসুন্দরীও তেমনি চন্দ্র দর্শনে আনন্দে ক্ষীণ-বক্ষা ও প্রফুল্লমুখী হইয়া উঠিয়াছে।

বৃষ্টি-বিবোধ বৃক্ষের নির্মল শ্যামল পত্রগুলি বায়ুভরে দুলিয়া দুলিয়া চাঁদের কিরণে চিক্চিক করিয়া জ্বলিতেছে। শ্রোণাকীগুলি বৃষ্টি বন্ধ হইয়াছে দেখিয়া, চারিদিকের ছোট ছোট গাছপালা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝোপের উপর ঝোকে ঝোকে উড়িয়া উড়িয়া বাহার দিয়া কিরিতেছে। মাঝে মাঝে বাতাস আসিয়া গাছপালার পত্রস্থ জল ঝাড়িয়া মাথা মুছাইয়া দিতেছে। যুবকের শাদা ঘোড়াটি গাছের নীচে দাঁড়াইয়া গা ঝাড়িতেছে। ঈসা বাঁ মন্দিরে ঢুকিয়া নিজের ভিজা ইজার লইয়া ঘোড়াটার গা মুছিয়া দিলেন। পরে তরবারি হস্তে লইয়া যুবতীকে বলিলেন, “তুমি পাণ্ডীর ভিতরে ঘুমাও, আর কোন ভয়ের কারণ নাই। আমি একবার ভট্টচার্য-বাড়ীতে আমার লোকজনের এবং তোমার দাদার অনুসন্ধান করে আসি।”

ঈসা বাঁ তরবারি হস্তে মন্দির হইতে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলেন। কিঞ্চিৎ দূরে অগ্নসর হইয়া দেখিলেন, দূরে কে একজন অশ্বারোহণে ইতস্ততঃ কিরিতেছে। যুবক অগ্নসর হইলেন। অশ্বারোহী ঈসা বাঁকে তরবারি-পাণি দেখিয়া ভীত কণ্ঠে বলিল, “কে ও?” ঈসা বাঁ কণ্ঠস্বরেই বুঝিতে পারিলেন যে, অশ্বারোহী কেদার রায়ের পুত্র বিনোদ।

ঈসা বাঁ আনন্দে বলিলেন, “বিনোদ! এস, ভয় নাই, আমি তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। স্বর্ণ ভাল আছে।” সহসা বিশ্বস্ত ও আত্মীয়তার প্রীতিমাখা-কণ্ঠস্বর শ্রবণে বিনোদ বিস্মিত-অন্তরে ঘোড়া ছুটাইয়া নিকটে আসিল। ঘোড়া হইতে নামিয়া ঈসা বাঁর পদধূলি গ্রহণ করিল। ঈসা বাঁ তাহাকে আনন্দে আলিঙ্গন করিলেন। বিনোদ বলিল, “দাদা সাহেব! আপনি এ দুর্ঘোণে কোথা থেকে?” ঈসা বাঁ তাহাকে সমস্ত ঘটনা খুলিয়া মন্দির দেখাইয়া ভট্টচার্য-বাড়ীর দিকে অগ্নসর হইলেন।

ঈসা বাঁ ভট্টচার্য-বাড়ী উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তাঁহার সমস্ত লোকজন

ଡ଼଼ିଆର ବାଢ଼ିତେ ବସିଯା ଯାନ୍ତି । ବାଢ଼ିର ବାଢ଼ି ବଢ଼ି ଡ଼ିଆର ଇସା ବାଢ଼ି
 ସମସ୍ତକାରେ, ପରମ ମୌତାମା ଜ୍ଞାନେ ଦେବତାର ନ୍ୟାୟ ସମ୍ମାନ ଓ ସମ୍ମାନରେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧନ
 କରିଲେନ । ରଞ୍ଜନୀ ଡ଼ିଆରବେର ଆଗ୍ରହେ, ଉଦ୍ଧୱା ଓ ବାଢ଼ିରେ, ଚିତ୍ତି ଓ ପ୍ରହାର ଇସା ବାଢ଼ି
 ଉଦ୍ଧାୟ ଆହାର କରେନ ଓ ରାତ୍ରି ନାମନେ ସମସ୍ତ ହେଲେନ । ଲୋକ ପାଠାଠିଆ ବିନୋଦ ଓ
 ରାୟ-ନନ୍ଦିନୀକେ ସମ୍ପର ହୁଅନ୍ତେ ଆନିଲେନ । ବର୍ଣ୍ଣମୟୀ ଅନ୍ତଃପୁରେ ମହାମାତ୍ରେ
 ରମଣୀଦିଗେର ଦ୍ଵାରା ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧିତା ହୁଅନ୍ତେ । ରଞ୍ଜନୀ ଡ଼ିଆର ଏକଜନ ଜମିଦାର । ତିନି
 ରାଜ୍ୟର ନ୍ୟାୟ ଯଦ୍ଵେ ଓ ଆଡ଼କ୍ଷରେ ଇସା ବାଢ଼ି ଏବଂ ତାହାର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜନ ଲୋକକେ
 ଶୋଭନ କରାହିଲେନ ।

ରଞ୍ଜନୀ ପ୍ରଥମେ ଇସା ବାଢ଼ି ବେହାରା ଠିକ କରିଆ ବର୍ଣ୍ଣମୟୀକେ ସାମୁଦ୍ଧାପୁରେ ପାଠାଠିଆ
 ଦିଲେନ । ତତ୍ପର ରଞ୍ଜନୀ ଡ଼ିଆରବେର ହେଲେ ଓ ସେତେକେ ଡାକିଆ ପ୍ରତ୍ୟେକେର ହତେ
 ଜଳପାନ ବାଢ଼ିବାର ଜନ୍ୟ ୧୦ଟି କରିଆ ଯୋହର ପ୍ରଦାନ କରିଆ ଅନ୍ଧାରୋହପେ
 ସୁରାଦପୁରେର ନିକେ ମୁକ୍ତ ଦାବିତ ହୁଅନ୍ତେ । ବର୍ଣ୍ଣମୟୀ ପାଠାଠିର ଦରଜାର କାଢ଼ିକେ ମଧ୍ୟେ
 ଦିଆ ଯତ୍ନର ଦୃଷ୍ଟି ଚଳିଲ, ତତ୍ପର ପଞ୍ଚୁ ତାହାର ପ୍ରାଣେର ଆରାଧ୍ୟ ମନୋଯୋହନ-
 ଦେବତାର ଭୁବନୋଦ୍ଧୱଳ ଅନ୍ଧାରୁଚ୍ଚ ମୂର୍ତ୍ତି ଅନିମେଷ ଦୃଷ୍ଟିତେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣେର ମିମାମାର
 ସହିତ ଦେଖିତେ ଲାଗିଲ । ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଲ, ସେ କୋନ ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦର ସର୍ବମୟ ଦେବତା ତାହାର
 ହସର-ଦନ ଚୁରି କରିଆ ହୁଟିଆ ଚଲିଆଛେନ । ତାହାର ଗମନ-ପଥେର ଉପରିସ୍ଥ ଆକାଶ,
 ନିରଞ୍ଜ ଦେଖି ଏବଂ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ଵେର ଶ୍ୟାମଳ ଉଜ୍ଜ୍ଵଳତା ସେନ ଆନନ୍ଦେ ପୁଲକିତ ହୁଅନ୍ତେ
 ଉଠିତେହେ । ଚାରିନିକେ ସେନ ଆଲୋକେର ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ଉଠିତେହେ । ବର୍ଣ୍ଣମୟୀ ଦେଖିଲ ସତ୍ୟ
 ସତ୍ୟାହି ତାହାର ପ୍ରିୟତମ—ସୁନ୍ଦରତମ ଏବଂ ଜଗଦ୍ଦିଯୋହନ । ତାରପର ସଖନ ଇସା ବାଢ଼ି
 ପଦ୍ମୀର ଉଜ୍ଜ୍ଵଳତା-ସେବାର ଅନ୍ତରାଳେ ମିଶାହିଆ ଗେଲେନ, ତତ୍ପର ସୁନ୍ଦରୀ ବୁକତାଜ୍ଞା
 ନିର୍ଦ୍ଧନିଃସ୍ଵାସ କେଲିଆ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଲ । ହୃଦୟ ଉଦ୍ଧୱିତ ନଦୀର ନ୍ୟାୟ କୁଲିଆ
 କୁଲିଆ ଉଠିତେ ଲାଗିଲ । ସତ୍ତେ ସତ୍ତେ ଦୁଇ ବିନ୍ଦୁ ଅଳ୍ପ ଅଜ୍ଞାତସାରେ ବାଢ଼ିକେ କାଢ଼ିତେ
 ପଠିତ ହୁଅନ୍ତେ । ସୁବତୀ ଉଦ୍ଧାତାଢ଼ି ପାଠାଠିର ଦରଜା ବଢ଼ କରିଆ ପାଠାଠିର ଚିତ୍ତରେ ଡ଼ିଆ
 ପଢ଼ିଲ । ବାହିରେର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାର ଆର ଇଚ୍ଛା ହୁଅନ୍ତେ ନା । ବେହାରାରା ପାଠାଠି ଲ଼ିଆ ଦୁଇ
 ନିକେର ବିକୃତ ଶ୍ୟାମାୟତ୍ତାନ ଧନାକ୍ଷେତ୍ରେର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ଦିଆ ସାମୁଦ୍ଧାପୁରେର ନିକେ
 ହୁଟିଆ ଚଳିଲ ।

ତୃତୀୟ ପରିଚ୍ଛେଦ

ସାମୁଦ୍ଧାପୁରେ

ଇସା ବାଢ଼ି ସମ୍ମଦ-ଇ-ଆଲୀ ଶ୍ରୀମତୀ ବର୍ଣ୍ଣମୟୀକେ ସାମୁଦ୍ଧାପୁର ବସାନ୍ତା କରିଆ ଦିଆ
 ସୁରାଦପୁରେର ନିକେ ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତେ । ସାମୁଦ୍ଧାପୁରେର ଜଳଦାନକ୍ଷ ସିଦ୍ଧ, ବର୍ଣ୍ଣମୟୀର
 ସାଥୀସହ । ତିନି ଏକଜନ ପ୍ରାଚୀନ ଜମିଦାର । ତାହାର ବୟସ ପାଞ୍ଚ ନବୁଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ

হইয়াছে। কিন্তু এখনও বৃদ্ধ বিনা চমশায় তাঁদের আলোতে কাশীরাম দাসের মধ্যভারত অনায়াসে পড়িতে পারেন। লোকটির বেশ হাসিখুশী মেজাজ। আজকাল প্রায় ঠাকুর পূজা এবং ছপে করিয়া পুকুরের মাছ ধরাতেই দিন কাটে।

উঁহার দুই বয়স পুত্র, বরদাকান্ত ও প্রমদাকান্ত। তাহাদের দুইজনের ঘরেও মাতৃটি মেয়ে ও পুত্রটি ছেলে জন্মিয়াছে। বরদাকান্তের জ্যেষ্ঠপুত্র হেমকান্ত, তাহার এক নির্মল সহিত কাশীতে বাস করে। তথাভীত আর সকলেই বাড়িতে। সুত্রাং বাড়িখানি ছেলেমেয়ের কোলাহলে এবং অট্টহাসিতে বেশ গোলজার। স্বর্ণ এখানে আর্মিয়া পরম যত্ন ও আনন্দের মধ্যে দিন কাটাইতে লাগিল। তাহার মামা ও মামীদের আদরে ও ভালবাসায়, মাতামহ এবং মাতামহীর স্নেহ ও যত্নে বাহিরে সুখানুভব করিলেও প্রাণের ভিতরে কি এক অতৃপ্তি ও শূন্যতা বোধ দিন দিন তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়া উঠিতেছিল। ইসা খাঁর কথা এক মুহূর্তও ভুলিতে পারিত না। ইসা খাঁর বীর্য-তেজঃ-ঝলসিত বীরবপু ও অনিন্দ্য-সুন্দর মুখমণ্ডল, তাহার সেই মধুবর্ষিণী অথচ সুস্পষ্ট গম্ভীর ভাষা এক মুহূর্তের জন্য ভুলিতে পারিল না। ইসা খাঁর সুন্দর-কমনীয় বীরমূর্তি তাহার হৃদয়ে এমন করিয়া আসন পরিগ্রহ করিয়াছে যে, যুবতীর চিন্তা ও কল্পনা, হৃদয় ও মন ইসা খাঁ-ময় হইয়া পড়িয়াছে। হৃদয়কে প্রবোধিত করিবার জন্য বহু চেষ্টা ও যত্ন করিল, কিন্তু সমস্তই ব্যর্থ হইয়া গেল। দেখিল, ভুলিতে বসিলে স্মৃতি আরও দ্বিগুণ ত্রিগুণ জাগিয়া উঠে। হৃদয়ে যখন প্রেমাপ্নি জ্বলিয়া উঠে তখন উহাতে বাধা দিতে গেলে শিলা-প্রতিহত নদীর ন্যায় তীষণ উচ্ছ্বসিত হইয়া দুই কূল প্রাবিত করিয়া ফেলে। পূর্বের লজ্জা ও সঙ্কোচ একেবারে উড়িয়া যায়। স্বর্ণ যখন সকল বালক-বালিকার মধ্যে বসিয়া নানা প্রকারে তাহাদের আনন্দ বিধান এবং তাহাদের ঋণিক কলহের বিচার করিতে বসে, তখন তাহার মানসিক অধীরতা কিছু চাপা পড়ে বটে, কিন্তু আবার একেলাটি বসিলেই প্রাণের আকুলতা দশগুণ বৃদ্ধি পায়। বর্ষার ভরা নদীর মত তাহার মন কি যেন এক চৌম্বক-আকর্ষণে ফাঁপিয়া ফুলিয়া উঠে। হৃদয়ের পরতে পরতে, শরীরের প্রতি অণুপরমাণুতে কি যেন এক পিপাসার তীব্রতা হইতে স্বর্ণময়ী বৃষ্টিতে পারিল, যৌবন কাল কি ভয়ানক! প্রেমের আকর্ষণ কি ভয়ঙ্কর বেগশালী! উহা এক মুহূর্তেই সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ভুলাইয়া প্রেমাস্পদের পদে আত্ম বিকাইয়া বসে। প্রেমাস্পদের মধ্যেই তখন তাহার জীবনের আশা ও নির্ভর, সুখ ও শান্তির সর্বস্ব দেখিতে পায়। রায়-নন্দিনীও দেখিতে পাইল, ইসা খাঁ-ই তাহার জীবনের সর্বস্ব। এক একবার তাঁহাকে পাইবার আশায় হৃদয় আশ্বস্ত হইত, কিন্তু পর মুহূর্তেই নিরাশায় তাহার অন্তর ব্যথিত ও অবসন্ন হইয়া পড়িত। স্বর্ণ ভাবিত, “আমি তো তাঁহাকে দেহ-দ্রব্য উৎসর্গ করিয়া বসিয়া আছি, কিন্তু তিনি যদি তাহা না বুঝেন! অথবা আমি পৌত্তলিক কাকের-কন্যা বলিয়া যদি আমাকে গ্রহণ না করেন। কৈ! তাঁহাকে তো

আমার প্রতি আকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয় না।" আবার শুবে, "না না, তিনি তো চিরকালই আমাকে ভালোবাসিয়া আসিয়াছেন। বাহাকে এককাল ভালোবাসিয়াছেন, সে যদি এখন তাঁহার আত্মবিক্রয় করে, তবে কি তিনি আনন্দিত হইবেন না? নিশ্চয়ই আনন্দিত হইবেন।"

"ভালোবাসা প্রেমে ঘনীভূত হইতে কতক্ষণ?" আবার নিরাশা তাহার কর্ণকুহরে গোপনীয়ভাবে বলে, "কি বিশ্বাস! পুরুষের মন!" আবার স্বর্ণকুমারী চঞ্চল-চিন্ত হইয়া উঠে। এইরূপ আশা এবং নিরাশায় স্বর্ণময়ীর জীবন কেমন যেন আনন্দবিহীন ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। সে কি করিবে কিছুই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছিল না।

জ্যেষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষ চতুর্দশী। সন্ধ্যা বহিয়া গিয়াছে। আকাশে কৃষ্ণ জলদখণ্ড শ্রেণী বাঁধিয়া হিমালয় পানে ছুটিয়াছে। চতুর্দশীর চন্দ্র এক একবার মেঘের ফাঁক দিয়া নববন্ধুর ন্যায় প্রেম-দৃষ্টিতে সুধাবর্ষণ করিয়া আবার দেখিতে দেখিতে তখনি মেঘের আড়ালে লুকাইতেছে। জগৎ এক একবার জ্যোৎস্না-প্রাবিত হইয়া হাসিয়া উঠিতেছে, আবার তরল আঁধারে ম্লান হইয়া যাইতেছে। বাতাস এক একবার থাকিয়া থাকিয়া উঁচু গাছের উপর দিয়া পাতাগুলিকে করতালির মত বাজাইয়া বহিয়া যাইতেছে। কখনও কখনও বাগানের নানাজাতীয় ফল ফুলের গাছের মধ্যে এলোমেলোভাবে বহিয়া যেন লুকোচুরি খেলিতেছে। ম্লান-কৌমুদী-মাখা পুকুরের জলে ছোট ছোট ঢেউ উঠিয়া শ্রুতি-মধুর তক্ তক্ শব্দে পাড়ে যাইয়া লাগিতেছে। স্বর্ণময়ী এই বাগানের মধ্যস্থ পুষ্করিণীর পরিষ্কার বাঁধা ঘাটে বসিয়া জ্যোৎস্নালোকে বকুলের সুদীর্ঘ মালা গাঁথিতেছে এবং গুন্ গুন্ করিয়া আপন মনে গান গাহিতেছে। মালা গাঁথিতে গাঁথিতে এক একবার কি যেন মনে ভাবিয়া পুকুরের মৃদু লহরী-লীলার দিকে মুখ তুলিয়া চাহিতেছে এবং বুকভাঙ্গা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেতেছে! স্বর্ণময়ীর কণ্ঠ যদিও গুন্ গুন্ করিতেছিল এবং চম্পক অঙ্গুলী যদিও বকুলফুলে সূতা পরাইতেছিল, তবুও তাহার মনে যেন কোন এক দেশের শোভন আকাশে পথভ্রান্ত বিহঙ্গের ন্যায় উড়িয়া বেড়াইতেছিল। আজকার চন্দ্রও যেন মেঘ-পটলে লুক্কায়িত, স্বর্ণময়ীর মুখমণ্ডলেরও তেমনি দীপ্তি লাভগ্য অন্তর্হিত। তাহার বদনমণ্ডল যেন কেমন এক প্রকার বিষাদ গম্ভীর বলিয়া বোধ হইতেছে। এই গম্ভীর্যের মধ্যেও তাহাকে অতুলনীয় সৌন্দর্যশালিনী বলিয়া বোধ হইতেছে। বাতাসে তাহার ললাট-প্রান্তস্থ কেশ-কলাপ ঈষৎ দুলিয়া দুলিয়া গোলাপীগণ চুম্বন করিতেছিল। মাপতীসুন্দরী, স্বর্ণময়ীর মামাতো ভগ্নী। যৌবনের সীমায় পদার্পণ করিয়াছে। সুতরাং তাহার দেহ-লতিকা যেমন পুষ্পিতা, মনও তেমনি সুরভিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। স্বর্ণময়ীকে সে আপনার হৃদয়ময় করিয়া তুলিয়াছে। স্বর্ণকে সে হৃদয়ের অন্তস্তম স্তর হইতে ভালোবাসে। স্বর্ণকে ভালোবাসিয়া সে নিজের জীবনকে মধুময় করিয়া তুলিয়াছে। মালতী সন্ধ্যা

হইতে বাটীর কোনোও ঘরে স্বর্ণকে খুঁজিয়া না পাইয়া অবশেষে বাগানে অনুসন্ধানের জন্য প্রবেশ করিল। বাগানে প্রবেশ করিয়া মালতী দেখিল যে, স্বর্ণ একেবারে বসিয়া গুল গুল কাঁধের গান করিতে করিতে মালা রচনা করিতেছে। সে অনেকক্ষণ স্বর্ণকে খুঁজিয়া পায় নাই, সুতরাং পুকুরপাড়ে স্বর্ণকে পাইয়া একবার তাহার সঙ্গে মজা কাঁধের লোভ মালতীর মনে অভ্যস্ত বলবৎ হইয়া উঠিল। মালতী পক্ষাঙ্কিত হইতে অতি ধীরে ধীরে পা টিপিয়া টিপিয়া আসিয়া নীরবে দাঁড়াইল। স্বর্ণ তখন ইসা খাঁর মূর্তিখ্যাসে প্রগাঢ় নিবিষ্ট, কাজেই অন্যমনস্ক, মালতীর আগমন টের পাইল না। মালতী হাসিমুখে স্বর্ণময়ীর মালাপাখা দেখিতে লাগিল। স্বর্ণ দু'গাছি মালা গাঁথিয়া পার্শ্বে রাখিয়া দিয়াছিল। মালতী তাহা ধীরে ধীরে নিঃশব্দে তুলিয়া আপনার গলায় পরিয়া খিল খিল করিয়া বেদম হাসিয়া উঠিল। স্বর্ণ অন্যমনস্ক ছিল, সুতরাং প্রথমে চকমিয়া উঠিল। তাহা পর মালতীর গলা ধরিয়া খুব হাসিতে লাগিল। সে হাসি যেন আর ধামিতে জানে না। সে বেদম হাসির চোটে সমস্ত বাগান ও পুকুরের জলও যেন অটু অটু হাসিতে লাগিল। নিকটস্থ বকুল গাছের ডালের খোপে একটি কোকিল বোধহয় নিদ্রা হাইতেছিল, শ্রীমতীঘরের হাসির চোটে আতঙ্কিত হইয়া কুহু কুহু করিয়া ডাকিতে ডাকিতে উড়িয়া বাইরা পুকুরীণীর অপর পার্শ্বে আশ্রয় লইল। অনেকক্ষণ পরে হাসির বেগ ধামিলে, স্বর্ণ মালতীকে বলিল, “কি লো! তুই এখানে মরতে এসেছিস কেন? আমাকে এ একবারে চম্কে দিয়েছিস? আমি তোর বর না কি লো? যে আমাকে ছাড়া একদণ্ড থাকতে পারিস না।”

মালতী : আমি তাই মরতে আসি নাই, তোমাকে ধরতে এসেছি। তোমাকে বর করতে কি আমার এমত? তুমি যদি বর হতে সাহস পাও, তাহলে আমি এখনই তোমাকে বরণ করি। কি বল? তোমার মত বর পেলে কি আর ছাড়ি?

স্বর্ণ : বটে, বরের জন্য দেখছি তুই কেপে উঠেছিস। বেশী অস্থির হস না, সবুর কর—মেগুড়া ফলবে।

মালতী : তাই তো! আপনি স্বপন পরকে দেখাও। বরের জন্য কে কেপে উঠেছে ত, মালা গাঁথতেই টের পাওয়া যাচ্ছে, আমরা বুঝি কিছু বুঝি না?

স্বর্ণ : কি বুঝিস লো! মালা তো তোর জন্যই গাঁথছিলাম।

মালতী : বটে : আমার জন্য না ইসা খাঁর জন্য?

স্বর্ণ : (কুপিত হইয়া) তুই এমন কথা বলি যে, জিব টেনে ছিড়ে দেব।

মালতী : কেন, আমি কি বলেছি? রোজই তো তুমি ইসা খাঁর পল্ল কর। তাঁর সাহস, তাঁর বীরত্ব, তাঁর ভালোবাসার কথা তুমিই তো বল।

স্বর্ণ : বেশ তো আমি বলি, তাতে কি হয়েছে? তাঁর বীরত্বের কথা, তাঁর সাহস ও সৌন্দর্যের কথা এবং আমাকে যে তিনি দুই বার প্রাণ রক্ষা করেছেন, তা আমি এক-এক বার বলবো। তাতে দোষ কি?

মালতী : তবে আমি কি দোষের কথা বলছি?

স্বর্ণ : তুমি মালা দেওয়ার কথা বলি কেন?

মালতী : তারি তো অপরাধ! না-পছন্দ হল কিসে?

স্বর্ণ : না-পছন্দ বা অযোগ্যের কথা কে বলেছে?

মালতী : বাঃ! বাঃ! তবেই তো তোমার পছন্দ ও যোগ্য হয়েছে দেখছি। তাই তো আমি মালা দিতে বলছি।

স্বর্ণ একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। পরে বলিল, “ওলো! তিনি যে মুসলমান, আর আমি যে হিন্দু।”

মালতী : হলই বা হিন্দু আর মুসলমান। আজকাল তো হিন্দু-মুসলমানে খুবই বিয়ে হচ্ছে।

স্বর্ণ : কোথায় খুব হচ্ছে?

মালতী : কেন? এই তো ডুলুয়ার ফজল গাজীকে রামচন্দ্রপুরের লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার কন্যা দিয়েছে। বাখরগঞ্জের হাশমতুল্লা চৌধুরীর সঙ্গে বাঁশছোড়ের চক্রবর্তীদের মেয়ে শরৎকুমারী বিয়ে তো গত পৌষেই হয়েছে। বামন ঠাকুরেরা এখন তো খুবই পাতি দিচ্ছেন। তাঁরা তো বলেছেন, “মুসলমান দেবতার জাতি, তাদের ঘরে মেয়ে দিলে অগৌরব বা অধর্ম নাই।” গত বৎসর সরাইলের জমিদার মথুরাকান্ত মুন্সফী ও আলমপুরের চৌধুরী শাহবাজ বানের মধ্যে কেন্দ্রপাড়া গ্রাম নিয়ে যে ভূমূল বিবাদ-বিসম্বাদ হয়, সে বিবাহ মথুরাকান্ত মুন্সফীর কন্যা সরোজ-বাহিনীর সঙ্গে চৌধুরী সাহেবের পুত্র আবদুল মালেকের বিবাহ দিয়েই তো মিটিয়ে ফেলা হল। বাবা সে বিষয়ের নিমন্ত্রণে গিয়েছিলেন। তাঁর মুখেই শুনেছি।

স্বর্ণ : ওরূপ দুই চারটা ঘটনায় কি আসে যায়?

মালতী : কেন? দুই চারটা কোথায়? বাদশা নবাব ও উজিরদিগকে বড় বড় হিন্দু রাজ-রাজড়া কন্যা দিচ্ছেন।

স্বর্ণ : আরে ওসব রাজ-রাজড়ার ও তাঁদের কন্যাদের কথা ছেড়ে দে। তাঁদের সবই শোভা পায়।

মালতী : (হাততালি) বাঃ! বাঃ! আমিও তো সেই জন্যই ইসা ঝাঁকে বরণ করতে বলছি। তুমি যে রাজা কেদার রায়ের কন্যা। তোমারও তো বেশ শোভা পাবে!

স্বর্ণ বড়ই অপ্রস্তুত ও অপ্রতিভ হইল। সে মনে মনে ভাবিল, আজ এরূপ হচ্ছে কেন? মালতী যে বড়ই জন্ম করতে আরম্ভ করল।

স্বর্ণকে অপ্রতিভ দেখিয়া মালতী বলিল, “তবে এইবার ইসা ঝাঁকে মালা দেবে? কেমন?”

স্বর্ণ : জোর বুঝি মুসলমান বিয়ে করতে বড়ই সাধ।

মালতী : আমার সাধ হলেই বা কি? আমি তো রাজকন্যা নই। এ সাধারণ
হিন্দু জমিদারের কন্যাকে কোন্ মুসলমান গ্রহণ করবে?

স্বর্ণ : তুমি যদি বলিস্ মা হয় আমি তার উপায় দেখি।

মালতী : আগে ভাই তুমি নিজেই যোগার দেখ। কথায় বলে, 'মামা! আগে
দেখ নিজের ধামা।--'

স্বর্ণ মালতীর কথায় তাহার গালে এক মৃদু ঠোকনা দিতে অগ্রসর হইলে,
মালতী নিজের গলা হইতে ফুলমালা লইয়া স্বর্ণের গলায় পরাইয়া দিল এবং
চক্ষিতে তাহার গণ্ড চূষন করিয়া বাড়ীর দিকে ছুটিল। স্বর্ণও তাহাকে ধরিবার জন্য
বাড়াসে আঁচল উড়াইয়া পুকুরের বাগান আলো করিয়া দ্রুত ছুটিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পাত্র

জ্যৈষ্ঠ মাস গত প্রায়। আষাঢ়ের ১৭ই তারিখে মোহররম উৎসব। সেই মোহররম
উৎসবের পরেই স্বর্ণময়ীকে পিত্রালয়ে ফিরিতে হইবে। স্বর্ণময়ী শিবনাথের মুখে
আরও সংবাদ পাইল যে, আগামী অগ্রহায়ণ মাসেই ইদিলপুরের শ্রীনাথ চৌধুরীর
সঙ্গে তাহার বিবাহের সঙ্কল্প পাকাপাকি হইয়াছে। রাজা এখন হইতেই বিবাহের
আয়োজনে লিপ্ত। বিশেষ সমারোহ হইবে। শিবু অত্যন্ত আনন্দের সহিত
দ্বিতমুখে স্বর্ণকে এই সংবাদ প্রদান করিলেও, বিবাহের কথায় স্বর্ণের বুক যেন
ধড়াস্ করিতে লাগিল। তাহার বক্ষের স্পন্দন এত সূজোরে চলিতে লাগিল যে,
স্বর্ণের সন্দেহ হইল পাছে বা অন্যে শ্রবণ করে। স্বর্ণের মুখমণ্ডল স্নান হইয়া
গেল। শিবনাথ ভাবিল, পাত্র বা কিরূপ ভাই ভাবিয়া স্বর্ণময়ী চিন্তিত হইয়াছে।
সুতরাং সে একটু কাশিয়া লইয়া গলাটা পরিষ্কার করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল,
"দিদি! আর ভাবতে হবে না, সে পাত্র আমি নিজে দেখেছি। মহারাজও
দেখেছেন। তাদের ঘর বেশ বুনিয়াদি। পাত্র দেখতে ওনতে সাক্ষাৎ কার্তিক
ঠাকুর। বয়সও অল্প। তোমার সঙ্গে বেশ মানাবে। সেরূপ সুশ্রী সুন্দর পাত্র
আমাদের এ অঞ্চলে আর নাই। তুমি একবার তাকে দেখলেই ভুলে যাবে।"
শিবনাথ আনন্দের সহিত তাহাকে সন্তুষ্ট ও খুশী করিবার জন্য এ সব কথা
বলিলেও স্বর্ণের কর্ণে তাহা বিষের মত বোধ হইতে লাগিল। স্বর্ণ চুল বাঁধিবার
ছল করিয়া সেখান হইতে উঠিয়া গেল। ঘরে যাইয়া একেবারে বিছানায় শুইয়া
পড়িল। বলিলে সে অনেককণ মুখ লুকাইয়া কাঁদিল। তারপর মুখ ধুইয়া মন
স্থির করিয়া অনেককণ পর্যন্ত চিন্তা করিল। সে বেশ চিন্তা করিয়া দেখিল, ইসা
খাঁ ব্যতীত তাহার প্রাণের একটি বিন্দুও এক মুহূর্তের জন্য কাহাকেও স্থান দিতে

প্রস্তুত নহে। ঈসা খাঁ ব্যতীত তাহার জীবনের কোনও অর্থাৎ নাই। সে দেখিল ঈসা খাঁকে তাহার হৃদয় এরূপ ভাবে ধরিয়া বসিয়াছে যে, সমস্ত দেবতা এমনকি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর পর্যন্ত এক মুহূর্তের জন্যও তাহার হৃদয়ের সিংহাসন হইতে ঈসা খাঁকে বিচ্যুত করিতে সমর্থ নহে। যুবতী অনেক ভাবিয়া শেষে ঈসা খাঁকে পত্রযোগে আত্মসমর্পণের কথা জানাইবার জন্যই মন স্থির করিল। ভাবী বিপদের গুরুত্ব স্বরণে এবং হৃদয়ের দুর্বিষহ যন্ত্রণায় লজ্জা দূরীভূত হইল। যুবতী পত্র লিখিয়া তাহা শিবনাথের দ্বারা খিজিরপুরে পাঠাইবার সঙ্কল করিল। বলা বাহুল্য, পত্র পারস্য ভাষায় রচিত হইল। আমরা সেই অমৃত-নিস্যন্দিনী পারস্য ভাষায় রচিত পত্রের বঙ্গানুবাদ দিতেছি :

পত্র

হে মহানুভব! প্রাণ-রাজ্যের একমাত্র অধীশ্বর! তোমাকে কি বলিয়া সম্বোধন করিব, তাহা ভাষায় খুঁজিয়া পাইতেছি না। মানুষ মুখের ভাষা আবিষ্কার করিয়াছে কিন্তু প্রাণের ভাষা অদ্যাপি অনাবিকৃত রহিয়াছে। প্রাণের একটি আবেগ প্রকাশ করিতে পৃথিবীর সমস্ত ভাষা যখন এক নিঃশ্বাসে ফুরাইয়া যায় তখন হে আমার প্রাণের আকাঙ্ক্ষিত প্রিয় দেবতা! এ হৃদয়ের অনন্ত ভাবোচ্ছ্বাস, অনন্ত দুঃখ-ব্যথা আমি কিরূপে প্রকাশ করিব। তবে আশা আছে, মহৎ ব্যক্তি তর্জনী প্রদর্শনেই চন্দ্র এবং গোলাপের একটি পাপড়িতেই প্রেমিক-হৃদয় দর্শন করেন।

হে নয়নানন্দ! হে আমার জীবনাকাশের প্রভাত-রবি! আমার ক্রটি ও বে-আদবী মার্জনা করিতে মর্জি হয়। হৃদয়ের নদী উচ্ছ্বসিত হইয়াছে, উহা অন্য নদীতে মিশিতে অক্ষম, উহা সমুদ্র ব্যতীত আর কাহাকেও আত্মসমর্পণ করিবে না। গোলাপ প্রস্ফুটিত হইয়াছে; কিন্তু খিজিরপুরের বুলবুল ব্যতীত আর কাহাকেও সুরভি দান করিবে না। শ্রীপুরে সরোবরে যে কমল ফুটিয়াছে, তাহা খিজিরপুরের দেবতার জন্যই ফুটিয়াছে। চরণ-প্রান্তে স্থান পাইবার অযোগ্য হইলেও তাহার প্রেম-দেবতা তাহাকে যোগ্যতা দান করিতে কুণ্ঠিত হইবে না। কমলের অটল বিশ্বাস যে, তাহার দেবতা পরম হৃদয়বান্ ও দয়ালু। এ বিশ্বাস অটুট রাখিতে পাঠান দেবতা কি অগ্রসর হইবেন না? নলিনীকে অনেক বুঝান হইল, সে স্পষ্ট বলিল, "আমি সূর্য ব্যতীত কাহারও পানে তাকাইব না।" চকোরকে অনেক বুঝান হইল, সে ক্ষুদ্র হইলেও গর্বের সহিত বলিল, "চন্দ্র-সুখা ব্যতীত আমি আর কিছুই পান করিব না।" চাতককে অনেক বুঝান হইল, সে বলিল, "আমি জলদের জল ব্যতীত অন্য জল পান করিব না।" প্রেমের নিকট সকলেই পরাস্ত, প্রেম চির-বিজয়ী। অধিনীর তাহাতে দোষ কি?

হে দেবতা!

উন্মাদিনী তাহার হৃদয়ের পায়ে প্রীতির ফুল সাজাইয়া চরণপ্রান্তে উপস্থিত।

একশে তাহার পূজা গ্রহণ করিলে দুঃখবনীর জন্য জীবন সাধক হইবে। যদি অন্যদিক কব-কিয়াইয়া দাও তাহাও ভাল, একটি হৃদয় তব্ব হইয়া অনন্তে মিশিবে, কিন্তু তাহাতে কি? দেবতার কোনও কার্যে দোষ নাই। বৈশাখের মেঘ ইচ্ছা করিলে মোক্ষনের হৃদয় বজ্রানলে দহ করিতে পারে, আবার ইচ্ছা করিলে তুষারশীতল মলিন ধবংস তাহাকে শিথল করিতে পারে। সকলি মেঘের ইচ্ছা।

চরণপ্রান্তের ধূলি-আকাঙ্ক্ষী—
শ্রীপুরের মরু-তাপ-দহ গোলাপ
স্বর্ণময়ী।

স্বর্ণ পত্র লিখিয়া তাহার একপ্রান্তে মুসলমানী কায়দামতে একটু আতর মাখাইয়া পুরু লেফাফায় বন্ধ করিল। তৎপর স্বহস্তের কারুকার্যযুক্ত এবং নানাপ্রকারের পার্শ্ব বয়েত অঙ্কিত একখানি সুন্দর রেমশী কুমালে তাহা বেশ করিয়া বাঁধিয়া শিবনাথের হস্তে সমর্পণ করিল। শিবনাথ পত্র পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “দিদি, এ কিসের পত্র?” বাড়ীর আরও সকলে, বিশেষতঃ মালতী পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করিল, এ কিসের পত্র? স্বর্ণ গম্ভীরভাবে বলিল, “ঈসা খাঁ আমাকে সেই রাতে দস্যু-হস্ত থেকে উদ্ধার করে প্রাতঃকালে সাদুল্লাপুরে রওয়ানা করবার সময় বলেছিলেন, ‘সাদুল্লাপুরে তোমার মঙ্গল মত পহঁছান-সংবাদ আমাকে জানিও।’ এতদিন লোকাভাবে তা জানাতে পারি নাই। বড়ই বিলম্ব হয়েছে। অত বড় লোক, বিশেষতঃ আমাকে যেরূপ বিপদ হতে রক্ষা করেছেন, তাতে কাজটা বড়ই অন্যায় হয়েছে।”

স্বর্ণের ছোট মামী পার্বতীসুন্দরী বিবস্ত্রি প্রকাশ করিয়া বলিলেন, “ছি! তোমার কোন বিবেচনা নাই। বার ভুঁইয়ার দলপতি ঈসা খাঁ মসনদ আলীর কাছে রাজবাচ্চায়া জোড়হস্তে দাঁড়িয়ে থাকেন; তাকে তুমি এত বিলম্বে মঙ্গল-সংবাদ দিতেছ! তিনি যে তোমাকে মঙ্গল-সংবাদ দিতে বলেছেন, তা তোমার চৌকপুরুষের ভাগ্য। শিবনাথ এতদিন এখানে নাই বা ছিল, আমাদের বাড়িতে কি অন্য লোকজন ছিল না? রাজার মেয়ে হয়েছে, বুদ্ধিটা একটু গম্ভীর কর। এলে তুমি বৈশাখ মাসে, আর মঙ্গল-সংবাদ দিচ্ছ জৈষ্ঠ্যের শেষে!”

স্বর্ণ একটু অপ্রতিভ হইবার ভাণ করিয়া বলিল,—“কি জানি মামী, আমার বড় ভুল হয়ে গেছলো, আমি সে জন্যে পত্রে ক্রটি স্বীকার করেছি।”

স্বর্ণ এই বলিয়া শিবনাথকে বিদায় করিয়া দিল এবং বলিয়া দিল যে, “নবাব বাড়ীর কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলিস যে, ‘শ্রীপুরের রাজবাড়ী হতে আসছি।’ তাহলে অন্যায়সেই নবাবের কাছে যেতে পারবি। পত্রের উত্তর নিয়ে আসা চাই। উত্তর আনলে বখশিশ পাবি।” শিবনাথ উপদিষ্ট হইয়া, ঘাড়ে লাঠি কেশিয়া কোমরে চাপরাস বাঁধিয়া একরাশি বাবরী চুল ঝাঁকাইতে ঝাঁকাইতে শ্রীপুরের দিকে রওয়ানা হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

খিজিরপুর প্রাসাদে

যথাসময়ে শ্রীমতী স্বর্ণময়ীর পত্র বহন করিয়া শিবনাথ কৈবর্ত খিজিরপুর রাজধানীতে উপস্থিত হইল। সূর্য তখন নীল আকাশের গায়ে নানা বর্ণের, নানা রকমের মনোহর মেঘের পট আকিয়া পশ্চিম-সাগরে ডুবু ডুবু প্রায়। এক রাত্রির জন্য বিদায় লইতেও সূর্যের মন যেন সরিতেছে না; তাই স্বেদে ডুবিতে ডুবিতেও সতৃষ্ণনয়নে পৃথিবী-সুন্দরীকে সহস্র কিরণ-বাহু প্রসারিত করিয়া আলিঙ্গন করিতেছে। খিজিরপুরের নবাব বাটীর বহির্বাটীর তোরণ অতিক্রম করিয়াই শিবনাথ দেখিতে পাইল, অন্যান্য এক মাইল লম্বা উত্তর-দক্ষিণে বিস্তারিত প্রকাণ্ড রাজবাটী। শ্যামল উদ্যানের মাঝখানে সমস্ত বাড়ীটা এমন পরিষ্কার চূর্ণকাম করা ও ধর্ধবে যে, দেখিলেই মনে হয় যেন শ্যামল তৃণতলে রাজহংসের ডিম্ব-শ্রেণী শোভা পাইতেছে। অসংখ্য চূড়া, গুম্বজ ও মিনারের রৌপ্যকলস ও ছত্রে তপনের শেষ স্বর্ণরশ্মি পড়িয়া ঝকঝক করিয়া জ্বলিতেছে। বাড়ির সম্মুখে তিন শত গজ চওড়া এবং দেড় মাইল লম্বা এক স্বচ্ছ-তোয়া দীঘি। সুবিশাল স্বচ্ছ জলরাশিতে অসংখ্য প্রকারের জলজ কুসুমরাশি প্রস্ফুটিত হইয়া মৃদু মারুত-হিন্দোল-উখিত তরঙ্গরাজির সহিত তালে তালে দুলিতেছে। দূর-দূরান্তর ব্যাপিয়া সে এক চমৎকার শোভা। সূর্যের হৈমাত্য পড়িয়া পড়িয়া সরোবরের সৌন্দর্য যেন উধলিয়া পড়িতেছে। লহরে লহরে কবিত্ব গড়াগড়ি যাইতেছে। অসংখ্য মংসা মনের আনন্দে কুর্দন করিতেছে। সরোবরের মধ্যস্থলে এক লৌহ-সেতু দ্বারা উভয় তীর সংযুক্ত। সেতু পার হইয়া আসিয়া সরোবরের তুল্য এক বিরাট রমণীয় পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করিতে হয়। এই সুবিশাল উদ্যানে পৃথিবীর সকল দেশের নানা প্রকার পুষ্পের বৃক্ষ, লতাগুল্য সংগৃহীত হইয়াছিল। বাগানে সহস্র সহস্র পুষ্পস্তবক ফুটিয়া সৌন্দর্যে দিগন্ত আলোকিত এবং সৌরভে গগন পবন আমোদিত করিত। তিন শত ভৃত্য বাগানের মালীর কার্যে নিযুক্ত ছিল। এই বাগানের শোভা দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ ও লুপ্ত হইয়া পড়িত। মুসলমানের স্বাভাবিক সৌন্দর্য ও পুষ্প-প্রিয়তা ইসা খাতে বেশ স্মৃতিলাভ করিয়াছিল। নানা জাতীয় সুকণ্ঠ ও সুন্দর বিহঙ্গ এই চির বসন্ত-সেবিত উদ্যানে বিরাজ করিত। এই উদ্যানের মধ্যেই ষাট গুম্বজী বিরাট মসজিদ। উহা আগাগোড়া রক্তপ্রস্তরে নির্মিত। কেবল জমি সবুজ মর্মরের। ভূতল হইতে গুম্বজের দীর্ঘ এক শত ফিট উচ্চ। প্রত্যেক গুম্বজের মস্তকে সুবর্ণ-কলস শোভা পাইতেছে। মসজিদের চারি পার্শ্বে স্বেতপ্রস্তরের চারিটি মিনার। প্রত্যেকটির উচ্চতা একশত পঁচিশ ফিট।

মসজিদ একশত গজ দীর্ঘ এবং আশি গজ প্রশস্ত। সম্মুখের চত্বরে পরিমাণে ইহার বিস্তার। মসজিদের চত্বরে ভূমি হইতে পাঁচ হাত উচ্চ। চারিদিক প্রশস্ত সোপান-শ্রেণীতে পরিবেষ্টিত। সোপান-শ্রেণীর উপরে সুন্দর টবে ঝড়ু-পুল্পজাল কুটিয়া অপূর্ণ বাহার খুলিয়াছে। মধ্যে মধ্যে নানা প্রকারের উৎস নানা ভঙ্গিমায় নির্মল জলধারার উদ্গার করিতেছে। শিবনাথ যাহা দেখিতেছে, তাহা হইতেই আর সহসা আঁধি ফিরাইতে পারিতেছে না। সে পূর্বে কেদার রায়ের বাড়ীকেই পবন হৃদয়ী ও সুবৃহৎ বলিয়া মনে করিত; কিন্তু এক্ষণে ইসা খাঁ উদ্যান ও প্রাসাদ দেখিয়া কেদার রায়ের শ্রীপুরের বাটী তাঁহার নিকট শ্রীহীন বলিয়া মনে হইতে লাগিল। শিবনাথ দেখিল, মসজিদে অন্যান্য তিন হাজার লোক মগরেবের নামাজ পড়িতেছে। সে সেই বিরাট মসজিদের দ্বারের সম্মুখে যাইয়া ভক্তিভরে সোজদা করিল।* বাগান পার হইয়া পুনরায় সিংহদ্বার। শিবনাথকে ইসা খাঁর নামীয় পত্রবাহক দেখিয়া প্রহরী বলিল, “এখানেই দাঁড়াও, নবাব সাহেব নামাজ পড়তে গিয়েছেন, এখনই আসবেন।” এখানে আমরা আমাদের পাঠকগণকে জানাইয়া রাখি যে, ইসা খাঁকে পূর্ব-বঙ্গালার সকল লোকেই বার ভূঁইয়ার নবাব বলিয়া আহ্বান করিত। বন্ধুত্বপক্ষেও তিনি একজন নবাবের তুল্য লোকই ছিলেন। তাঁহার বার্ষিক আয় পঞ্চান্ন লক্ষের উপর ছিল। আজকার হিসাবে পাঁচ কোটিরও বেশি। ইসা খাঁর সাত হাজার অশ্বারোহী, বিশ হাজার পদাতিক, দুইশত রণতরী এবং দেড়শত তোপ ছিল। অশ্বশালায় সাত হাজার অশ্ব এবং হস্তিশালায় পাঁচশত হস্তী সর্বদা মৌজুদ থাকিত। প্রত্যহ পাঁচশত ছাত্র তাঁহার প্রাসাদ হইতে আহ্বার পাইত। একশত পঁচানব্বই জন জমিদার তাঁহার অধীনে ছিল। তিনি দশ বৎসর কাল অরাজকতার জন্য বাঙ্গালার নবাব সরকারের রাজস্ব দিয়াছিলেন না। তাহাতে প্রায় আড়াই কোটি টাকা তাঁহার রাজকোষে সঞ্চিত হইয়াছিল। তিনি তাঁহার রাজ্যে দুই হাজার পুষ্করিণী, তিন হাজার ইঁদারা, দুইশত পাখুশালা এবং ষাটটি মাদ্রাসা স্থাপন করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে, মুসলমানদের চিরন্তন প্রধানসারে এই সমস্ত মাদ্রাসা অবৈতনিক ছিল। এতদ্ব্যতীত হিন্দুদের পঞ্চাশটি টোলের অধ্যাপকগণের প্রত্যেকে বার্ষিক একশত টাকা করিয়া সাহায্য পাইতেন। সেকালের এই একশত টাকা সাহায্য এ-কালের হাজার টাকার তুল্য। তিনি তাঁহার রাজ্যের নানা স্থানে তিনশত মাইলের উপর রাস্তা নির্মাণ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত বহু শিল্পদ্রব্যের কারখানা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাঁহার কারখানায় প্রকৃত তোপ, বন্দুক, তলোয়ার, ঘোড়ার জিন এবং কাচের দ্রব্য দিল্লীর বাদশাহী কারখানায় প্রকৃত ঐ সমস্ত দ্রব্য হইতে নিকট হইতো না।

* সেকালের হিন্দুরা মুসলমানের মসজিদ ও দরগাহ দেখিলে এই প্রকার সম্মান প্রদর্শনে প্রস্তুত ছিল।

ঈসা খাঁ নামাজ পড়িয়া মসজিদ হইতে করিতেই শিবনাথ কুর্বিণ করিয়া পত্র দিল। ঈসা খাঁ কুমাল খুলিয়াই বুঝিতে পারিলেন, স্বর্ণময়ী পত্র। পত্রখানি হাতে করিতেই ঈসা খাঁ আপাদমস্তকে কি যেন এক বিদ্যুৎসঙ্গ প্রবাহিত হইল। ঈসা খাঁ সহসা শিহরিয়া উঠিলেন। পত্র খুলিয়া উপরের স্তরের লেখা পড়িয়াই বাটীতে প্রবেশ করিলেন। শিবনাথের খাইবার থাকিবার ভালো বন্দোবস্ত করিয়া দিতে হিন্দু-অতিথিশালার দারগাকে আদেশ করিয়া গেলেন। শিবনাথ বিশ্বয়-বিস্ফারিত নেত্রে রাস্তার দুই পার্শ্বে স্থাপিত বীর-পুরুষদের অশ্বারূঢ় প্রস্তর-মূর্তি দৌলতে দেখিতে অতিথিশালায় যাইয়া উপস্থিত হইল।

রাতি এক প্রহর। ঈসা খাঁ হস্তীদন্ত-নির্মিত একখানি আরাম-কুর্সীতে বসিয়া ভাবিতেছেন। গৃহের মধ্যে একশত ডালবিশিষ্ট ঝাড় জ্বলিতেছে। প্রকাণ্ড কঙ্ক, কঙ্কের ছাদ স্বর্ণ ও রৌপ্যের লতাপাতায় সুশোভিত। ছাদের কড়ি, বরগা কিছুই দৃষ্ট হইতেছে না। বলা বাহুল্য যে, প্রস্তরের কড়ি বরগা ছাদের সহিত অল্পত কৌশলে মিশাইয়া দেওয়া হইয়াছে। দেওয়ালে সুবৃহৎ দর্পণ, প্রস্তরের নানাবর্ণের ফুল এবং বহুমূল্য চিত্ররাজি শোভা পাইতেছে। সম্রাজ্ঞী রাজিয়ার কৃপাণপাণি অশ্বারূঢ়া বীর্যবতী মূর্তিখানি অতি চমৎকার শোভা পাইতেছে। রাজিয়া যেমন অতুলনীয় সুন্দরী তেমনি অসাধারণ সাহসিনী, ও তেজস্বিনী। তাঁহার মুখ-চোখ হইতে প্রতিভার আলো যেন ঠিকরিয়া পড়িতেছে। আর একটি চিত্রে মহাবীর রোস্তম তরবারির আঘাতে এক ভীষণ আত্মদাহ সর্পকে বিনাশ করিতেছেন। রোস্তমের অসাধারণ বীরত্ব ও তেজ ছবিতে চমৎকার রূপে ফুটিয়াছে। আর একটি চিত্রে উদ্যান মধ্যে বসিয়া 'যজ্ঞনু' বীণা বাদন করিতেছেন; দুঃখিনী প্রেমোন্মাদিনী 'লায়লা' সেই মধুর বীণাধ্বনি শ্রবণ করিতেছেন। লায়নার দুই চক্ষু বহিয়া তরল মুক্তাধারার ন্যায় অশ্রুধারা নির্গত হইতেছে। উদ্যানের ফুল ও পক্ষীগুলি মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে। আর একখানি চিত্রে ফরহাদ প্রেমোন্মত্ত চিত্তে পাহাড় কাটিতেছেন। অনবরত দৈহিক পরিশ্রমে ফরহাদের সুকুমার তনু ক্ষীণ ও মলিন হইয়া পড়িয়াছে। শিরী বিষণ্ণ চিত্তে ককর্ণনেত্রে দূরত্ব প্রাসাদের ছাদ হইতে তাহাই দর্শন করিতেছেন। তাঁহার চক্ষু হইতে প্রিয়তমের প্রতি প্রেম ও সহানুভূতির কি ভুবনমোহন জ্যোতিঃ নির্গত হইতেছে!

একখানি চিত্রে একজন দরবেশ স্থায়ী লোকদিগকে ইসলাম গ্রহণ এবং তাঁহার সহায়তা করিতে আহ্বান করিতেছেন। সমবেত লোকগণ সকলেই নীরব ও নিস্তব্ধ। কিন্তু ষোড়শবর্ষ রয়ক এক যুবক স্বর্গীয় দীপ্তিবলসিত তেজোময়ী মূর্তিতে দণ্ডায়মান হইয়া বিশ্বাসের কলেমা পাঠ করতঃ অসি উত্তোলনপূর্বক আনুগত্য জ্ঞাপন করিতেছেন। আর একখানি চিত্রে বালক রোস্তম, এক মস্ত শ্বেতহস্তীকে পদাঘাতে বধ করিতেছেন। একখানি চিত্রে রাজ্যচ্যুত ছদ্মবেশী ইরানেশ্বর জামশেদ, জাবলস্তানের উদ্যানে শিলাসনে উপবিষ্ট। সম্মুখে

জীবনভ্যনেও অপর সৌন্দর্যশালিনী রাজকুমারী তাহাকেই স্বকীয় আকাঙ্ক্ষিত প্রেম-সঙ্গ জন্মসঙ্গ জানে সবেই নিরাকরণার্থ সজ্জাট জামলেদের একখানি চিত্র লইয়া পরম কৌতূহল এবং প্রেমামুগ্ধ-কুন্ত-নয়নে আড়াল হইতে আকৃতির সহিত মিলাইয়া দেখিতেছেন। চিত্রে কুমারীর এক পার্শ্বে একটি নৃত্যশীল যম্বর এবং অন্য পার্শ্বে একটি মনোরম যুগ শোভা পাইতেছে। আর একখানি চিত্রে হস্তমঞ্চনার সুসজ্জিত নিভৃত কক্ষে শ্রেয়-উন্মাদিনী জোলেখা সুন্দরী পিপাসাতুর চিত্রে ইউসুফের নিকট শ্রেয় বাচঞা করিতেছেন—আর ধর্মপ্রাণ ইউসুফ উর্ধ্বে অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়া পরমেশ্বরের ক্রোধের কথা জোলেখাকে জ্ঞান করিতেছেন। উভয়ের মুখে স্বর্ষ ও নবকের চিত্র। একখানি চিত্রে মক্কানির্বাসিতা হাজেরা বিবি শিশুপুত্র ইসমাইলকে শারিত রাখিয়া জলের জন্য চতুর্দিকে ছুটাছুটি করিতেছেন। এদিকে ইসমাইলের পদাঘাতে ভূমি হইতে এক নির্মল উৎসধারা বহির্গত হইতেছে। একজন স্বর্গীয় ছরী ইসমাইলের চিত্তবিনোদনের জন্য তাহার চোখে দৃষ্টি স্থাপন করিয়া হাস্যমুখে দাঁড়াইয়া আছেন। শিশু তাহার মুখপানে অনিমেষ আঁখিতে এমন সরল উদার অথচ কৌতূহলপূর্ণ মধুর দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে যে, সমস্ত পৃথিবী যেন অস্ত-ধারায় সিক্ত হইয়া যাইতেছে! আর একখানি চিত্রে মহামতি সোলেমান তাহার রত্নখচিত সিংহাসনে বসিয়া আছেন। সুন্দরীকুল-ললাম সাবাব রাজী বিলকিস্ রূপের ছটার দশদিক আলো করিয়া আগমন করতঃ কাচনির্মিত মেঝে সরোবর জানে একটু বিচলিত হইয়া পার হইবার জন্য পরিধেয় বাস ঈষৎ টানিয়া ধরিয়াছেন। হজরত সোলেমান এবং অন্যান্য পরিষদমণ্ডলী রাজীর বুদ্ধিব্রহ্ম দেখিয়া দ্বিত হাস্য করিতেছেন। লজ্জার সহিত সৌন্দর্য ও অভিমান-পরিমা মিশিয়া রাজী বিলকিস্কে এক ভুবনমোহন সৌন্দর্য প্রদান করিতেছে। এই প্রকারের অসংখ্য কবি-চিত্ত-বিনোদন তসবীরে চতুর্দিকের প্রাচীরগায়ে বেহেশতের শোভা বিকাশ করিতেছে।

গৃহের মধ্যে আন্তর গোলাপের গন্ধ ছুর ছুর করিতেছে। মেঝের উপর রাশি রাশি গোলাপ শোভা পাইতেছে। এক পার্শ্বে বৃহৎ পালঙ্কের উপর বিছানা পাতা রহিয়াছে। বিছানার উপরে শ্বেত রেশমের মূল্যবান চাদরখানি দীপালোকে কলমল করিতেছে। তিন পার্শ্বে কিম্বাপের বহুমূল্য ভাঙ্কিয়া। জরীর কার্য করা সবুজ মঞ্চলে তাহা ঢাকা। বিছানার এক পার্শ্বে শাহনামা, সেকেশ্বারনামা এবং কয়েকখানি বহুমূল্য ইতিহাস শোভা পাইতেছে। পুস্তকগুলি সমস্তই মণিখচিত করিয়া সুবর্ণের পুরু পাত্রে বাঁধা। মণিগুলি দীপালোকে কক স্বক করিয়া জ্বলিতেছে।

এই প্রকারের সুরম্য গৃহতলে বসিয়া একমনে ঈসা খাঁ কি চিন্তা করিতেছেন। ঈসা খাঁর প্রিয়তমা ভগ্নী ফাতেমা অনেকক্ষণ হইল ঘরে প্রবেশ করিয়া বিছানার নিকট দাঁড়াইয়া বহিঃগুলি নাড়াচাড়া করিতেছে, তবুও ঈসা খাঁর চমক নাই।

ফাতেমা আর কখনও তাহার ভ্রাতার এই প্রকার অন্যান্যমনকতা দেখে নাই। অন্যান্য দিবস ফাতেমা আসিতেই ইসা খাঁ তাহাকে কণ্ঠ ধড়র প্রদান করেন। উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় সম্প্রীতি ও গভীর ভালবাসা। প্রত্যেক দিন হায়েট ইসা খাঁর পরিশ্রান্ত মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের শান্তি ও শ্রীতি সজ্জারের জন্য ফাতেমাকে সেতার বাজাইয়া গান গাহিতে হয়। ফাতেমা অতি সুন্দর রূপে গাহিতে এবং বাজাইতে শিখিয়াছে। আহমদনগরের প্রসিদ্ধ মসীত্যাচার্য করতলব খাঁ তিন বৎসর পর্যন্ত ফাতেমাকে গীতবাদ্য শিক্ষা দিয়াছেন। ফাতেমার ধর্ম ও শান্তি-বিসর্গিত পান গুনিলে পাষণ হৃদয়ও বিগলিত হয়। ফাতেমা যখন আঙ্গুলে সেক্তরক্ষ পত্রিয়া সেতারের তারে হস্ত স্পর্শ করে, তখন তারগুলি যেন আপনা আপনি কি এক বাদুবেশে নাচিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া অতৃপ্ত মদিরাবেশময় ঝঙ্কার দিতে থাকে। ফাতেমা এত দ্রুত অঙ্গুলী চালনায় অত্যন্ত যে মনে হয় তাহার অঙ্গুলী স্থির রহিয়াছে। সেতার আপনা আপনি বাজিতেছে। তারপর সেতারের ঝঙ্কার ও মধুবর্ষিণী মূর্ছনার সহিত যখন তার সুধাকণ্ঠ গাহিয়া উঠে, তখন মনে হয় স্বর্গরাজ্য তরল হইয়া ধরাতলে বহিয়া যাইতেছে। কিন্তু আজ অনেককণ হইল ফাতেমা আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ভ্রাতার ইঞ্জিত না পাইলে সে কোনো দিন বসে না। বসে না যে, সে শুধু ইসা খাঁর সুমধুর সঙ্গাষণের জন্য—ইসা খাঁ তাহাকে আদর করিয়া সম্মেহে বসিতে বলিবে বলিয়া। ফাতেমা যখন দেখিল যে, ইসা খাঁ জানালার দিক হইতে মুখ ফিরাইতেছেন না, তখন একখানি পুস্তকের দ্বারা আর একখানি পুস্তকে আঘাত করিল। আঘাতের শব্দে ইসা খাঁর চমক ভাঙ্গিয়া গেল। নক্ষত্র-খচিত নীলাকাশের প্রান্ত-বন্ধ-দৃষ্টি ফিরাইয়া গৃহমধ্যে চাহিলেন। দেখিলেন, সমস্ত ঘর ঝাড়ের আলোকে উজ্জ্বল হইয়া শোভা পাইতেছে। আর সেই গৃহের কার্পেটমণ্ডিত মেঝেতে দাঁড়াইয়া ফাতেমা ঈষৎ বঙ্কিম অবস্থায় তাহার তত্র শব্দ্যার পার্শ্বে পুস্তক লইয়া ক্রীড়া করিতেছে। তাহার অলকাবলী বিমুক্ত। তাহার বদনমণ্ডল পুণ্যের জ্যোতিঃতে স্নিগ্ধ। দেখিয়া মনে হয় যেন জ্যোৎস্নার রাজ্যে মূর্তিমতী বালিকা প্রতিমা শান্ত ভঙ্গিমায় দাঁড়াইয়া আছে। ফাতেমার বয়স সবে ছাদশ হইলেও এবং এখনও তাহার যৌবনপ্রাণ্ডিত্ত বিলম্ব থাকিলেও তাহার মুখমণ্ডল বেশ ভাবুকতাপূর্ণ। সে ভাব অতি নির্মল—অতি পবিত্র—বৃথিবা স্বর্গরাজ্যের উর্ধ্বের। ইসা খাঁ মুখ তুলিয়া মধুর স্বরে বলিলেন, “কি গুল, কখন এসেছিস?” পাঠক জানিয়া রাখিবেন, ইসা খাঁ আদর করিয়া ফাতেমাকে গুল অর্থাৎ ফুল বলিয়া ডাকিতেন।

ফাতেমা : হাঁ যিঞাভাইজান! আপনি আজ একমনে কি ভাবছিলেন? আমি অনেককণ এসেছি।

ইসা খাঁ : তা আমাকে ডাকিস নাই কেন? আমি না বলে কি বসতেও নেই? আকাশের দিকে চেয়ে মনটা যেন কোন দেশে চলে গিয়েছিল। তুই এইবার

সেতার নিয়ে বসে যা ।' আজ খুব ভালো বাজাব । মনটা বড় আঁহুর ।

ফাতেমা তখন সেতার লইয়া একখানি মখমলমণ্ডিত রূপার কুর্সীতে বসিয়া চম্পক-বিনির্ভিত আঙ্গুলে মেজ্রাক পরিয়া সেতারের বক্ষ স্পর্শ করিল । সে ললিত-কোমল করপল্লবের ইস্তিতে সেতারের সুও তন্ত্রী নাচিয়া উঠিয়া বাজিতে লাগিল । সেতারের মধুর ঝঙ্কারে আলোক-উজ্জ্বল গৃহ যেন চঞ্চল হইয়া উঠিল । ঝাড়ের কর্ণুর-মিশ্রিত শত মোমবাতির তুঙ্গ শিখা মৃদু কম্পনে কাঁপিতে লাগিল । সেতারের মনোমদ মধুর তরল ঝঙ্কারে ঈসা খাঁর এক আত্মীয় রমণী এবং আয়েশা খানম সাহেবা ও অন্যান্য অন্তঃপুরিকারা আসিয়া উপস্থিত হইলেন । প্রতাহই এইরূপ হইত । ফাতেমার হাতে সেতার বাজিলে কেহই স্থির থাকিতে পারিত না । বিশেষতঃ ফাতেমার ধর্ম ও ঐশী-প্রেম সম্পর্কীয় গজল শুনিয়া পূণ্য সঙ্করের আশায় আয়েশা খানম সেতার ঝঙ্কার দিলেই আসিতেন । ঈসা খাঁ আয়েশাকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া চরণ চুম্বন করিলেন এবং একখানি স্বর্ণ বিমণ্ডিত ছিবদ-বদ-রচিত বিচিত্র আসনে আম্রাজ্ঞানকে বসিবার জন্য মখমলের মসন্দ পাতিয়া দিলেন । আয়েশা খানম তাহার শ্রীতিপ্রফুল্লতা-মণ্ডিত শাস্ত অথচ পঙ্কীর সৌন্দর্যে গৃহ আলোকিত করিয়া রাজরাজেশ্বরীর ন্যায় আসন গ্রহণ করিলেন । অন্যান্য রমণীরাও যথাযোগ্য আসন পরিগ্রহ করিলেন । সুবিশাল পুরী নীরব ও নিঃশব্দ । কেবল আসাদ-মঞ্জিলে (সিংহ-প্রাসাদে) সেতারের মধুর নিকণ কাঁপিয়া কাঁপিয়া চতুর্দিকে অমৃত বৃষ্টি ঝরিতেছে । এক গৎ বাজাইবার পর ফাতেমা গজল ধরিল । সে পীযুষ-বর্ষিণী পারস্য ভাষার গজলের বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইল । বলা বাহুল্য, পারস্য ভাষার অমৃতত্ব ও ছন্দ-ঝঙ্কার বঙ্গানুবাদে কেহ অনুসন্ধান করিবেন না ।

সঙ্গীত

"হে শিব সুন্দর! চির মনোহর পরম পুরুষ পরাংপর!
হে নিখিলশরণ ভুবনরঞ্জন পতিতপাবন ত্রিগুণাকর!
গগনে গগনে পবনে পবনে তোমারি মহিমা ভাসে,
কাননে কাননে কুসুমে কুসুমে তোমারি মাধুরী হাসে ।
নদ নদী জল বহে কল কল ঢালিয়া অমিয়-ধারা,
কুঞ্জ কাননে তোমার গায়নে বিহগ আপনা-হারা ।
নীল আকাশে তারকা প্রকাশে তোমারি মহিমা রটে,
সবারি মাঝে তুমিই ফুটিছ তুমিই হাসিছ বটে!
(ওধু) আমারি হৃদয় রবে কি আঁধার? তাও কি কখনো হয়,
এই যে গো তুমি হৃদয়ের মাঝে, জয় জয় তব জয় ।"

ফাতেমা ভাবাবেশে তনুয় চিত্তে গগন-পবন সুধা-প্রাবিত্ত করিয়া সঙ্গীতটি গাহিল। সে যখন শেষের চরণ ঝঙ্কার দিয়া নিমীলিত নেত্রে গাহিল, “এই যে গো তুমি হৃদয়ের মাঝে, জয় জয় তব জয়”, তখন তাহার মুখের দৃশ্যে এবং ভাবের আকুলতায় সকলেই কাঁদিয়া ফেলিল। তারপর কিছুক্ষণ থামিয়া বালিকা বিশ্রাম করিল। ঘরের ভিতর টানা-পাখা চলিলেও তাহার ললাটে হৃদবিন্দু দেখা দিল। পাখার বাতাসে তাহার মুক্ত অলকাবলী উড়িয়া উড়িয়া দোল বাইতেছে। অথবা উহারা সঙ্গীতরসে মাতোয়ারা হইয়া নৃত্য করিতেছে। বালিকা আবার গাহিল—

আজি, প্রভাতে—
 বহিয়া কুসুম গন্ধ
 সমীর বহিছে মন্দ
 প্রাণের কুঞ্জে মূরজ মন্দ্রে
 বাজিছে অযুত হৃন্দ।

আজি, কার দরশন আশে
 পুলকের হৃদয় ভাসে,
 কার প্রেমের বাণী অমিয় ঢালিয়া
 মরমে মরমে পশে!

কার ভুবনভুলান ছবি,
 যেন প্রভাতের রবি
 মেঘের আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে
 দেখা দিয়ে যায় ডুবি।

কার অই বাঁশীর স্বরে
 পরাগ আকুল করে!
 হৃদয়-কুঞ্জে কুসুমপুঞ্জে
 কে ডাকিছে মোরে!

আমি চিনেছি ওরে এখন
 ও যে জীবনের জীবন
 হৃদয়ের ধন নয়নমাণি
 প্রাণবল্লভ রতন।

ফাতেমা ৩০ মিনিটে ছিনবার গাহিয়া এ-সঙ্গীত শেষ করিল। শেষের গদ্য গাহিবার সময় ঐশী প্রেমের তীব্র উদাসে সকলের বুক ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। আয়েশা খানম বেএখতেয়ার হইয়া অশ্রুজলে বুক ভাসাইতে লাগিলেন। ফাতেমা

যখন গাহিতেছিল তখন মনে হইতেছিল, কোটি স্বর্ণ এই বালিকার পুণ্য চরণতলে চুবুয়ার হইয়া যাইতেছে। সকলের মুখমণ্ডল পুণ্যের মহিমায় কি সুন্দর! কি উজ্জ্বল! স্বর্ণরাজ্যের এক অমৃত-ঝরণা সকলের হৃদয়ে প্রবাহিত হইতেছে। আয়েশা খানম বলিলেন, “ফাতেমা! আর একটি ক্ষুদ্র মোনাজাত (প্রার্থনা) গেয়ে ফাস্ত হ’। বড় পরিশ্রম হইল।”

ফাতেমা বলিল, “না মা! কিছুই পরিশ্রম হয় নাই। আপনি যতক্ষণ বসবেন, আমি ততক্ষণ গুনব।” বালিকার কণ্ঠে আবার বাজিল—

কুঞ্জ সাজিয়ে তোমারি আশে বসিয়ে আছি হে প্রাণধন!
তোমারি চরণ করিয়া শরণ সঁপিয়া দিয়েছি এ দেহ মন।
তোমারি তরে ভক্তি কুসুমে গাঁথিছি আমি শোভন মালা,
হৃদি-সিংহাসনে বসহ বঁধুয়া আঁধার মানস করিয়ে আলা।
মরমে মরমে হৃদয়ে হৃদয়ে জেগেছে তোমার প্রেমের তৃষা,
(আমি) পারি না যে আর এমন করিয়া জাগিতে হে নাথ! বিরহ-নিশা।

ফাতেমা যখন কিন্নরীকণ্ঠে গাহিল, “আমি পারি না যে আর এমন করিয়া জাগিতে হে নাথ! বিরহ-নিশা” তখন সকলেই কাঁদিয়া উঠিলেন। ফাতেমা এমনি করিয়া সমস্ত প্রাণের ব্যাকুলতা-জ্বাড়া ব্যাকুল স্বরে এমন চমৎকার সুরে অপূর্ব ভঙ্গিমার সহিত “আমি পারি না যে আর এমন করিয়া জাগিতে হে নাথ! বিরহ-নিশা” গাহিল যে, সকলে এক সঙ্গে ঐশী প্রেমে উন্মত্ত হইয়া পড়িলেন। সকলেই প্রাণের ভিতরে সেই পরম সুন্দর পরম পুরুষের তীব্র তৃষ্ণা অনুভব করিতে লাগিলেন। সঙ্গীত ধামিবার অর্ধঘণ্টা পরে সকলের প্রেমোচ্ছ্বাস মন্দীভূত হইল। কিন্তু তখনও মনে হইতেছিল যেন, সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সঙ্গীতের অমৃতায়মান স্বরে বোমবর্ষে স্থির ধীর হইয়া রহিয়াছে। ঈসা খাঁ নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বলিলেন, “আমাজান! ফাতেমা কি চমৎকার গায়! আর আজকার সঙ্গীতের বাছাই বা কি মনোহর! ও যখন গায়, তখন আমার মনে হয়, যেন সাক্ষাৎ দেবী-কুলেশ্বরী জগজ্জননী ফাতেমা জোহরা-ই মর্ত্যে আসিয়া বালিকা মূর্তিতে গাহিতেছেন!”*

আয়েশা : আহা! আজ যদি তোমার কেবলা সাহেব বেঁচে থাকতেন, তা হলে তিনি কি আনন্দই না উপভোগ করেতেন! তবুও আমার বিশ্বাস, ও যখন গায়, তখন তাঁর আত্মা এসে সঙ্গীত-সুখা পান করতে থাকে। ফাতেমা যতদিন আছে, ততদিন আমি এই স্বর্ণসুখ অনুভব করছি। কিন্তু তারপর এ সুখ ও পুণ্য ভোগের ভাগ্য হবে না।

* জগজ্জননী বিবি ফাতেমা সঙ্গীতেও পটু ছিলেন। তাঁহার সঙ্গীতগুলি “কেতাবল অঘানী”তে দ্রুটবা। আরবে প্রাচীন কাল হইতেই নারীদিগের মধ্যে সঙ্গীত-চর্চা প্রসার লাভ করিয়াছিল। (“এবনে খলদুন” দেখুন।)

ঈসা : কেন মা!

আয়েশা : কেন আর কি? ফাতেমাকে তো আর চিরকাল এখানে রাখতে পারব না। তুমিও তো বিবাহ করবে না যে, বৌমাকে কিছু শিখা দিতে পারবে।

ফাতেমা : কেন মা! আমি চিরকালই আপনার কাছে থাকব।

আয়েশা : (হাস্য করিয়া) হাঁ বাছা! ঐ রকম সকলেই ভাবে বটে! কিন্তু এ জগতে যা ভাবা যায়, তাই ঠিক রাখতে পারা যায় না। তুমি ছেলে মানুষ, সংসার-চক্রের এখনও কিছু জ্ঞান না।

ফাতেমা : যা হক মা, মিঞাভাইয়ের শাদীর আয়োজন কর।

ঈসা বা ফাতেমার কথায় লজ্জিত হইয়া জননীৰ অসাম্বন্ধে মুঠি ভুলিয়া দ্বিত মুখে ইঙ্গিতে ফাতেমাকে বলিলেন, “চুপ”।

আয়েশা : হাঁ মা! আমি শীঘ্রই উপযুক্ত পাত্রীর সন্ধানে লোক পাঠাচ্ছি।

ফাতেমা : হাঁ, আশ্রাজ্ঞান! কেদার রায়ের কন্যা স্বর্ণময়ী নাকি খুব সুন্দরী?

আয়েশা : থাকুক সুন্দরী, তাতে কি হবে?

ফাতেমা : কেন আশ্রাজ্ঞান?

আয়েশা : হিন্দুর মেয়ের আবার সৌন্দর্য!

ফাতেমা : না মা! সে নাকি পাঠানীর মত সুন্দরী!

আয়েশা : হাজার হউক, সে হিন্দুর মেয়ে।

ফাতেমা : সে তো আর হিন্দু থাকছে না, শাদী হলে সে সত্য ধর্ম গ্রহণ করে মুসলমান হবে।

আয়েশা : তা হউক বাছা। তাই বলে আমি প্রতিমাপূজক কাফেরের কোনও কন্যাকে কদাপি ঘরে এনে বংশ কলুষিত করবো না।

ফাতেমা : কেন মা! আজকাল তো অনেক মুসলমানই হিন্দুর মেয়ে বিয়ে করছে।* হিন্দুর মেয়ে অসভ্য হলেও, মুসলমান-পরিবারে এসে আদব, কায়দা, লেহাজ্জ, তমিজ্জ, তহজ্জিব, আখলাক সমস্তই শিখে সভ্য হয়ে যায়।

আয়েশা : তা বটে মা। কিন্তু এতে গুরুতর জাতীয় অনিষ্ট হচ্ছে। হিন্দুর নিস্তেজ রক্ত মুসলমানের রক্তে মিশ্রিত হয়ে মুসলমানকে ক্রমশঃ হিন্দুর ন্যায় ভীক, কাপুরুষ, ঐক্যবিহীন, ছাড়োপাসক নির্বীর্য নগণ্য জাতিতে পরিণত করবে।

জননীৰ বাক্যে ঈসা খাঁর হৃদয় যেন কাঁপিয়া উঠিল। সহসা কুসুমমালা-পবিধানোদ্যত ব্যক্তি মাল্যে সর্পের অবস্থিতি দর্শনে যেমন চমকিত হইয়া উঠে, ঈসা খাঁ তেমনি চমকিয়া উঠিলেন। তিনি স্বর্ণময়ীকে মানসপ্রতিমা সাজাইবার জন্য

*: ভারতবর্ষের মুসলমানেরা প্রায় সকলেই রাজপুতানী বিবাহ করিয়াছিলেন। তৎপর সকল প্রদেশের শ্রেষ্ঠবংশীয় হিন্দু কন্যার পাণিনীড়িত প্রথা খুবই প্রচলিত হইয়াছিল। সেই সূত্রে আমাদের মধ্যে নানা, নানী, দাসা, দাদী, মামু প্রভৃতি রাজপুত শব্দ ও হিন্দুয়ানী নানপ্রকারের প্রথা মেয়ে-মহলে এখনও বিরাজমান।

যে কল্পনা করিতেছিলেন, তাহা জননী-মুখ হইতে নির্গত বাক্যের বহু-নির্ঘাতে যেন চুম্বার হইয়া গেল। ইসা খাঁ একটু স্থির হইয়া বলিলেন, “আম্বাজান! বাস্তবিকই হিন্দু কন্যার পাণিপীড়ন দোষে ভবিষ্যতে মুসলমানদিগকে অধঃপাতে যেতে হবে বলে মনে হয়।”

আয়েশা : বাছা! এতে মুসলমানের এমন অধঃপতন হবে যে, কালে মুসলমান হিন্দুর ন্যায় কাপুরুষ ও “গোলামের জাতি”তে পরিণত হবে।

ইসা খাঁ : তবে কথাটা কেউ তলিয়ে দেখছে না কেন?

আয়েশা : দেখবে কে? স্বয়ং বাদশাহ্ আকবর পর্যন্ত এই পাপে লিপ্ত। হিন্দুকে সম্বুট করার জন্য তিনিই এই প্রথা বিশেষরূপে প্রবর্তন করেছেন। তিনি ভাবছেন, এতে হিন্দুরা শ্রীত ও মুগ্ধ হয়ে বাধিত থাকবে। ফলে কিছু বিপরীত ঘটবে। এতে শতই ভারত-সম্রাটের সিংহাসনের উপর হিন্দুদের মাতুলত্বের দাবি প্রতিষ্ঠিত হবে। হিন্দুর সাহস স্পর্শ দিন দিন বেড়ে যাবে। ভাগিনেয় সম্রাট হলে হিন্দুদের উচ্চ উচ্চ পদ প্রাপ্তি সহজ ও সুলভ হয়ে উঠবে। এইরূপে দেশের স্বাভাবিক পরিচালনায় হিন্দুর হস্তও নিযুক্ত হবে। অন্যদিকে বংশধরেরা মাতুলত্বের হীনতাবশতঃ কাপুরুষ, বিলাসী এবং চরিত্রহীন হয়ে পড়বে। আমার মনে হয়, উত্তরকালে এ জন্য ভারতীয় মুসলমানকে বিশেষ ক্রেশ ও লাঞ্ছনা ভোগ করতে হবে। এরা ভারতের রাজপতাকা বহুস্তে রক্ষা করতে পারবে না।

ইসা খাঁ অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া নীরব রহিলেন। জননীর হিন্দু-কন্যা বিবাহের অনিষ্টকারী মত বিদ্যুতের ন্যায় তাঁহার হৃদয়কে স্পর্শ করিল। তিনি মনে মনে বিশেষ সম্বুট গণিলেন।

ফাতেমা : আম্বাজান! তবে আমরা কখনো হিন্দু বউ আনবো না।

আয়েশা : কখনও না, ছিঃ!

এই বলিয়া আয়েশা খানম গৃহ হইতে বাহির হইলেন এবং তাঁহার সঙ্গে ফাতেমাও বাহির হইয়া গেল। ইসা খাঁ একাকী বসিয়া ব্যথিতচিত্তে স্বর্ণময়ীর পত্রের কি উত্তর দিবেন, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। ইসা খাঁ অর্ধ রাত্রি পর্যন্ত অনেক ভাবিলেন—অনেক চিন্তা করিলেন; কিন্তু সে-ভাবনা, সে-চিন্তা অনন্ত সমুদ্রবক্ষে দিক্‌হারা নৌকার ন্যায় ঘুরিতে লাগিল। স্বর্ণময়ীর প্রেমপত্রখানি শত ব্যয়েরও অধিক পড়িলেন। যৌবনে বিদ্যাদীপ্ত-সৌন্দর্য তাঁহার হৃদয়-আকাশে সৌদামিনীর মত চম্‌কাইতে লাগিল! স্বর্ণময়ীর হৃদয়ের প্রবল অনুরাগ ও সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের কথা স্বরণ করিয়া ইসা খাঁ বড়ই কাতর ও মর্মান্বিত হইয়া পড়িলেন। তিনি শতই বুঝিলেন যে, স্বর্ণকে তিনি প্রেমের বাহুতে জড়াইয়া না ধরিলে, স্বর্ণের জীবন ভস্মে পরিণত হইবে। রায়-নন্দিনীর পরিণাম ভাবিয়া তাহার হৃদয়খানি নিজের হৃদয়ে তুলিয়া লইয়া দেখিলেন, তিনি ব্যতীত স্বর্ণের আর কেহ নাই—কিছু নাই। তিনি ব্যতীত স্বর্ণ অনাধিনী, স্বর্ণ রাজকন্যা হইলেও তিনি

ব্যতীত ভিখারিণী! ঈসা খাঁ শিহরিয়া উঠিলেন। বসিয়া, ওইয়া, দাঁড়াইয়া চিন্তা করিলেন—কিন্তু সমস্যার কিছুই মীমাংসা করিতে পারিলেন না। ঈসা খাঁ রায়-নন্দিনীকে যখন মন্দিরে দর্শন করিয়াছিলেন—যখন তাহার সহিত আলাপ করিয়াছিলেন—তখনও স্বর্ণের সৌন্দর্য ও ভাষা তাঁহাকে আনন্দ দান করিয়াছিল। কিন্তু সে আনন্দ তাহার হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা স্পর্শ করিতে পারে নাই। তিনি ইচ্ছা করিলেই স্বর্ণকে অনায়াসেই বিবাহ করিতে পারিতেন—বার ভুইয়ার প্রধান ঈসা খাঁ মসনদ আলীকে, কেদার রায় যে পরম আগ্রহে কন্যাদান করিয়া জামাতৃপদে বরণ করিতে কৃতার্থতা জ্ঞান করিবেন, তাহা তিনি বেশ জানিতেন; কিন্তু তখন তাহার মানসিক অবস্থা অন্যরূপ ছিল। প্রথমতঃ ঈসা খাঁ নিজের বিবাহ সম্বন্ধে স্থিরসঙ্কল্প হইয়াছিলেন না; তাহার পর তাহার ইচ্ছা ছিল যে, বিবাহ করিলে কোন বীর্যবতী বীরাজনাকেই বিবাহ করিবেন! বীরাজনা বিবাহের খেয়াল ছিল বলিয়াই, স্বর্ণময়ীকে পরম রূপবতী এবং ফুটন্ত-যৌবনা দর্শন করিলেও কদাপি তাঁহাকে বিবাহ কবিরার কল্পনাও তাহার মস্তিষ্কে উদয় হয় নাই। কারণ, হিন্দু-কন্যাতে বীরত্বের আশা নিঃস্বক্ষে অত্র ফলের আশা সদৃশ। এজন্য স্বর্ণময়ী তাহার নেত্রে গগন-শোভন চিস্ত-বিনোদন তারকার ন্যায় ফুটিয়াছিল, হাসিয়াছিল এবং কিরণ বিতরণও করিয়াছিল; কিন্তু তাহাতে তাহার চিস্ত-বিকার জন্মাইতে সমর্থ হয় নাই। তারার সৌন্দর্য দেখিয়াই তৃপ্ত হইতে হয়। ছিড়িয়া গলে পরিবার কাহারও আকাঙ্ক্ষা হয় না। কিন্তু স্বর্ণের প্রাণ দিয়া লেখা প্রাণ-ঢালা প্রেমের সৌন্দর্য-মাখা, আত্মোৎসর্গের অটল বিশ্বাস ও অচল নিষ্ঠাপূর্ণ পত্র পাঠে স্বর্ণময়ীর নাস্ত্রিক সৌন্দর্য তাহার নিকট হইতে ক্রমশঃ লোপ পাইতে লাগিল। তিনি যতই পুনঃ পুনঃ সেই হৃদয়ের লিপি পাঠ করিতে এবং নিজের হৃদয়-মুকুরে স্বর্ণের হৃদয়ের ছবি দেখিতে লাগিলেন, ততই স্বর্ণময়ী তাহার নিকট তারকার পরিবর্তে গোলাপে পরিবর্তিত হইতে লাগিল। অবশেষে স্বর্ণ তাহার সম্মুখে মনপ্রাণ-প্রীণন সুরভিপূর্ণ শিশিরসিক্ত, উষালোক-প্রস্ফুটিত অতি মনোহর গরিমাপূর্ণ রক্তাভ লোভনীয় বস্রাই গোলাপের ন্যায় প্রতিভাত হইল। তখন তিনিও উহাকে আদর করিয়া বুকে তুলিয়া লইতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু হায়! ঠিক এমন সময়েই তাহার জননী উদ্যানের প্রবেশদ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। তিনি ইচ্ছা করিলে, সামান্য বল প্রয়োগেই এ-দ্বার উন্মোচন করিতে পারিতেন। কিন্তু জননীর হিন্দু রমণী বিবাহের যুক্তিসঙ্গত অনিষ্টকারী মত লৌহ-অর্গলের মত সে-দ্বার কঠিনভাবে অবরুদ্ধ করিল। জননীর যুক্তির সারবস্তায় এবং বচনের ওজস্বিতায় ঈসা খাঁর উদ্দাম হৃদয়ের প্রেম-প্রবাহ, হযরত দায়ুদের সঙ্গীত শ্রবণে উত্তাল তরঙ্গময়ী খরগতি স্রোতস্বিনীর ন্যায় স্তম্ভিত হইয়া পড়িল।

ঈসা খাঁ চিন্তা করিয়া দাঁড়িলেন, রায়-নন্দিীর প্রেমের নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করাও যা, আর স্বর্ণময়ীর কোমল তরল প্রেমপূরিত-বক্ষে শাণিত বিষদিশু ছুরিকা

প্রাণটি করিয়া ছর্থাপও খও খও করাও তাই। সুতরাং ইসা খাঁ বর্ণের হৃদয়-দানের প্রত্যাখ্যানের কল্পনা করিতেও শিহরিয়া উঠিতেছিলেন। তাহার বীর-হৃদয় কাঁপিয়া উঠিতেছিল। হায়! প্রগতে সিংহ-শাদ্দুল-পরাক্রমী উচ্চ-প্রতাপ নির্ভীক বীর-হৃদয়ও এমন করিয়া প্রেমের নিকটে কুষ্ঠিত এবং লুপ্তিত হইয়া পড়ে। প্রেমের কি অপরাহের বিশ্ব-বিজয়িনী শক্তি! ক্ষুদ্র কীট হইতে বিশ্বশ্রুটি অনন্তপুরুষ পর্যন্ত প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ। প্রেমের শাসন কি কঠিন শাসন! প্রেমের আকর্ষণ কি মোহনীয়! আজ যুবতী-প্রেমের মদিরাকর্ষণে ইসা খাঁর প্রশান্ত চিত্তও নিশাপতি সুখান্তে কৌমুদী-আকর্ষণে সমুদ্রের ন্যায় উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছে। অন্যদিকে জননী-প্রেমের কঠিন শাসনে সেই উল্লসিত সিদ্ধ উষেলিত হইয়াও, আকাঙ্ক্ষিত ক্ষেত্রে ভরস-বাহু বিস্তার করিতে পারিতেছে না। বেলাভূমি অতিক্রম করিবার সাধ্য নাই, উহা জননী-প্রেমের কঠিন ও অভঙ্গুর পর্বতশ্রাচীরে পরিবেষ্টিত। ইসা খাঁ অনেক গবেষণার পর বুঝিতে পারিলেন যে, জননীকে ধরিয়া বসিতে পারিলেই তাহার মত কিরিবে। কিন্তু তজ্জন্য সুযোগ চাই। সুতরাং ইসা খাঁ অবশেষে নিখিল-শরণ মঙ্গল-কারণ বিশ্ব-বিধাতার বিপদভঞ্জন চরণে আশ্রয় লইয়া চকল চিত্ত কতকটা স্থির করিলেন। তৎপর স্বর্ণ-খচিত 'খাস-কাগজে' কস্তুরী-গছ-বাসিত স্বর্ণ-কালিতে স্বর্ণময়ীকে লিখিলেন :

প্রিয়তমে!

আমার অনন্ত স্নেহাশীর্বাদ, প্রগাঢ় প্রেমানুরাগ এবং মঙ্গল-কামনা জানিবে। তোমার প্রাণ-ঢালা পত্র পাঠে তোমার হৃদয় ক্রামলকবৎ প্রত্যক্ষ করিতেছি। হে মানসসুন্দরি! বিশ্ব-প্রহ্লাদিনী পুষ্প-কুন্তলা হৈম-কিরীটিনী উষা যেন তাহার গোলাপী করের বিচিত্র তুলিকায় অধরমণ্ডল বিচিত্র বর্ণানুরঞ্জিত জলদকদম্বে বিভূষিত এবং সমুচ্ছল করে, তেমনি, হে আমার হৃদয়-সরোবরের স্বর্ণ-সরোজিনি! তোমার নির্মল স্বর্ণীয় প্রেমের বিশ্ব-বিনোদন-কিরণে এ-হৃদয় সূশোভিত এবং পুলকিত হইয়াছে। তোমার বীণা-বাণী-নিখিত প্রেম-ওজরণে হৃদয়-কুসুম—যাহা মুকুলিত ছিল, তাহা প্রস্ফুটিত হইয়াছে।

প্রিয়তমা স্বর্ণময়ী!

অনেকদিন হইতেই তোমাকে স্বর্ণময়ী মূর্তির ন্যায় ভালোবাসিতাম। আজ সে স্বর্ণময়ী মূর্তি ভীকন্ত ও সরস প্রেমময়ী, শ্রীতিময়ী, হৃদয়ময়ী, কল্যাণময়ী অমৃত প্রতিমার পরিণত। সুতরাং সে মূর্তিকে ধারণা করিয়া হৃদয়ে তুলিয়া লইতে বে আনন্দ ও উল্লাস, তাহা কেবল অনুমেয়। আমি অযোগ্য হইলেও, তুমি যে হৃদয় দান করিয়াছ তাহা সম্পূর্ণ হৃদয়ের সহিত ধারণ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিলাম। অগ্নি মনোরমে! যে হৃদয় শীতের তুষার সম্প্রাণে সঙ্কুচিত এবং আপনার মধ্যে

আপনি লুকায়িত ছিল, তাহা আজ তোমার মৃত-সঙ্গীতনীর প্রেম-মলয়া-স্পর্শে
প্রসূনপুঞ্জ-মণ্ডিত, কোকিল-কুঞ্জ-কুহরিত, নবলক্ষ্মদল শোভিত স্বর্ণ-শ্রী-বিমণ্ডিত
বাসন্তী-উদ্যানে পরিণত হইয়াছে।

অয়ি হৃদয়ময়ি!

আজ হৃদয়ের প্রতি চক্ষু তোমার মোহিনী মূর্তি ধ্যানে নিমিত্ত। প্রতি কর্ণ
তোমার অমৃত-নিস্যাদিনী জীবন-সঙ্কারিণী বাণী শ্রবণে উৎকর্ণ। প্রতি নাসারক্ত
তোমার কল্পরী-বিনিমিত্ত সুরভি গ্রহণে প্রমোদিত। প্রতি চরণ তোমার প্রেমের
কুসুমাত্ত-পথে প্রধাবিত। প্রতি বাহুল্যিকা তোমার প্রেমালিঙ্গনে প্রসারিত।
প্রতি অণুপরমাণু তোমার দিকে উন্মথ।

অয়ি কল্যাণি!

একগে কল্যাণময় প্রভু পরমেশ্বরের কল্যাণ-বারির জন্য প্রতীক্ষা কর। বসন্ত
উপস্থিত হইলেই কল্যাণ-বারি বর্ষণ হয় না। বারি-বর্ষণের জন্য, কষ্টকর হইলেও
কিঞ্চিৎ নিদাঘ-জ্বালা সহ্য করিতে হয়। হে সুন্দরি! নৌকা সম্পূর্ণরূপে প্রবৃত্ত ও
সজ্জিত হইলেই 'মরুভূমি' অভিযান করিতে পারে না। অনুকূল বায়ু-
প্রবাহের জন্য অপেক্ষা করিতে হয়। হে মানসি! উপস্থিত তোমাকে সম্পূর্ণ
হৃদয়ের সহিত গ্রহণ করিলাম, প্রকাশ্যে অর্থাৎ অভিনন্দন করিতে কিঞ্চিৎ বাধা
আছে। সে-বাধা কল্পগামরের আশীর্বাদে শীঘ্রই দূরীভূত হইবে বলিয়া আশা
করি। তজ্জন্য আমাদের অধীর বা নিরাশ হইবার কিছুই নাই। পিপাসা বাড়িতে
ধাক্ক, শেষে উহা অমৃতপানে পরম তৃপ্তিলাভ করিবে।

সব্বুখে মহররমোৎসবে তোমার সহিত দেখা করিবার জন্য ব্যগ্র রহিলাম।

ইতি—

তোমারই

ঈসা

খিজিরপুর—আসাদ-মঞ্জিল।

পত্র শেষ করিয়া ঈসা বা পুনরায় পত্রের এক কোণে বিশেষ করিয়া লিখিলেন :

“হে প্রেমময়ি! ব্যায়াম-চর্চা এবং অল্প-সঙ্কলনে পটুতা লাভ করিতে বিশেষ
যত্ন করিবে, ঐ পটুতাই সেই বাধা দূরীকরণে বিশেষ সহায় হইবে।”

অনন্তর পত্রখানি একটি বহুমূল্য আতরের শিশির সহিত ক্ষুদ্র রৌপ্যাবায়ে বদ্ধ
করিয়া রেশমী রুমালে বাঁধিয়া শিবনাথের হস্তে সমর্পণ করিলেন। শিবনাথকে
এক জোড়া উৎকৃষ্ট ধুতি, চাদর এবং একটি সুবর্ণ মুদ্রা বর্ষণ দিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পরামর্শ

খশোরের রাজা প্রতাপাদিত্য আজ খুব সকাল সকাল কাছারি ভাসিয়া দিয়াছেন। প্রতাপাদিত্য মন্ত্রণা-গৃহে একখানি রৌপ্য-সিংহাসনে বসিয়াছেন। পার্শ্বে তাঁহার মন্ত্রী শ্যামকান্ত ও অন্যতর সেনাপতি কালিদাস ঢালী মখমলমণ্ডিত উচ্চ ক্ষুদ্র চৌকির উপর উপবিষ্ট। দালানের দরজা বন্ধ। জানালাগুলি কেবল মুক্ত রহিয়াছে। দূরে ফটকের কাছে একজন পর্ভুগীজ সিপাহী পাহারা দিতেছে।

তাঁহার উপর কড়া হুকুম, যেন রাজ্যদেশ ব্যতীত কাহাকেও প্রবেশ করিতে দেওয়া না হয়। প্রতাপাদিত্যের চক্ষু মদ্যপানে রক্তবর্ণ। তাঁহার শরীর বেশ বলিষ্ঠ এবং অসুরের ন্যায় পেশীসম্পন্ন। চক্ষুর দৃষ্টি অন্তর্ভেদী অথচ নির্মম। মুখমণ্ডলে ধীরত্বের তেজ নাই; কেবল ত্বরতা ও নিষ্ঠুরতা বিরাজমান। চেহারায়া লাভণ্যের পরিবর্তে তীব্র কামুকতার চিহ্ন দেদীপ্যমান। তাঁহাকে দেখিলে যুগপৎ ভীতি এবং ঘৃণার উদ্বেক হয়। প্রতাপাদিত্যের বয়স ৫৫ বৎসর হইলেও তাঁহার ইন্দ্রিয়পরায়ণতার কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। একজন কবিরাজ দিবারাত্র তাঁহাকে কামাগ্নি-সন্ধীপন রস, কামেশ্বর মোদক, চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ ইত্যাদি কামেন্দ্রিয়-উত্তেজক ঔষধ সরবরাহ করিবার জন্য নিযুক্ত রহিয়াছে। সুন্দরী স্ত্রীলোকের অনুসন্ধানের জন্য একদল গোয়েন্দাও নিযুক্ত আছে। প্রতাপাদিত্য যেমন কামুক, তেমনি নিষ্ঠুর। বঙ্গের সরস কোমল ভূমিতে তাঁহার ন্যায় মহাপাষণ্ড, নৃশংস ও নর-পিশাচ, অতীতে বিজয় সিংহ,* রাজা কংস এবং উত্তর কালে দেবী সিংহ ও নবকৃষ্ণ ব্যতীত আর কেহ জন্ম গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

প্রতাপাদিত্য কক্ষের নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বলিলেন : “কগলাকান্ত! এতদিনে তো বসন্তখুড়োর নিপাত করতে সমর্থ হলাম। কিন্তু কেদার রায়ের কন্যা স্বর্ণময়ীকে নিয়ে এখনও তো কেউ ফিরল না!”

মন্ত্রী : মহারাজ! আপনি বসন্তপুরে গিয়েছিলেন বলে তবু জানাবার সুবিধা হয়নি। স্বর্ণময়ীকে যারা লুণ্ঠিত গিয়েছিল, তারা অকৃতকার্য হয়ে ফিরে এসেছে।

প্রতাপ : কি! অকৃতকার্য হয়ে ফিরল!

মন্ত্রী : আজে হাঁ, অকৃতকার্য হয়ে।

* বিজয় সিংহ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের সিংহল হইতে লিখিতপত্র দেখ। রাজা কংসের ভীষণ অত্যাচার “রিয়াজ-উস-সালাতিনে” দেখ। দেবী সিংহ এবং রাজা নবকৃষ্ণের লোমহর্ষণ অত্যাচারির বিবরণের জন্য এডমণ্ড ব্যার্কের বক্তৃতা এবং “মুর্শিদাবাদ কাহিনী” দেখ।

প্রতাপ : ডাকো তাদের ।

মন্ত্রী তখন তাহাদিগকে ডাকিবার জন্য সিপাহীদের ব্যাহাকে লোক পাঠাইলেন । কয়েক মিনিটের মধ্যে রামদাস, রাধাকান্ত, হরি, শিবা, মাধা প্রভৃতি আসিয়া মাটিতে লুটাইয়া প্রতাপকে দণ্ডবৎ করিল । তৎপরে দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিল ।

প্রতাপ : কেদার রায়ের কন্যা কোথায়?

রাধাকান্ত : মহারাজ! তাকে ইসা খাঁ ছিনিয়ে নিয়েছে ।

প্রতাপ : তাদের ঘাড়ে মাথা থাকতো?

রাধা : আমাদের অবশিষ্ট সকলেই মারা পড়েছে । আমাদের দোষে নেই । অপরাধ মার্জনা করুন ।

প্রতাপ ব্যাঘ্রের ন্যায় ভীষণ গর্জন করিয়া কহিলেন, “যা, এখনই তাদের একেবারে মার্জনা করছি।” এই বলিয়া জন্মাদের সর্দারকে আদেশ করিলেন যে, “এদের গায়ে আলকাতরা মেখে আগুনে পোড়াও ।”

বলা বাহুল্য, পাঁচটি প্রাণী অর্ধ ঘণ্টার মধ্যে এইরূপ নিষ্ঠুরভাবে ভস্মীভূত হইয়া পৃথিবী হইতে উড়িয়া গেল ।

প্রতাপ ইহাদিগকে ভস্ম করিবার আদেশ দিলেন; কিন্তু নিজের নৈশাচিক কামানলে আহুতি দিবার জন্য স্বর্ণময়ীর চিন্তায় চঞ্চল ও উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন । তাঁহার ব্যাকুলতা দেখিয়া শ্যামাকান্ত বলিলেন, “মহারাজ! ব্যস্ত হবেন না । আগামী আঘাটের মহররম-উৎসব উপলক্ষে সৈন্য পাঠিয়ে স্বর্ণময়ীকে লুটে আনবার জোগাড় করছি।”

সেনাপতি কালিদাস ঢালী বলিল, “এই পরামর্শই ঠিক । মহররম উপলক্ষে সাদুচাপুরে মহোৎসব হয়ে থাকে, নানাদেশ হতে লোক-সমাগম হয় । সেই সময় যাত্রীবেশে বহুসৈন্য গেরণ করতে পারবে । একবার ধরে ‘ময়ূরপঙ্খী’তে তুলতে পারলেই হয় । একশ’ দাঁড়ের ময়ূরপঙ্খী কারও ধরবার সাধ্য হবে না ।”

প্রতাপ : কিন্তু কেদার রায় এক্ষণে খুব সাবধান হয়েছে । স্বর্ণময়ীকে রক্ষা করবার জন্য অবশ্যই উপযুক্ত রক্ষী রাখবে । সাদুচাপুরের মিত্রদের লোকজনের অভাব নাই ।

শ্যামা : সেই যা একটু ভাবনা । প্রথমে একটা দাস্তা হবে ।

প্রতাপ : সে কি দাস্তা? সে যে দস্তুরমত যুদ্ধ বাঁধবে । এই তো চর-মুখে ওন্লেম যে, সাদুচাপুরের মিত্র-বাড়ীতে স্বর্ণময়ীর রক্ষাকল্পে দুইশ’ সিপাহী কেদার রায় পাঠিয়েছেন ।

কালিদাস : তা হোক । আমাদের মাহতাব খাঁ সেনাপতি সাহেব যদি যান, তা হলে আমরা দুইশত সিপাহী নিয়েও হাজার লোকের ভিতর হতে কেদার রায়ের কন্যাকে ছিনিয়ে আনতে পারবো ।

প্রতাপ : (একটু হাসিয়া!) কেন, তুমি একাকী সাহস পাও না কি?

কালি : সাহস পাব না কেন, মহারাজ! কিন্তু জানেন তো, সাবধানের মার নেই। ঝাঁ সাহেব আমার চেয়ে সাহসী এবং কৌশলী। বিশেষতঃ, সিপাহীরা তাঁর কথায় বিশেষ উৎসাহিত হয়। তিনি সঙ্গে থাকলে কার্যসিদ্ধি অবশ্যজারী।

প্রতাপ : তবে তাঁকে ডাকান যাক।

কালি : আজ্ঞা হাঁ! তাঁর সঙ্গেও পরামর্শ করতে হচ্ছে।

প্রতাপাদিত্য। তখনই সেনাপতি মাহতাব ঝাঁকে ডাকিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। অর্ধ ঘণ্টার মধ্যে ঝাঁ সাহেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঝাঁ সাহেবের বয়স ত্রিশের উপরে নহে। দেখিতে অত্যন্ত রূপবান ও তেজস্বী। চরিত্রে অতি পবিত্র, মূর্তি গভীর অথচ মনোহর। তাঁহার চাল-চলনে ও কথা-বার্তায় এমন একটা আদব-কায়দা ও আত্মসম্মানের ভাব ছিল যে, সকলেই তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মান করিত। প্রতাপাদিত্যের মত পাপিষ্ঠ প্রভুও তাঁহাকে দেখিয়া স্তম্ভিত করিতেন। প্রতাপ, ঝাঁ সাহেবের সহিত কদাপি কোনও কুপরামর্শ করিতে সাহসী হন নাই। তাঁহার সহিত হাসি-ঠাট্টা করিতে পর্যন্ত সাহস পাইতেন না। তাঁহাকে দেখিলেই মনে লোকে সভ্য-ভব্য হইয়া পড়িত। অথচ তিনি অত্যন্ত মিতভাষী ও সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। প্রতাপাদিত্যের আহ্বান বা নিজেই বিশেষ গরজ ব্যতীত ঝাঁ সাহেব কদাপি দরবারে আসিতেন না। কল কথা, প্রতাপ ও ঝাঁ সাহেবের মধ্যে প্রভু-ভৃত্যের ব্যবহার ছিল না। বিজ্ঞাতির কাছে কেমন করিয়া আত্মসম্মান রক্ষা করিয়া চাকুরি করিতে হয়, ঝাঁ সাহেব তাহা ভালোভাবেই জানিতেন।

ঝাঁ সাহেব আসন গ্রহণ করিলে কালিদাস সমস্ত কথা সংক্ষেপে বুঝাইয়া বলিলেন। ঝাঁ সাহেব বলিলেন, “পাত্রী কি মহারাজের প্রতি আসক্ত?”

কালি : না, তাহলে কি আর এত গোলযোগ হয়? সেরূপ হলে তো অনায়াসেই কার্যসিদ্ধি হত। তা হলে আর আপনাকে ডাকবার আবশ্যক হত না।

ঝাঁ : তবে তো এ কার্য বড়ই কলঙ্কের।

কালি : কোন পক্ষে?

ঝাঁ : মহারাজের পক্ষে। তাকে জোর করে আনলে সে কি মহারাজকে শাদী করবে?

কালি : জোর করি শাদী করাব। শাদী না করে বাঁদী করে রাখব।

ঝাঁ : কাজটা বড়ই ঘৃণিত। এ কাপুরুষের কার্য।

প্রতাপের হৃদয় বর্ণময়ীর জন্য উন্মত্ত। সুতরাং ঝাঁ সাহেবের কথাগুলি তাঁহার কর্ণে বিষদিক্ত শল্যের ন্যায় প্রবেশ করিল। আর কেহ হইলে হয়তো প্রতাপ তখনই মাথা কাটিবার আদেশ দিতেন। কিন্তু ঝাঁ সাহেব ক্ষমতাশালী বীরপুরুষ বলিদ্রাই তাহা হইল না। তবুও প্রতাপ বিরক্তি-ব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন : “ঝাঁ সাহেব! আপনাকে ধর্মের উপদেশ দেবার জন্য ডাকা হয়নি।”

বা : আমিও তা বলছি না । কিন্তু কিসের জন্য ডেকেছেন মহারাজ?

প্রতাপ : স্বর্ণময়ীকে এনে দিতে হবে ।

বা : কেমন করে?

প্রতাপ : লুঠ করে ।

বা : মহারাজ! মাফ করুন, এমন কার্য ধর্ম সইবে না ।

প্রতাপ : আবার ধর্মের কথা?

বা : তবে কি ধর্ম পরিত্যাগ করব?

প্রতাপ : প্রভুর আজ্ঞা পালনই ধর্ম ।

বা : অধর্মজনক আজ্ঞাও কি?

প্রতাপ : আজ্ঞা পালন দিয়ে কথা, তাতে আবার ধর্মার্থ কি?

বা : মহারাজ! তবে কি আপনি ধর্মার্থ মানেন না?

প্রতাপ : প্রতাপাদিত্য এমন ধর্মের মুখে পদাঘাত করে ।

বা : তওবা! তওবা!! এমন কথা বলবেন না, মহারাজ! সামান্য প্রভু পেয়ে আত্মহারা হবেন না । পরকাল আছে—বিচার আছে—জীবনের হিসাব-নিকাশ আছে—দীন-দুনিয়ার বাদশাহ্ খোদাতালা নিত্য জাগ্রত । তিনি সবই দেখছেন ।

প্রতাপ : ওসব কোরান-কেতাবের কথা রেখে দিন । ওটা মুসলমানদেরই শ্রবণযোগ্য । আমি হিন্দু, ও-সব মানি না ।

বা : কেন, হিন্দুশাস্ত্রে কি কোরানের উপদেশ নেই?

প্রতাপাদিত্য বড়ই জুলিয়া গেলেন । তাঁহার ধৈর্যের বন্ধন ছিন্ন হইয়া গেল । রাগিয়া বলিলেন : “ও-সব শাস্ত্র দরিয়ায় ঢালো । আমার শাস্ত্র স্বর্ণময়ী, আমার ধর্ম স্বর্ণময়ী । আমি তাকেই চাই । যেমন করেই হোক তাকে এনে দিতে হবে ।”

বা : মহারাজ! আমি মুসলমান, আমি বীরপুরুষ । তঙ্করের ন্যায় লুঠে আনতে পারব না । ওটা দস্যুর কার্য । স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার কাপুরুষের পক্ষেই শোভা পায় ।

প্রতাপ : কিন্তু আমার অনুরোধে তা একবারের জন্য করতেই হবে ।

বা : মহারাজ, অনুগতকে মাফ করবেন ।

প্রতাপ : বা সাহেব! মার্জনা করবার সময় থাকলে, কখনই আপনাকে আহ্বান করতাম না । যেমন করেই হোক স্বর্ণময়ীকে আনতেই হবে । বীরপুরুষকে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য অনেক সময় দস্যু-তঙ্কর সাজতে হয় । তাতে কলঙ্ক নেই । বা সাহেব! আপনি তো সামান্য সেনাপতি, অত বড় অবতার রাক্ষসবিধ্বংসী রামচন্দ্র স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিরাপরাধ বালীকে তঙ্করের ন্যায় হত্যা করেছিলেন । তসা ভ্রাতা লক্ষ্মণ, ইন্দ্রজিতকে হস্তবেশে কাপুরুষের মত বধ করেছিলেন । বীর-চূড়ামণি অর্জুন নপুংসক শিখণ্ডীকে সশুখে রেখে ভীষ্মকে পরাস্ত করেছিলেন । ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির দ্রোণাচার্যকে পরাস্ত করার জন্য “অশ্বখামা হত ইতি গজ” রূপ মিথ্যা কথা বলতে কুণ্ঠিত হননি । পুরাণে একরূপ রাশি রাশি দৃষ্টান্ত আছে ।

বন্দনময়ীকে নিয়ে আসতে পারলে আমার গ্রাণের দুহিতা অক্লান্তভাবে আপনার হস্তেই সমর্পণ করব। আপনি আমার শ্রেষ্ঠ জামাতা হবেন।

বা : মহারাজ! বোড় হস্তে মার্জনা প্রার্থনা করি। সমস্ত পৃথিবীর রাজত্ব পেলেও এবং স্বর্গের অঙ্গরীরা চরণ-সেবা করলেও মাহতাব খাঁর দ্বারা এ-কাজ সম্পন্ন হওয়ার নহে। অন্য যে পারে করুক।

প্রতাপ : কি! এত বড় আশ্বর্ষ্য! আমি বলছি তোমাকে এ-কাজ করতেই হবে।

বা : মহারাজ! কখনই নয়। আপনার চাকুরি পরিত্যাগ করলাম।

প্রতাপ : সাধন! ও জিহ্বা এখনই অগ্নিতে দগ্ধ করব, কার সাধ্য নিজ ইচ্ছায় আমার চাকুরী পরিত্যাগ করে! তোমার মত খাঁকে শিক্ষা দিতে প্রতাপের এক নিমেষ সময়ের আবশ্যিক।

বা : মহারাজ! আমি আর আপনার ভৃত্য নহি। সুতরাং বিবেচনা করে কথা বলবেন।

প্রতাপাদিত্য এবার জুলিয়া উঠিলেন, পা হইতে পাদুকা খুলিয়া মাহতাব খাঁর দিকে সম্মুখে নিক্ষেপ করিলেন। মাহতাব খাঁ শূন্য-পথেই পাদুকা লুকিয়া লইয়া “কমবন্দ বে-ভমিজ শয়তান” বলিয়া প্রতাপাদিত্যের মুখে বিষম জোরে কয়েক ঘা বসাইয়া দিয়া গৃহ হইতে দ্রুত বহির্গত হইয়া গেলেন। মাহতাব খাঁর পাদুকা-গ্রহণে প্রতাপাদিত্যের নাক-মুখ হইতে দরদর ধারায় রক্ত ছুটিল। সকলে কিও কুকুরের ন্যায় হাঁ হাঁ করিয়া খাঁ সাহেবের দিকে ক্রিয়া উঠিল। প্রতাপাদিত্য “হের উতার লাও, হের উতার লাও” বলিয়া ক্রোধে গর্জিতে লাগিলেন। সেনাপতি সাহেব তখন তীষণ গর্জনে আকাশ কাঁপাইয়া “কিছি কা মরণে কা এরা দা হ্যায় তো, আও” বলিয়া কোষ হইতে ঝন্ ঝন্ শব্দে তরবারি আকর্ষণ করতঃ কিরিয়া দাঁড়াইলেন। খাঁ সাহেবের প্রদীপ জ্বালাময়ী করালী-মূর্তি ও অগ্নি-জিহ্বা তরবারি দর্শনে সকলের বকের স্পন্দন পর্যন্ত যেন থামিয়া গেল। মাহতাব খাঁ ধীর-মহুর্ গতিতে কৃপাণ-পাণি অবস্থায় কিরিয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া সেই মুহূর্তেই যশোর ত্যাগ করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মনোহরপুরে

মাহতাব খাঁ রাণে ও ঘৃণায় যশোর নগর হইতে নৌকা ছাড়িলেন। তাঁহার মনে হইতেছিল যত শীঘ্র যশোরের এলাকার বাহিরে যাইতে পারেন, ততই মঙ্গল। যশোরের বায়ুমণ্ডল যেন তাঁহার কাছে বিষাক্ত বলিয়া বোধ হইতেছিল। বিশেষতঃ প্রতাপাদিত্যের লোকজন আসিয়া অনায়াসেই তাঁহাকে আবদ্ধ করিতে পারে।

তিনি বীরপুরুষ হইলেও একাকী কি করিতে পারেন! তাঁহাকে ধরিতে পারিলে প্রতাপাদিত্য যে হাত-পা বাঁধিয়া জ্বলন্ত চিতায় দগ্ধ করিবেন, সে-বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। সুতরাং তিনি মাল্লাদিগকে খুব দ্রুত নৌকা বাহিতে আদেশ করিলেন। ষাঁ সাহেব যে প্রতাপাদিত্যের রাজ্য ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন, মাঝি-মাল্লারা অবশ্য তাহা জানিত না। তাহাদের জানিবার কথাও ছিল না। তাহারা জানিলে অবশ্য আসিত না। কারণ এইরূপ কার্যে প্রতাপাদিত্য যে তাহাদের শরীরের চর্ম ছাড়াইয়া তাহাতে লবণ মাখিয়া দিবেন, তাহা তাহারা বেশ জানিত। সেনাপতি কোন দরকারবশতঃ মনোহরপুরে যাইতেছেন বলিয়া মাঝিরা বিশ্বাস করিতেছিল।

মাহতাব ষাঁ মনোহরপুরে পহুঁছিতেই প্রায় সন্ধ্যা হইল। মনোহরপুরে প্রতাপাদিত্যের একখানা বাড়ী ও একটি কাছারি ছিল। এতদ্ব্যতীত সেখানে গোলা ও হাটবাজার দস্তুরমত ছিল। কাছারিতে ১০ জন তবকী অর্থাৎ বন্দুকধারী, ২৫ জন লাঠিয়াল, একজন জমাদার, একজন নায়েব এবং অন্যান্য কর্মচারী ১০/১২ জন ছিল। প্রতাপাদিত্যের স্ত্রীর সংখ্যা চল্লিশেরও উপর ছিল। এতদ্ব্যতীত উপপত্নীও যথেষ্ট ছিল। মনোহরপুরে চতুর্থ রাণী দুর্গাবতী বাস করিতেছেন। তিনি পূর্বে যশোরের প্রাসাদের অধিবাসিনী ছিলেন। কিন্তু ক্রমে সন্তানাদি হওয়ায় তাঁহার যৌবনে ভাঁটা ধরিলে প্রতাপাদিত্যের মন-মধুকর যখন দুর্গাবতীকে কিঞ্চিৎ নীরস বলিয়া মনে করিল, তখন মনোহরপুরের ক্ষুদ্র বাটীতে তাঁহাকে সরাইবার ব্যবস্থা হইল। তদ্ব্যতীত প্রতাপাদিত্য আরও একটি কারণে দুর্গাবতীতে নির্বাসিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। দুর্গাবতী অত্যন্ত মুখরা ছিলেন, একবার রাগিয়া গেলে তাঁহার জিহ্বার বাক্যানলে সকলকেই দগ্ধ হইতে হইত। তাঁহার জিহ্বা সর্বতোভাবে নিঃশব্দ ও নিঃসঙ্কোচ ছিল। তাঁহার তীব্র সমালোচনা এবং বিদ্রূপ-বাণে প্রাসাদবাসিনী অন্যান্য রাণীরা অস্থির থাকিতেন। তিনি প্রতাপাদিত্যকেও অতি সামান্যই গ্রাহ্য করিতেন। দুর্গাবতী তাঁহার পরবর্তী রাণীদিগকে আপনার ক্রীতদাসী অপেক্ষাও তাচ্ছিল্য করিতেন। প্রতাপাদিত্য অবশেষে এই দারুণ সঙ্কট হইতে মুক্ত হইবার জন্য তাঁহাকে মনোহরপুরে নির্বাসিত করিয়াছিলেন।

দুর্গাবতী মনোহরপুরে আসিয়া প্রাসাদের নিত্য ব্যাভিচার, অত্যাচার ও হত্যা-দূষিত বিষাক্ত বায়ু হইতে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছিলেন। প্রতাপাদিত্য বৎসরের কোনও সময় এদিকে আসিলে দুর্গাবতীর মন্দিরে অবশ্যই পদধূলি পড়িত। নতুবা তাঁহাকে একপ্রকার বৈধব্য জীবনই কাটাইতে হইত। এই দুর্গাবতীর সময়েই মাহতাব ষাঁ যশোরের রাজপুরীতে প্রবেশ এবং নিজের বীরত্ব ও বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়া প্রধান সেনাপতির পদ লাভ করেন। সে আজ দশ বৎসরের কথা। যশোরের অন্তঃপুরে তখন দুর্গাবতীর একাধিপত্য। দুর্গাবতীর যৌবনের সুবর্ণ-শুভলে প্রতাপাদিত্য তখন দুঃস্থদ্যভাবে পোষা কুকুরের ন্যায় বাঁধা ছিলেন।

দুর্গাবতী মুখরা ও আধিপত্যপ্রিয়া হইলেও অত্যন্ত বদান্য ও উদার-প্রকৃতি ছিলেন। লোকের গুণানুকীর্ণনে সর্বদাই তাঁহাকে মুক্তকণ্ঠ দেখা যাইত। প্রতাপের কুৎসিৎ ব্যবহারই পরে তাঁহাকে মুখরা করিয়া তুলিয়াছিল। মাহতাব বা রাণীর সৌভাগ্যের দিনে রাণীর হস্ত ও মুখ হইতে অনেক আর্থিক পুরস্কার ও বাচনিক প্রশংসা পাইয়াছিলেন বলিয়া রাণীকে তিনি মাতৃবৎ শ্রদ্ধা করিতেন। রাণীও মাহতাবকে পুত্রবৎ স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। রাণীর মনোহরপুর নির্বাসনে এবং তাঁহার আধিপত্য চূড়ান্তে সর্বাপেক্ষা যদি কেহ দুঃখিত হইয়া থাকেন, তবে সে মাহতাব বা। রাণীর একটি কন্যা এবং একটি পুত্র। কন্যার বয়স অষ্টাদশ বৎসর, নাম অক্ষণাবতী। পুত্র শিশু, পঞ্চম বৎসর মাত্র বয়ঃক্রম। নাম অক্ষণকুমার। অক্ষণাবতী পূর্ণ যুবতী। ভাদ্রের ভরা গাঙ্গ, কূলে কূলে রূপ উছলিয়া পড়িতেছে। বন্ধে বন্ধে প্রেমের ভরস আকুল উচ্চ্বাসে আবর্ত সৃষ্টি করিয়াছে। চোখে মুখে প্রেমের বিদ্যুৎকীর্ণি স্কুরিত হইতেছে। প্রাণের পিপাসা বাড়িতে বাড়িতে এখন যেন উহা বিশ্ব-বিমোষিনী মূর্তি পরিগ্রহ করিতেছে। সুপক্ব আঙ্গুর বা রসাল আশ্র যেরমন বৃক্ষ-পক্ব হইতে ফাট ফাট হইয়া পড়ে, অক্ষণাবতীও ডেমনি রসবতী হইয়া ফাট ফাট প্রায়। তাহার হস্ত-পুষ্ট সবল ও সুডৌল দেহে যৌবন পূর্ণ প্রতাপে রাজত্ব বিস্তার করিয়াছে। তাহাকে দেখিলেই মনে হয় যে, রমণী বহুকষ্টে বহু সাধনায় যৌবনের প্রতাপ ও প্রতাকে আয়ত্ত রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। যেন চন্দ্রমার সুবর্ণ কৌমুদীজ্বল কিম্বাত ভাদ্রের সফেনতোয়া স্রোতস্বতী কূলে কূলে পূর্ণ হইয়া ফুলিয়া ফাঁপিয়া হেলিয়া দুলিয়া আবর্ত রচিয়া কল্ কল্ ছল্ ছল্ করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। এত বয়স এবং এত রূপের গৌরব থাকা সত্ত্বেও অক্ষণাবতীর বিবাহ হয় নাই। বিবাহ না হইবার কারণ পাত্র না জোটা। পাত্র না জুটিবার কারণ প্রতাপাদিত্যের নিদারুণ নৃশংস নৈশাচিক ব্যবহার। কথাটা একটু খুলিয়াই বলিতেছি। ইতঃপূর্বে প্রতাপ তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী বিভাবতীর বিবাহ বাক্সা চন্দ্রধীপাধিপতি রামচন্দ্র রায়ের সহিত সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এই রামচন্দ্র রায়ের রাজ্য অধিকার করিবার জন্য প্রতাপের নিদারুণ হইত না। কিন্তু রামচন্দ্র রায় জীবিত থাকিতে বিনাযুদ্ধে রাজ্য অধিকার করা অসম্ভব। যুদ্ধ করিলে প্রতাপই জিতিবেন, তাহারই বা নিশ্চয়তা কোথায়? রামচন্দ্র রায় বার ভূইয়ার এক ভূইয়া ছিলেন। বিশেষতঃ তাঁহারই পল্টনে পড়ুসীজ ও গুলান্দাজ একদল উৎকৃষ্ট গোলন্দাজ সেনা ছিল। তাহাদের ভোগের জন্য প্রতাপাদিত্য তীত ছিলেন। অগত্যা প্রতাপাদিত্য, জামাতাকে কোন পর্ব উপলক্ষে বিশেষ সমাদর ও ধুম-ধামের সহিত একদা নিমন্ত্রণ করিলেন। রামচন্দ্র রায় স্বপ্নের নিমন্ত্রণ পাইয়া পরমহ্রদে যশোরের রাজপুরীতে আগমন করিলেন। প্রতাপাদিত্য গভীর নিশীথকালে জামাতা রামচন্দ্র রায়কে উপাংগ-বধ করিবার জন্য সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া রাখিলেন। নব্বাধম পাখও একবারের জন্যও উদ্ভিন্ন-যৌবনা কন্যার ওবিষাং পর্যন্ত চিন্তা করিলেন না।

কন্যা সেই নিদারুণ লোমহর্ষণ ঘটনার আভাস পাইয়া স্বামীকে সমস্ত নিবেদন করিল। রামচন্দ্র রায় রাত্রিযোগে কৌশলক্রমে প্রতাপাদিত্যের পুরী হইতে প্রাণ লইয়া কোনওরূপে পলায়ন করিলেন।* এই ঘটনার পরে কোনো রাজা কি জমিদার প্রতাপাদিত্যের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতে চাহিতেন না। এ-দিকে মধ্যবিস্তৃত শ্রেণীর কেহ-ই সাহস করিয়া সুন্দরবনের ভীষণ ব্যাঘ্রের ন্যায় নররক্ত-লোলুপ প্রতাপের কন্যা বিবাহের প্রস্তাব করিবারও সাহস করিত না। প্রতাপও গর্ব-অহঙ্কারে রাজা ব্যতীত আর কাহাকেও কন্যা সম্প্রদানের কল্পনাও করিতেন না। কিন্তু এ দিকে কন্যার দেহে যখন যৌবন-জ্যোয়ার খরতর বেগে বহিতে লাগিল, তখন প্রতাপাদিত্য নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও মাহতাব খাঁর করে অরুণাবতীকে সমর্পণের বাসনা করিলেন। কারণ মাহতাব খাঁ অপেক্ষা উচ্চদরের পাত্র আর জুটিতেছিল না। কিন্তু মাহতাব খাঁকে সাধিয়া কন্যা দান করিতে প্রতাপের ইচ্ছা ছিল না। কোনো ঘটনা উপলক্ষ করিয়াই তাঁহাকে কন্যাদানের সংকল্প করিলেন। ঘটনাও জুটিয়া উঠিল। পাঠকগণ পূর্বেই তাহা অবগত হইয়াছেন। কিন্তু প্রতাপের দুর্ভাগ্যবশতঃ খাঁ সাহেব স্বর্ণময়ী-হরণে সম্মত হইলেন না।

সে যাহা হউক, মাহতাব খাঁ প্রতাপাদিত্যের রাজ্য হইতে চিরবিদায় লইবার পূর্বে পথে মনোহরপুরে অবতরণ করিয়া মাতৃতুল্যা রাণী দুর্গাবতীর আশীর্বাদ লইয়া চিরবিদায় গ্রহণ করাই সমস্ত মনে করিলেন। অরুণাবতীকে তিনি ভালোবাসিতেন, কিন্তু সে ভালোবাসায় প্রেমের নেশা প্রবেশ করে নাই। খাঁ সাহেব ঘাটে নৌকা লাগাইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। প্রহরী তাঁহাকে চিনিত ও জানিত। রাণী দুর্গাবতী মাহতাব খাঁকে দেখিয়া আনন্দে পরম পুলকিত হইলেন। অতি শীঘ্র সমাদরে বসাইয়া অরুণাবতীকে জলযোগের যোগাড় করিতে বলিলেন। মাহতাব খাঁ জলযোগের আয়োজন দেখিয়া রাণীকে বলিলেন, “মা! আমার আর জলযোগের সময় নেই। আমাকে এখনই মহারাজের এলাকা ছেড়ে পালাতে হবে। যদি বেঁচে থাকি এবং খোদার মজী সুদিন পাই, তখন আবার শ্রীচরণে উপস্থিত হব।” এই বলিয়া রাজার সমস্ত ব্যবহার দুঃখার্ত চিত্তে বর্ণনা করিলেন। গুনিয়া রাণীর চক্ষু হইতে জলধারা বহিতে লাগিল। ঘটনা গুনিয়া এবং প্রতাপের ক্রোধের কথা ভাবিয়া দুর্গাবতীর প্রাণ যেন শুকাইয়া গেল। রাণী সত্য সত্যই মাহতাব খাঁকে পুত্রের ন্যায় ভালোবাসিতেন। তারপর অরুণাবতীর বিবাহের আশান্তরসাও যে মাহতাব খাঁর সঙ্গে সঙ্গে শূন্যে মিশাইবে, ইহা ভাবিয়া রাণীর মুখ শুকাইয়া গেল। বুকের পঞ্জর যেন ধসিয়া যাইতে লাগিল! রাণী ক্রন্দনের উচ্চাস রোধ করিতে পারিলেন না! এদিকে মাহতাব খাঁর সম্মুখেও কাঁদিতে পারিতেছিলেন না। এরূপ অনেকেই থাকে, যারা অতীব ভীত সন্তাপেও

*: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত “বৌঠাকুরাণীর হাট” দেখ।

লোকের সম্মুখে কাঁদিতে পারে না। রাণীও সেই প্রকৃতির ছিলেন। তিনি উঠিয়া অন্য ঘরে গেলেন। সেই নির্জন গৃহে যাইয়া তাহার কঙ্কপ্রাণের উল্কাস একেবারে শুমরিয়া উঠিল। রাণী কাঁদিতে লাগিলেন। বাস্তবিক রাণী যুগপৎ পুত্র-শোক ও কন্যা-শোকে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। এদিকে অরুণাবতী নানা প্রকার মিষ্টান্ন এবং ফলমূলে স্বর্ণখানা ও রৌপ্যবাটি সাজাইয়া মাহতাব ঝাঁর সম্মুখে উপস্থিত করিল। মাহতাব ঝাঁ প্রায় দুই বৎসর পরে অরুণাবতীকে দেখিলেন। দেখিয়া একেবারে বিস্মিত এবং স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। ঝাঁ সাহেব যেন সহসা এক স্বপ্নাতীত রাজ্যে উপনীত হইলেন; তিনি দেখিলেন, অরুণাবতীর সর্বাঙ্গ আশাতীতরূপে পরিপুষ্ট। সমস্ত শরীরে যৌবন উথলিয়া পড়িতেছে। কৃতজ্ঞতার ডাগর আঁখিতে শত শত বিদ্যুৎ ক্রীড়া করিতেছে। দেহলতিকা, জ্যোৎস্নাফুল্ল রঞ্জনীগন্ধার ন্যায় ফুটিয়া গর্বভরে বৃক্ষের উপর ঈষৎ হেলিত অবস্থায় যেন দণ্ডায়মান। অরুণাবতী যদিও পূর্বে শত শতবার মাহতাব ঝাঁকে দেখিয়াছে, তাহার ক্রোড়ে উঠিয়াছে, তাহার সহিত কতদিন নদীতটে ভ্রমণ করিয়াছে, কিন্তু আজ সে মাহতাব ঝাঁকে যেমন অপূর্ব সুন্দর সূঠাম রমণীয় কান্তি লোভনীয় পুরুষরূপে দেখিতেছে, পূর্বে সে কখনও তেমনটি দেখে নাই। মাহতাব ঝাঁই যে তাহার প্রেম-দেবতা হইবেন, তাহার পানিতেই যে পানি মিশাইতে হইবে, অরুণাবতী তাহা নানা সূত্রেই বেশ ভাল করিয়া শুনিয়াছিল এবং সেই সূত্রে অরুণাবতীর হৃদয় মাহতাব ঝাঁর অনুরাগে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। অরুণাবতী যখন সেই পরিপূর্ণ প্রেমের দৃষ্টিতে মাহতাব ঝাঁকে দেখিতেছিল—তখন ঝাঁ সাহেব যে তাহার চক্ষে অদ্বিতীয় পুরুষরত্ন বলিয়া প্রতিভাত হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য কি? প্রেম যখন অসুন্দরকে সুন্দর করে—মরুকে উদ্যানে পরিণত করে—অগ্নিকে তুষার,—নীরসকে সরস এবং অপবিত্রকে পবিত্র করে, তখন স্বাভাবিক সুন্দর ঝাঁ সাহেব যে অপার্থিব সুন্দর বলিয়া অরুণাবতীর চক্ষে প্রতিভাত হইবেন তাহাতে আর সন্দেহ কি? ঊষার দৃষ্টি যেমন আকাশকে অরুণিমাঙ্কাল বিভূষিত করে—বসন্ত যেমন বিগতশ্রী উদ্যানকে উদ্যানকে স্বর্গীয় শ্রীমণ্ডিত ফুলফুলদলে বিশোভিত করে, রজনী যেমন আঁধারে আকাশে তারকামালা ফুটাইয়া অপার্থিব সৌন্দর্য প্রদর্শন করে—প্রেমও তেমনি প্রেমাস্পদকে অলৌকিক সৌন্দর্য, অসাধারণ গুণ এবং অপার্থিব মহিমায় বিভূষিত, বিমণ্ডিত এবং বিশোভিত করে। মাহতাব ঝাঁ তাহার ত্রিভুবন-মোহিনী দৃষ্টি অন্যদিকে কিরাইতেছে। লজ্জা-রাগে তাহার বদনমণ্ডল আবৃত হইয়া যাইতেছে। আবার মাহতাব ঝাঁ নত আঁখিতে আহায়ে রত হওয়া মাত্রেই, অরুণাবতীর চঞ্চল ও পিপাসাজুর আঁখি তাহার মুখে দৃষ্টি স্থাপন করিতেছে। আবার আঁখিতে আঁখি পড়া মাত্রই দৃষ্টি অন্য বিষয়ে পতিত হইতেছে এবং হৃদয় ফুলিতেছে, শরীর শিহরিত হইতেছে, মন দুলিতেছে। প্রাণের তীব্র চৌম্বক আকর্ষণ উভয়ের হৃদয়কে এত

জোরে টানিতেছে যে, বোধ হয় উভয়ের হৃদয় দুইটি শরীর ভেদ করিয়া এই মুহূর্তেই বাহির হইয়া আসিবে। সেনাপতি নিজের সঙ্কটজনক অবস্থা ভাবিয়া বীরের মত আত্মসংযম করিবার চেষ্টা করিলেন। অতি সামান্য নাশতা করিয়াই হাত ধুইতে উদ্যত হইলে, অরুণাবতী লজ্জার বাধ ভাবিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, “সে কি!” এই বলিয়া মাহতাব খাঁর হস্ত ধারণ করিয়া বলিল, “সব খেতে হবে।” যুবতীর স্নেহমাখা সুকোমল করস্পর্শে মাহতাব খাঁর সর্বান্তে যেন কি এক অপার্থিব পুলক-প্রবাহ প্রবাহিত হইল। সর্বান্ত রোমাঞ্চিত এবং হৃদয়ের প্রত্যেক বিন্দু সুধাধারায় সিঞ্চিত হইল। মাহতাব খাঁ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ছলছল নেত্রে তাঁহার বিপদের কথা বর্ণনা করিলেন। শুনিয়া যুবতীর বুক অতি বিষম বেগে স্পন্দিত হইয়া ধামিয়া গেল। যুবতী বাকশূন্য স্পন্দহীন মৃন্ময়ী প্রতিমার ন্যায় দণ্ডায়মান। অরুণাবতীর দুই চক্ষু অশ্রুর ঝরণা ছুটিল। প্রতাপ-কুমারীর ইচ্ছা হইতেছিল যে, সে একবার ছিন্ন লতিকার ন্যায় মাহতাব খাঁর চরণমূলে পতিত হইয়া দুই হস্তে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া প্রাণ ভরিয়া ক্রন্দন করে। কিন্তু লজ্জা আসিয়া তাহাতে বাধ সাধিল। যুবতী অবশেষে থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। পাছে বা পড়িয়া যায় এই ভাবিয়া মাহতাব খাঁ দ্রুত উঠিয়া তাহাকে ধরিলেন। প্রিয়তমের উভয় বাহুস্পর্শে যুবতীর শরীরের প্রতি অণুপরমাণুতে যে প্রেমের তীব্র উচ্ছ্বাস হইল, তাহাতে যুবতী ক্ষণকালের জন্য আত্মসম্বরণে অসমর্থ হইয়া বিহ্বলা হইয়া পড়িল। মাহতাব খাঁ তাহাকে মূর্ছিত মনে করিয়া তাহার মস্তক নিজ ক্রোধে স্থাপনপূর্বক পাখা দ্বারা বাতাস করিতে লাগিলেন। খাঁ সাহেব মহাবিপদ গণিয়া দুর্গাবতীকে ব্যস্তকণ্ঠে ৩/৪ বার “রাণী মা! রাণী মা!” বলিয়া আহ্বান করিতেই রাণী অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া ত্বরিতপদে তথায় উপস্থিত হইলেন। চোখে-মুখে কয়েকবার শীতল জলের ঝাপটা দিলে অরুণাবতীর চেতনা হইল। সে আপনাকে তদবস্থায় দেখিয়া লজ্জায় সমস্ত বদনমণ্ডল আরক্ত করিয়া অবতষ্ঠন টানিয়া দূরে সরিয়া বসিল। রাণী সমস্তই বুঝিতে পারিলেন। ইহা যে মূর্ছা নহে, নিদারুণ সিকাম প্রেমাবেশ, তাহা বুঝিয়া কন্যার মানসিক অবস্থার শোচনীয়তা স্বরণে নিতান্তই ক্রিষ্ট ও ব্যথিত হইলেন। তিনি ভাবিলেন, পরস্পরের চুখনেই এ ঘটনা ঘটিয়াছে।

রাত্রি অধিক হয় দেখিয়া মাহতাব খাঁ দুর্গাবতীর নিকট নিতান্ত বিনীত ও কাতরভাবে বিদায় প্রার্থনা করিলেন। রাণী কিছুক্ষণ নিস্তরুণ থাকিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, “বাবা! আশীর্বাদ করি নিরাপদ দীর্ঘজীবন লাভ কর। এ রাক্ষসের রাজ্য ছেড়ে যাওয়াই ভাল। কিন্তু বাবা! আমার অরুণাবতীর কি উপায় হবে?” রাণী আর কিছু বলিতে পারিলেন না, কাঁদিতে লাগিলেন। মাহতাব খাঁর প্রাণেও অসীম বেদনা। সে স্থান ত্যাগ করিতে তাঁহার পা যেন অগ্রসর হইতেছিল না। তাঁহার হৃদয় ও চক্ষু সমস্তই অরুণাবতীতে ডুবিয়া মজিয়া গিয়াছিল। বহু

কটে ধৈর্য ধারণ করিয়া স্থান পরিভ্রমণে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু রাণীর কথায় হৃদয় যেন সেখানেই বসিয়া পড়িল। মনে হইল, অরুণাবতীকে ছাড়িয়া কিছুতেই বাইব না, 'বা' হইবার তা' হউক। আবার ভাবিলেন, এখানে থাকিবই বা কোথায়? আমার জন্য অরুণাবতীও শেষে কি প্রতাপের রোমানলে দগ্ধ হইবে! মাহতাব খাঁ বজ্রাহতের ন্যায় বহুক্ষণ পর্যন্ত নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিলেন। তিনি এমন দুর্বলতা জীবনে কখনও উপলব্ধি করেন নাই। আজ তিনি দেখিলেন, হৃদয় শ্রেয়-সূত্রায় উন্মত্ত হইয়া পড়িলে তাহাকে প্রশান্ত করা ভীষণ অসম যুদ্ধে জয়লাভ করা অপেক্ষাও শত কঠিন।

"অরুণাবতীর কি উপায় হবে?" এ-প্রশ্নের উত্তর কি দিবেন? তাহা কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছিলেন না। এইরূপে প্রায় অর্ধ ঘণ্টা অতীত হইল, এমন সময় দূর আকাশের কোণে গুড় গুড় করিয়া মেঘ ডাকায় মাহতাব খাঁর চট্কা ভাঙ্গিল। বহু কষ্ট ও যত্নে হৃদয় বাঁধিয়া তিনি বলিলেন, "মা! আমি জীবনে কখনও অরুণাবতীকে ছুলব না। সুদিন হলে অরুণাকে বিয়ে করব। অরুণা ব্যতীত কাকেও বিয়ে করব না। মা! আমি এখন পথের কাঙ্গাল। সঙ্গে পঞ্চাশটি মাত্র টাকা আছে। ভাগ্য আমাকে কোথায় নিয়ে ফেলবে জানি না। মা! আমি বাল্যকালেই পিতৃমাতৃহীন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন। তিনি এখন এলাহাবাদের বাদশাহী দুর্গের অধ্যক্ষ। আমি দশ বৎসর চাকুরি করে যে-অর্থ সঞ্চিত করেছি, তা' সবই মহারাজের নিকট গচ্ছিত। সে বিপুল অর্থ পেলে আমি অবশিষ্ট জীবন সুখে কাটাতে পারতাম। কিন্তু ঘটনা যা ঘটেছে, তাতে অতি নীচ রাজ্য ছাড়তে না পারলে প্রাণ পর্যন্ত হারাতে হবে। হৃদয় এতক্ষণ আমাকে ধরবার জন্য বরণতরী অর্ধপথে এসে উপস্থিত হয়েছে।"

রাণী মাহতাব খাঁর অর্ধাতাবে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া তাড়াতাড়ি একশত মোহরের একটি মোড়ক এবং নিজের হস্তের একটি হীরকাসুরী উন্মোচনাপূর্বক মাহতাব খাঁর করে অর্পণ করিয়া কহিলেন, "বৎস! আর বিলম্ব করো না। সত্বর প্রস্থান কর। পরমেশ্বর তোমার মঙ্গল করুক, তাঁর হস্তে তোমাকে সমর্পণ করলাম। বড় বিপদ! সত্বর প্রস্থান কর।" রাণীকে অভিবাদনপূর্বক আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া মাহতাব খাঁ দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন। ঘাটে যাইয়া তাড়াতাড়ি নৌকা খুলিয়া দিলে মাস্তারা দ্রুত দাঁড় ফেলিতে লাগিল।

"বাবা! আমার অরুণাবতীর কি হবে?" রাণী দুর্গাবতীর এ কথার অরুণাবতীর শোকসিন্দু উথলিয়া উঠিল। সে নিজের হৃদয়কে বহু প্রবোধিত করিল কিন্তু কিছুতেই তাহা প্রবোধিত হইল না। সে স্পষ্ট বুঝিল, তাহার মন খড়ির ন্যায় টক টক করিয়া তাহাকে বলিল, "মাহতাব খাঁ আর এ রাজ্যে কিরিবে না, ফিরিতে পারে না। তোমার কপাল চিরদিনের জন্য পুড়ে গেল।"

অরুণাবতী গৃহে আসিয়া বাত্যাহত লভিকার ন্যায় উন্মত্ত সৈকত-নিকিত

শকরীর ন্যায় বিছানার পড়িয়া ছটফট করিয়া কাঁদিতে লাগিল। সে মাহতাব খাঁকে যতই ভুলিতে চেষ্টা করিল, ততই তাহার পক্ষে মাহতাব খাঁর বিরহ অসহ্য হইতে অসহ্যতর, অসহ্যতম হইয়া উঠিল। মুহূর্তের মধ্যে অরুণাবতী উন্মাদিনীর ন্যায় তাহার গহনার হস্তদস্ত নির্গিত ক্ষুদ্র পিটিকা লইয়া সকলের অজ্ঞাতসারে বাটীর পশ্চাৎভাগের শিড়কী-দ্বার উদ্ঘাটনপূর্বক প্রেমোন্মাদের উদ্দেশ্যে ধাবিত হইল।

নৌকা তখন ঘাট ছাড়িয়া কয়েক রশি দূরে চলিয়া গিয়াছে। অন্ধকারের মধ্যে শুধু বাতি দেখা যাইতেছে। নদীতীর নির্জন। অরুণাবতী বহুদিন নদীতটে পরিভ্রমণ করিয়াছে। সে তাহার গম্বু্যাপথে রুদ্ধশ্বাসে দ্রুত ধাবিত হইল এবং অল্প সময়ের মধ্যে নৌকার নিকটবর্তী হইয়া নৌকা কূলে ভিড়াইতে বলিল। মাহতাব খাঁ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া অরুণাবতীকে গৃহে ফিরিবার জন্য পুনঃপুনঃ বিনীত অনুরোধ করিতে লাগিলেন। মাঝিরা নৌকা কূলে ভিড়াইতেছিল, কিন্তু মাহতাব খাঁর নিষেধে পুনরায় ছাড়িয়া দিবার উপক্রম করিল। অরুণাবতী তখন জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সাঁতারাইয়া নৌকা ধরিতে অগ্রসর হইল। মাহতাব খাঁ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া অরুণাবতীকে মুহূর্ত মধ্যে কিস্তীতে টানিয়া তুলিলেন। বলা বাহুল্য, অরুণাবতী জলে পড়ায় কোন কষ্ট পায় নাই। কারণ, প্রত্যেহ সে নদীর জলে স্নান করিত বলিয়া ভাল সাঁতার জানিত। উভয়ের সিন্ধু বস্ত্র পরিবর্তন করা আবশ্যিক হইল। অরুণাবতীর বস্ত্র লইয়া মাহতাব খাঁকে বিপদে পড়িতে হইল। অরুণাবতী আসিবার কালে কেবল গহনার বাস্তুই আনিয়াছিল। অতিরিক্ত কাপড় আনিবার বিষয় চিন্তাও করে নাই। মাহতাব খাঁও ধৃতি পরিতেন না। সুতরাং সিন্ধু শাড়ী পরিবর্তন করিয়া অরুণা কি পরিবে, তাহাই চিন্তার বিষয় হইল। এদিকে অরুণাবতী পশ্চাৎ দ্বার দিয়া নির্গত হইবা মাত্রই দ্বারের শব্দে রাণী গৃহ হইতে বহির্গত হন। তিনি বাহির হইয়াই তরল আঁধারে বেশ দেখিলেন যে, অরুণাবতী গহনার বাস্তু হস্তে নৌকার উদ্দেশ্যে ধাবিত হইয়াছে। কিন্তু কন্যাকে পলায়ন করিতে দেখিয়া কিছুমাত্র দুঃখিত না হইয়া বরং কিঞ্চিৎ আশ্চর্য হইলেন। কারণ তিনি কন্যার ভীষণ প্রেমোন্মাদের লক্ষণ দেখিয়া তাহার জীবন সম্বন্ধে আকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন। রাণী তাড়তাড়ি গৃহে ফিরিয়া নিজের কিছু গহনা, দুইশত মোহর এবং কয়েকখানি কাপড় লইয়া অরুণাবতীর পশ্চাতে ছুটিলেন। তিনি পৌঁছিতে পৌঁছিতেই মাহতাব খাঁ সুন্দরীকে জল হইতে নৌকায় তুলিলেন এবং অরুণার বস্ত্র পরিবর্তনের মহাসমস্যায় পতিত হইয়া অবশেষে বাস্তু হইতে নিজের অগ্রগণ্য বেশমী পাগড়ী বাহির করিয়া তাহাকে পরিধানের জন্য দিতেছিলেন, ঠিক এমন সময়েই রাণী তট হইতে আহ্বান করিলেন। দুর্গাবতীর আহ্বানে অরুণার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। মাহতাব খাঁও লজ্জিত হইলেন। রাণী নৌকা লাগাইতে বলায়

অক্লান্ত ভয় হইল, পাছে বা তাহাকে ছিনাইয়া বাটি লইয়া যায়। অক্লান্ত বলিল, “মা! নৌকা আর লাগাব না, আমি যখন ভেসেছি, তখন ভাসতে দাও।” রাণী অক্লান্ত প্রাণের বাধা বুঝিয়া বলিলেন, “মা, তুই কলছিনী নস্। তুই-ই প্রকৃত সতী। মা! আমি তোমার গমনে বাধা দিব না। আমি গমনের সুবিধা করে দিবার জন্যই এসেছি। কাপড় ও টাকা এনেছি, নিয়া যা।”

নৌকা কূলে লাগিল। রাণী মোহর, গহনা ও কাপড় দিয়া আশ্বাস করিয়া বলিলেন : “আজ আমি তোমাদেরকে অকূলে ভাসালাম, কিন্তু বিধাতা শীঘ্রই তোমাদেরকে কূল দিবেন।” রাণী এই বলিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিতে বলিলেন। রাণী বাড়ি ফিরিতে ফিরিতে এক একবার সাক্ষরিত্রে পশ্চাৎ ফিরিয়া নৌকা দেখিতে লাগিলেন। শেষে আর নৌকা দেখা গেল না। কেবল প্রদীপের আলো দেখা যাইতে লাগিল। অবশেষে নৌকা বাঁক ফিরিলে তাহাও অন্তর্হিত হইল। রাণী নিঃশব্দে বাটি ফিরিলেন। প্রাঙ্গণে পদার্পণ করিয়া বুঝিলেন—বাড়ী যেন শূন্য শূন্য বোধ হইতেছে। প্রকৃতি যেন উদাস প্রাণে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেছে। রাণী ক্রুদ্ধভাবে গৃহ প্রবেশ করতঃ বিছানার পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

হেমদার ষড়যন্ত্র

মহাব্রতম নিকটর্তী। আর সাতদিন মাত্র অবশিষ্ট। বরদাকান্তের জ্যেষ্ঠপুত্র হেমদাকান্ত কাশী হইতে বাটি ফিরিয়াছে। তাহার এক পিসী বৃদ্ধ বয়সে কাশীবাসী হইয়াছিলেন। পিসী হেমদাকে পুত্রবৎ লালন-পালন করিয়াছিলেন। পিসীর সন্তানাদি কিছুই ছিল না। হেমদাই তাহার সর্বস্ব। পিসীর যথেষ্ট টাকা-কড়ি ছিল। সুতরাং হেমদাকান্ত বাল্যকাল হইতেই পিসী স্বীরদার আদরে বিলাসে উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছিল। ছোটবেলা হইতেই তাহার কোনও আদার বা আকাঙ্ক্ষা একদিনের জন্যও অপূর্ণ থাকিতো না। হেমদা তাহার পিসী স্বীরদার নিকটেই প্রায় থাকিত। কাশীতে গল্পতটে একটি দ্বিতল বাড়িতে হেমদা তাহার পিসী ও স্বীর সহিত বাস করিত। পিসীর নগদ প্রায় ২৫ হাজার টাকা ছিল। সে কালের এই পঁচিশ হাজার আঙ্গকালকার লাখেরও উপর। পিসী সমস্ত টাকাই লগ্নী কারবারে লাগাইয়াছিলেন। তাহা হইতে যে আয় হইত তাহাতেই পিসী, হেমদা ও হেমদা-পত্নী কমলার স্বচ্ছন্দে খরচপত্র পোষাইত। টাকা হেমদার হস্তেই থাকিত। পিসী দিবারাত্রি তপ জপ আত্মিক উপবাস করিয়া এবং নানা প্রকার দেবলীলা ও উৎসব দেবীয়া সময় কাটাইতেন। স্বীরদা-সুন্দরী সন্তান

হিন্দু-ঘরের আদর্শ নিষ্ঠাবতী প্রবীণা মহিলার ন্যায় ছিলেন। জীবন-সন্ধ্যার আঁধার যতই ঘনাইয়া আসিতে লাগিল, ক্ষীরদাও ততই অস্তিমের সম্মেলের জন্য অধীর ও আকুল প্রাণে ধর্মকর্মেই অধিকতর লিপ্ত হইতে লাগিলেন। সংসারের সর্বস্বই হেমদা ও তাহার স্ত্রীর হাতে ছাড়িয়া দিলেন। হেমদা কয়েক বৎসরের মধ্যেই টাকা খাটাইয়া পঞ্চাশ হাজার টাকার লোক হইতে দাঁড়াইল। সে আর কয়েক বৎসরের মধ্যেই যে কাশীর মধ্যে একজন প্রথম শ্রেণীর শ্রেষ্ঠী বা ধনীতে গণ্য হইবে, ইহা সকলেই আলোচনা করিত। কিন্তু এই সময় হইতেই তাহার চরিত্র ভীষণরূপে কলুষিত হইয়া উঠিল। পূর্ব হইতেই তাহার লাম্পট্য দোষ ছিল। এক্ষণে এই লাম্পট্যের সঙ্গে মদ্যপান, দূতক্রীড়া এবং পরদারগমন অভ্যস্ত হইয়া উঠিল। অগ্নিশিখা বায়ু সংযোগে আরও প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। কাশী ভারতে সত্য সত্যই এক অল্পত স্থান। উহার অসংখ্য ক্ষুদ্র ও বৃহৎ মন্দির, অসংখ্য সুন্দর ও কুৎসিত দেবীর প্রাতঃসন্ধ্যা আরতি-অর্চনায় ধর্মপিপাসু হিন্দু নরনারীর প্রাণে যেমন ভক্তি ও নিষ্ঠার ভাব উদ্ভেক করে, অন্যদিকে নানা দিগ্দেশাগত অসংখ্য প্রকারের চোর, জালিয়াত, বিশেষতঃ লাম্পট নরনারীর অবিরাম বীভৎস লীলায় পবিত্রাত্মা মানবমাত্রকেই ব্যথিত করে। জগতে যে সমস্ত জঘন্য লোকের অন্যত্র মাথা লুকাইবার স্থান নাই, কাশীতে তাহারা পরমানন্দে বাস করে। বহুসংখ্যক রাজ-রাজ্যার অনুসত্র উনুক্ত থাকায় এই সমস্ত পাপাত্মাদিগের উদরান্নের জন্যও বড় ভাবিতে হয় না। কাশীতে প্রকৃত চরিত্রবান্ ভালো লোকের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। চরিত্রহীন লাম্পট ও জুয়াচোরদের সংখ্যাধিক্যে এই অল্প সংখ্যক প্রকৃত নিষ্ঠাবান্ চরিত্রশালী লোকের অস্তিত্বে অনেক সময়েই সন্দেহের সম্ভার করে।

যে যাহা হউক, হেমদা কাশীর ব্যভিচার-দুষ্ট বায়ুতে এবং কুসংসর্গ প্রভাবে অল্পকালের মধ্যেই একজন প্রথম শ্রেণীর গুণ্ডার মধ্যে পরিগণিত হইল। তাহার শরীরে বেশ শক্তি ছিল, সে শক্তি এক্ষণে নানা প্রকার পাশবিক এবং পৈশাচিক কার্য সাধনে দিন দিন দুর্দম ও অসংযত হইয়া উঠিল। গায়ের শক্তি, হৃদয়ের সাহস, টাকার বল, সহচরদিগের নিত্য উৎসাহ এবং পাপ-বিলাসের উত্তট-চিন্তা তাহাকে একটা সাক্ষাৎ শয়তানে পরিণত করিল। অনবরত কাম-পূজায় তাহার ধর্মকর্ম-জ্ঞান লোপ পাইল। মদের নেশা তাহাকে আরও গভীর পক্ষে নিক্ষেপ করিল। শেষে মদ্য-সেবা এবং কাম-পূজাই তাহার জীবনের একমাত্র কর্তব্য হইয়া উঠিল। অবশেষে বামাচারী তান্ত্রিক-সম্প্রদায়ের এক কাপালিক সন্ন্যাসীর হস্তে সে তত্ত্ব মত্তে দীক্ষিত হইয়া পাপে দ্বিধাশূন্য ও নির্ভীক হইয়া পড়িল।

হেমদা বামাচারী-সম্প্রদায়ে দীক্ষিত হইবার কিছু পরেই সাদুস্তাপুরে প্রায় দুই বৎসর পরে বাড়ী ফিরিল। আত্মীয় স্বজন সকলেই তাহার আগমনে পরমানন্দিত হইল। সে কাশী হইতে বাড়ী ফিরিবার সময়ে নানা প্রকার সুন্দর সুন্দর অলঙ্কার, ছেলের খেলনা, বানারসী শাড়ী, চাদর, পাথরের নানাপ্রকার দ্রব্য ও মূর্তি,

চরীক কাঁচুলাী মকলকে উপহার দিবার জন্য আনিয়াছিল। হেমদা বাড়িতে খসিফাই দেখিতে পাইল যে, উদ্ভিন্ন যৌবনা গ্রন্থীপুকাতি স্বর্ণময়ী তাহাদের বাড়ী প্রাপ্তকিত করিয়া বিবাহ করিতেছে। স্বর্ণময়ীকে দেখিয়া সে চমৎকৃত, মুগ্ধ এবং এক হইয়া গেল। সে কাশীতে নানাদেশীয় অনেক সুন্দরী দেখিয়াছে এবং নিজে অনেক সুন্দরীর সর্বনাশও করিয়াছে, কিন্তু তাহার মনে হইল স্বর্ণময়ীর ন্যায় কোন সুন্দরী কদম্বি নেত্রপথবর্তী হয় নাই। স্বর্ণময়ী যে একদম রসবতী, মীলাবতী, মনোহরী এবং মোহনীয় সুন্দরীতে পরিণত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া তাহার প্রাণ যেন অপাৰ্শ্বিক আনন্দে পূর্ণ এবং মগ্ন হইয়া গেল। কাশী ত্যাগ করিতে তাহার যে কষ্ট হইয়াছিল, এক্ষণে তদপেক্ষা শতগুণ আনন্দ তাহার প্রাণে সমুদ্ভিত হইল। সে নিজেকে পরম সৌভাগ্যশালী বলিয়া মনে করিল। পিশাচের হৃদয় পৈশাচিক ঘৃণিত বাসনায় চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে সর্বোৎকৃষ্ট শাড়ী, চাদর, হুড়ি, পুড়ল ও পাথরের একপ্রস্থ বাসন স্বর্ণময়ীকে উপহার দিল। সরল-প্রাণা বিমল-চিত্ত স্বর্ণময়ীর উপহার বলিরা প্রাণের সহিত গ্রহণ করিল। কিন্তু দুই তিন দিনের মধ্যেই হেমদার কুৎসিত হাবভাবে, সক্রাম-পিণাসু দৃষ্টিতে স্বর্ণ একটু সঙ্কুচিতা এবং লজ্জিতা হইল। হেমদার প্রতি তাহার একটু ঘৃণারও উদ্রেক হইল। পাণিষ্ঠ হেমদা নানা ছলে স্বর্ণময়ীর গৃহে প্রবেশ করিয়া নানাক্রমে তাহার মনোহরণের চেষ্টা করিলেও স্বর্ণময়ী অচল অটল রহিল।

হেমদা হতই তাহাকে ধর্মভ্রষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, স্বর্ণময়ী ততই তাহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে লাগিল। হেমদার চেষ্টা যতই বিফল হইতে লাগিল, ততই তাহার হৃদয়ের পাপ-লিঙ্গা বলবতী হইতে লাগিল। তাহার আগ্রহ ও যত্ন বাড়িয়াই গেল। মেঘ-বিহারিণী চঞ্চলা সৌন্দর্যিনী যেমন মধুরকে বিমুগ্ধ এবং উন্মত্ত করে, বৈদ্যুতিক গুত্র আলোক যেমন শলভকে আকর্ষণ ও আকৃষ্ট করে, বংশীধ্বনির মধুরতা যেমন মৃগকে জ্ঞানশূন্য করে, রায়-নন্দিনীর ভরা যৌবনের উদ্ভাসিত রূপতরঙ্গও তেমনি পাণ্ডা হেমদাকান্তকে উন্মত্ত ও শান্ত করিয়া তুলিল।

হেমদা কাশী হইতে আসিবার সময় তাহার দীক্ষাওক অভিরাম স্বামীও সঙ্গে আসিয়াছিল। অভিরাম স্বামী সন্ন্যাসীর হস্ত পৈত্রিকবাস পরিধান এবং সর্বদা কপালে বক্তচন্দনের কোঁটা ধারণ করিত। বস্ত্রতে ও গলার রত্নাকমালা, শিরে দীর্ঘকেশ, কিন্তু জটাভঙ্গ নহে। এতদ্ব্যতীত তাহার সন্ন্যাসের বাহ্যিক বা আভ্যন্তরিক কোনও লক্ষণ ছিল না। সে সর্বদাই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং মস্তকে গ্রহুর স্তৈল মর্দন করিত। তাহার শরীর মাংসল, মসৃণ, স্থূল এবং পেশীবহুল। সে অসুরের মত ভোজন করিত। সকালে তাহার জন্য দুই সের লুচি, এক সের মোহনভোজ ও অন্যান্য ফলমূল বরাদ্দ ছিল। বিবহরে অর্ধ সের চাউলের জড়, এক পোয়া দড়, এক সের পরিমিত মাছ এবং দুই সের মাংস এবং অন্যান্য

মিষ্টান্ন প্রায় দুই সের, সর্বত্র ছয় সের ভোজ্যভাত তাহার উদর-গহ্বরে স্থান পাইত। অপরাক্তে দেড় সের ঘন ক্ষীর তাহার জলখাবার সেবায় লাগিত। রাত্রে কুটি ও মাংসে প্রায় পাঁচ সেরে তাহার কুন্নির্বাণ হইত। তাহার ভোজন, আচরণ ও ব্যবহারে সন্ন্যাসের নামগন্ধও ছিল না। মদ্য সর্বদাই চলিত। তাহার চেহারা ও নয়নের কুটিলতা তীব্রভাবে লক্ষ্য করিলে সে যে একটি প্রাক্তন শয়তান তাহা তীক্ষ্ণবুদ্ধি লোকে বুঝিতে পারিত। কিন্তু তাহার গৈরিক বাস, দীর্ঘকেশভার এবং রক্ত-চন্দনের ফোঁটা হিন্দু-সমাজে তাহাকে সঙ্কমের সহিত সন্ন্যাসীর আসন প্রদান করিয়া ছিল। তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর নামে অনেকে 'ইতঃ নষ্ট ততঃ দ্রষ্টের' দল, শিষ্য ও চেলারূপে স্বামীজীর পাদ-সেবায় লাগিয়া গেল। স্বীলোকদিগের মধ্যে কবচ লইবারও ধুম পড়িয়া গেল। বশীকরণ, উচাটন, মারণ প্রভৃতির মন্ত্র-প্রণালী ও ছিটেফোঁটা কত লোকে শিখিতে লাগিল। শিষ্যদিগের আধ্যাত্মিক উন্নতির মধ্যে ধানেশ্বরীর সেবা খুব চলিল। সেকালের ইসলামীয় শাসনে মদ্য কোথায়ও ক্রয় করিতে পাওয়া যাইত না। এখনকার মত ব্রান্ডি, শ্যাম্পেন, শেরী, ক্রোরেট প্রভৃতি বোতলবাহিনীর অস্তিত্ব ছিল না। কোনও মুসলমান মদ্যপান করিলে কাজী সাহেব তাহাকে কষাঘাতে পিঠ ফাটাইয়া দিতেন। হিন্দুর মধ্যে কেহ মদ খাইয়া মাতলামী করিলেও কষাঘাতে পিঠ ফাটিয়া যাইত। কাজেই বড় শহরেও মদের দুর্গন্ধ, মাতালের পৈশাচিক লীলা কদাপি অনুভূত ও দৃষ্ট হইত না। হিন্দুদের মধ্যে বাড়িতে অতি নিভৃতে ধানেশ্বরী নামক দেশী মদ প্রস্তুত করিয়া কেহ কেহ সেবন করিত। ইসলামীয় সভ্যতার অনুকরণে হিন্দু সমাজেও মদ্যপান ও শূকর-মাংস ভক্ষণ অত্যন্ত গর্হিত এবং ঘৃণিত বলিয়া বিবেচিত হইত।*

স্বামীজির আগমনে আর কিছু উপকার হউক আর না হউক, অনেক হিন্দু যুবকই বাড়িতেই বকযন্ত্রে মদ চোয়াইতে লাগিল। স্বামীজি হেমদাকাণ্ডের বিশেষ অনুরোধে পড়িয়াই সাদুস্বাপুরে আসিয়াছিল। দুইদিন থাকিবার কথা, কিন্তু আজ পাঁচদিন অতীত হইতে চলিল, তথাপি স্বামীজির মুখে যাইবার কথাটি নাই। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, কেবল রায়-নন্দিনী। হায় যুবতীর সৌন্দর্য! তুমি এ জগতে কতই না অনর্থ ঘটাইয়াছ! তুমি স্বর্গের অমূল্য সম্পদ হইলেও কামুক ও পিশাচের দল তোমাকে কামোন্মত্ততার তীব্র সুরা মধ্যেই গণ্য করিয়াছে। তুমি একদিকে যেমন পূর্ণিমার জ্যোৎস্না-বিধৌত রমণীয় কুসুমোদ্যান সৃষ্টি করিতেছ, অন্যদিকে যেমন পৃথিবীপুত্রিত অতি বীভৎস শূন্যানেরও সৃষ্টি করিতেছ। কেহ কেহ তোমার ধ্যান করিয়া ফেরেশতা প্রকৃতি লাভ করিতেছে বটে, কিন্তু অনেকেই নরকের কামকীটে পরিণত হইতেছে।

* হিন্দুশাস্ত্রে শূকর মাংস ও মদ্য পবিত্র ও ভক্ষ্য বলিয়া নির্দিষ্ট। কিন্তু মুসলমানেরা শূকর মাংসভোজী ও মদ্যপাতীকে নিতান্ত ঘৃণা করিতেন বলিয়া মুসলমান রাজত্বে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা ইহা পরিভ্যাগ করেন।

পেটুক বালক রসগোল্লা দোঁধলে তাহার মুখে যেমন লালা ঝরে, গর্ভিনী তেঁতুল দেখিলে তাহার জিহ্বায় যেমন জল আইসে, তীব্র ভূষ্কার্ত ব্যক্তি বরফ দেখিলে যেমন তন্নাভে অধীর হইয়া উঠে, বহুমূলা মণি দেখিলে তরুর যেমন আকুল হইয়া পড়ে, আমাদের অভিরাম স্বামী মহাশয়ও তেমনি নবযুবতী অতুল স্বপবতী নির্মল রসবতী শ্রীমতি রায়-নন্দিনীকে দেখিয়া একেবারে ভিজিয়া গলিয়া গেলেন। পাষাণের পাপলিঙ্গা যেন ফেনাইয়া ফুলিয়া উঠিল। শিষ্য এবং গুরু উভয়ে যুগপৎ রায়-নন্দিনীর জন্য দিবস-যামিনী চিন্তা করিতে লাগিল। হেমদার কু-মতলব স্বর্ণ বেশ বৃষ্টিতে পারিয়াছিল, কিন্তু অভিরাম স্বামীর “মনের বাসনা” স্বর্ণ দূরে থাকুক, হেমদাও বৃষ্টিতে পারে নাই। বলা বাহুল্য, শিষ্য অপেক্ষা গুরু চিবদিনই পাকা থাকে। সুতরাং এখানেই বা তাহার ব্যতিক্রম হইবে কেন?

হেমদা কয়েক দিনেই বৃষ্টিতে পারিল যে, স্বর্ণকে দূষিত করা সহজ নহে। স্বর্ণ প্রথম প্রথম পূর্বের ন্যায় ভাই-বোন ভাবে তাহার পাশে বসিত, কিন্তু পরে আর তাহার পাশে বসা দূরে থাকুক, তাহার সম্মুখেও বাহির হইত না। এমন কি, তাহাকে দাদা বলিয়া সম্বোধন করাও পরিত্যাগ করিল। স্বর্ণ এক্ষণে মহরুরমের দিন গণিতে লাগিল। কারণ মহরুরমের পরের দিবসই তাহাকে পিত্রালয়ে লইবার জন্য লোক আসিবে।

যত শীঘ্র হেমদার কলুষদৃষ্টি ও ঘৃণিত সংকল্প-দুষ্ট বাটি হইতে নির্গত হইতে পারে ততই মঙ্গল! কয়েক দিবসের মধ্যেই স্বর্ণ যেন বড়ই স্কৃতিহীনতা বোধ করিতে লাগিল। ঈসা খাঁর পত্র পাইয়া স্বর্ণ অনেকটা প্রফুল্ল ও আনন্দিত হইয়াছিল। কিন্তু পাপাত্মা হেমদাকান্তের ঘৃণিত ব্যবহারে বড়ই অসুখ বোধ করিতে লাগিল। একবার তাহার স্বামীর কাছে হেমদার ঘৃণিত সংকল্প ও পাপ-প্রস্তাবের কথা বলিয়া দিবার জন্য ইচ্ছা করিত; কিন্তু তাহাতে বিপরীত ফল ফলিতে পারে এবং তাহার নামেও হেমদা মিথ্যা কুৎসা আরোপ করিয়া বিষম কলঙ্ক সৃষ্টি করিতে পারে, এই আশঙ্কায় তাহা হইতে নিবৃত্ত হইল। ভাবিল, আর তিনটা দিন কাটিয়া গেলেই রক্ষা পাই। হেমদাও স্বর্ণময়ীর পিত্রালয়ে যাইবার দিন আসন্ন দেখিয়া অস্থির হইয়া উঠিল। সে এবং তাহার গুরুদেব যত প্রকার তত্ত্বমন্ত্র এবং ছিটেফোঁটা জ্ঞানিত, তাহার কোনটিই ব্যক্তি রাখিল না। গুরুদেব অভিরাম স্বামী হেমদার প্রতি গভীর সহানুভূতি দেখাইতে লাগিল। অভিরাম স্বামী নিজে স্বর্ণময়ীর যৌবনে মুগ্ধচিস্ত না হইলে একরূপ ভয়ানক এবং নিতান্ত জঘন্য কার্যের সংকল্প হয়ত লোক-লজ্জার জন্যও অনুমোদন করিত না। কিন্তু সে জ্ঞানিত যে, হেমদার ভাগ্যে শিকা ছিড়িলে সে নিজেও দুঃসভাওে জিহ্বা লেহন করিবার সুবিধা পাইবে।

দিন চলিয়া যাইতেছে—স্বর্ণময়ী হস্তচ্যুত হইতে চলিল দেখিয়া গুরুদেবও

বিশেষ চিন্তিত হইল। অবশেষে তন্ত্রের বিশেষ একটি বশীকরণ মন্ত্র সারা দিবারাত্রি জাগিয়া লক্ষ্যবার জপ করতঃ একটি পান শক্তিপূত করিল। এই পান স্বর্গকে স্বহস্তে সেবন করাইতে পারিলেই হেমদাকান্তের বাসনা পূর্ণ হইবে বলিয়া স্বামীজি দৃঢ়তার সহিত মত প্রকাশ করিলেন, পানের রস গলাধঃকরণ মাত্রই স্বর্গময়ী হেমদার বশীভূতা হইবে।

পাপাত্মা হেমদাকান্ত এই পান পাইয়া পরম আহ্লাদিত হইল। এক্ষণে এই পান স্বর্গকে কিরূপে খাওয়াইবে তাহাই হেমদার চিন্তার বিষয়ীভূত হইল। সন্ন্যাসী যখন পান দিল, তখন সন্ধ্যা। স্বর্গ তখন অন্যান্য বহু স্ত্রীলোকের মধ্যে বসিয়া গল্প করিতেছিল, সুতরাং তাহাকে পান দিবার জন্য দুর্বৃত্তের মনে সাহস হইল না।

অতঃপর কিছু রাত্রি হইলে হেমদা সকলের অসাম্বন্ধে স্বর্গময়ীর গৃহে নিঃশব্দে প্রবেশ করিয়া পালঙ্কের আড়ালে বসিয়া রহিল। স্বর্গময়ী আহারান্তে গৃহে আসিয়া দ্বার বন্ধ করতঃ শয়ন করিবার পরে পাপাত্মা মৃদুমন্দ হাস্যে স্বর্গের নিকটে উপস্থিত হইল। স্বর্গ সহসা তাহাকে গৃহ মধ্যে দর্শন করিয়া—পাশ্চিমধ্যে দংশনোদ্যত ফণী দর্শনে পথিকের ন্যায় বিচলিতা হইয়া চীৎকার করিবার উপক্রম করিল। পাপাত্মা তদর্শনে অতীব বিনীতভাবে দুই হস্ত জোড় করিয়া বলিল, “স্বর্গ! আমি কোন মন্দ অভিপ্রায়ে আসি নাই। তুমি যাতে চিরকাল সুস্থ থাক, সেই জন্য সন্ন্যাসী-ঠাকুর এই মন্ত্রপূত-পান দিয়েছেন; এটা তোমাকে খেতে হবে।”

স্বর্গ : তুমি এখনই গৃহ থেকে নির্গত হও, নতুবা বিপদ ঘটবে, ও পান সন্ন্যাসীকে খেতে বল। আমি ও পান কিছুতেই খাব না!

স্বর্গের দৃঢ়তা দেখিয়া হেমদা দুই হস্তে স্বর্গের পা জড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে পান খাইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল। স্বর্গ তাহার এই বিসদৃশ ব্যবহারে নিতান্ত কুপিত হইয়া সজোরে তাহার বক্ষে পদাঘাত পূর্বক দ্বার খুলিয়া তাহার ছোট মায়ীর গৃহের দিকে চলিয়া গেল। সহসা স্বর্গের সবল পদাঘাতে পাপিষ্ঠ কামাক্স হেমদাকান্ত একেবারে ঘরের মেঝেতে চিৎ হইয়া পড়িল। বৃকে পদাঘাত এবং মস্তকে পাকা মেঝের শক্ত আঘাত পাইল। কিন্তু এ আঘাত অপেক্ষা তাহার মানসিক আঘাত সর্বাপেক্ষা অসহ্য হইয়া উঠিল। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, যে রূপেই হউক স্বর্গের সর্বনাশ সাধন করিবেই।

হেমদা নিতান্ত দুঃখিত ক্ষুব্ধ ও উত্তোজিতভাবে সমস্তই গুরুদেবের নিকটে নিবেদন করিল। অতঃপর পরামর্শ হইল যে, মহররমের দিবস স্বর্গকে নৌকাপথে হরণ করিয়া একেবারে কাশী লইয়া যাইতে হইবে।

নবম পরিচ্ছেদ

কাননাবাসে

প্রধান সেনাপতি মাহতাব খাঁ যশোর হইতে প্রস্থানের কিঞ্চিৎ পরেই প্রতাপাদিত্য তাঁহাকে ধরিয়া আনিবার জন্য কালিদাস ঢালীকে আদেশ করিলেন। ঢালী মহাশয় অনুসন্ধান করিয়া কোথাও খাঁ সাহেবকে পাইলেন না। পরে নদীতটে যাইয়া শুনিলেন যে, খাঁ সাহেব নৌকা করিয়া বামনী নদী উল্লাইয়া গিয়াছেন। কালিদাস যাইয়া রাজাকে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। ঘটনা শুনিয়া প্রতাপাদিত্যের রোশানল শীতল হইয়া গেল। মনে একটু অনুশোচনার উদ্রেক হইল। মাহতাব খাঁই প্রতাপের দক্ষিণ হস্ত। মাহতাবের বাহুবল এবং রণ-কৌশলেই প্রতাপের যা কিছু প্রভাব ও দম। মগ ও পর্তুগীজেরা কতবার মাহতাব খাঁর দুর্দম বিক্রমে রণক্ষেত্রে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছে। প্রতাপ ভাবিলেন, মাহতাব খাঁ শত্রুপক্ষে যোগদান করিয়া তাঁহার ঘোরতর অনিষ্ট সাধন করিতে পারেন। তিনি যদি কেদার রায় বা রামচন্দ্র রায়ের অথবা ভূসুয়ার কঙ্কল গাজীর সেনাপতিত্ব গ্রহণ করেন, তাহা হইলে প্রতাপের পক্ষে বিষম সমস্যা। এক্ষণে হয় তাঁহাকে ফিরাইয়া আনা, না হয় নিহত করাই মঙ্গলজনক বলিয়া বোধ হইল। প্রতাপ তখনি কালিদাসকে এক শত বন্দুকধারী সৈন্যসহ একখানি দ্রুতগামী তরী লইয়া মাহতাব খাঁকে ধরিয়া আনিবার জন্য আদেশ করিলেন। কালিদাস কালবিলম্ব না করিয়া শত সৈন্য সমত্তিবাহারে শীঘ্র তরনীতে আরোহণ করিলেন। পঞ্চাশ দাঁড় প্রকাণ্ড ছিপের আকৃতি নৌকা কল কল করিয়া বামনীর উর্ধ্বল-স্রোত বিদারণ করতঃ মাহতাব খাঁর উদ্দেশ্যে ছুটিয়া চলিল।

মাহতাব খাঁর নৌকা ছয় দাঁড়ের হইলেও ক্ষুদ্র বলিয়া বেশ ছুটিয়া চলিয়াছিল। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, সারারাত্রি নৌকা বাহিতে পারিলে, প্রাতঃকালে কিঞ্চিৎ বেলা উদয়েই প্রতাপাদিত্যের এলাকা ছাড়াইতে পারিবেন। প্রতাপাদিত্যের এলাকা ছাড়াইতে পারিলেই তিনি নিরাপদ। মাহতাব খাঁ দাঁড় ফেলিতে বাহাতে কিছুমাত্র শৈথিল্য না করে, সে জন্য তিনি অর্ধরাত্রি পর্যন্ত জাগিয়া রহিলেন। মাহতাব খাঁ প্রাণপণে নৌকা বাহিতে লাগিল। মাঝি খাঁ সাহেবকে জাগিয়া থাকিতে দেখিয়া তাঁহাকে শয়ন করিবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতে লাগিল এবং নৌকা যে প্রত্যাহতেই সলিমাবাদের সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়া খাঁর এলাকায় পৌঁছাইতে পারিবে, এ বিষয়ে খুব বড়মুখে বড়াই করিতে লাগিল।

মাহতাব খাঁ মাঝির ব্যগ্রতা এবং মাহতাবাদিত্যের প্রতি দ্রুত দাঁড় নিষ্ক্ষেপে পুনঃ পুনঃ সাবধানতা দর্শনে নিশ্চিন্ত হইয়া শয্যাতে সেহ পাতিলেন এবং স্বল্পকালেই

নিদ্রাভিত্ত হইয়া পড়িলেন। মাহতাব খাঁ নিদ্রিত হইয়া পড়িলে মাঝি ও মাল্লারা একস্থানে নৌকা লাগাইয়া সকলেই পলায়ন করিল। তাহাদের পলায়ন করিবার কারণ যে প্রতাপাদিত্যের কঠোর দণ্ডভীতি, তাহা বোধ হয় পাঠক বুঝিতে পারিতেছেন। খাঁ সাহেব যখন যশোরে নৌকায় আরোহণ করেন, তিনি যে যশোর হইতে পলায়ন করিতেছেন তখন মাঝিরা তাহা বুঝিতে পারে নাই। তিনি সলিমাবাদে বিশেষ কোন গোপনয় রাজ্যকার্ষে যাইতেছেন বলিয়াই তাহারা বুঝিয়াছিল; কিন্তু মনোহরপুর হইতে নৌকা ছাড়িলে অক্লণবতী যখন পলায়মান-বেশে নৌকায় উঠিল তখন তাহারা বুঝিল যে, সেনাপতি প্রতাপাদিত্যের কন্যাকে কুলের বাহির করিয়া লইয়া পলায়ন করিতেছেন। তাহারা নিজেদের পরিণাম ভাবিয়া উদ্ভিগ্ন হইল; তাহারাই মাহতাব খাঁর পলায়নে সাহায্য করিয়াছে, প্রতাপ ইহা সহজেই জানিতে পারিবেন। জানিতে পারিলে তাহাদিগকে যে জান্ন, বাচ্চা বুনিয়াদসহ জ্বলন্ত আগুনে পুড়াইয়া মারিবেন, ইহা স্বরণ করিয়া শিহরিয়া উঠিল। তাহাদের গায়ে ঘর্ম ছুটিল। অন্যদিকে সেনাপতির ভয়ে নৌকা বাহনেও অস্বীকৃতি হইবার সাহস ছিল না। ঘটনা যতদূর গড়াইয়াছে তাহাতেই তাহাদের প্রাণরক্ষা হইবে কি না সন্দেহের বিষয়। তবে নিজেদের অক্ষতা জানাইয়া সেনাপতির রাজকন্যা হরণের সংবাদ রাজাকে অর্পণ পূর্বক আপনাদের নির্দোষত্ব জ্ঞাপন করিতে পারিলে হয়ত প্রতাপাদিত্য তাহাদিগকে ক্ষমা করিতে পারেন, এই বিশ্বাসে তাহারা পলায়ন করিল। সেনাপতি সাহেব নিজের ব্যস্ততা এবং নিজের বিপক্ষিতার মধ্যে মাঝিদের বিপদের কথা একবারও ভাবিবার অবসর পান নাই। তিনি যেরূপ উদার ও মহদন্তঃকরণের লোক ছিলেন, তাহাতে মাঝিরা নিজেদের বিপদের কথা খুলিয়া বলিলে, তাহাদিগকে নিজের সহস্র বিপদের মধ্যেও বিদায় করিয়া দিতেন।

যাহা হউক, মাঝিরা পলায়ন করিবার প্রায় একপ্রহর পরে মাহতাব খাঁর নিদ্রা ভাঙ্গিল। তিনি দাঁড়ের শব্দ না শুনিয়া নৌকার ভিতর হইতে বাহির হইলেন। বাহির হইয়া দেখিলেন, মাঝি-মাল্লার কোন নিদর্শন নাই। নৌকা একগাছি রজু দ্বারা একটি গাছের মূলে বাঁধা রহিয়াছে। প্রকৃত রহস্য বুঝিতে তাহার বিলম্ব হইল না। তৎক্ষণাৎ তিনি অক্লণবতীকে জাগাইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বুঝাইয়া বলিলেন। মাঝিদের পলায়নে প্রতাপ-দুহিতা নিভাস্ত উদ্ভিগ্ন ও অধীর হইয়া পড়িল। পাছে বা পশ্চাৎকালিত রাজ-অনুচরদের হস্তে ধৃত হওয়ায় উচ্ছ্বসিত জীবনের উদ্দাম সুখ ও প্রেমের কল্পনা মরীচিকার পরিণত হয়। তাহার হৃদয়-তরুণীর প্রবনক্ষত্র, তাহার তৃষ্ণার্ত জীবনের সুশীতল অমৃত-প্রস্রবণ, তাহার জীবনাকাশের চিস্তাবিনোদন লোচনরঞ্জন অপূর্ব জলধনু পরে বা বিপদঘাত হয়, এবিধ চিন্তায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। মাহতাব খাঁ মুহূর্তে চিন্তা স্থির করিয়া অক্লণবতীকে কল্পশায়ী আত্মাহতালার উপর নির্ভর করিতে বলিয়া শেষে বলিলেন, “প্রিয়তমে! এ বিপদে

গ্রাম যদি কোনরূপে নৌকার ছালটি ধরে রাখতে পার, তা হলে আমি একাই দাঁড় ফেলে নিয়ে যেতে পারি। এ ছাড়া আর কোন উপায় নাই। তুমি যখন হতভাগ্যের জীবন-সঙ্গিনী হয়েছ, তখন দুঃখ ভোগ করা ছাড়া উপায় কি?”

মাহতাব খাঁ এমন গভীর অনুরাগ এবং শুভ্র সহানুভূতির সহিত কথাটি বলিলেন যে, প্রতাপ-বালার কর্ণে তাহা অমৃতবর্ষণ করিল। নৌকায় আরোহণ করা পর্যন্ত মাঝিদের জন্য লজ্জায় পরস্পর কোন কথাবার্তা বলিতে পারে নাই। এক্ষণে লোক-সঙ্কোচ দূর হওয়ায় এবং বিপদ সমাগমে উভয়ের হৃদয়, চক্ষু ও স্নিহ্বা মুক্তাবস্থায় সুরভিত প্রেমের অমিয় দৃষ্টি ও মধুর ভাষা উদগীর্ণ করিতে লাগিল। হাতুড়ির আঘাত যেমন দুইখণ্ড উত্তম ধাতুকে পরস্পর অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত করিয়া দেয়, বিপদও তেমনি দুইটি অনুরাগোক্ত হৃদয়কে একেবারে মিলাইয়া দেয়। অগুণ্যস্বাপে অল্পপরিমিত দুঃখ যেমন বৃহৎ পাত্রকে পূর্ণ করিয়া ফুলিয়া উঠে, বিপদের আঁচেও তেমনি হৃদয়ের কোণে যে প্রেম, যে সহানুভূতি নীরবে আলস্যশয্যায় পড়িয়া ঘুমাইতেছে তাহাও জ্বোরেশোরে দশগুণ উজ্জ্বলিত হইয়া হৃদয়ের কল ভাসাইয়া অপর হৃদয়কে ভাসাইয়া ফেলে। তখন দুই মিশিয়া এক হয়।

অরুণাবতী বাল্যকাল হইতেই নৌ-ক্রীড়ারত ছিল বলিয়া হাল ধরিতে অভ্যস্তা ছিল। এক্ষণে বিপদকালে প্রতাপ-কুমারী হাল ধরিয়া বসিল, আর খাঁ সাহেব বীর-বাহুর বিপুল বলে দুই হস্তে দাঁড় ফেলিতে লাগিলেন। নৌকা নদীর খর-প্রবাহ কাটিয়া কল কল করিয়া ছুটিয়া চলিল। ছয় দাঁড়ে নৌকা যেরূপ দ্রুত চলিয়াছিল, মাহতাব খাঁর দুই দাঁড়েও নৌকা প্রায় সেইরূপ ছুটিল। মাহতাব খাঁ তালে তালে দাঁড় ফেলিতেছেন, আর সুন্দরী অরুণাবতী সাবধান-হস্তে হাল ধরিয়া তাহার পানে চাহিয়া মৃদুমন্দ হাসিতেছে। সে হাসিতে মাহতাব খাঁও হাসিতেছেন। পরস্পরের হাসিতে উভয়ের হৃদয়ে যে কোটি নক্ষত্রের স্নিহ্ব আলোক মরকত-দুষ্টির ন্যায় জ্বলিতেছে—ঐ নীলাকাশের তারাগুলি যদি সে প্রেমামৃতমাধা দিব্য দীপ্তি দর্শন করিত, তাহা হইলে এই মুহূর্তে সমস্তগুলি আকাশচ্যুত হইয়া চিরদিনের জন্য ডুবিয়া রহিত। উর্ধ্বে অনন্ত নক্ষত্রখচিত জলদ-বিযুক্ত অনন্ত নভোমণ্ডল, নিম্নে শ্যামলা ধরণী বক্ষে রঞ্জিত-প্রবাহ বায়নী নদী কোটি তারকার প্রতিবিম্ব হৃদয়ে ধারণ করতঃ উদ্ভাস গতিতে কল কল ছল ছল করিয়া ফুটন্ত যৌবনা প্রেমোন্মাদিনী রসবতী যুবতীর ন্যায় সাগরসঙ্গমে ছুটিয়াছে; আর তাহার বক্ষে নবীন প্রেমিক-প্রেমিকা দাঁড় ফেলিয়া হাল ধরিয়া অনন্ত আনন্দ ও অপার আশায় হৃদয় পূর্ণ করিয়া নৌকা বাহিয়া চলিয়াছে। মরি! মরি!! কি সুবনমোহন চিত্তবিনোদন লোচনরঞ্জন দৃশ্য! যে বিপদ এমন অবস্থার সংঘটন করে, তাহা সম্পদ অপেক্ষাও প্রার্থনীয় নহে কি?

নৌকা ছুটিয়াছে। আকাশে তারকা দলও ছুটিয়া চলিয়াছে। বায়নী ছুটিতেছে,

বাতাস ছুটিতেছে। এ জগতে ছুটিতেছে না কে? জগৎ পর্যন্ত, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড পর্যন্ত ছুটিয়া চলিয়াছে। অনন্তকাল হইতে ছুটিতেছে, অনন্তকাল ছুটিবে। এ ছোট্ট কিছু শেষ নাই, সীমা নাই। রজনী পূর্ব গোলাধ ত্যাগ করিয়া পশ্চিম গোলাধে ছুটিল—উষার ওদ্র আলোক-রেখা ছুটিয়া আসিয়া অন্ধর-অন্ধ-বিলম্বিত শ্বেত পতাকার ন্যায় ফুটিয়া উঠিল। নদীবক্ষ ঈষৎ আলোকিত হইল। শীতল-সলিল-শীকর-সিক্ত-মৃদু-সমীরণ নায়ক-নায়িকার বাবরী দোলাইয়া কুন্তল উড়াইয়া প্রতি মুহূর্তে ছুটিয়া চলিল। মাহতাব খাঁ ঈষৎ স্বর্ণাভা-মণ্ডিত ওদ্র-রঞ্জিত-ফলকবৎ ললাটদেশে গুরুশ্রমে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম ফুটিয়াছে। মাহতাব খাঁ দাঁড় তুলিয়া সম্মুখের দিকে স্থির ও দূরগামিনী দৃষ্টিতে চাহিলেন—দেখিলেন, দূর—অতিদূরে একখানি প্রকাণ্ড নৌকায় কয়েকটি বাতি জ্বলিতেছে! হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল—আবার দেখিলেন,—পকেট হইতে দূরবীণ বাহির করিয়া দেখিলেন। যাহা দেখিলেন, তাহাতে বুঝিলেন বিপদ আসন্ন। অরুণাবতীও দেখিল, একখানি নৌকা তীরের মত ছুটিয়া আসিতেছে। খালি চোখে নৌকা দেখা যাইতেছে না, কেবল আলো ছুটিয়া আসিতে দেখা যাইতেছে। অরুণাবতী ব্যাঘ্রসন্দর্শনভীতা মৃগীর ন্যায় কাঁপিয়া উঠিল।

মাহতাব খাঁ প্রকৃত বুদ্ধিমান বীরপুরুষের মত মুহূর্ত মধ্যে চিন্তা ও কর্তব্য স্থির করিয়া ফেলিলেন। অরুণাকে বলিলেন, “অরুণে! ব্যাকুল হইও না, আত্মাহু আছেন। আমাদের নৌকায় বাতি নাই, সুতরাং ওরা আমাদেরকে দেখতে পায় নাই। চল, নদীর তীরবর্তী জঙ্গলে আশ্রয় লওয়া যাক। নৌকা বেয়ে ওদের হস্ত অতিক্রম করা অসম্ভব। মুসলমান কখনও শত্রু দেখে আত্মগোপন করে না, কিন্তু আজ আত্মগোপন না করলে অমূল্য কোহিনূর তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না। নৃপকিরীট-শীর্ষ-শোভী কোহিনূর কখনও কুকুরের গলায় অর্পণ করবে না। অরুণা! ভূমি আর বিলম্ব করো না, সমস্ত দ্রব্য গুছিয়ে পেটিকা-বদ্ধ কর। আমি এখন নৌকা তীরে লাগাচ্ছি।”

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই নৌকা তীরে লাগিল। মাহতাব খাঁ দ্রুত নামিয়া রজ্জু দ্বারা একটি বৃক্ষমূলে নৌকা বাধিলেন। তৎপর দুইজনে সমস্ত জিনিষপত্র নামাইয়া জঙ্গলের মধ্যে জমা করিলেন। সমস্ত দ্রব্য তথায় পুঞ্জীকৃত করিয়া নৌকার ছই ও পাটাতনের তক্তা-সকল গভীর জঙ্গলে রাখিয়া নৌকা ডুবাইয়া দিলেন।

বামনীর উভয় পার্শ্বে সেই স্থলে বহুদূরব্যাপী অরণ্য। নিকটে কোথাও লোকালয় নাই। জঙ্গলে নানা জাতীয় বৃক্ষ। জঙ্গল এমন নিবিড় এবং বিশাল ছিল যে, তখন এখানে দলে দলে মৃগ বিচরণ এবং ব্যাঘ্র গর্জন করিত। পূর্বে শিকার উপলক্ষে দুই তিনবার মাহতাব খাঁ এ-জঙ্গলে পদার্পণ করিয়াছিলেন, তাই তিনি এ-কাননের বিষয় অবগত ছিলেন। খাঁ সাহেব জিনিসপত্র একস্থানে রাখিয়া

একস্থানে একটু দূরে বৃক্ষের নিবিড় অঙ্ককারের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া অরুণাকে লইয়া বসিলেন। হিংস্র স্থাপত্যশীতির জন্য তিনি তাহার 'খুনরেজ' (ব্রহ্মপিণাসু) নামক ডব্বাঝি কোমর হইতে মুক্ত করিয়া হস্তে ধারণ করিলেন। জঙ্গলের কাঁকের ভিতর দিয়া দূরবীণ ধরিয়া মাহতাব খাঁ শত্রুতরী পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে উষার আলোক আরও কুটতর হইয়া উঠিল। অর্ধ ঘণ্টার মধ্যে প্রতাপাদিত্যের প্রকাণ্ড নৌকা দাঁড়ের আঘাতে নদী-বক্ষে উর্মি তুলিয়া এবং শবে উভয় তটের কানন-হৃদয়ে প্রতিধ্বনি জাগাইয়া মাহতাব খাঁ ও অরুণাবতীর আশ্রয়দাত্রী বনভূমি পচাতে ফেলিয়া সলিমাবাদের দিকে ছুটিয়া চলিল। মাহতাব খাঁ অজু করিয়া শুভিপুতচিন্তে বামণীর তটস্থ শ্যাম দুর্বাদলের মখমল আন্তরণে ফজরের নামাজ পড়িয়া বিশ্বশরণ মঙ্গলময় আব্রাহামতালার পদারবিধে কৃতজ্ঞতার অশ্রুবারি বর্ষণ করিলেন। অনন্তর বিশ্বলোচন অরুণদেব জ্বন-বিমোহন তরুণ অরুণিমা-জ্বলে আকাশ-মেদিনী বামণীর চঞ্চল হৃদয় এবং কাননের বর্ষাবারি-বিধৌত সরস-শ্যামল-মসৃণ তরু-বহীর পক্ষে স্বর্ণ-চূর্ণজাল ছড়াইয়া অর্পণ শোভা ফুটাইলে মাহতাব খাঁ অরুণাবতীর কর ধারণ করতঃ আশ্রয়ের উপযুক্ত স্থান অনুসন্ধান কিঞ্চিৎ ভিতরে প্রবেশ করিলেন। অরণ্য—শাল, তাল, তমাল, সুন্দরী, ঝাউ, অশ্বখ, কদম্ব, বেত, কেতকী, হরীতকী, আমলকী, আম্র, খর্জুর, পনস প্রভৃতি জাতীয় অসংখ্য ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বৃক্ষে পরিপূর্ণ। কোথাও নানাজাতীয় গুল্ম ও তৃণ বাড়িয়া ভূমি আচ্ছন্ন এবং অগম্য করিয়া ফেলিয়াছে। কোথাও বা মনুষ্য-হস্তকৃত সযত্ন-রচিত উদ্যান অপেক্ষাও বনভূমি মনোহর। রাশি রাশি কেতকী ও কদম্ব ফুল ফুটিয়া প্রভাত সমীরে গন্ধ ঢালিয়া সমস্ত বনভূমি আমোদিত করিয়া তুলিয়াছে। ঘুঘু, কিসা, দোয়েল, শ্যামা, বন্য কুক্কট, বুলবুল, টিয়া প্রভৃতি অসংখ্য বিহঙ্গ বিবিধ স্বরে মধুর কূজনে প্রভাত-কানন চঞ্চল ও মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে। বন-প্রকৃতির সরস শ্যামল নির্মল নগ্ন শোভা দেখিয়া অরুণার নব প্রেমাকুল চিন্ত যেন প্রেমের আভ্যন্তর আনন্দে ফুটিয়া উঠিল।

উত্তরে কিয়দূর অগ্রসর হইয়া এক নির্মল-সলিলা সরসী দেখিতে পাইলেন। ক্ষুদ্র সরসীর চারিপার্শ্বে মখমল-বিনিম্বিত কোমল ও শ্যামল সম্প্রসারিত। তাহার মধ্যে বর্ণাঙ্কিত নানাবিধ বিচিত্র বর্ণের তৃণজাতীয় পুষ্প ফুটিয়া শ্যামল ভূমি অর্পণ সুসমায় সাজাইয়াছে। সরোবরের জলে অসংখ্য মৎস্য কীড়া কূর্দন করিতেছে। মাঝে মাঝে শাপলা ও কুমুদ ফুটিয়া মৃদু হিলোলে দুলিয়া দুলিয়া নাচিতেছে। জল এত পরিষ্কার যে, নীচের প্রত্যেকটি বাসুকা কণা দেখা যাইতেছে। রক্ত-বেথা-অভিভূত সমুচ্ছল শকরীর কান্ড জলের তটায় সরসীপার্শ্ব আলোকিত করিয়া ভ্রমণ করিতেছে। আকাশের নানাবর্ণ রচিত অমৃতমালা আকাশসহ সরসীর তলে শোভা পাইতেছে। কি বিচিত্র দৃশ্য! কি মনোমোহিনী

শোভা। দেখিয়া দেখিয়া প্রতাপ-তনয়া একেবারে মুগ্ধ-লুপ্ত এবং বিস্মিত হইয়া পড়িল। অরুণা অরণ্যভূমির উজ্জ্বল শ্যামল-বিনোদ কোমল শোভা আর কখনও দর্শন করে নাই। সুতরাং তাহার প্রেমাকুল তরুণ চিত্ত যে বনভূমির শান্তি সম্পদে, বিচিত্র সৌন্দর্যে এবং নির্জন প্রেমের সরস পুলকে মাতিয়া উঠিবে, তাহা তো অত্যন্ত স্বাভাবিক। তাহার এত আনন্দ হইল যে, ইচ্ছা হইতেছিল সে একবার পুষ্পখচিত গালিচা-বিনিন্দী কোমল ঘাসের উপর চঞ্চলা হরিণী বা প্রেমোন্মাদিনী শিখিনীর ন্যায় নৃত্য করে। মাহতাব খাঁও অবশ্য প্রকৃতির শিষ্ট শোভা এবং মোহন দৃশ্যে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। ক্ষণেকের জন্য তাহার চিত্ত নগরের বহু লোক সহবাস পূর্ণ অশান্তি ও কোলাহলময় জীবনের প্রতি দিক্কার দিল। অলক্ষিতে তাহার প্রেমমদিরাকুল চিত্তের মর্ম হইতে প্রভাতকানন মুখরিত করিয়া মধুর কণ্ঠে ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াত ধ্বনিয়া উঠিল :

“দর ফস্লে বাহার আগার তনে হর নিরস্তী
 পুর ময়ে কদাহ বমন দেহদ বন্ লবে কীসত,
 গরচে বরহর কসে সখুন বাশদ জীশত ।
 সগ বে বমন আরজাঁকে বরম নামে বেহেশত।”

মাহতাব খাঁ সুললিত স্বরে সেই নির্জন কাননে সুধাকণ্ঠ বিহঙ্গাবলীর মধুর কুঞ্জে মধু বর্ষণ করিয়া কয়েকবার “রুবাইয়াত”টি গাহিলেন। অরুণাবতী ফার্সী জানিত না, কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তে মাহতাব খাঁকে জিজ্ঞাসা করিল,—“কি গাইছেন? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।”

মাহতাব : কি গাইব। তোমারই গান গাইছি।

অরুণা : আমার গান কেমন? গজলটা ভেসেই বলুন না!

“আচ্ছা তবে শোন,” এই বলিয়া—প্রকৃটিত ওত্র রজনীগন্ধা মাকুত হিল্লোলে যেমন করিয়া ফুটন্ত যৌবনা গোলাপ-সুন্দরীর রক্তবক্ষ স্পর্শ করে, মাহতাব খাঁও তেমনি ভাবে প্রণয়-সোহাগে চম্পক অঙ্গুলে অরুণাবতীর গোলাপী কপোল টিপিয়া বলিলেন, “কবি বলিতেছেন যে, আনন্দময় বসন্তকাল পুষ্পিত নিকুঞ্জ কাননে যদি কোন অঙ্গরীবৎ সুন্দরী অর্থাৎ অরুণাবতী কোমল করণশ্ৰবে এক পাত্র মদিরা আমার অধরে ধারণ করে, তাহা হইলে কুকুর আমা অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ, যদি আর কখনও বেহেশত কামনা করি।”

অরুণা রুবাইয়াতের ব্যাখ্যা শুনিয়া ঈষৎ সলজ্জ কটাক্ষ হানিয়া শ্রিত হাসিয়া বলিল, “বটে! কবি তো খুব রসিক।”

মাহতাব : আর আমি বুঝি অরসিক?

অরুণা : কে বলল?

মাহতাব : ভাবে।

অরুণা : কি প্রকারে?

মাহতাব : তবে মদিরাপাত্র কোথায়?

অরুণা : সে যে বসন্তকালে ।

মাহতাব : এ বর্ষাকাল হলেও এ কাননে এখনও বসন্ত বিরাজমান ।

অরুণা : আচ্ছা, বসন্তই যেন হল; কিন্তু এখানে মদিরা কোথায়? আর তুমি মুসলমান, মদা যে তোমার জন্য হারাম ।

মাহতাব : কবি যে মদ্যের কথা বলেছেন, তা হারাম নহে ।

অরুণা : সে আবার কোন মদ্য?

“সে এই মদ্য” এই বলিয়া মাহতাব ঝাঁকুণীকে ভূজপাশে জড়াইয়া অধরে অধর স্থাপন করিলেন । অধর-রসামৃত পানে উভয়েই পুলকিত শিহরিত এবং বিমোহিত হইলেন । অরুণাবতী দেখিল সমস্ত পৃথিবী যেন সুধারসে বিপ্লাবিত । সহসা একটা বুলবুল উড়িয়া আসিয়া অরুণাবতীর অতি নিকটস্থ কদম্ব শাখায় বসিয়া ডাহার পানে চাহিয়া ডাকিয়া উঠিল । অরুণাবতী সেই বিহঙ্গের দৃষ্টিতে লজ্জিত হইয়া আনত চক্ষুতে চুখনাকৃষ্ট মুখ সরাইয়া লইল । যুবতী-হৃদয়ে যৌবনতরঙ্গে যেমন প্রেমাকুল, লজ্জায় তেমনি সদা অবগুষ্ঠিত ।

মাহতাব ঝাঁকুণী সর্বোবরের অদূরে গোলাকারে ঘন সন্নিবিষ্ট তালবৃক্ষ পূর্ণ একটি উচ্চস্থান দেখিতে পাইলেন । তাল গাছগুলির ফাঁকে বেতের লতা এমন ঘন ভাবে জন্নিয়াছে যে, বাহির হইতে মধ্যস্থানের নির্মল তৃণাচ্ছাদিত স্থানটুকু সহসা দেখা যায় না । অরুণাবতীও সেইস্থানে কানন-বাসের কুটির নির্মাণের জন্য পছন্দ করিল । একদিকের কিঞ্চিৎ বেত কাটিয়া দ্বার প্রস্তুত করা হইল । অতঃপর ছোট ছোট দেবদারু ও সুন্দরী গাছ কাটিয়া মঞ্চ প্রস্তুতপূর্বক নৌকার ছই এবং গোলপাতার সাহায্যে দুইটি রমণীয় কুটির প্রস্তুত করা হইল । কাঁচা বেত চিরিয়া তদ্বারা বন্ধনীর কার্য শেষ করা হইল ।

প্রতাপাদিত্যের নৌকা বামনী নদী হইতে কিরিয়া না গেলে অরুণাকে লইয়া সেই তীর্থ জঙ্গল অতিক্রম করতঃ অন্যত্র যাওয়া মাহতাব ঝাঁকুণীকে নিতান্ত অসুবিধা ছিল । কয়েক ফ্রেন্স পশ্চিমে আর একটি নদী আছে । সেখানে সহসা নৌকা পাওয়ার সম্ভাবনা নাই । এদিকে নৌকা ব্যতীত কোন নিরাপদ স্থানে ঘাইবার সুবিধা নাই । কারণ তখন সুন্দরবনের এই অঞ্চল অসংখ্য নদী-প্রবাহে বিভক্ত ও বিদৌত ছিল । হেমন্তকাল হইতে বৈশাখের শেষ পর্যন্ত এই সমস্ত অরণ্য লোকের খুব চলাচল হইত । নল, বেত এবং নানাজাতীয় কাষ্ঠ আহরণের জন্য বহু লোকের সমাগম হইত । কিন্তু বৃষ্টিপাত শুরু ও বর্ষা সূচনা হইলেই এই সমস্ত অরণ্য জনমানব-শূন্য হইয়া পড়িত । মাহতাব ঝাঁকুণী হইলে, এই বনভূমি অতিক্রম করিয়া প্রতাপের রাজ্যের বাহিরে চলিয়া যাইতেন, কিন্তু অরুণাবতীর বিপদ ও ত্বেশ ভাবিয়া সেই কাননেই আবাস-কুটির রচনা করিলেন । বিশেষতঃ অরুণাবতী এবং মাহতাব ঝাঁকুণী প্রেম-উচ্ছাসিত হৃদয়,

কিছুদিন এই রমণীয় কাননাবাসে বাস করিবার জন্যও ব্যাকুল হইয়াছিল। নৌকায় রক্ষণ করিবার পাত্রাদি সমস্তই ছিল। প্রায় দুই মণ অত্যাঁকট চাউল, কিছু দাল, ঘৃত, লবণ ও অন্যান্য মশলা যাহা ছিল, তাহাতে দুইজনের দুই মাস চলিবার উপায় ছিল। বনে হরিণ, নানাজাতীয় খাদ্য-পক্ষী এবং সরোবরে মৎস্যের অভাব ছিল না। মাহতাব ঋণ প্রথম দিবসেই এক হরিণ শিকার করিয়া তাহার গোশত কাবাব করিয়া অরুণাবতী সহ পরমানন্দে উদরপূর্তি করিলেন।

অরুণাবতী মাহতাব ঋণ নিকট ইসলামের পবিত্র কালেমা পড়িয়া মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হইল। আপাততঃ আত্মরক্ষার জন্য উভয়েই সেই নিবিড় বনে বাস করিতে লাগিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

মহররম উৎসব

১৭ই আষাঢ় মহররম উৎসব। সেকালের মহররম উৎসব এক বিরাট বাপার, সমারোহকাণ্ড এবং চিত্ত-উন্মাদক বিষয় ছিল। মহররমের সে অসাধারণ আড়ম্বর, সে জাঁক-জমক, সে ক্রীড়া-কৌশল, সে লাঠি ও তলোয়ার খেলা, সে বাদ্যোদ্যম এবং যাবতীয় নর-নারীর মাতোয়ারা ভাবের উচ্ছ্বাস, সে বিরাট মিছিল, সে মর্সিয়া পাঠ, সে শোক প্রকাশ, সে দান খয়রাৎ, মহররমের দশদিন ব্যাপী সে সান্ত্বিক ভাব, বর্তমানে কল্পনা ও অনুমানের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেকালের হিন্দু-মুসলমান, ধনী-দরিদ্র, আলেম-জাহেল, সকলেই মহররম উৎসবে যোগদান করিতেন। তখন বাঙ্গালা দেশে অদূরদর্শী কাটমোস্তার আবির্ভাব ছিল না; সুতরাং মহররম উৎসব তখন বেদান্ত বলিয়া অভিহিত হইত না। মহররমের দশ দিবস কেবল মুসলমান নহে, হিন্দুরা পর্যন্ত পরম পবিত্রভাবে যাপন করিতেন। মহররমের দশ দিবস চোর চুরি করিত না, ডাকাত ডাকাতি করিত না, লম্পট লাম্পটা ত্যাগ করিত। ধনী ধনভাগর মুক্ত করিয়া গরীবের দুঃখ বিমোচন করিত। ক্ষুধার্ত অন্ন পাইত, তৃষ্ণার্ত সুমিষ্ট সরবৎ পাইত, বস্ত্রহীন বস্ত্র পাইত, প্রত্যেক লোক প্রত্যেকের নিকট সাদর সত্কাষণ, আদর আপ্যায়ন এবং প্রেমপূর্ণ ব্যবহার পাইত। আবাল-বৃদ্ধ-বগিতা সমস্ত কার্য ফেলিয়া মহররম উৎসবে যোগদান করিতেন। বীরপুরুষ অস্ত্রচালনায় নৈপুণ্য লাভ করিয়া বীরত্ব অর্জন করিবার, কাক ও শিল্পিগণ মহররমের সাজিয়া সংগঠনে আপনাদের সূক্ষ্ম কারুকার্যের সৌন্দর্য দেখাইবার জন্য মস্তিষ্ক পরিচালনা করিবার, বালক-বালিকাগণ 'কাসেদ' সাজিয়া আনন্দ উপভোগ করিবার, ধনী দান খয়রাতে বদান্যতা লাভ করিবার, দেশবাসী গ্রামবাসী পরস্পরের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া

বহুযুদ্ধে কাঁধে কাঁধে, দলপাওগণ বিভিন্ন দলের পরিচালনা করিয়া নেতৃত্ব অর্জন করিবার এবং সর্বোপরি সকলেই এই দশ দিন নির্মল আনন্দ, বিপুল উৎসাহ, সাময়িক উত্তেজনা, শত্রু-সংহারে উদ্দীপনা এবং মিত্রের প্রতি হিতৈষণা পোষণ করিবার সুবিধা পাইত। মহররমের দশ দিন সমারোহের দিন—উৎসাহের দিন এবং পুণ্যের দিন ছিল। সমগ্র দেশ বাসোদামে মুখরিত—শানাইয়ের কক্কণ-গীতিতে প্রাণ দ্রবীভূত, খেলোয়াড় এবং বীরপুরুষদিগের অস্ত্র সঞ্চালনে, হুঙ্কারে এবং সঙ্গী অভিযানে চতুর্দিক উৎসাহ আনন্দে পরিপূর্ণ—মেদিনী কম্পিত—দিগন্তল চমকিত হইত। মিছিলের বিপুল আড়ম্বরে, তাজিয়া ও দুলাদুলের বিচিত্র সজ্জার, কাক্কায়ে, পতাকার উড্ডয়নে, অশ্বারোহীদিগের অস্ত্র সঞ্চালনে কি চমৎকার দৃশ্যই না প্রতিভাত হইত! মর্স্যার কক্কণ তানে প্রাণের পর্দায় পর্দায় কি কক্কণ রসেরই না সজ্জার করিত! মহররমের দশ দিনে ইসলামের কি অতুল প্রভাবই প্রকাশ পাইত। মহাত্মা ইমাম হোসেনের অপূর্ব আত্মোৎসর্গ ও অদম্য স্বাধীনতা-শুভার উন্মাদনা গগনে গগনে পবনে পবনে নব জীবনের স্মৃতি ও উদ্যাস ছড়াইত। রোগী রোগশয্যা হইতে উঠিয়া বসিত, ভীকু সাহস পাইত, হতাশ ব্যক্তিও আশায় মাতিয়া উঠিত। উৎসাহিত আত্মরক্ষার ভাবে অনুপ্রাণিত হইত, বীরের হৃদয় শৌর্বে পূর্ণ হইত। মহররমের দশ দিন দিগ্বিজয়ী বিরাট বিশাল মুসলমানজাতির জুলন্ত ও জীবন্ত প্রভাব প্রকাশ পাইত। মুসলমান এই দশ দিন বাহুতে শক্তি, মস্তিষ্কে তেজঃ, হৃদয়ে উৎসাহ এবং মনে আনন্দ লাভ করিতেন। সমগ্র পৃথিবীতে মহররমের ন্যায় এমন শিক্ষাপ্রদ, এমন নির্দোষ, এমন উৎসাহজনক পর্ব আর নাই। অধ্য আমরা, মূর্খ আমরা, অদূরদর্শী আমরা, তাই মহররম-পর্ব দেশ হইতে উঠিয়া গেল। জীবন্ত ও বীরজাতির উৎসব কাপুরুষ, অলস, লক্ষ্যহীনদিগের নিকট আদৃত হইবে কেন? বীর-কুল-সূর্য অদম্যতেজা হজরত ইমাম হোসেনের অতুলনীয় আত্মোৎসর্গ ও স্বাধীনতা-শুভার জুলন্ত ও প্রাণপ্রদ অভিনয়, প্রাণহীন নীচচেতা স্বার্থান্বেষীদের ভালো লাগিবে কেন? পেচকের কাছে সূর্য, কাপুরুষের কাছে বীরত্ব, বধিরের কাছে সঙ্গীত, অলসের কাছে উৎসাহ কবে সমাদর লাভ করে? যখন বাঙ্গলায় মুসলমান ছিল, সে মুসলমানের প্রাণ ছিল—বুদ্ধি ছিল—জ্ঞান ছিল—তেজঃ ছিল—বীর্য ছিল; তখন মহররম উৎসবও ছিল। যাহা হউক, উৎসবের কথা বলিতেছিলাম, তাহাই বলি।*

মহররমের ১০ তারিখ—বাঙ্গলার পর্তুগীজদের শহর বাঙ্গার কম্পিত করিয়া মুহম্মদ ইমাম হোসেনের জয়ধ্বনি উচ্চারিত হইতেছে। ছিন্নহরের সঙ্গে সঙ্গেই সাদুল্লাপুর হইতে এক কোশ পশ্চিমে কল্লিত কারবালায় বিশাল মাঠে চতুর্দিক

* প্রায় বিংশ বৎসর পূর্বে মহররম উৎসবকে আবার প্রবল ও জীবন্ত করিয়া তুলিবার জন্য বহু বক্তৃতা ও প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। সুখের বিষয় গতদিন পথে হিন্দুদিগের সংগঠন শক্তির খাড়া বাইচা মোটা-মৌলবীরা এখন মহররমের সপক্ষে কঠোরা দিতেছেন। (৪র্থ সংস্করণ)

হইতে বিচিত্র পরিচ্ছদধারী সহস্র সহস্র লোক সমাগত হইতে লাগিল। নামাবর্ণের বিচিত্র সাজ-সজ্জায় শোভিত মনোহর কারুকার্যভূষিত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ তাবুত, অসংখ্য পতাকা, সমুজ্জ্বল আসা-সোটা, ভাবর বর্শা, তরবারি, খল্লর, গদা, তীর, ধনু, সড়কি, রায়বংশ, নামা শ্রেণীর লাঠি, খ, ছুরি, বানুটি প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রে স্বর্ণ-সজ্জা-শোভিত দুন্দুল, সহস্র সহস্র অশ্বারোহী ও শত শত হস্তি-শোভিত মিছিলের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ দল চতুর্দিক হইতে শ্রেণীবদ্ধ সমুজ্জ্বল অবস্থায় কারবালার ময়দানের দিকে ধাবিত হইল। অসংখ্য বাদ্য নিনাদে জনহুল কম্পিত এবং দিগ্ভ্রমল মুখরিত হইয়া উঠিল। পিপীলিকাশ্রেণীর ন্যায় জনশ্রেণী জন ও হুল আচ্ছন্ন করিয়া নানা পথে নৌকায় কারবালার ময়দানে ধাবিত হইল। জন-কোলাহল সাগর-কল্লোলবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। পঁচাত্তরটি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ মিছিলের দল শতাধিক তাবুত সহ বিভিন্ন গ্রাম হইতে বিভিন্ন পথে আসিয়া কারবালার ময়দানের বিভিন্ন প্রবেশ-পথ-মুখে অপেক্ষা করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে ইসা খাঁ মসনদ-ই-আলীর মহররমের বিপুল মিছিল আড়ম্বর, প্রতাপ ও অসাধারণ জাঁকজমকের সহিত কারবালার নিকটবর্তী হইল। ইসা খাঁর রৌপ্য-নির্মিত স্বর্ণ ও অসংখ্য মণি-মাণিক্য—খচিত সুচারুছত্র, অসংখ্য কিঙ্কণীজাল সমলঙ্কৃত পতাকা, দর্পণ এবং কৃত্রিম লতাপুষ্প এবং নানা বিচিত্র কারুকার্য-শোভিত ত্রিশ হস্ত পরিমিত উচ্চ, বিশাল ও মনোহর তাবুত মিছিলের অগ্রভাগে একশত ভারবাহী কক্ষে বাহিত হইল। ইসা খাঁর তাবুত দেখিবামাত্রই সেই বিপুল জনতা সমুদ্র-গর্জনে “হায়! হোসেন! হায় হোসেন!” রবে স্বাবর জসম চরাচর জুগৎ যেন কম্পিত করিয়া তুলিল। মধ্যাহ্ন ভাঙ্করের প্রথর কিরণে তাজিয়ার শোভা শতগুণে ঝলসিয়া উঠিল। তাজিয়ার পশ্চাতে দুই সহস্র অশ্বারোহী উর্দী পরিয়া বামহস্তে রক্তবর্ণ বিচিত্র পতাকা বিধূনন এবং দক্ষিণ করে উলঙ্গ কৃপাণ আফালন করিয়া গমন করিল। তাহার পশ্চাতে পঁচাত্তর সুসজ্জিত স্বর্ণ-আস্তরণ-বিমণ্ডিত হস্তী তালে তালে সমতা রক্ষা করিয়া পৃষ্ঠে ভীষণ ভাবর বর্শাধারী দুই দুই জন বীরপুরুষকে বহন করতঃ উপস্থিত হইল। তৎপশ্চাৎ দুইশত বাদ্যকর ঢাক, ঢোল, ডেরী, শানাই, পটহ, ডঙ্গা, তুরী, জগঝম্প, দফ, শিঙ্গা প্রভৃতি নানাবিধ বাদ্যে ভূতল খতল কম্পিত করিয়া কারবালায় উপস্থিত হইল। তাহার পশ্চাতে শত শত খেলোয়াড় লাঠি, তরবারি, বানুটি, সড়কির নানা প্রকার ক্রীড়া-কৌশল দেখাইতে দেখাইতে ভীমতেজে অগ্রসর হইল। তৎপর নানাজাতীয় পতাকা ও ঝাণ্ডা পুনরায় দেখা দিল। তৎপর কৃষ্ণবর্ণ অশ্বপৃষ্ঠে কৃষ্ণসজ্জায় শোভিত ভেঙ্কঃপুঞ্জ-মূর্তি মহাবীর ইসা খাঁ শত অশ্বারোহী-বেষ্টিত হইয়া অগ্রসর হইলেন। তৎপশ্চাতে স্তম্ভ পরিচ্ছদ-সমান্বৃত দক্ষিণ হস্তে শ্বেত এবং বাম হস্তে কৃষ্ণ চামর-শোভিত সহস্র যুবক পদব্রজে বিলাপ এবং ব্যজন করিতে করিতে আগমন করিল। তৎপর বিপুল জনতা গৈরিক-প্রবাহের ন্যায় চতুর্দিক হইতে

কারবালায় প্রবেশ করিল। ইসা খাঁও তাবুত কারবালায় প্রবেশ করিলে, অন্যান্য
 মিছিলের দল নানা পথে উদ্ভাস ও আনন্দে হুড়ার করিয়া কারবালায় প্রবেশ
 করিল। সুলতান মুসলমান-কুলমহিলাপণ ভাঙাঘে চড়িয়া সূত্র যবনিকায় আবৃত
 হইয়া উৎসব-ক্ষেত্রের এক পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন। অসংখ্য হিন্দু মহিলা লাল,
 নীল, সবুজ, বাসন্তী প্রভৃতি বর্ণের শাড়ী পরিয়া সিঁথিতে সিন্দূর মাখিয়া, মানাবিধ
 স্বর্ণ ও রৌপ্যালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া, ওজস্বী মল, মূপুরের কপু কপু কুমু কুমু এবং
 ঘন ঘন কণ কণ শব্দে নদী ও প্রান্তরবন্ধে আনন্দমিষ্ণ জাগাইয়া, রূপের ছটায়
 পথ আলোকিত করিয়া, কথার ঘটায় হাসির লহরী ফুলিয়া চঞ্চল শফরীর ন্যায়
 শ্রীলোকদিগের নির্দিষ্ট স্থানে জমায়েত হইল। মাঝাতাছা নদীর তীরে সহস্র সহস্র
 তরুণী নানাবর্ণের নিশাম উড়াইয়া দাঁড়ের আঘাতে জল কাটিয়া বাইচ দিতে
 লাগিল। অসংখ্য বালক-বালিকা এবং যুবক-যুবতীর উৎকৃষ্ট মুখকমলের আনন্দ-
 জ্যোতিঃতে মাঝাতাছার জল-প্রবাহ আলোকিত এবং চঞ্চল হইয়া উঠিল। নদীর
 পারেই ঘোড়দৌড়ের বাঁধা রাস্তা; তাহাতে শত শত ঘোড়া প্রতিযোগিতা করিয়া
 ধাবিত হইতে লাগিল। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা মহররমের শিনী স্বরূপ নানা
 শ্রেণীর মিঠান্ন পাইয়া আনন্দ করিতে লাগিল। খেলোয়াড়পণ শত শ দলে বিভক্ত
 হইয়া নানাপ্রকার ব্যায়াম, অস্ত্র-চালনা এবং ক্রীড়া-কৌশল প্রদর্শন করিতে
 লাগিল। বিশাল মরুদানে এক মহা সামরিক চিত্তোন্মাদকর দৃশ্য! অগণিত নরনারী
 সেই মহা উত্তেজনার ক্রীড়া-কৌশল দেখিয়া মুগ্ধ ও লুক হইতেছে। মুহূর্ত্তঃ
 সেই বিশাল জনতা "ইমাম হোসেন কি—ফতেহ" বলিয়া গগন-স্ববন কম্পিত
 করিতেছে। শত শত বালক জবুর হুড়ার ন্যায় লম্বা টুপী মাথায় পরিয়া ছুটাছুটি
 করিতেছে। থাকিয়া থাকিয়া "হার! হোসেন! হার! হোসেন!!" রবে প্রকৃতির
 বন্ধে শোকের দীর্ঘ লহরী ফুলিতেছে। ধনাঢ্য নরনারীপণ তাবুত লক্ষ্য করিয়া
 পুশ, লাজ, পরস ও কড়ি বর্ষণ করিতেছে। দরিদ্রেরা পরস ও কড়ি আশ্রহের
 সহিত কুড়াইয়া লইতেছে। কেহ কেহ রাশি রাশি বাতাসা বর্ষণ করিতেছে।
 বালকের দল সেই বাতাসার লোতে হড়া-ওড়ি, পাড়াপাড়ি করিতেছে। বিশাল
 মরুদানের চতুর্দিকে তাবুত লইয়া মিছিলসমূহ শ্রেণীবদ্ধভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।
 আর যথাস্থানে অবুত লোক লাঠি তরবারি প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র লইয়া কৃত্রিম হুড়
 করিতেছে। পারকপণ স্থানে স্থানে দল বাঁধিয়া ককশকণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে কারবালায়
 পুণ-সূর্য্যার কাহিনী সঙ্গীতালানে প্রকাশ করিতেছে। ধন্য ইমাম হোসেন! তুমি
 ধন্য! তোমার ন্যায় প্রাতঃনরুণীয় এবং চিরজীবিত আর কে? ধন্য তোমার
 দার্দ্র্য! ধন্য তোমার আত্মত্যাগ!! ধন্য তোমার স্বাধীনতা-প্রিয়তা! শত ধন্য
 তোমার অদমনীয় সাহস ও শৌর্ষ! তোমার ন্যায় বীর আর কে? তোমার ন্যায়
 অক্লান্তই বা আর কে? প্রজাতন্ত্র-প্রথা রক্ষা করিবার জন্য, ধর্ম ও ন্যায়ের রক্ষাদা
 রক্ষা করিবার জন্য তোমার ন্যায় আর কে আত্মত্যাগ করিবে? "মস্তুর সাধন

কিংবা শরীর পাতন" এ প্রতিজ্ঞা তোমার দ্বারা পূর্ণ হইয়াছে। পুণ্যভূমি আরবের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য, ইসলামের পবিত্রতম প্রজাতন্ত্র-প্রথা রক্ষা করিবার জন্য, মুক্তার করাল গ্রাস এবং নির্বাসন ও অত্যাচারের তীব্র নিষ্ঠুর যন্ত্রণাও তোমাকে বিচলিত করিতে পারে নাই। তুমি সবংশে ধ্বংস হইলে, তথাপি অন্যত্রের প্রভুত্বের নিকট মস্তক নত করিলে না। আজ অত্যাচারী এজিদের স্থান এবং তোমার স্থানের মধ্যে কি বিশাল ব্যবধান। তুমি আজ জনতের যাবতীয় নর-নারীর কণ্ঠে কীর্তিত, হৃদয়ে পূজিত। তুমি কারবালায় পরাজিত এবং নিহত হইয়াও আজ বিজয়ী এবং অমর।

মহররম উৎসব খুব জোরে চলিতে লাগিল। ক্রমে দিনমণি পশ্চিম-গগনদ্বায়ে দ্রুত নামিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে দিবসের শেষ-রশ্মি বৃক্ষের অশ্রুভাগে উদ্ভিত হইল। সন্ধ্যা সমাগমে দুই একটি তারকা নীলাকাশে ফুটিতে লাগিল। আর দেখিতে দেখিতে অমনি জল-স্থল সহসা প্রদীপ্ত করিয়া সহস্র সহস্র মশাল কারবালা ক্ষেত্রে জুলিয়া উঠিল। নানা বর্ণের মাহতাব, ডুবড়ী এবং হাওয়াই জুলিয়া জুলিয়া কারবালার হস্তাক্ষেত্রের দারুণ রোষানল উদ্দীর্ণ করিতে লাগিল। সহস্র সহস্র বোমের আওয়াজে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। সহস্র সহস্র আতনের বানুটি খেলোয়াড়দিগের হস্তে অদ্ভুত কৌশলে ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। কি অপূর্ব দৃশ্য! শান্তরময় মনুষ্য! শান্তরময় অনলক্রীড়া! নদীগর্ভে অনল-ক্রীড়া! আকাশে অনল-ক্রীড়া! জলে-স্থলে-অস্তরীক্ষে সর্বত্র বিপুল উৎসাহ। বিপুল আনন্দ!! বিপুল কোলাহল!! বিপুল স্মৃতি!!!

সাদুয়াপুর মিত্রদের বাড়ী হইতেও বিপুল সমারোহে তাজিয়ার মিছিল বাহির হইয়া কারবালায় আসিয়াছিল। পাঠকগণ! অধুনা ইহা পাঠ করিয়া বিম্বিত হইবেন। কিন্তু যে-সময়ের কথা বর্ণিত হইতেছে, তখনকার ঘটনা ইহাই ছিল। বাদশার জাতি মুসলমানের সকল কার্যেই হিন্দুর শ্রদ্ধা এবং সহানুভূতি ছিল। মুসলমানের মসজিদ এবং পীরের দরগা দেখিলে সকল হিন্দুই মাথা নোয়াইত, মুসলমানের ঈদ পর্বেও হিন্দুরা মুসলমানদিগকে পান, আতর এবং মিষ্টান্ন উপহার দিত। মুসলমানের পোষাক পরিচা হিন্দু তখন আত্মবিমান বোধ করিত। মহররম পর্ব তো হিন্দুরা প্রাণের সহিত বরণ করিয়া লইয়াছিল। আজিও বাংলার বাহিরে বিহার এবং হিন্দুস্তানের হিন্দুরা মহররম পর্বে মুসলমানের ন্যায়ই মাতিয়া উঠে। অনেক রাজ-রাজ্যদানের বাড়িতে দফতরমত তাবুত উঠে এবং মিছিল বাহির হয়। আজিও হিন্দুস্তানে মহররম পর্বে হিন্দু-মুসলমানে গভীর একপ্রাণতা পরিলক্ষিত হয়।*

* অধুনা হিন্দু-মুসলমান বিরোধের কালে হিন্দুসভা হইতে হিন্দুদের কতারা জাতির কলে হিন্দুস্তানের হিন্দুরা ও মহররম হইতে সরিয়া পড়িতেছেন। (৪র্থ সংস্করণ)

সাদুল্লাপুর খিয়ারের বাড়ি হইতে খুলপথে মিছিল আসিয়াছিল। আর জলপথে দুইখানি সুসজ্জিত পিনীসে বাড়ীর গিন্নি ও বধূরা, অদ্যখানিতে স্বর্ণময়ী, মালতী এবং অন্যান্য বালক-বালিকা। যাত্রারা নৌকা বাইচ দিতেছিল। বরকন্দাজেরা দাঁড়ি-সোকে ভা দিয়া চাল-ডালওয়ার লইয়া পাহারা দিতেছিল। হেমদাকান্ত এবং অন্যান্য দুবকেরা অস্বাভাবিক আসিয়াছিল। কাপালিক ঠাকুর রক্তবর্ণ চেলি পরিয়া কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা কাটিয়া স্বর্ণময়ীদের নৌকায় চড়িয়া মহররমের উৎসব দেখিতেছিল। নদীগর্ভে একস্থানে ইসা খাঁর কয়েকখানি রণতরী নৌযুদ্ধের অভিনয় করিতেছিল। স্বর্ণময়ী সেই অভিনয়ই সান্নিহবেশে পর্যবেক্ষণ করিতেছিল।

ইসা খাঁ যে স্বর্ণময়ীর সহিত মহররম উৎসবের দিন দেখা করিতে চাহিয়া ছিলেন, হেমদাকান্ত তাহা বিলক্ষণ অবগত ছিল। কারণ ইহা গোপনীয় বিষয় ছিল না। দুর্মতি হেমদাকান্ত এক্ষণে এই ছলে স্বর্ণকে হরণ করিবার জন্য একটা কৌশল বিস্তার করিল। হেমদা নৌকার পাহারাওয়াল বরকন্দাজদিগকে সহসা ডাকিয়া কয়েকটি ঘোড়া বন্ধ করিবার ভার তাহাদিগকে দিয়া, “আমি আসছি, তোমরা অপেক্ষা কর” বলিয়া সন্দের কয়েকটি কাশী-নিবাসী আগন্তুক বন্ধু লইয়া স্বর্ণের নৌকায় আসিয়া উপস্থিত হইল এবং অত্যন্ত ব্যস্ততা সহকারে মালতীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, “মালতী! তুমি এবং অন্যান্য সকলে নেমে অন্য নৌকায় উঠ, এ নৌকা তাজিয়া-ঘাটে নিয়ে যেতে হবে। তথায় নবাব সাহেব স্বর্ণকে দেখবার জন্য অপেক্ষা করছেন।” হেমদাকে বাটির ছেলেমেয়েরা অত্যন্ত ভয় করিত। সুতরাং হেমদা বলিবা মাত্রই তাহারা অন্য নৌকায় তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল। অস্তিরাম স্বামী নৌকা হইতে নামিয়া ডাকায় উঠিল। মাঝি-মাল্লারা পিনীস তাড়াতাড়ি বাহিয়া তাজিয়াঘাটা পানে ছুটিল। হেমদার সন্দের ছদ্মবেশধারী কতিপয় ব্যক্তি নৌকায় উঠিয়া পড়িল। “ইহারা ইসা খাঁর লোক, স্বর্ণকে লইতে আসিয়াছে,” মাঝি-মাল্লারা ইহাই মনে করিল।

হেমদা এবং স্বামীজী দুইজন, জনতার মধ্যে মিশিয়া নানাস্থানে ক্রীড়া-কৌতুক এবং আভসবাজী দেখিতে লাগিল। অনেক বিলম্বে তাহারা বরকন্দাজদিগের নিকট উপস্থিত হইল। উপস্থিত হইয়াই তাড়াতাড়ি বলিল, “যাও, যাও, তোমলোগ জলদি তাজিয়া-ঘাটামে কিস্তীকে হেফাজত মে হও। ওঁহা নবাব সাহেবকা সাথ মোলাকাত করনেকে লিয়ে রাজকুন্ডারী তশরিক লে পেয়ি হায়। জলদি ওঁহা যানা।” বরকন্দাজেরা “হুজুর”, বলিয়া তাজিয়া-ঘাটের দিকে দৌড়াইল।

অস্তিরাম স্বামী পূর্বেই মাঝি এবং মাল্লাদিগকে একটি প্রথম ঊষধ পানের সহিত মিশাইয়া খাইতে দিয়াছিলেন যে, তাহারা তাজিয়া-ঘাটার নৌকা লইয়া যাইয়া একটু বিশ্রাম করিতেই বেহন এবং সজ্জাশূন্য হইয়া পড়িল। তখন সেই ছদ্মবেশী ওজর দল পাল তুলিয়া মাঝাজাহা নদীর পশ্চিমগামী একটা ক্ষুদ্র শাখার দিকে নৌকা চলাইল। নৌকা ডরা-পালে উড়িয়া চলিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

যুদ্ধ

রাত্রি অর্ধ প্রহরের পর মহব্রহ্ম-উৎসব শেষ হইলে, নবাব ঈসা খাঁ মসনদ-ই-আলী যখন জগদানন্দ মিত্রকে ডাকাইয়া স্বর্ণময়ীর সহিত দেখা করিতে চাহিলেন, তখন চারিদিকে তাজিয়া-ঘাটায় স্বর্ণের অনুসন্ধান হইল। কিন্তু স্বর্ণ এবং তাঁহার নৌকার কোনও খোঁজ-খবর কোথায়ও পাওয়া গেল না। সকলেই মহাব্যস্ত এবং উদ্ভিগ্ন হইয়া উঠিল। চতুর্দিকে বহু নৌকা, লোকজন এবং গুপ্তচর প্রেরিত হইল। শ্রীপুর হইতে রাজা কেদার রায় চতুর্দিকে বহু গুপ্তচর ও সন্ধানী পাঠাইলেন। নবাব ঈসা খাঁও অনেক লোকজন পাঠাইলেন। হেমদাকান্ত তাঁহার গুরু অভিযাম স্বামীকে লইয়া এই সুযোগে স্বর্ণময়ীকে খুঁজিবার ছলে সাদুতাপুর পরিভ্রমণ করিল। স্বর্ণময়ীর পিনীসের মাঝি-মান্নাদিগকে তিন দিন পরে সংজ্ঞা-শূন্য অবস্থায় এক জঙ্গলের ভিতর পাওয়া গেল। নানা ঔষধ প্রয়োগে তাহাদের চৈতন্যবিধান করা হইল বটে, কিন্তু তাহারা তাজিয়াঘাটে উপস্থিত হইবার পরের কোনো ঘটনাই বলিতে পারিল না। কতিপয় ভদ্রলোক ঈসা খাঁর অনুচররূপে হেমদার নিকট উপস্থিত হইয়া তাজিয়া-ঘাটে নৌকা লইতে আসে, হেমদাকান্তের আদেশেই তাহারা নৌকা লইয়া তাজিয়া ঘাটে উপস্থিত হয়। এই পর্যন্ত মাঝি-মান্নাদিগের নিকট সন্ধান পাওয়া গেল। যে সন্ধান পাওয়া গেল, তাহা হইতে সকলেই স্থির সিদ্ধান্ত করিল যে, রাজা প্রতাপাদিত্যের লোকেরাই ঔষধ প্রয়োগে নৌকা-বাহকদিগের সংজ্ঞা হরণ করিয়া স্বর্ণময়ীকে হরণ করিয়াছে। প্রতাপাদিত্যের রাজধানী যশোর নগরে বহু সুদক্ষ চর প্রেরিত হইল, কিন্তু স্বর্ণময়ীর কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। কেদার রায়, তাঁহার ভ্রাতা চাঁদ রায়, জগদানন্দ মিত্র এবং ঈসা খাঁ সকলেই স্বর্ণময়ীর জন্য বিষম ব্যাকুল ও উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। সকলে মিলিয়া প্রতাপের রাজ্য আক্রমণ এবং প্রতাপের ধ্বংস সাধনের পরামর্শ করিতে লাগিলেন। প্রতাপের বক্ষের উপর মৃত্যুর শূল বসাইতে না পারিলে স্বর্ণময়ীর যে কোন সন্ধানই পাওয়া যাইবে না ইহাই সকলের বিশ্বাস। ঈসা খাঁ তাঁহার হৃদয়-আকাশের প্রেম-চন্দ্রমা, তাঁহার জীবন-বসন্তের লোলাপ-মঞ্জরী, যৌবন-উষার কোকিল-কাকলী, মানস-সরসীর প্রীতির কমল, অনুরাগ-বীণার মোহন মূর্ছনা, চিরসাধের স্বর্ণময়ীর জন্য একান্ত বিচলিত হইয়া উঠিলেন। তিনি কি করিবেন, তদ্বিষয়ে একান্ত উদ্ভিগ্ন হইয়া পড়িলেন। এদিকে কেদার রায় কন্যা-শোকে একান্ত বিচলিত এবং অভিভূত হইয়া ঈসা খাঁর সাহায্যে প্রতাপের রাজ্য আক্রমণের সংকল্প করিলেন। ঈসা খাঁও এ বিষয়ে অনুমোদন করিলেন।

প্রথমতঃ প্রতাপকে ৩য় প্রদর্শনের দ্বারা স্বর্ণময়ীর উদ্ধার মানসে এক পত্র দেওয়া হইল : তাহাতে লেখা হইল যে, পঞপ্রাণি মাত্র স্বর্ণময়ীকে প্রত্যর্পণ না করিলে, তাহার রাজ্য ও জীবন নিরাপদ হইবে না। প্রতাপাদিত্য এই পত্র পাইয়া তেলেবেওনে জ্বলিয়া উঠিলেন। প্রতাপাদিত্য স্বর্ণময়ীর অপহরণের বিষয় কিছুই অবগত ছিলেন না। অকারণে তাহার উপর স্বর্ণময়ী-হরণের দোষারোপ, অধিকন্তু রাজ্য ও জীবন বিনাশের ভীতি-প্রদর্শনে প্রতাপ ক্রোধে ও অপমানে গর্জিয়া উঠিলেন। প্রতাপ অত্যন্ত তীব্র ও অপমানজনক ভাষায় কেদার রায়কে প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। সে প্রত্যুত্তরের তীব্র-তীক্ষ্ণ বাক্য-শেল রাজা কেদার রায় এবং নবাব ইসা খাঁকে তখন বিষম ব্যথিত ও উত্তেজিত করিয়া তুলিল। তখন উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া দাঁড়াইল।

প্রতাপাদিত্য সদ্ব্যুতাপূর্বক একদল পর্ভুগীজ গোলন্দাজ এবং পাঁচ হাজার পদাতিক ও তিন শত অশ্বরোহী সৈন্য লইয়া সহস্রাধিক নৌকা সাহায্যে নদীপথে কেদার রায়ের রাজ্যে অতর্কিত অভিযান করিলেন। কেদার রায়ের রাজ্যের প্রান্তপাল সৈন্যগণ প্রবল-প্রতাপ প্রতাপাদিত্যের সৈন্যদলকে প্রতিরোধ করিতে পারিল না। প্রতাপ শাহবাজপুর হইতে ফুলপথে অতি দ্রুতবেগে বঙ্ক-বিষ্ণু-বিন্দুৎ-সকুল ঝটিকাবর্তের ন্যায় রাজা কেদার রায়ের রাজধানী শ্রীপুরাভিমুখে অশ্ব ধাবিত করিলেন। সহসা প্রতাপের এতাদৃশ অগ্রগতি শ্রবণে কেদার রায় প্রথমতঃ বিচলিত, পরে রাজধানী শ্রীপুরের সমস্ত সৈন্য-সামন্ত বরকন্দাজ ও লাঠিয়াল লইয়া প্রবল তেজে প্রতাপাদিত্যের অগ্রগতি রুদ্ধ করিলেন এবং দূত পাঠাইয়া ইসা খাঁর নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। তিন দিবস অবিরাম যুদ্ধের পরে রাজা কেদার রায় পরাস্ত হইয়া শ্রীপুরের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। প্রতাপাদিত্য, গোলন্দাজ সৈন্যের সাহায্যে গোলাবর্ষণ করিয়া দুর্গপ্রাকার ভগ্ন করিতে দুর্জয় চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সপ্তম দিবস প্রাতে ইসা খাঁ চারি হাজার পদাতিক, পাঁচ শত অশ্বরোহী সৈন্য লইয়া শ্রীপুরের নিকটবর্তী হইলেন। প্রতাপাদিত্যের খ্যাতনামা সেনাপতি কালিদাস ঢালী সাত হাজার পদাতিক এবং নয়শত অশ্বরোহী সৈন্য লইয়া উদয়গড় নামক স্থানে ব্যূহ-বিন্যাস করিয়া ইসা খাঁর সেনাদলের উপর আপত্তিত হইলেন। সন্ধ্যা পর্যন্ত তীষণভাবে যুদ্ধ চলিল। লাঠি, তরবারি, বন্দুক ও তীর সমানভাবে সংহার-কার্য সাধন করিল! উভয় সেনাদল মরিয়া হইয়া যুদ্ধিতে লাগিল। ইসা খাঁ বিপুল প্রতাপে যুদ্ধ করিয়া প্রতাপ-বাহিনীকে পর্যুদস্ত ও বিচ্ছিন্ন করতঃ গভীর হৃদয়ে দিগ্ভয় চমকিত করিয়া শ্রীপুরের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। কালিদাস-পরিচালিত সেনাদল যাহাতে পুনরায় একত্র হইয়া পশ্চাদিক হইতে আক্রমণ করিতে না পারে, তজন্য আজিম খাঁ শূর নামক জনৈক সুদক্ষ বীর-পুরুষের অধীনে আড়াইশত অশ্বরোহী সৈন্য রাখিয়া নিজে ঝঞ্ঝা-গতিতে শ্রীপুরের দিকে ধাবিত হইলেন। সমস্ত দিন

ভীষণভাবে যুদ্ধ করিয়া সন্ধ্যার প্রাকালে উদয়গড় হইতে পৃথক করিয়া যাত্রি এক প্রহরের মধ্যে পাঁচ ফোশ দূরবর্তী শ্রীপুরে উপস্থিত হইলেন। তিনি শ্রীপুরের নিকটবর্তী হইয়া বিশেষে রণক্রান্ত সৈন্যাদিকে আহার ও বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করিতে আদেশ দিলেন। চতুর্দিকে চৌকি স্থাপন করিয়া যত্ন সতর্কভাবে সমস্ত সেনার তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। কিঞ্চিৎ যাত্রি থাকিতেই দুইশত অশ্বারোহী এবং এক সহস্র পদাতিক লইয়া বজ্রের ন্যায় ভীষণ গতিতে শত্রু-সেনার উপরে পতিত হইবার জন্য কূচ করিলেন। অবশিষ্ট সৈন্যদলকে সমর-সঙ্কায় প্রস্তুত এবং আহ্বানমাত্রেই ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় শত্রুকূলে আপতিত হইবার জন্য আদেশ করিয়া গেলেন।

ষাটশ পরিচ্ছেদ

গুরু-শিষ্য

কাপালিককুল-চূড়ামণি অভিরাম স্বামী এবং পাশাশয় হেমদাকান্ত স্বর্গকে খুঁজিবার ছল করিয়া তাহাদের আরক্ত কার্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য নৌকাযোগে সাদুল্লাপুর পরিত্যাগ করিল। হেমদাকান্তের সহকারী গুণ্ডার দল স্বর্গকে লইয়া পূর্ব পরামর্শানুসারে ইদিলপুরের নিবিড় জঙ্গলে আশ্রয় লইয়াছিল। তখন স্বর্গকে লইয়া নৌকাপথে বেশীদূর ভ্রমণ করিলে, পাছে কেহ কোন সন্ধান পায়, এজন্য স্বামী ও শিষ্য ইদিলপুরের নির্জন কাননেই আপনাদের পাপ অভিসন্ধি সম্পাদনের নিরাপদ আশ্রয় মনে করিয়াছিল। গুণ্ডার দল স্বর্গময়ীকে লইয়া সেই কাননাভ্যন্তরে কুটীর রচনা করিয়া বাস করিতেছিল। তিন দিবস পরেই পাশাত্মা অভিরাম স্বামী ও হেমদাকান্ত সেই কাননাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। তাহারা রোক্তদামানা এবং ক্ষিপ্তমনা স্বর্গকে নানাপ্রকারে সাধুনা প্রদান করিতে এবং প্রবোধ দিতে ও পাপ-প্রলোভনে ভুলাইতে চেষ্টা করিল। স্বর্গময়ী তাহাদের বাক্য শ্রবণে যার-পর-নাই মর্মপীড়িতা হইল। সে কখন ক্রন্দন, কখন তর্জন-গর্জন করিয়া তাহাকে ফিরাইয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল। কিন্তু “চোরা না গুনে ধর্মের কাহিনী”। স্বর্গের মানসিক উত্তেজনা এবং উৎক্লিষ্ট-ভাব দর্শনে স্বামী-শিষ্য মিলিয়া তাহাকে কঠোরভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিল। স্বর্গ যখন দেখিল, তাহার কষ্ট ও নির্যাতন চরমে উঠিয়াছে এবং অল্পদিনের মধ্যে পাপ-সংকল্পে সম্মত না হইলে, পাষাণের বল-প্রকাশেও কুণ্ঠিত হইবে না, তখন সে এই বিষম বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য এক কৌশলজাল বিস্তারের কল্পনা করিতে লাগিল। মাকড়সা যেমন আগ্রয়শূন্য হইলেই নিজের দেহের ভিতর হইতে সূত্র নির্গত করিয়া জাল নির্মাণ পূর্বক আপনাকে আশ্রয়-সংস্থিত করে, মানুষও তেমনি বিপদে পড়িলেই তাহার

অস্তবহু আত্মা তাহাকে নূতন বুদ্ধি-কৌশল উদ্ভাবনের কল্পনায় মাতাইয়া তোলে । স্বর্ণ দেখিল, অভিরাম স্বামীও তাহাতে মুগ্ধ এবং লুক্ক । হেমদা এবং স্বামীজি উভয়েই তাহার শিকার । সুতরাং আপাততঃ একজনকে ভালোবাসার ছলনায় মুগ্ধ করিতে পারিলেই অন্যের সহিত তাহার বিরোধ উপস্থিত অনিবার্য । উভয়ের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত করিতে পারিলে, হয়ত তাহার উদ্ধার হইবার কোন পথ খুলিয়া যাইতে পারে । এই সংকল্পে স্থিরসিদ্ধান্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে স্বামীজি এবং হেমদাকান্তের সহিত কথোপকথন করিতে ও স্বামীজির প্রতি একটু বেশী ভালোবাসা দেখাইতে লাগিল । নানাপ্রকার উৎকৃষ্ট খাদ্য এবং দুষ্প্রাপ্য জিনিসের ফরমায়েস করিতে লাগিল । অন্যান্য লোক থাকিলে তাহার সঙ্কোচ ও লজ্জা বোধ হয়, এই অস্থিলায় সমস্ত লোককে বিদায় করিয়া দেওয়াইল । এক্ষণে এই নিবিড় অরণ্যে স্বামীজি, হেমদা এবং স্বর্ণ ব্যতীত আর কেহই রহিল না ।

স্বর্ণকে লইয়া প্রথম প্রথম স্বামীজি ও শিষ্যের মধ্যে ঈর্ষা ও বিদ্বেষের সৃষ্টি, তৎপর অত্যাচলকাল মধ্যেই কলহ হইতে লাগিল । স্বর্ণ চালাকী করিয়া সে কলহে স্বামীজির পক্ষ অবলম্বন করিতে লাগিল । শুধু তাই নয়, স্বামীজি সম্মুখে আসিলেই সে আনন্দ প্রকাশ করে, কিন্তু হেমদাকে দেখিলেই সে লজ্জা ও ঘৃণায় ঘোমটা টানিয়া বসে । ইহাতে হেমদার দিনদিন স্বামীজির প্রতি জাতক্রোধ হইতে লাগিল । এই সময় স্বর্ণময়ী একদিন সুযোগ বুঝিয়া, হেমদা কার্যোপলক্ষে একটু দূরে গেলে পর, স্বামীজিকে ডাকিয়া বলিল, “আমি যখন ভাগ্য-দোষে অকূলে পতিত হয়েছি, তখন কূলে উঠবার আর আশাও নাই, ইচ্ছাও নাই । কূলে উঠলে লোক-গঞ্জনায়ে গলায় কলসী বেঁধে ডুবে মরতে হবে । সুতরাং মনে করেছি, অকূলে থেকেই একটা কূলে আশ্রয় নেব । দুই কূল তো আশ্রয় করতে পারব না । একটা মন দু'জনকে দিতে পারব না । গুরু থাকতে লঘুকে বরণ করতে পারব না । কিন্তু যেরূপ ব্যাপার দেখছি, তাতে বোধ হয়, শিষ্যই অবিলম্বে আমাকে উদ্ধিষ্ট করবে । কিন্তু সেরূপ হলে নিশ্চয় জেনে রেখ, আমি আত্মহত্যা করব । তোমাকেই স্বী-হত্যার পাতকভাগী হতে হবে । ঠাকুর! যদি আমার জীবনে তোমার মমতা থাকে, তা হলে আমাকে নিয়ে পলায়ন কর ।”

অনলম্পর্শে ভুবড়ীবাজি যেমন অসংখ্য স্কুলিন্সে প্রবলভাবে জুলিয়া উঠে, স্বর্ণময়ীর অনুরাগপূর্ণ হিত-পরামর্শে অভিরাম স্বামীর হৃদয় আশা, আনন্দ ও উৎসাহে তেমনি নাচিয়া উঠিল ।

কুকুর যেমন প্রভুহস্ত হইতে মাংসখণ্ড পাইবার সম্ভাবনায় আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠে, কাম-কুকুর অভিরাম স্বামীও স্বর্ণময়ীর পরামর্শে তেমনি আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল । তাহার হৃদয়-উদ্যানের ওহ কুলে সহস্র লক্ষ কুসুম ফুটিয়া উঠিল! স্বর্ণ-রাজ্য তাহার চরণতলে গড়াগড়ি যাইতে লাগিল । নিরাশার যক্ষ-সৈকত বিপ্রাবিত করিয়া সুও প্রেমের ক্ষুদ্র নির্ঝর, যাহা কেবল তাহার হৃদয়ের

অতি নিভৃত কোণে লুকায়িত ছিল—প্রবল তরঙ্গ-ভঙ্গে আবর্ত রচিয়া ফুলিয়া-ফাঁপিয়া সাগর-সঙ্গমে ছুটিয়া চলিল। পরামর্শ ঠিক হইয়া গেল। পর দিবস রাত্রি থাকিতেই হেমদাকে নিরাশার অন্ধকারে নিক্ষেপ করিয়া সেই কানন-পথেই পলায়ন করিতে হইবে।

রাত্রি এক প্রহর থাকিতেই অভিরাম স্বামী শয্যা ত্যাগ করিয়া স্বর্ণকে লইয়া সেই কাননের অন্ধকার-পথে দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। নৌকাপথে অন্য কোন দিকে পলায়ন করিলে, হেমদা তাহার সন্ধান পাইতে পারে, এই আশঙ্কায় সেই কাননের দক্ষিণভাগে অগ্রসর হইতে লাগিল। কাপালিক চিন্তা করিল যে, আমরা যে আশ্রম ত্যাগ করিয়া পুনরায় এই কাননের অন্যত্র আশ্রয় লইব, হেমদা তাহা কল্পনাও করিতে পারিবে না।

এদিকে হেমদা যথাসময়ে গাত্রোথান করিয়া স্বর্ণ ও অভিরাম স্বামীকে দেখিতে না পাইয়া অত্যন্ত ব্যস্তসমস্ত হইয়া উঠিল। তাহার বকের স্পন্দন যেন ধামিয়া যাইতে লাগিল। সে চঞ্চল পদে এদিক-ওদিক খুঁজিয়া দুইজনের একজনকেও দেখিতে পাইল না। শেষে অনুসন্ধান করিয়া দেখিল, উভয়ের বস্ত্র, অলঙ্কার ও অন্যান্য মূল্যবান হালকা জিনিস-পত্র কিছুই নাই। তখন হেমদা দুঃখে ও ক্ষোভে প্রজ্বলিতপ্রায় হইয়া উঠিল। অভিরাম স্বামী তাহার চক্ষে প্রকট শয়তান বলিয়া প্রতিভাত হইতে লাগিল। তাহার প্রতিহিংসাবহি একেবারে নভঃস্পর্শী হইয়া উঠিল। তাহাকে অনন্তকাল নরকানলে দগ্ধ করিলে এবং কুটী কুটী করিয়া কাটিলেও তাহার ক্রোধ কিছুতেই শান্ত হইবে না।

স্বর্ণ এবং স্বামীজি কোন পথে কোথায় পলায়ন করিয়াছে, তন্নির্ধারণই তাহার একমাত্র চিন্তার বিষয়ীভূত হইয়া উঠিল। সে অনেক ভাবিয়া শেষে কানন-পথেই উড়ো-পাখির পশ্চাদ্ধাবিত হইল। স্বামী এবং স্বর্ণ যে-পথে পলায়ন করিয়াছিল, সে-পথে অনেক লতা ও গাছের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা ভগ্ন এবং নত হইয়া পড়িয়াছিল। স্থানে স্থানে বর্ষা-বারি-পুষ্ট ঘাসের মাথা দলিত হইয়াছিল। হেমদা বহু কষ্টে সেই সমস্ত চিহ্নের অনুসরণ করিয়া দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল।

অভিরাম স্বামী এবং স্বর্ণময়ী দ্রুতপদে দক্ষিণাভিমুখে ক্রমাগত চলিতে ছিল। বেলা দুই প্রহরের সময় তাহারা ক্ষুৎপিপাসায় অত্যন্ত কাতর হইয়া এক স্থানে বিশ্রাম করিতে লাগিল। সঙ্গে যে যৎসামান্য ফল-মূল ছিল, স্বামীজি পরম যত্নে তাহা স্বর্ণকে খাওয়াইতে লাগিল। যে স্থানে বসিয়া তাহারা জলযোগ করিতেছিল, সে স্থান মাহতাব খাঁর আশ্রম হইতে বেশী দূর নহে। স্বর্ণ এবং অভিরাম স্বামী জলযোগান্তে সে স্থান হইতে প্রায় উঠিবার উপক্রম করিতেছিল, এমন সময়ে অপকৃত-লিকার শার্দূলের ন্যায় ক্রুদ্ধ ও রুদ্রমূর্তি হেমদাকান্ত পশ্চাদ্দেশ হইতে আসিয়া একসঙ্গে অভিরাম স্বামীর কন্ধদেশে ভীষণ ঋ প্রহার করিল। অভিরাম স্বামী বিকট চীৎকার করতঃ বনভূমি বিকম্পিত করিয়া দশ হাত দূরে যাইয়া

ভূতলে পতিত হইল। তাহার বিকট রক্তদেশ হইতে অঙ্গপ্রথারে রক্ত পড়িতে লাগিল। হেমদা রোষাবেশে কম্পিত এবং শ্রমীণ হইয়া অত্যন্ত তীব্র কটুক্তিতে অভিরাম স্বামী ও স্বর্ণময়ীর মর্মবিদ্ধ করিতে লাগিল। দারুণ ঘৃণায় অভিরাম স্বামীর মস্তকে তরুণ পদাঘাত করিল। অতঃপর বিকট গর্জন করিয়া রক্তবিক্রিত-শানিত-খ উদ্যত করতঃ স্বর্ণকে বলিল, “বল, এখন তোর মতলব কি? এই বলিয়া নিতান্ত অকথা এবং অশ্রাব্য ভাষায় স্বর্ণকে গালাগালি করিতে লাগিল। স্বর্ণ তখন লজ্জা, রোষ এবং ক্ষোভে দলিতা ফণিনীর ন্যায়, সমুদ্রা সিংহীৰ ন্যায়, কুকুরাক্রান্ত নিকুপায় মার্জারের ন্যায়,—বৃক্ভাড়িত মহিষীর ন্যায় নিতান্ত শব্দ মূর্তি ধারণা করিল। বন-পথে আসাকালীন অভিরাম স্বামী একখানি তলওয়ার লইয়া আসিয়াছিল। স্বর্ণময়ী মুহূর্ত মধ্যে ভূতল হইতে সে তরবারি উত্তোলন করিয়া সংহারিণী-মূর্তিতে—দৃষ্টিতে অগ্নিকণা বর্ষণ করিয়া বলিল, “পাপাত্মা হেমদা! আয় দেখি তোর কত শক্তি ও সাহস! তোর পাপ-বাসনা অদ্য রক্তধারে নির্বাপিত করব।” এই বলিয়া বিপন্থা সতী তাহার গ্রীবামূল লক্ষ্য করিয়া বিদ্যুৎবেগে তরবারি প্রহার করিল। পলকে হেমদাকান্ত ইষৎ পশ্চাতে হঠিয়া গেল, তাহাকে অসি গ্রীবামূলে না লাগিয়া বাহুমূলে লাগিয়া অনেকটা কাটিয়া গেল। হেমদা তখন স্বর্ণময়ীর প্রেমে সম্পূর্ণ হতাল হইয়া দারুণ প্রতিহিংসায় ঋ প্রহারার্থে উদ্যত হইল। এমন সময় অভিরাম স্বামীর বিকট চীৎকারে উদ্ভিগ্ন ও কৌতূহলী হইয়া মাহতাব বা উথায় উপস্থিত হইয়া “কি কর, কি কর” বলিয়া হেমদার উপরে ভীষণ ব্যাঘ্রের ন্যায় পতিত হইলেন এবং তরবারির আঘাতে হেমদার হস্তের ঋ মাটিতে ফেলিয়া দিলেন। অতঃপর মুহূর্ত মধ্যে হেমদার বক্ষে এক প্রচণ্ড পদাঘাত করিয়া তাহাকে ভূতলশায়ী এবং বন্দী করিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

উপযুক্ত প্রতিকূল

উষার শুভ হাসি পূর্ব-গগনে প্রতিভাত হইবার পূর্বেই—বিহগ-কণ্ঠে ললিত কাকলী উদ্গীত হইবার বহু পূর্বেই ইসা বা মসনদ-ই-আলী সহস্র পদাতি, দুইশত সাদি লইয়া বস্ত্র-প্রতাপে, প্রতাপের সৈন্যের উপর পতিত হইলেন। প্রতাপ-সৈন্য সহস্রা পশ্চাদ্ধিক হইতে আক্রান্ত হইয়া নিতান্ত ভীত, চকিত এবং নিস্তেজ হইয়া পড়িল। অনবরত অন্ত্রাঘাতে তাহার কদলী তরুর ন্যায় পতিত হইতে লাগিল। উষালোক প্রকাশমান হইলে প্রতাপের সৈন্যদল ইসা বাঁর সেনাবল নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর দর্শনে অতিমাত্র সাহসী হইয়া বিষম বিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিল। এদিকে ঠিক সেই সময়ে ইসা বাঁর অবশিষ্ট বাহিনী ভীষণ

ঝঞ্ঝাবাত্যার ন্যায় বিদ্যুৎসেজে মণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া মহা সংহার আরম্ভ করিল। কেদার রায়ের সৈন্যগণও দুর্গ হইতে নির্গত হইয়া তীক্ষ্ণ ভেজে প্রতাপ-সৈন্যকে আক্রমণ করিল। ইসা খাঁর গোলন্দাজ সেনা অব্যর্থ লক্ষ্যে প্রতাপের পর্তুগীজ সৈন্য-পরিচালিত তোপগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিল। বহু পর্তুগীজ আহত ও নিহত হইল। অসংখ্য তরবারি সঞ্চালনে মনে হইল যেন পগনমণ্ডলে অসংখ্য বিদ্যুৎ ক্রীড়া করিতেছে। বৈশাখের ঝটিকা যেমন মেঘদলকে বিচ্ছিন্ন করে, ইসা খাঁর প্রবল প্রতাপে তেমনি যশোহরের সৈন্যদল ছিন্ন-ভিন্ন, দলিত, নিহত এবং আহত হইয়া সমর-ক্ষেত্র আচ্ছাদিত করিয়া পতিত হইতে লাগিল। পরাজয় দেখিয়া প্রতাপাদিত্য আশ্চর্যের জন্য পলায়নপর হইলে, ইসা খাঁ শোণিত-রঞ্জিত কৃপাণ হস্তে ঘূর্ণিতলোচনে, শত্রু-সংহারক-বেশে প্রতাপাদিত্যের সম্মুখীন হইয়া তরবারি বিস্তারপূর্বক গতিরোধ করিলেন। ইসা খাঁ প্রতাপাদিত্যের তরবারি ঢালে উড়াইয়া বলিলেন, “প্রতাপ! এখনও স্বর্ণময়ীকে দিতে স্বীকৃত হও, নতুবা আজ তোমার রক্ষা নাই। আজ মুসলমান তোমার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছে। নিজেকে রাজা বলে পরিচয় দিয়ে যে-ব্যক্তি পরের কন্যাকে দস্যুর ন্যায় হরণ করে, তাকে আমি দস্যুর ন্যায়ই হত্যা করে থাকি। স্বর্ণময়ী কোথায়? প্রকাশ করলে এখনও তোমাকে প্রাণদণ্ড হতে অব্যাহতি দান করতে পারি!” ইসা খাঁর বাক্যে, প্রতাপ বাক্সদের ন্যায় জুলিয়া উঠিলেন এবং ‘ইসা খাঁ, সাবধান!’ এই কথা বলিয়া তরবারি সঞ্চালন করিলেন। ইসা খাঁ তরবারির আঘাত ঢালে উড়াইয়া কৃতান্তের মননার ন্যায় দীর্ঘ অসি প্রতাপের হৃদদেশে প্রহার করিলেন। প্রতাপ সে আঘাত কৌশলে ব্যর্থ করিলেন। দুইজন দুইজনকে মণ্ডলাকারে পরিভ্রমণ করিয়া নানা প্রকার অস্ত্র-কৌশল প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তরবারি, ডগ্গ, গদা, খঞ্জর নানা অস্ত্র উভয়ে উভয়ের প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। পরিশ্রান্ত অশ্বঘয়ের মুখ হইতে ফেনা নির্গত হইতে লাগিল। প্রতাপ বলিলেন, “খাঁ সাহেব! এসো অশ্ব হতে নেমে দুজনে মিলে যুদ্ধ করি।” অতঃপর প্রতাপ ও ইসা খাঁ অশ্ব হইতে অবতরণপূর্বক মিলে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। দুই এক পেঁচ খেলিবার পরেই প্রতাপ বুঝিলেন, ইসা খাঁ তাঁহার অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী। তখন প্রতাপ সহসা পরিচ্ছেদের অভ্যস্তর হইতে একখানি শাণিত ছুরিকা ইসা খাঁর বক্ষে বিদ্ধ করিতে উদ্যত হইলে, ইসা খাঁ মুহূর্তে ছুরিকা মুষ্টিতে ধরিয়া ফেলিলেন। ছুরির আঘাতে হস্ততল বিক্ষত হইয়া গেল। প্রতাপের বিশ্বাসঘাতকতায় ইসা খাঁ ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় “বেইমান, কাফের” বলিয়া গর্জন করতঃ প্রতাপের কটিবন্ধনী আকর্ষণ করিয়া তাহাকে শূন্যে উঠাইয়া সবলে ভূমিতে নিক্ষেপ করিলেন। প্রতাপ শূন্যচ্যুত বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের ন্যায় ভূতলে পতিত হইয়া পুনরায় উঠিতে যাইতেছেন দেখিয়া ইসা খাঁ সজোরে বক্ষের উপর দাঁড়াইয়া জ্বালাময় তল্ল বক্ষলক্ষ্যে উদ্যত করিয়া বলিলেন, “বল জাহান্নামী কাফের, স্বর্ণ কোথায়? নতুবা এই ডগ্গায়ে তোর

বন্ধ বিনীত করবা।” প্রতাপ বলিল, “আমি স্বর্ণময়ীর কোন সংবাদই অবগত নহি, অকাবণে আমাকে বধ করো না।”

চতুর্দিক হইতে সহস্র কণ্ঠে ধ্বনি উঠিল, “কি? এখনও প্রবন্ধনা? মাক্রম লক্ষ্যমানকে।” ইসা খাঁ এইবার বর্ষা আরও দৃঢ়মুষ্টিতে উর্ধ্বে উঠাইলেন। এমন সময়ে এক ব্যক্তি অশ্বের দাপটে চতুর্দিক লক্ষ্যমান করিয়া শ্বেত পতাকা হস্তে “ধামুন! ধামুন!” বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করিতে করিতে নক্ষত্র-গতিতে ইসা খাঁর নিকটবর্তী হইলেন। ইসা খাঁ সকলকে পথ ছাড়িয়া দিতে বলিলেন। অশ্বারূঢ় ব্যক্তি ইসা খাঁকে কুর্নিশ করিয়া বলিলেন, “হজুর! প্রকৃত অপরাধীকে আমি বন্ধন করে এনেছি। যশোহরপতি স্বর্ণকে হরণ করেন মাই, সুতরাং তাঁকে দণ্ড প্রদান করবেন না।” ইসা খাঁ আগন্তুকের সন্তোষ এবং তেজোব্যঞ্জক মূর্তি দেখিয়া তাঁহাকে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিতে বলিয়া প্রতাপাদিত্যকে রাজবন্দীরূপে রক্ষা করিতে কর্মচারীদেরকে আদেশ দিলেন।

সুচতুর পাঠক বোধহয় বুঝিতে পারিয়াছেন যে, এই আগন্তুক মাহতাব খাঁ। প্রতাপের পরাজয়ে রাজা কেদার রায় পরম আনন্দে ও উল্লাসে ইসা খাঁকে অভ্যর্থনা করিয়া রাজপ্রাসাদে লইয়া গেলেন। দুঃখ-দুর্ভাবনা-পীড়িত শ্রীপুরে আবার নব আনন্দ ও নবশ্রী ফিরিয়া আসিল। নহবতে নহব বিজয়-বাজনা বাজিতে লাগিল। নগরবাসীরা পত্র, পল্লব, লতা, পুষ্প, কদল বৃক্ষ ও পতাকায় নগর সুশোভিত করিলেন। নানা স্থানে উচ্চ উচ্চ ভোরণ নির্মিত ও গীতিবাদ্য হইতে লাগিল। কেদার রায় বিপুল আড়ম্বুরে ইসা খাঁ ও তাঁহার সৈন্য-সামুদ্রকে ভোজ্য প্রদানের জন্য বিপুল আয়োজন করিতে লাগিলেন। এদিকে লোকজন ও বাহক যাইয়া মাহতাব খাঁর নৌকা হইতে আহত কাপালিক এবং বন্দী হেমদাকে লইয়া আসিল। পাণ্ডী করিয়া পরম সমাদরে অক্ষণাবতী ও স্বর্ণময়ীকে আনা হইল। স্বর্ণময়ীর মুখে সমস্ত ঘটনা শুনিয়া সত্যস্থ যাবতীয় ব্যক্তি ঘৃণা ও ক্রোধে কাপালিক এবং হেমদাকে প্রহারে জর্জরিত করিল। আহত কাপালিক সেই প্রহারেই প্রাণত্যাগ করিল। হেমদাকে দণ্ড করিয়া মারিবার জন্য তাহার পিতা বরদাকান্ত এবং রাজা কেদার রায় ইসা খাঁকে শিবদান করিলেন। সত্যর সমস্ত লোক একবাক্যে “ইহাই পাপাত্মার উপযুক্ত শাস্তি” বলিয়া উঠিল। কিন্তু ইসা খাঁ প্রাণদণ্ডের সমর্থন না করিয়া হেমদার নাক-কান কাটিয়া দেন হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। সকলে তাহাতে আরও সন্তুষ্ট হইল। মিথ্যা ধারণার জন্য ইসা খাঁ এবং কেদার রায় উভয়েই প্রতাপাদিত্যের নিকট দূর্বে প্রকাশ করিলেন। ইসা খাঁ সত্বল ও পবিত্র অন্তঃকরণে প্রতাপাদিত্যের সহিত গলায় গলায় সম্মিলিত হইলেন। তাঁহাকে বন্ধুতার চিহ্ন-স্বরূপ অনেক মূল্যবান দ্রব্য উপহার প্রদত্ত হইল।

ইসা খাঁর ধর্মগুরু মওলানা বেজাউল মোস্তফা বলিলেন যে, “পাপের দণ্ড

ভোগ অনিবার্য। কিন্তু পরকাল অপেক্ষা ইহকালে দণ্ড ভোগ অনেক সুখের। মহারাজ! আপনি পূর্বে যে বর্ণময়ীকে হরণ করবার জন্য চেষ্টা করেছিলেন, সেই পাপের ফলে আপনার এই পরাজয়, লোকক্ষয়, ধনক্ষয়, অপহরণ এবং লাঞ্ছনা ভোগ করতে হল। পাপের শাস্তি তখন না হলে অনেকে মনে করে উহা পাপ নহে। কিন্তু ইহা অত্যন্ত ভুল। পাপ কঠোর শাস্তি প্রসবের জন্যই সমগ্র গ্রহণ করে থাকে।”

অতঃপর ইসা খাঁ অরুণাবতীর বিবাহের কথা পাড়িলেন। প্রতাপ সাক্ষরেন্দ্রে বলিলেন, “সেনাপতি সাহেবের সঙ্গে পূর্ব হতেই অরুণাবতীর বিবাহ দিবার জন্য আমার সংকল্প ছিল। আমার দুর্মতিবশতঃই তাঁর সহিত আমার বিরোধ ও শত্রুতা জন্মো ছিল, কিন্তু তিনি আজ আমাকে আসন্নমৃত্যু হতে রক্ষা করেছেন। তাঁর উদারতা ও মহত্বে আমি যথেষ্ট লজ্জিত এবং আশ্চর্যান্বিত হয়েছি। তাঁর ন্যায় মহানুভব এবং হৃদয়বান পরমোপকারী ব্যক্তির করে কন্যাদান করতে পারলে এক্ষণে আমি পরম সুখ ও গৌরব অনুভব করব। আমার অরুণাবতী-রূপ মাধবীলতা উপযুক্ত সহকারকেই আশ্রয় করেছে।” অতঃপর প্রতাপাদিত্য বিবাহের তারিখ নির্দিষ্ট করিয়া অরুণাবতীকে সঙ্গে লইয়া যশোহরে ফিরিয়া গেলেন।

মাহতাব খাঁ ইসা খাঁর সৈন্যদলে চাকুরী গ্রহণ করিলেন। প্রতাপাদিত্য রাজধানীতে প্রত্যাগত হইয়া কয়েকদিন পরে, গভীর দুঃখ এবং শোকের সহিত ইসা খাঁ ও মাহতাব খাঁকে লিখিয়া জানাইলেন যে, বসন্ত রোগের আক্রমণে অরুণাবতী সহসা পরলোক গমন করিয়াছে। মাহতাব খাঁ এই দারুণ সংবাদে মর্মান্বিত হইয়া পড়িলেন। আঁশার জ্যোৎস্না চির আঁধারে ঢাকিয়া গেল। অরুণাবতীর যে অক্ষণিমাজ্জাল তাঁহার হৃদয়ে আলোক-প্রবাহ ও আনন্দের উৎস সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা সূচিভেদ্য অন্ধকারে পরিণত হইয়া অনন্ত বিষাদ ও অনন্ত শোকের প্রবাহ সৃষ্টি করিল। হায় প্রেম! হায় সুখ! তোমাদের আশা এমনি করিয়া মানুষের হৃদয় চিরকাল ভাঙিতেছে, জ্বলাইতেছে এবং নিশ্লেষণ করিতেছে। তোমাদের দুইজনের মোহে এই বিশ্ব-সংসার মুগ্ধ হইয়া ছুটিতেছে। তাহার ফলে—নিরাশা, অবিশ্বাস, অপ্রাণি; তাহার ফলে—শোক, দুঃখ, বিষাদ ও হাহাকাণ্ডে বিশ্ব-সংসার পরিপূর্ণ হইতেছে। ইসা খাঁ এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় যার-পর-নাই ব্যথিত হইলেন। তিনি মাহতাব খাঁর প্রতি গভীর সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া তাহাকে নানারূপে সাহায্য করিতে ও প্রবোধ দিতে লাগিলেন। অন্য স্থানে তাঁহার বিবাহের প্রস্তাব করিতে চাহিলেন, কিন্তু মাহতাব খাঁ আর বিবাহ করিবেন না বলিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

ভালিকোট যুদ্ধের সূচনা

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে দাক্ষিণাত্যে পাঁচটি স্বাধীন স্বরাজ্য ছিল। এই পাঁচটি রাজ্যের মধ্যে বিজয়নগর নামক সর্বপ্রধান রাজ্যটি হিন্দু রাজ্য এবং আহমদনগর, বিদর, বিজাপুর, গোলকুণ্ডা এবং চারিটি মুসলমান রাজ্য ছিল। বিজয়নগরের হিন্দু রাজারা বরাবর মুসলমান-রাজ্য চতুটয়ের সহিত মৈত্রী ও সৌহার্দ্য স্থাপন করিয়া দিন দিন প্রতিপত্তি ও সম্ভ্রম বৃদ্ধি করিতেছিলেন। বিজয়নগরের রাজারা সর্বদাই মুসলমানদিগের সম্মান ও সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া চলিতেন। সুতরাং এই রাজ্যের হিন্দু-রাজ্য লোপ করিবার জন্য নিত্য-জয়শীল কোনও মুসলমান বীরপুরুষ কদাপি উদ্যোগী হন নাই। কিছুকাল পরে মুসলমান নবপাল চতুটয়ের মধ্যে ভয়ানক গৃহ-বিবাদের সূচনা হইল। এই গৃহ-বিবাদের পরিণামে দাক্ষিণাত্যের সোলতানেরা পরস্পরের বল ক্ষয় করিয়া কথঞ্চিৎ দুর্বল হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে বিজাপুরের সোলতানের সহিত বিজয়নগরের রাম রায়ের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। এই সংঘর্ষ লোকক্ষয়কর যুদ্ধে পরিণত হয়। আহমদনগরের সোলতান রাম রায়ের পক্ষে অবলম্বন করতঃ বিজাপুরের দর্প চূর্ণ করিবার জন্য সৈন্যে যুদ্ধক্ষেত্রে উপনীত হন। বিজয়-নগর এবং আহমদনগরের সম্মিলিত বিপুল বাহিনীর বীর্য প্রতাপে বিজাপুরের সোলতান শোচনীয়রূপে পরাজিত হন। এই বিজয় লাভে এবং মুসলমান সোলতানগণের অনৈক্য দর্শনে রাম রায় নিতান্ত স্পর্ধিত, অহঙ্কৃত এবং মুসলমানের সর্বনাশ সাধনে বিশেষ উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। দাক্ষিণাত্যে মুসলমান ও ইসলামের আধিপত্য এবং প্রভাব নাশ করিবার জন্য বিপুল সমরোদ্যোগ করিতে থাকেন। ওলন্দাজ ও পর্তুগীজদিগের সাহায্যে একদল সুদক্ষ পোলন্দাজ সৈন্য পঠন করেন। গোপনে তোপ-কামান ও বন্দুক প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত ও সংগ্রহ করিতে থাকেন। বিজয়নগরাধিপ যে মুসলমান ধ্বংসের জন্য এক্ষণে দুর্ভাগ্যাকার বশীভূত হইবেন, দাক্ষিণাত্যের মুসলমান সোলতানেরা কদাপি তাহা স্বপ্নেও চিন্তা করেন নাই। তাহারা তখন ঘোরতর গৃহ-বিবাহে লিপ্ত। বিজয়নগরের বিপুল সংখ্যক হিন্দু অধিবাসী, মুসলমানের চিরনির্বাসন ও সবংশে ধ্বংস করিয়া আনন্দে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠে। তাহাদের উন্মত্ততা পরিশেষে সংহারক মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া বিজয়নগরের মুসলমান সংহারে প্রবৃত্ত হয়। বিজয়নগরে নানাদেশীয় কয়েক সহস্র মুসলমান ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে বাস করিতেন। একদা পতীর স্বাক্ষিতে হিন্দুরা দল বাঁধিয়া তাহাদিগকে সংহার করিতে থাকে। মুসলমানেরা

সর্বত্র উৎপীড়িত এবং কিয়দংশ নিহত হইয়া ক্রোধে প্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায় জুলিয়া উঠে। সকলেই অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করিয়া গাভীর বেশে সজ্জিত হন। মুসলমান রমণীরাও তরবারি হস্তে আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত হন। মুসলমানদিগের উদ্দীপ্ত তেজে হিন্দুরা ক্ষণকালের জন্য স্তম্ভিত হইয়া পড়ে। এই সময়ে দুর্গ হইতে দলে দলে সৈন্য আসিয়া মুসলমানদিগকে হত্যা করিতে শুরু করে। সমস্ত নগরবাসী হিন্দু ও হিন্দুসৈন্যের দ্বারা ভীষণভাবে আক্রান্ত হইয়া মুষ্টিমেয় মুসলমান নবনারী সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। কতিপয় অনিন্দ্যসুন্দরী মুসলমান যুবতীকে বন্দী করিয়া কৃতঘ্ন রাম রায় তাহাদের সতীত্ব নাশে উদ্যত হন। যুবতীরা আত্মহত্যা করিয়া নরাধম পিশাচের হস্ত হইতে ধর্মরক্ষা করেন। অতঃপর মসজিদসমূহ চূর্ণ করিয়া তাহার স্থূপের উপর ত্রিশূল-অঙ্কিত পতাকা উড়াইয়া দিতেও কুষ্ঠিত হন না। এখানে বলা আবশ্যিক যে, স্বীয় রাজধানীর মুসলমানদিগকে প্রথমেই আক্রমণ ও ধ্বংস করিবার বাসনা তাহার ছিল না। প্রথমতঃ সোলতানগণকে একে একে পরাস্ত করিয়া দাক্ষিণাত্য হইতে ঐসলামিক শক্তি সম্পূর্ণ ধ্বংস করিতে ও পরে যাবতীয় মুসলমান হত্যা করাই তাহার অভীষ্ট ছিল। কিন্তু উনুস নাগরিক ও উদ্ভুল সৈন্যদিগের উদ্দাম উত্তেজনায় প্রথমতঃ তাহার রাজধানীই মুসলমান-রক্তে রঞ্জিত হইল!

এই সংবাদ অত্যল্পকাল মধ্যেই মুসলমান রাজ্য চতুষ্টিয়ে দাবানল শিখার ন্যায় প্রবেশ করিল। মুসলমানগণ প্রথমে এই নিষ্ঠুর পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। পরে সত্যতা অবগত হইয়া বিস্মিত, স্তম্ভিত ও শোকাকুল হইলেন। অবশেষে রুদ্র মন্ত্রে জেহাদের অগ্নি-সঙ্গারিণী বাণী ঘোষিত হইল। সোলতান চতুষ্টিয় মুহূর্ত মধ্যে গৃহ-বিবাহ ভুলিয়া ইসলামের সন্ধান ও আপনাদের মঙ্গলার্থে ভ্রাতৃত্বাবে একত্র সম্মিলিত হইয়া রাম রায়কে সমুচিত শিক্ষা প্রদান এবং বিজয়নগরে ইসলামের বিজয় পতাকা প্রোথিত-করণ মানসে পরস্পর পরস্পরের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। মোস্তা মৌলবিগণ সর্বত্র অগ্নিময়ী বক্তৃতায় প্রত্যেক সক্ষম ও সুস্থ মুসলমানকে তরবারি ধারণ করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করিলেন। দাক্ষিণাত্যের সর্বত্রই মুসলমানদের মধ্যে জেহাদের ভীষণ আন্দোলন আরম্ভ হইল। রাম রায় তাহার পরিণাম ভাবিয়া কম্পিত হইলেও অনন্যগতি হইয়া রাজকোষ নিঃশেষিত করতঃ বিপুল সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। দাক্ষিণাত্যবাসী মুসলমানগণ আর্থাবর্তবাসী বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়বন্ধনকে পত্রযোগে পবিত্র জেহাদের জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন।

এই সময়ে বিজাপুরের শাহী দরবারের আলীম দাদ বা নামক একজন আমীর বাস করিতেন। ইহার জন্মস্থান প্রাচীন নসিরাবাদ* জেলার ইউসফশাহী পরগণার শেরমস্ত নামক পল্লীতে। ইহার পিতা একজন বিখ্যাত বীরপুরুষ ছিলেন। ইসা খাঁর

* আধুনিক ময়মনসিংহ।

সহিত আলীম দাদ খাঁর বাল্যকাল হইতে বন্ধুতা ছিল। উভয়ে এক মাদ্রাসায় এক ওস্তাদের কাছে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যৌবনের প্রারম্ভে আলীম দাদ খাঁ বিজ্ঞাপুরে গমন করেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই প্রতিভা বলে রাজ-পারিষদের পদে সমাক্রম হন। আলীম দাদ খাঁ স্বীয় বাল্যবন্ধু প্রবল প্রতাপশালী স্বাধীন ছুইয়াকুল-মণি ইসা খাঁকে পরমানন্দে জেহাদে যোগদান করিবার জন্য নিম্নলিখিত পত্র প্রেরণ করিলেন :

প্রিয়তম সুহৃদ!

করুণাময় বিশ্বপাতা পরমেশ্বরের মহিমা নিত্য জয়যুক্ত হউক। তাঁহার অনন্ত মঙ্গলকর আশীর্বাদের পুণ্য-বারিতে আপনি অভিষিক্ত হউন। আপনার মনুষ্যত্ব এবং ইসলাম-অনুরাগ, বসন্তে কুসুম বিকাশের ন্যায় প্রস্ফুটিত হইয়া পৃথিবী আমোদিত করুক। আপনার বীর্য ও সাহস, বর্ষা-বারিপুষ্ট কলনাদিনী খরগামিনী তটিনীর উদ্ভাসিত প্রবাহের ন্যায় জীবনের কর্মক্ষেত্রে প্রবাহিত হউক।

হে বন্ধু! মানব-জীবন বিদ্যুৎ ক্ষণস্থায়ী হইলেও বিদ্যুৎ যেমন মুহূর্তেই তাহার বিদ্যোজ্জ্বলকারিণী প্রতিভার তীব্র ছটায় জগৎকে উদ্ভাসিত ও চমকিত করিয়া থাকে, আপনিও তেমনি সর্বশক্তিমান আনুহাতালা এবং তাঁহার প্রেরিত মহাপুরুষের আশীর্বাদে আপনার কর্মোজ্জ্বল জীবন ধর্মপ্রভায় দিগন্ত আলোকিত করুন।

প্রাণাধিক সখে!

বিজয়নগরের বিশ্বাসঘাতক পিশাচপ্রকৃতি পাষও রাজা রাম রায় এবং হিন্দুগণ, দাক্ষিণাত্য হইতে করুণাময় আনুহাতালার আদিষ্ট ও অভিলষিত পরম পবিত্র ইসলাম ও মুসলমানকে নেতনাবুদ ও বে-বুনিয়াদ করিবার জন্য ভীষণ ও ঘৃণিত ষড়যন্ত্র করিয়াছে। ইতিমধ্যে বিজয়নগরের যাবতীয় মুসলমান নরনারী, বালকবৃদ্ধনির্বিশেষে পাষও ও ঈশ্বরদ্রোহী কাফেরদিগের হস্তে অতীব শোচনীয়ভাবে নিহত হইয়াছে। যাবতীয় মসজিদ চূর্ণকৃত এবং অপবিত্রিত হইয়াছে। খ্রিষ্টানগণ জেরুজালেম অধিকার করিয়া মুসলমানদের প্রতি যেরূপ লোমহর্ষণকর ভীষণ জুলুম ও হত্যাকাণ্ডের অনুষ্ঠান করিয়াছিল, বিজয়নগরের মুসলমানের প্রতি সেইরূপ অত্যাচার হইয়াছে। কৃতন্ত্র রাম রায় ঐসলামিক সোলতানী শক্তি-তরু উৎপাটিত করিয়া ইসলাম ও মুসলমানকে নিরাশ্রয়, বিপন্ন ও ধ্বংস করিবার মানসে, বিপুল সেনাবল সংগ্রহ করিতেছে। আমরাও সকলে এই পাষও কাফের এবং তাহার রাজ্য দর্শ, ভগ্ন ও চূর্ণ করিবার জন্য বহুপরিকর হইয়াছি। সোলতান চতুর্দশ সমস্ত মনোমালিন্য কুলিয়া ইসলামের দুঃমনকে দমন করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। অনেক মুসলমান রমণী এবং শাহজাদী পর্বস্ত অস্ত্রধারণে বহুপরিকর হইয়াছেন। যাবতীয় মুসলমানের হৃদয় রগোন্ডাসে

পূর্ণিমার সমুদ্রের ন্যায় উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে। সমগ্র দাক্ষিণাত্যে জেহাদের চিন্তোন্মাদিনী গীতিতে প্রতিধ্বনিত হইতেছে! বর্ষার প্রভাব হ্রাস হইবামাত্রই আমরা যুদ্ধে অগ্রসর হইব। আশা করি, এই পবিত্র জেহাদ উপলক্ষে আপনার বিজয়ী তরবারি কাফেরশোণিতসিঞ্জে দাক্ষিণাত্যের ভূমি উর্বরা ও ঔজ্জ্বল্য প্রদর্শনে আকাশ-মণ্ডলকে প্রভাসিত করিবে। আপনার বীরবাহু বিজয়নগরের দুর্গ-শীর্ষে ইসলামের চন্দ্রকলা-শোভা বিজয়-কেতু উড্ডয়নে নিশ্চয়ই সাহায্য করিবে। ইতি।

ভবদীয় প্রণয়াম্পদ সখা ও ভ্রাতা—
অকিঞ্চন আলিম দাদ।

শেখ ইয়াকুব নামক একজন সৈনিক পুরুষ এই পত্র ও অন্যান্য কতিপয় মূল্যবান উপহার সহ দাক্ষিণাত্য হইতে খিজিরপুরে ইসা খাঁ মসনদ-ই-আলীর নিকট প্রেরিত হইল।

পঞ্চদশ অধ্যায়

নিরাশা

প্রতাপের সহিত যুদ্ধের পরে কয়েক দিনের মধ্যে দেখিতে দেখিতে ভাদ্র মাস প্রায় অতিবাহিত হইতে চলিল। ইসা খাঁ ভাদ্র মাসের শেষে অনুরাগাতিশয্যে কেদার রায়ের নিকট দূত পাঠাইয়া স্বর্ণময়ীকে বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। ইসা খাঁ স্বর্ণময়ীকে বিবাহ করিতে চান, এ প্রস্তাবে কেদার রায় যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা চাঁদ রায়, অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন এবং অমাত্যবর্গের সহিত এ বিষয়ে পরামর্শ করিলেন, কিন্তু কুলগুরু এবং চাঁদ রায় সম্পূর্ণ অমত প্রকাশ করিলেন। ইদিলপুরের শ্রীনাথ চৌধুরীর সহিত স্বর্ণময়ীর বিবাহের পাকাপাকি কথা হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে সেই বাগ্দত্তা কন্যাকে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী মুসলমানের হস্তে সমর্পণ করা অপেক্ষা মহাপাতক আর কি আছে? ইহা দ্বারা কুল অপবিত্র ও কলঙ্কিত হইবে। এবিধ নানা আপত্তি উত্থাপন করিয়া চাঁদ রায় এবং কুলগুরু যশোদানন্দ ঠাকুর কেদার রায়ের অমত করিয়া ফেলিলেন। আজকাল যেমন কিষ্কিন্দা-বিবাহ লইয়া হিন্দু পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে দুই প্রকার মত পরিলক্ষিত হয়, তখন মুসলমানকে কন্যাদান সম্বন্ধে ব্যবস্থাদাতা পণ্ডিতদিগের মধ্যেও সেই প্রকার দুই মত ছিল। মুসলমানকে কন্যাদানের পক্ষে একদল এবং অন্যদল ইহার বিপক্ষে। বলা বাহুল্য, পক্ষ অপেক্ষা বিপক্ষেই পণ্ডিত সংখ্যা খুব বেশী ছিল।

স্বর্ণময়ীর মাথা রাণী হিরণ্যায়ীও সম্পূর্ণ অমৃত প্রকাশ করিলেন। ইতিমধ্যে ইসা বীর জননী আয়েশা খানম, স্বর্ণময়ীকে বিবাহ করিবার জন্য তাঁহার পুত্র কেদার বাব্বের নিকট ঘটক পাঠাইয়াছেন, ইহা শুনিয়া যার-পর-নাই দুঃখিত এবং ক্ষুণ্ণ হইলেন। ইসা বাকে একটু মিষ্ট তিরস্কারও করিলেন। স্বর্ণময়ীকে পুত্রবধূরূপে বরণ করিতে যেন তাঁহার সম্পূর্ণ অমৃত, বিশ্বস্ত লোক পাঠাইয়া সে কথাও গোপনে কেদার বাব্বকে জানাইয়া দিলেন। কিন্তু গোপনে জানাইলেও ইসা বা অবিদ্যেই তাহা জানিতে পারিলেন। তিনি আশায় নিরাশার আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। কেদার বাব্ব কি অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, তাহা ভাবিয়া তিনি আকুল হইতে লাগিলেন। এমন সময় যথাকালে ঘটক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কেদার বাব্ব ব্যতীত সকলেরই ঘোর আপত্তি, বিশেষতঃ পূর্বেই স্বর্ণের বিবাহের কথা ইন্দিপুরের শ্রীনাথ চৌধুরীর সহিত পাকাপাকি হইয়া গিয়াছে বলিয়া কেদার বাব্ব সম্মতি প্রকাশ করিতে না পারিয়া নিরতিশয় দুঃখিত হইয়াছেন ইত্যাদি সমস্ত ব্যাপার ঘটক আদ্যোপান্ত বিবৃত করিলেন।

ঘটকের কথা শুনিয়া বীরপুরুষ ইসা বীর ক্ষীত বক্ষ যেন দমিয়া গেল। আলোকময় আনন্দকোলাহলপূর্ণ পৃথিবী যেন শূশানে পরিণত হইল। স্বর্ণময়ীর প্রেমের মোহিনী আশার কনককিরণ-রাগে তাঁহার যে, চিন্তা বিচিত্র জ্বলদ-কদম্ব-শোভিত উষার আকাশের ন্যায় শোভিত ছিল, তাহা হতাশার কৃষ্ণ-মেঘে সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল! বিস্তৃত রাজ্য, অখণ্ড প্রভুত্ব, প্রসূন যৌবন, অগাধ ধন, যাহা এতদিন সুখ ও স্বানন্দের কারণ ছিল, এখন তাহা জীবনপথের কষ্টক বলিয়া মনে হইতে লাগিল। ইসা বা ভাবিতে লাগিলেন, “হায়! কি কুক্ষণেই আমি স্বর্ণময়ীকে উদ্ধার করিয়া ছিলাম! আর কি কুক্ষণেই বা স্বর্ণময়ী আমাকে আত্মডালি দিয়া পত্র লিখিয়াছিল! স্বর্ণকে আমি নির্মম দস্যুর হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া শেষে কি অকূল সাগরে ভাসাইয়া দিব? হায়! যে সরলা যুবতী আমাকে সম্পূর্ণ প্রাণের সহিত বসন্তের নবলতিকার ন্যায় জড়াইয়া ধরিয়াছে, তাহাকে কিরূপে বিচ্ছিন্ন করিব? বিচ্ছিন্ন করিলে, তাহার জীবন-কুসুম যে অকালে বিসৃত হইবে! হায়! আমিই বা বিশেষ বিবেচনা না করিয়া স্বর্ণকে হৃদয়-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলাম কেন? বাগদস্তা কন্যাকে কেদার বাব্বই বা কি করিয়া পুনরায় অন্যত্র সমর্পণ করেন? হায়! স্বর্ণ আমাতে কেন মজিল? কি বিষয় সমস্যা! এ সমস্যার মীমাংসা করা মানব-বুদ্ধির অগম্য। হায়! হৃদয় যে এক মুহূর্তের জন্যও স্বর্ণকে ভুলিতে পারিতেছে না। স্বর্ণকে পাইব না, ইহা চিন্তা করিতে—কল্পনা করিতেও হৃদয় চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়। হায়! আমার স্বর্ণ! আমাতে উৎসৃষ্টপ্রাণা স্বর্ণ,—আমাতে মুগ্ধ স্বর্ণ, আমার প্রেম-বারিদের আকাঙ্ক্ষণী তৃষ্ণার্ত-চাতকী স্বর্ণ, সে অন্যের পাণিপীড়ন করিবে, উঃ! এ-চিন্তা কি অসহ্য! কি মর্মহৃদ!! কি ভীষণ!! হায়! আমি যদি স্বর্ণকে না পাই, তবে প্রেমের বাভিচার কবিতা এ-জীবনকে আর কলঙ্কিত করিব

না। শুধু তাই কি? এ জীবন লইয়া সংসারে যে কি করিব, তাহাও ভে। খুঁজিয়া পাইতেছি না। কি আশ্চর্য! যদি স্বৰ্গকে না পাই তাহা হইলে সংসারে আমার আর কিছুই কার্য নাই—অনুরাগ নাই—প্রয়োজন নাই! কিন্তু যদি স্বৰ্গকে পাই, তাহা হইলে এ-সংসারে যেন কর্তব্যের শেষ নাই—অনুরাগের সীমা নাই—কর্মের ইতি নাই—আনন্দের ইয়ত্তা নাই (হায় যৌবন! হায় রমণীর সৌন্দর্য! হায় প্রেম! তোমাদের কি অঘটন-ঘটন-পটিয়সী শক্তি! কি অদ্ভুত প্রয়াস!! ধন্য প্রেম! তোমার প্রভাবে মরুভূমিতে মন্দাকিনী বহে, শুষ্ক তরুতে কুসুম ফোটে, অমাবস্যায় চন্দ্রোদয় হয়, হেমন্তে কোকিল গায়, অন্ধ নক্ষত্র দর্শন করে, পশু গিরি লঙ্ঘন করে! তুমি বাহুতে শক্তি, হৃদয়ে আনন্দ, নেত্রে জ্যোতি, শরীরে স্বাস্থ্য, কর্মে উৎসাহ, মস্তিষ্কে বুদ্ধি, মানসে কল্পনা। তুমি যেখানে, সেখানেই স্বৰ্গ! তোমার যেখানে অভাব, তাহাই নরক! তোমার প্রাণিই জীবন, তোমার অভাবই মরণ!”)

ঈসা খাঁ প্রেমাম্পদের প্রেম-সৌরভে চিরবঞ্চিত হইবার ক্ষোভে নিতান্ত বিমনায়মান-চিন্ত হইয়া পড়িলেন; চঞ্চল মনকে প্রকৃতিস্থ করিবার জন্য বহু চেষ্টা করিলেন; কিন্তু পূর্বের শাস্তি আর ফিরিয়া আসিল না। ঠিক এই উদ্বেগ ও মানসিক অস্থির্যের মধ্যে আলীম দাদ খানের জেহাদের নিমন্ত্রণ-পত্র লইয়া লেখ ইয়াকুব বিজিরপুরে উপস্থিত হইলেন। পত্রপাঠে ঈসা খাঁর সর্বশরীরে বিদ্যুৎতরঙ্গ প্রবাহিত হইল। কাপুরুষ শয়তান কাফেরের হস্তে মুসলমানের এতাদৃশ শোচনীয় ও নৃশংস হত্যাকাণ্ড পাঠে, তেজীমান পাঠান বীর ক্রোধে ও ক্ষোভে প্রজ্বলিতপ্রায় হইয়া উঠিলেন। জেহাদের উন্মাদনায় তাঁহার বীরহৃদয় উদ্দীপিত হইয়া উঠিল। হৃদয়বান পাঠান বীরের জ্বালাময় বিস্ফারিত নেত্রযুগল হইতে নিহত নরনারী ও বালক-বালিকাদিগের জন্য সহ-মর্মিতা এবং শোকের তরল মুক্তাধারা নির্গত হইতে লাগিল। সে পুণা অশ্রু-প্রবাহে তাঁহার হৃদয়ের অশান্তি ও চাঞ্চল্য কথঞ্চিৎ দূরীভূত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ মন্ত্রী ও পারিষদবর্গকে আহ্বান করিয়া সেই পত্র পাঠ করিয়া শুনাইলেন। পত্র শ্রবণে সকলের চক্ষুতেই ড্রাট-শোকের এবং জাতীয় সহানুভূতির অশ্রুবিন্দু উদ্গত হইল। এ জেহাদে যোগদান করা যে অপরিহার্য কর্তব্য, সে-বিষয়ে সকলেই একমত প্রকাশ করিলেন। সম্ভ্রান্ত বংশের একশত যুবক জেহাদের জন্য রণক্ষেত্রে যাইতে স্বৈচ্ছায় প্রস্তুত হইলেন। ঈসা খাঁ, মাহতাব খাকে প্রতিনিধি-স্বরূপ রাজো রাখিয়া পবিত্র জেহাদে যোগদান করিবার জন্য সমস্ত আয়োজন ঠিক করিতে লাগিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই রাজা রক্ষা এবং রাজকার্য পরিচালনার সমস্ত বন্দোবস্ত করতঃ দুই সহস্র উৎকৃষ্ট বগদক্ষ যোদ্ধা লইয়া জলপথে দক্ষিণাত্যে যাত্রা করিলেন। একশত স্বৈচ্ছাসেবক বীর যুবকও রণোৎসাহে উৎসাহিত হইয়া তাঁহার সহিত গমন করিলেন। ঈসা খাঁর প্রেম-পিপাসিত হৃদয়ের নিদাক্ষণ উদ্বেগ এবং স্বর্ণময়ী লাডের ন্যাকুল ও অবিরাম

অসুরের সহিত প্রতিষ্ঠিত ।

মন্দিরের সম্মুখে প্রশস্ত নাট-মন্দির । নাট-মন্দির বিবিধ সজ্জায় সজ্জিত ।
উহাতে ঝাড়, ফানুস, লষ্ঠনের সঙ্গে সুপক্ক কলার কাঁদী ও রঙ্গীন কাগজের ফুলের
ঝাড়ও ঝুলিতেছে । দিল্লীর চিত্রকরদের অঙ্কিত কয়েকখানি সুন্দর পটও সোনা-
রুপার কাঠাম বা ফ্রেমে শোভা পাইতেছে । দলে দলে লোক পূজা-বাড়িতে
আসিতেছে ও যাইতেছে । নানা স্থান হইতে ভারেভারে ফলমূল ভরিভরকারি
অনবরত আসিতেছে । মন্দির দক্ষিণ-দ্বারী । মন্দিরের পূর্ব-পার্শ্বে একটি প্রকাণ্ড
ফল-ফুলের বাগান । সেই বাগানের পূর্বে একটি ইষ্টক-মণ্ডিত পথ । সে পথের
নীচেই স্বচ্ছ-সলিলা ইচ্ছামতী কল্ কল্ করিয়; দিবারাত্রি আপন মনে প্রবাহিত
হইয়া যাইতেছে ।

নদীর ঘাট অনেক দূর পর্যন্ত সুন্দররূপে বাঁধান । নৌকাযোগে নানা স্থান হইতে
নানা দ্রব্য আসিয়া ঘাটে পৌঁছিতেছে । আর ভারীরা তাহা ক্রমাগত ভূইয়া-বাড়িতে
বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে । ঘাটে কয়েকখানি পিনীস, বজরা ও ডিঙ্গি বাঁধ
রহিয়াছে । ঘাটে রাজবাড়ী ও পার্শ্ববর্তী অন্যান্য বাটীর বহু স্ত্রীলোক স্নান
করিতেছে । এলায়িত-কেশা, সিন্ধু-বস্ত্রা পদ্মমুখী শ্রীমতীদের মুখে বাল তপন
তাহার কিরণ মাখাইয়া সৌন্দর্যের লহরী ফুটাইয়া তুলিয়াছে । কোন রমণী গ্রীবা
হেলাইয়া দীর্ঘ কুন্তলরাশি সাজিমাটি ও খেল-সংযোগে পরিষ্কার করিতেছে । কোন
নারী কাপড় ধুইতেছে । বালিকার দল পা নাচাইয়া জল ছিটাইয়া সাঁতার
কাটিতেছে । যুবতীরা ঈষৎ ঘোমটা দিয়া আবক্ষ জলে নামিয়া শরীর মর্দন
করিতেছে এবং মাঝে মাঝে আড়চক্ষে সম্মুখ দিয়া নৌকায় কাহারো যাইতেছে,
তাহা দেখিয়া লইতেছে । প্রবীণরা ঘাটে বসিয়া কেহ কেহ সূর্যপূজার মন্ত্র
আওড়াইতেছে । কেহ কেহ পিতলের ঘটি ও কলসী মাজিয়া এমন ঝকঝকে
করিতেছে যে, উহাতে সূর্যের ছবি প্রতিবিম্বিত হইয়া বলমল করিয়া সোনার ন্যায়
জ্বলিতেছে । হায়! মানুষ নিজের মনটি যদি এমন করিয়া মাজিত, তাহা হইলে
উহাতে বিশ্ব-সূর্য পরমেশ্বরের জ্যোতিঃপাতে কি অপূর্ব শোভাই না ধারণ করিত!
মানুষ নিজের ঘটি-বাটী, এমন কি জুতা জোড়াটি যেমন পরিষ্কার রাখে, মনকে
তেমন রাখে না । অথচ মানুষই সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান ।

কোন যুবতী স্নানান্তে কলসী কক্ষে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতেছে । ঘাটের
দক্ষিণ-পার্শ্বে কতিপয় পুরুষও স্নান করিতেছিল । একটি প্রফুল্ল মূর্তি ব্রাহ্মণ পৈতা
হাতে জড়াইয়া মন্ত্র জপ করিতেছে । তাহার পার্শ্বে ফুটন্ত গোলাপের মত একটি
শিশু স্নানান্তে উলঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়া আগুল চুমিতেছে এবং এক দৃষ্টে বৃদ্ধ
ব্রাহ্মণের জপ, মন্ত্র-ভঙ্গী এবং জল ছিটান দেখিতেছে । বোধ হয়, তাহার কাছে
এ-সমস্তই অর্থশূন্য অথচ কৌতুকবহু মনে হইতেছে । সে এক এক বার মনে
মনে ভাবিতেছে যে, তাহার ঠাকুরদাদা জল লইয়া এক রকম খেলা করিতেছে ।

কিন্তু পরক্ষণেই তাহার মুখের গাণ্ডীয্য বালকের ধারণা নষ্ট করিয়া দিতেছে। এ-সংসারে গাণ্ডীয্যের প্রভাবেই অমেক হালকা জিনিস গুরু এবং গুরু জিনিসও গাণ্ডীয্যের অভাবেই হালকা হইয়া পড়ে।

শ্রীপুরের ঘাটে দুর্গোৎসবের ষষ্ঠীর দিনে প্রাতঃকালে যখন এই প্রকার রমণীদিগের স্নানের হাট বসিয়াছে, সেই সময়ে একখানি সবুজবর্ণ অতি সুন্দর শ্রকোণ বজরা, একখানি পিনীস ও একখানি বৃহদাকারের ডিম্বি সহ আসিয়া ঘাটে পড়িল।

বজরায় খুব বড় একটি ডঙ্কা ছিল। বজরা কূলে লাগিবামাত্রই একজন লোক সেই ডঙ্কায় পিটিতে লাগিল। ডঙ্কার আওয়াজে সমস্ত গ্রামখানি যেন প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। অনেক বাড়িতেই তখন পূজার ঢাক বাজিতেছিল। ডঙ্কার আওয়াজে ঢাকের শব্দ তলাইয়া গেল। ডঙ্কার তুমুল ধ্বনি শুনিয়া ছেলের দল এবং অনেক কৌতূহলী ব্যক্তি বজরার দিকে ছুটিল।

বজরার মধ্যে একটি প্রশস্ত কক্ষে একখানি ব্যাঘ্রচর্মাসনে এক তেজঃপুঞ্জ মূর্তি দিব্যকান্তি দরবেশ বসিয়া তস্বী জপিতেছিলেন। তাহার মুখমণ্ডল জ্যোতির্ময়, গাণ্ডীয্য অথচ ঈষৎ হাস্যময় এবং প্রশান্ত। তাহার চেহারার লাবণ্য, দীপ্তি এবং প্রশান্ততা দেখিলেই তিনি যে একজন প্রতিভাশালী ধর্মপ্রাণ তেজস্বীপুরুষ, তাহা সকলেই বুঝিতে পারে। তাহার গাত্রে অতিশুদ্ধ একটি সাধারণ পিরহান, তাহার উপরে একটি সন্দরিয়া এবং মাথায় শ্বেতবর্ণ পাগড়ী। পরিধানে পা'জামা। এই সামান্য বস্ত্রেই তাহাকে বেশ মানাইয়াছে। তাপসের বয়স পঞ্চাশের উপর নহে। তাহার সর্বাঙ্গের গঠন সুন্দর, দোহারা। মুখে অর্ধহস্ত পরিমিত দীর্ঘ মসৃণ কৃষ্ণশাব্দ শোভা পাইতেছে। গ্রীবদেশের চতুর্দিশে বাবরীগুলি ঝুলিয়া পড়িয়াছে। দুই পার্শ্বের জোলুক প্রভাত বায়ুতে ঈষৎ আন্দোলিত হইতেছে। যেন দুইটি কালো সর্প দুইপার্শ্বে ঝুলিয়া পড়িয়া দোল খাইতেছে। যে আসিতেছে, সেই তাহার সম্মুখে আসিয়া মস্তক নত করিতেছে। তাহাকে দেখিয়া কেহ অগ্রসর হইতেও পারিতেছে না, পিছাইতেও পারিতেছে না। চঞ্চলমতি কলহপ্রিয় ছেলে-মেয়েরা যাহারা মুহূর্ত পূর্বে ভীষণ কোলাহলে প্রভাত-আকাশ মুখরিত করিয়া তুলিয়াছিল, তাহারাও দরবেশের সম্মুখে চিত্রপুস্তলিকার মত দাঁড়াইয়া আছে। কাহারও মুখে একটু সাড়া শব্দ নাই। তাহার মুখের দিকে মুখ তুলিয়া কেহ তাকাইতেও পারিতেছে না। জনৈক ব্রাহ্মণ তাহার পরিচয় জানিবার জন্য বজরা সংলগ্ন ডিম্বিতে যাইয়া একজন লোককে জিজ্ঞাসা করিল। তাহার মুখে ব্রাহ্মণ জানিতে পারিল যে, দরবেশের নাম শাহ সোলতান সুফী মহীউদ্দীন কাশ্মীরী। তিনি কাশ্মীরের কোনও রাজপুত্র। রাজসিংহাসন ত্যাগ করিয়া দীর্ঘকাল শাস্ত্রালোচনা ও তপস্যা দ্বারা সিদ্ধিলাভ করতঃ ধর্ম-প্রচার উপলক্ষে কিয়দিন হইল নিম্ন-বঙ্গে আগমন করিয়াছেন।

ইতোমধ্যে দরবেশের জপ শেষ হইলে তিনি বালকদিগকে অতি মধুর স্বরে বজ্রার নিকটে আহ্বান করিয়া হাস্যমুখে নিতান্ত স্নেহের সহিত সকলের নাম-ধাম জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। বালক-বালিকারা তাহার মধুর আহ্বানে একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল। নৌকায় যথেষ্ট পরিমাণে মর্তমান-কলা ও মিঠাই ছিল। তিনি প্রত্যেক বালককে পাঁচটি করিয়া কলা ও পাঁচটি করিয়া সন্দেশ পরম স্নেহের সহিত দিতে লাগিলেন। বালকদের মধ্যে সন্দেশ লইতে প্রথমে অনেকেই ইতস্ততঃ করিলেও পরে আগ্রহের সহিত তাহা গ্রহণ করিল। বালকেরা সকলেই হিন্দু। তন্মধ্যে ১৪/১৫ জন গোড়া ব্রাহ্মণ-সন্তান। শাহ সাহেব কদম্বী ও মিঠাই বন্টন করিয়া দিয়া সকলকেই খাইতে বলিলেন। তাহারা মত্ত-মুগ্ধবৎ সেই বজ্রার দুই পার্শ্বে বসিয়া স্বচ্ছন্দে কলা ও সন্দেশ খাইতে লাগিল। সেই সময় অনেক হিন্দু পুরুষ ও রমণী দণ্ডায়মান হইয়া ভিড় করিয়া তামাসা দেখিতেছিল। সকলেই যেন পুস্তলিকাবৎ নীরব ও নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া সেই মহাপুরুষের দেব-বাঙ্কিত-মূর্তি ও বালকদের প্রতি জননী-সুলভ মমতা দর্শন করিতে লাগিল।

বালকদের মধ্যে একটি ছেলেকে রোগা দেখিয়া শাহ সাহেব তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার জ্বর হয় কি?” সে মাথা নাড়িয়া মৃদুস্বরে বলিল, “হঁ”। দরবেশ সাহেব মনে মনে কি পড়িয়া ফুঁ দিলেন এবং তাহাকে বলিলেন, “তোমার আর জ্বর হবে না।” বালক বলিল, “বিকালে আমার জ্বর আসবে। এ জ্বরে কোনও চিকিৎসায় ফল করে নাই।” দরবেশ বলিলেন, “আচ্ছা বাবা! বিকালে একবার এসো, তোমার জ্বর আসে কি-না দেখা যাবে। তোমাদের বাড়ী কত দূরে?” বালক অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া নিকটের একখানি গ্রামের উচ্চশীর্ষ তালগাছ দেখাইয়া বলিল, “ঐ যে, আমাদের বাড়ীর তালগাছ দেখা যাচ্ছে।” একটি বালককে জ্বরের জন্য ফুৎকার দিতে দেখিয়া আর একটি বালক বলিল, “আমার একটি ছোট ভাই ক’মাস থেকে পেটের অসুখে ভুগছে।” দরবেশ বলিলেন, “বাড়ী হতে মাটির একটি নূতন পাত্র নিয়ে এস, আমি পানি পড়ে দিব। তোমার ছোট ভাই-এর অসুখ ভাল হয়ে যাব।” নীলাম্বরী-পরিহিতা প্রফুল্লমুখী একটি বালিকা অনেকক্ষণ দরবেশের নিকট বসিয়া তাহার মুখের দিকে এতক্ষণ পর্যন্ত আগ্রহ ও প্রীতিমাখা দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল। কখন দরবেশ মুখ ফিরাইবেন তাহার প্রতীক্ষা করিতেছিল। এইবার দরবেশ মুখ ফিরাইলে সে তাহার দক্ষিণ হস্তের তর্জনী বাম হস্তের দুইটি অঙ্গুলীর দ্বারা চাপিয়া ধরিয়া আধ আধ স্বরে বেশ একটু তন্মিমার সহিত মুখ নাড়িয়া বলিল, “আমার আঙ্গুলটা কেটে গেছে, ব্যথা করছে।” দরবেশ সন্নেহে তাহার চিবুক ধরিয়া বলিলেন, “কেমন করে হাত কেটেছে?”

বালিকা : আমার পুতুলের ছেলের বিয়ের তরকারি কুটতে কেটে গেছে।

দরবেশ : তোমার পুতুলের ছেলে আছে? তার বিয়ে হয়েছে?

বালিকা : হ্যা, আপনি দেখবেন?

দরবেশ সাহেব বালিকার মতলব বুঝিয়া বলিলেন, “আচ্ছা, বিকালে নিয়ে এস, দেখব”---এই বলিয়া তিনি বালিকার আঙ্গুলে ফুৎকার দিয়া বলিলেন, “তোমার বেদনা সেবে গেছে।” বালিকা কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া আশ্চর্যের সহিত বলিল, “কৈ! আর তো বেদনা করে না! বা! আপনার ফুঁতে বেদনা সেবে গেল।”

তখন হৃৎপ্রসবিনী ভারতবর্ষের রম্যোদ্যান বঙ্গভূমি, আজকালকার মত রেলের কল্যাণে নদ-নদীর স্রোত বন্ধ হইয়া ম্যালেরিয়ার প্রিয় নিকেতনে পরিণত হইয়াছিল না; তাই সেই বহুসংখ্যক বালক-বালিকার মধ্যে একটি মাত্র কুণ্ড বালক ছিল। বালক-বালিকারা সুফী সাহেবের নিকট হইতে ক্রমে ক্রমে বিদায় লইল। যে সমস্ত বয়স্ক লোক দাঁড়াইয়াছিল, দরবেশ সাহেব তাহাদিগকে স্থানীয় নানা ভাষা জিজ্ঞাসা করিলেন। লোক-সংখ্যা কত, মুসলমান কত, কেদার রায় কেমন লোক, স্থানীয় আবহাওয়া কেমন, জিনিসপত্র কেমন পাওয়া যায়, লোকের চরিত্র, শিক্ষা ও ধর্মানুরাগ কেমন, কত সম্প্রদায়, কত জ্ঞানি, কি কি পূজা-পদ্ধতি চলিত আছে ইত্যাদি নানা বিষয়ে তিনি উপস্থিত জনসাধারণকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। তাহারাও যথায় উত্তর দিতে লাগিল। কেবল কেদার রায় কেমন লোক, এই প্রশ্নের উত্তর দিতে সকলেই ধতমত খাইয়া পরে বলিল, “ভাল লোক। অনেক লোক-লঙ্কর আছে; বাঙ্গালার নবাবের খাজনা দুই বৎসর হল বন্ধ করেছে।”

দরবেশ সাহেব প্রশ্নোত্তর হইতে বুঝিতে পারিলেন, স্থানটি বেশ স্বাস্থ্যকর। মৎস্য ও তরিতরকারি অপরিয়াণ্ড। অধিবাসীদের মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু। সাধারণতঃ লোক সকল অশিক্ষিত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন। কেদার রায় ও তাঁহার ভ্রাতা চাঁদ রায় সামান্য একটু বাঙ্গালা ও ফারসী জানেন। কেদার রায় অপেক্ষা চাঁদ রায় কম নিষ্ঠুর ও উদার প্রকৃতি। কেদার রায় গণমুখ, হঠকারী এবং কৃপমণ্ডকবৎ সংকীর্ণ-জ্ঞান বলিয়া নিজেকে সত্য সত্যই প্রতাপশালী, বিশেষ পরাক্রান্ত স্বাধীন রাজা বলিয়াই মনে করেন। বাঙ্গালার নবাব দায়ুদ খাঁর পতনে রাজ্যের বিশৃঙ্খলা ঘটায় তিনি খাজনা বন্ধ করিয়া তাঁহার প্রজামণ্ডলীর মধ্যে নিজেকে স্বাধীন নরপতি বলিয়া প্রচার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, তবে রাজস্বের ধারণ ও মুদ্রাঙ্কনে এখনও সাহসী হন নাই।

কেদার রায় ঈসা খাঁকে সম্মুখে ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও হাত-জোড় করিয়া বাধ্যতা স্বীকার করিলেও তাঁহাকে স্বীয় আধিপত্য বৃদ্ধির পথে কষ্টক স্বরূপ বিবেচনা করেন। ঈসা খাঁ ও তাঁহার স্বর্গীয় পিতা উপকার ব্যতীত কেদার রায়ের কখনও অপকার করেন নাই। বলিতে গেলে ঈসা খাঁর বন্ধুভাবই তাঁহার রাজারক্ষার অবলম্বন-স্বরূপ হইয়াছে। ঈসা খাঁ কেদার রায়ের হিতৈষী না হইলে, ভুলুয়ার প্রবল প্রতাপান্বিত ফজল গাজীর তরবারি ও কামানের মুখে কোন দিন

শ্রীপুর শ্রীশূন্য হইয়া যাইত। ইসা খাঁর আনুকূল্যেই কেদার বৎ প্রদানের জমিদারের বহু এলাকা হস্তগত করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

দ্বি-প্রহরের প্রারম্ভে সমস্ত লোক চলিয়া গেলে, হজুরত মহাউদ্দীন সাহেবের ভৃত্য, খাদেম ও শিষ্যগণ আহারের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইল। শাহ সাহেবের সঙ্গে তাঁহার অনুচর আট জন, বাবুর্চি একজন, খাদেম পাঁচজন এবং মাঝি-মাল্লা কুড়িজন, মোট চৌত্রিশ জন লোক ছিল। তিনি নিজেই সম্পত্তি হইতে এই সমস্ত লোকের ব্যয়ভার বহন করিতেন। কাহারও নিকট হইতে অর্থাৎ কিছু লইতেন না। তবে খাদেমের উপহার স্বরূপ প্রদান করিলে, তিনি গ্রহণ করিতেন। তিনি প্রায় বারমাসই রোজা রাখিতেন। রাত্রিতে সামান্য কিছু দুগ্ধ, কুটী ও ফল-মূল ভক্ষণ করিতেন। মৎস্য, মাংস স্পর্শও করিতেন না। সমস্ত রাত্রি উপাসনা ও ধ্যান-ধারণায় রত থাকিতেন। ফজরের নামাজের পরে কোরান শরীফের এক-তৃতীয়াংশ আবৃত্তি করিতেন। তৎপর মধ্যাহ্ন পর্যন্ত সমাগত লোকদিগকে উপদেশ ও রোগীদিগকে পানি পড়িয়া দিতেন। তাঁহার পানি পড়ায় সহস্র সহস্র ব্যক্তি রোগ-মুক্ত হইতেছিল। তিনি যেখানে যাইতেন সেইখানেই কবিরাজ ও হাকিমগণের অনু মারা যাইত। তাঁহার পানিপড়ার অদ্ভুত শক্তি দর্শনে লোকে আর কবিরাজ বা হাকিমের কাছে ঘেঁষিত না। দুই দিনের রাস্তা হইতে লোক আসিয়া পানি পড়াইয়া লইয়া যাইত, তিনি মধ্যাহ্নে জোহরের নামাজ পড়িয়া আসরের নামাজের পূর্ব পর্যন্ত তিন ঘণ্টা মাত্র ঘুমাইতেন। তাঁহার নিদ্রার এই এক আশ্চর্যভূ ছিল যে, আসরের ওয়াক্ত হওয়া মাত্রই তিনি জাগ্রত হইতেন। বার বৎসরের মধ্যে তাঁহার এই নিয়মের কোন ব্যতিক্রম হয় নাই। আসরের নামাজ অন্তে সন্ধ্যার পূর্ব পর্যন্ত কোন কোন দিন তিনি আধ্যাত্মিক-সঙ্গীত ও গজলের চর্চা করিতেন। কোন কোন দিন গ্রন্থ রচনা করিতেন। তৎপর সন্ধ্যার প্রাকালে খোলা মাঠে বা নদীর ধারে ভ্রমণ করিতেন এবং সাক্ষোপাসনা মুক্ত আকাশের নীচেই প্রায় সম্পন্ন করিতেন। মগরেব বাদ কিঞ্চিৎ বিশ্রাম ও সমাগত লোকজনদিগকে উপদেশ দিতেন। তাঁহার স্বর অতীব মিষ্ট, সুস্পষ্ট এবং গভীর ছিল। উপদেশে শ্রোতৃবর্গ তনুয়চিত্ত হইয়া পড়িত। মধ্যরাত্রি পর্যন্ত লোকজনের ভিড় কমিত না। মসলা-মসায়েল, ফতোয়া-ফারাজ এবং অধ্যাত্ম-নীতি সম্বন্ধে তাঁহাকে শত শত লোকের প্রশ্নোত্তর দিতে হইত। তাহাতে তিনি বিরক্তির পরিবর্তে আনন্দ প্রকাশ করিতেন। মওলানা, মুন্শী, খোন্দকার ও মুফতিগণ তাঁহার নিকট নানা বিষয়ের মীমাংসার জন্য উপস্থিত হইতেন। সকাল হইতে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্যন্ত লোকারণ্যের হলহলায় দিগ্‌মণ্ডল নিনাদিত হইত। তিনি যেখানে অবস্থান করিতেন, সেখানে দস্তুরমত হাট-বাজার ও থাকিবার চটী বসিয়া যাইত। রাত্রি দ্বিপ্রহরে লোকজন বিদায় হইলে তিনি নৈশ-উপাসনা সমাপ্ত করিয়া ধ্যানস্থ হইতেন। ফজরের সময় এই ধ্যান ভঙ্গ হইত। ধ্যানের সময় তাঁহার সর্বাত্ম

হইতে এক প্রকার শিষ্ট জ্যোতিঃ নিগত হইত।

ফলতঃ শাহ্ মহীউদ্দীন একজন অসাধারণ জ্ঞানী এবং তপঃপ্রভাবসম্পন্ন বিশ্ব-প্রেমিক দরবেশ ছিলেন। আরবী, ফারসী, তুর্কী ও সংস্কৃত এই চারটি ভাষায় তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। সমগ্র কোরান, হাদিস, মস্নবী ও হাফেজ তাঁহার মুখস্থ ছিল। ইহা ছাড়া সংস্কৃত উপনিষদ, ষড়দর্শন ও গীতা তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা তাঁহার সংস্কৃতজ্ঞানের অগাধ পরিচয় পাইয়া চমৎকৃত হইয়া যাইতেছেন। ইতিহাস, দর্শন, ধর্মশাস্ত্র এবং কাব্য এই চারি বিষয়ে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও সূক্ষ্মদর্শিতা অভিব্যক্ত হইত। তাঁহার বজরাখানি আড়াই হাজারেরও উপর গ্রন্থে পরিপূর্ণ ছিল। বাল্যকাল হইতেই বিশ্বশোষণ-জ্ঞানপিপাসা তাঁহাকে আকুল করিয়া তুলিয়াছিল। জ্ঞান-চর্চার ব্যাঘাত হইবে বলিয়াই তিনি দারপরিগ্রহ করেন নাই এবং নিজে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াও রাজ-সিংহাসন কনিষ্ঠকে সমর্পণ করিয়াছিলেন। তিনি আদর্শ মুসলমানের ন্যায় জ্ঞানপিপাসু, উদারপ্রকৃতি, ধর্মনিষ্ঠ ও বিশ্বহিতৈষী পুরুষ ছিলেন।

নয় মাস কাল তিনি বাঙ্গলায় আসিয়াছেন। ইহারই মধ্যে তিনি ৩৫ হাজার হিন্দুকে নানাপ্রকারের ভূত-প্রেত দৈত্য-দানবের কল্পিত বিশ্বাসের মসীমলিন অন্ধকার হইতে একমাত্র সচ্চিদানন্দ আত্মাত্মার উপাসনা অর্চনায় দীক্ষা দিয়া মুসলমান সমাজভুক্ত করিয়াছেন! তাহাদের টিক কাটাইয়া, তিলক মুছাইয়া, গলার রসি খোলাইয়া, সভ্য-পরিচ্ছদে বিভূষিত করিয়াছেন। প্রাচীন হিন্দুরা যে মুসলমান ছিলেন, ইহা তিনি বেদ ও উপনিষদ হইতে প্রমাণ করিয়া হিন্দু পণ্ডিতদিগকে চমৎকৃত করিয়া দিতেন। প্রাচীন আর্ষজাতি যে সর্বাংশে মুসলমানদিগেরই ন্যায় একেশ্বরবাদী ও একজাতিভুক্ত ছিলেন, তাহারা যে সাকার ও জড়োপাসনার বিরোধী, এমন কি তাহারা যে মুসলমানদিগেরই ন্যায় পরম উপাদেয় জ্ঞানে গোমাংস ভক্ষণ করিতেন* এবং মৃতদেহগুলিকে নিষ্ঠুর ও পৈশাচিক ভাবে চিতায় দহ না করিয়া পরম যত্নে গোর দিতেন, তাহা তিনি বেদ, উপনিষদ ও পুরাণ হইতে তন্ন তন্ন করিয়া দেখাইয়া দিতেন। বিধবা-বিবাহের বহু ঘটনা ও শাস্ত্রীয় বাক্য প্রদর্শনপূর্বক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে পরাস্ত করিয়া দিতেন। আধুনিক হিন্দুগণ যে আদিম অসভ্য অনাৰ্যজাতির সংশ্লেবে মৃৎ-প্রস্তর উপাসক এবং বাবস্থাদাতা ব্রাহ্মণদিগের স্বার্থমূলক কট ষড়যন্ত্রে পতিত হইয়া লতধাবিচ্ছিন্ন, কুসংস্কার-সম্পন্ন এবং ধর্মভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে, তাহা তিনি এমন ভাবে চক্ষে অশ্রুনি নির্দেশপূর্বক দেখাইয়া দিতেন যে, স্বার্থহীন ব্রাহ্মণেরাও অশ্রুপাত করিত। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, কালী, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ ইত্যাদি দেব-দেবী যে আকাশ-কুসুমের ন্যায় কবি-কল্পিত তাহা ব্রাহ্মণগণও

* মূল রামায়ণ, মহাভারত, মনুসংহিতা, ভাবপ্রকাশ দেখ। অতিথি আসিলে গো-মাংস দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হইত বলিয়া সংস্কৃত ভাষায় অতিথির এক নাম 'গোমু'।

শেষে যুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেন। তাঁহার জ্ঞানগর্ভ অমৃত-নিস্যন্ধিনী বক্তৃতা শ্রবণে পাঁচ হাজার ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় লাভ করিয়া মানবজ্ঞানের সার্থকতা সম্পাদন করেন। মহাত্মা শাহ্ মহীউদ্দীন পাঁচ লক্ষ মুসলমানকে শিষ্যত্বে দীক্ষিত করেন। শেরেক, বেদাত প্রভৃতি কুসংস্কার যাহা হিন্দু সংস্পর্শে মুসলমানদের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, তিনি তাহা সমূলে উৎপাটিত করেন।

তিনি দেশের নানা স্থানে বহু ইন্দারা ও দীর্ঘিকা বনন করেন। শুধু তাহাই নহে, ধামা রাস্তা নির্মাণ, মসজিদ, মাদ্রাসা স্থাপন ইত্যাদি বহু জনহিতকর সংকার্যে তিনি প্রভূত অর্থ ব্যয় ও পরিশ্রম করিতেন। তিনি প্রত্যেক সভায় সমাগত হিন্দু-মুসলমানকে প্রাণ্ডুক্ত সংকার্যসমূহের জন্য যথাসাধ্য সাহায্য করিতে বলিতেন। শ্রোতৃমণ্ডলী তাঁহার কথায় আনন্দের সহিত অর্থ দান করিত। এইরূপে নয় মাসে তিনি প্রায় লক্ষ টাকা প্রাণ্ড হইয়াছিলেন। এই টাকার সমস্তই পূর্বোক্ত সদনুষ্ঠানসমূহে ব্যয় করিয়াছিলেন। মসজিদ ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠায় স্বহস্তে তিনি ভিত্তি-প্রস্তর প্রতিষ্ঠিত করিতেন। ইন্দারা ও পুষ্করিণী খননে দশ কোদাল করিয়া মাটি অগ্রে নিজে উঠাইতেন। রাস্তা নির্মাণেও সর্বাগ্রে নিজে মাটি কাটিয়া দিতেন। তাঁহার এই প্রকার প্রবল লোকহিতৈষণায় সকলেই মুগ্ধ হইয়া যাইত। হিন্দুরা তাঁহাকে দেবতা বলিয়া পূজা করিত।

তিনি প্রত্যহ অপরিমাণ পরিমাণে যে সমস্ত ফল, মূল, ছাল, ডাল, তরিতরকারি, মৎস্য, খাসী, মোরগ, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মাখন ও বস্ত্র উপহার পাইতেন, তাহা দীন-দুঃখী অনাথদিগকে জ্ঞাতিবর্গ-নির্বিশেষে বিতরণ করিতেন, এবং কোন স্থান হইতে যাইবার পূর্বদিন মহাসমারোহপূর্বক সকলকে ভোজ্য দিতেন। ফলত, গঙ্গা যেমন হিমালয় হইতে নির্গত হইয়া বঙ্গের সমতলভূমিতে সহস্র শাখা বিস্তারপূর্বক সহস্র জল-প্রবাহে জমী উর্বরা করিয়া, মাঠে মাঠে সোনা ফলাইয়া, তৃষ্ণার জ্বালা দূরীভূত করিয়া, দেশের জঞ্জালজাল ভাসাইয়া লইয়া, পণ্য-পূর্ণ তরণী বহিয়া, বায়ুকে পবিত্র ও স্নিগ্ধ করিয়া, সমস্ত দেশে স্বাস্থ্য শান্তি ও আনন্দ ছড়াইয়া কল্ক নাদে আপন মনে বহিয়া যাইতেছে, মহাত্মা শাহ্ মহীউদ্দীন সাহেবও তেমনি প্রেম-পুণ্য-সত্যের আলোক-উজ্জ্বল উদার হৃদয় ও বিশ্বহিত-কামনায় সৌরভ-পূর্ণ মন লইয়া কাশ্মীর হইতে বাঙ্গালায় আসিয়া বাঙ্গালার তরুণায়া-শীতল গ্রাম ও নগরে নবজীবন, নবআনন্দ ও নবপুলকের স্রোত গৃহে গৃহে প্রবাহিত করিতেছিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

তালিকোটের যুদ্ধ

বর্ষান্তে শরভের প্রারম্ভে দিগ্ভয় পবিত্র এবং ধরাতল সুগম হইলে, দাক্ষিণাত্যে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সমর-দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। তালিকোটের প্রশস্ত জে.এ উভয় বাহিনী পরস্পর বিজিগীষু হইয়া সম্মুখীন হইল। আহমদ নগর, বন্দর, বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সোলতানদিগের সৈন্যের সহিত নানাস্থান হইতে বজ্রাতীত হিতাভিলাষী ইসলামের গৌরবাকাজী যুবক যোদ্ধগণ আসিয়া যোগদান করিলেন। বীরকুলচূড়ামণি সোলতান হোসেন নিজাম শাহ দেওয়ান মুসলিমবাহিনীর সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিলেন। রাজা রাম রায় স্বকীয় সেনাদল পরিচালনার ভার গ্রহণ করিলেন। এই ভীষণ সমরোদ্যমে সমগ্র দক্ষিণ-ভারত ৫ মাস হইয়া উঠিল। কয়েক দিন পর্যন্ত উভয় বাহিনী পরস্পর আক্রমণোদ্যত হইয়া অবস্থান করিবার পরে, একদা প্রত্যুষে একদল হিন্দুসৈন্য মুসলিম বাহিনীর এক অংশ আক্রমণ করিল। এই আক্রমণের ফলে সেইদিন উভয় পক্ষে ভীষণ সমর-ঝটিকা প্রবাহিত হইল। মুসলমান সৈন্য জেহাদের নামে এবং হিন্দু সৈন্য রাজ্য-রক্ষা-কল্পে মগ্ন হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। হয়, হস্তী এবং বীরপুরষদিগের পদভরে পৃথিবী কম্পিত হইল। তরবারির চাঞ্চল্যে, বর্ষার দীপ্তিতে অসংখ্য বিদ্যুৎকাল হইতে লাগিল। তোপের গর্জনে চতুর্দিক্ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। অশ্বারোহী, পদাভিক এবং গোলন্দাজ সৈন্যগণ অসাধারণ রণ-কৌশল প্রকাশ করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। সমস্ত দিবসের ভীষণ যুদ্ধেও কোন পক্ষের জয়-পরাজয় নির্ণয় হইল না।

এইরূপ ক্রমাগত তিন দিবস ভীষণভাবে সমর চলিল। চতুর্থ দিবস মোসলেম-বাহিনী বিপুল বিক্রমে হিন্দুদিগকে আক্রমণ করিল। গাজিগণ “আল্লাহ আকবর” রবে মুহূর্মুহঃ আকাশ-পাতাল কম্পিত করিয়া ব্যাঘ্রের ন্যায় দুর্ধর্ষ বিক্রমে শত্রু-সৈন্য সংহার করিতে লাগিল।

বৈশাখ-বাত্যা-তাড়িত সমুদ্রের ন্যায়, রণক্ষেত্রে ভয়াবহ আকার ধারণ করিল। সহস্র সহস্র হিন্দু সৈন্য আহত ও নিহত হইয়া ভূপতিত হইতে লাগিল। অপরাহ্ন কালে মুসলমানের দীর্ঘপ্রতাপ রোধে অসমর্থ হইয়া হিন্দুসৈন্য পশ্চাতে হটিতে লাগিল। তাহারা ধীরে ধীরে পশ্চাতে হটিয়া একটি উচ্চাবচ ভূমিতে বাইয়া স্থির হইল।

পনাদিবস প্রত্যুষে বিজয়নগরের সৈন্যদল সে-স্থান হইতেও বিতাড়িত হইল।

১৬ দিবস বিজয়নগর হইতে বহু সংখ্যক নূতন তোপের আমদানি হওয়ায়

হিন্দুসেনা সাহসী হইয়া তেজের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। পর্তুগীজ গোলন্দাজগণ অবিশ্রান্ত গোলা নিক্ষেপে মুসলমান পক্ষের বহু কতি সাধন করিল। হোসেন নিজাম শাহ্ ক্রোধে সিংহের ন্যায় গর্জন করিয়া একদল যোদ্ধাকে প্রানের মমতা ত্যাগ করিয়া তোপের উপর পড়িয়া, তোপ কাড়িয়া লইতে বলিলেন। বঙ্গীয় পাঠান-বীর ইসা খাঁ তোপের উপর পড়িবার জন্য ৫০ জন আত্মোৎসর্গকারী বীরপুরুষকে আহ্বান করিলেন। তাঁহার আহ্বানে তাঁহার অধীনস্থ দুই সহস্র যোদ্ধার প্রত্যেকেই শহীদ হইবার জন্য লালায়িত হইয়া তোপ কাড়িয়া লইবার জন্য উদ্যত হইলেন। ইসা খাঁ তাঁহাদের রণোন্মত্ততা দর্শনে অতিমাত্র উৎসাহিত হইলেন এবং সকলকে নিরস্ত করিয়া বঙ্গীয় যুবকদিগের মধ্য হইতে বিনা বিচারে পঞ্চাশজনকে গ্রহণপূর্বক বিদ্যুৎবেগে তোপ লক্ষ্য করিয়া ঘোড়া ছুটাইলেন। বাজ পক্ষী যত দ্রুত চটকের উপর বা নেকড়ে বাঘ যত সত্বর মেঘপালের উপর উৎপতিত হয়, ইসা খাঁ বাঙ্গালী যোদ্ধাগণকে লইয়া তদপেক্ষা তীব্র বেগে, ভীষণ ঝটিকাবর্তের ন্যায় মুক্ত কৃপাণ করে “আল্লাহ্ আক্ববর” রবে গোলন্দাজ সেনার উপরে পতিত হইলেন! গোলার আঘাতে ৪৩ জন সৈনিক এবং পঁয়ত্রিশটি অশ্বদেহ চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল। সাতজন মাত্র বীর করাল কৃপাণ করে তোপখানার উপর পতিত হইয়া তরবারির ক্ষিপ্ত প্রহারে তোপ-পরিচালক গোলন্দাজগণকে ষণ্ড ষণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিলেন। সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় তোপখানা বক্ষা করিবার জন্য চতুর্দিক হইতে সৈন্যদল আসিয়া ভীষণ বিক্রমে তাহাদিগের প্রতি অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল। সপ্তজন মুসলমান গাজী রুদ্ধশ্বাসে চরম বিক্রমে তরবারি চালাইতে লাগিলেন। দুইজন বিশেষ আহত এবং অবশিষ্ট পাঁচজন শরীরের স্থানে স্থানে আঘাত প্রাপ্ত হইয়াও ক্ষুদ্র শৈলের ন্যায় অসংখ্য সৈন্যের ভীষণ আক্রমণরূপ নদীর প্রবাহকে গুরুতর বাধা প্রদান করিলেন। ওদিকে মুসলিম বাহিনীর অগ্রগামী দলের সৈন্যগণ আসিয়া পড়ায় হিন্দু সেনা তোপখানা পরিত্যাগ করিয়া বৃকতাড়িত শৃগালের ন্যায় পশ্চাদগামী হইল। মুসলমান সেনা তখন তোপের মুখ ফিরাইয়া হিন্দু সেনাকে লক্ষ্য করিয়া তোপ দাগিতে লাগিল। চতুর্দিক বহুনির্ধোষ-নির্নাদিত বনভূমির ন্যায় ভীতিসঙ্কুল হইয়া উঠিল। তোপের গোলার অভাব হওয়ায় সোলতান নিজাম শাহ্ রাশি রাশি পয়সা পুরিয়া তোপ দাগিতে আদেশ করিলেন। তাহাতে গোলা অপেক্ষা অধিকতর সুফল ফলিল। পয়সাগুলি বিচ্ছুরিত হইয়া চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হওয়ায় বহুসংখ্যক হিন্দু সেনা আহত এবং নিহত হইল। তাহার ফলে অবশিষ্ট সৈন্য-বৃহৎ ভগ্ন করিয়া নগরাভিমুখে পলায়নপর হইল। মোসলেম সেনা পলায়নপর হিন্দু সেনার পশ্চাদ্ভাবিত হইয়া তাহাদিগকে হত্যা করিতে লাগিল। হিন্দু সেনা নগরে প্রবেশ করিয়া নগরদ্বার রুদ্ধ করিল এবং নগর পরিবেষ্টন করিয়া যে পরিখা ছিল, তাহার সেতু তুলিয়া ফেলিল।

বিজয়নগরের চতুর্দিক সমুচ্চ সুদৃঢ় প্রাচীর এবং দুই শত হস্ত পরিমিত প্রশস্ত ও বিশ হস্ত গভীর পরিখা দ্বারা বেষ্টিত ছিল। পরিখার গর্ভে নানাবিধ তীক্ষ্ণাশ্র শেল, শূল ও লৌহদণ্ড প্রোথিত ছিল এবং প্রাচীরোপরি প্রস্তর নিক্ষেপের উপযোগী বহুসংখ্যক যন্ত্র ও ভোপশ্রেণী সজ্জিত ছিল। মুসলমান সৈন্য, নগরের সিংহদ্বারের নিকটবর্তী হইয়া প্রাচীর ভাঙ্গিবার জন্য একস্থান লক্ষ্য করিয়া অনবরত ভোপ দাগিতে লাগিল। বিজয়নগরের পক্ষে পর্দুগীজ গোলন্দাজগণও যথায়থ তাহার উত্তর দিতে লাগিল।

পরিখা অতিক্রম করিতে না পারিলে নগর আক্রমণের বিশেষ সুবিধা নাই দেখিয়া নিজাম শাহ পরিখা উত্তীর্ণ হইবার জন্য কৌশল ও বুদ্ধি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু সংখ্যক নৌকা নির্মাণপূর্বক পরিখা উত্তীর্ণ হইবার জন্য চেষ্টা করা হইল। কিন্তু তাহাতে কোনই সফল ফলিল না। অবশেষে বহুসংখ্যক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ ও প্রস্তর নিক্ষেপপূর্বক সেতু নির্মাণের পরামর্শ স্থির হইল। ভোপের আশ্রয়ে ইসা খাঁ একদল ধর্মযোদ্ধা লইয়া সেতু রচনা করিতে লাগিলেন। বিপক্ষের গোলা ও প্রস্তর নিক্ষেপে দলে দলে বীরপুরুষ হত হইতে লাগিলেন, কিন্তু সে-দিকে আজ কাহারও দৃকপাত নাই! অসংখ্য শবদেহে পরিখার গর্ভদেশের কিয়দংশ পরিপূর্ণ হইয়া গেল। পরিখার জল রক্তস্রোতে আরক্ত হইয়া উঠিল। বহু সাধনা এবং বহু প্রাণদানে সেতুর কতক অংশ নির্মিত হইল বটে, কিন্তু প্রাচীরের উপরিস্থ ভোপখানা হইতে অজস্রধারে অব্যর্থ লক্ষ্যে গোলা ও প্রস্তর বর্ষণ হওয়ায় অবশিষ্ট অংশ নির্মাণ করা অসম্ভব হইয়া পড়িল। ইসা খাঁ এই প্রতিবন্ধকতায় আরও উত্তেজিত হইয়া তীষণ গর্জন করিয়া উঠিলেন। বিংশতি হস্তপরিমিত স্থান সেতু নির্মাণ হইতে অবশিষ্ট ছিল। ইসা খাঁ জলদগভীর স্বরে সৈন্যবৃন্দকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, “কে আছ আজ ধর্মপ্রাণ ষোদাভক্ত সাক্ষা মুসলমান! এখনি এই সেতু হইতে আমার পশ্চাতে ঝাঁপাইয়া পড়। সাঁতার কাটিয়া এই অংশ অতিক্রম করিয়া দ্বারের মূলদেশে যেয়ে দ্বার ভাঙ্গিবার চেষ্টা কর।”—এই কথা বলিয়া পাঠান-বীর উন্মত্তের ন্যায় পরিখার জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন।

তাঁহার সঙ্গে সহস্র সহস্র যোদ্ধা পরিখায় ঝাঁপাইয়া পড়িয়া পরপারে উত্তীর্ণ হইয়া আঁকশির সাহায্যে তীরে উঠিয়া স্বারদেশ আক্রমণ করিলেন। সহস্রাধিক মুসলমান পরিখার জলগর্ভস্থ তীক্ষ্ণাশ্র অস্ত্রে এবং কামানের গোলার আঘাতে প্রাণত্যাগ করিলেন। ইসা খাঁ পরিখা অতিক্রমকালে বাহুতে একটা তীক্ষ্ণাশ্র বিধাত্ত শূলের সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু রণোন্মত্ত অবস্থায় তিনি তাহা কিছুমাত্র অনুভব করিতে পারিলেন না। তীষণ বিস্ফোরক প্রয়োগে সিংহদ্বার চূরমার হইয়া গেল। তখন শাগিত কৃপাণ হস্তে ‘দীন দীন’ রবে মুসলমান বীরগণ কুখার্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় নগরভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। সমর-কাণ্ড অতি প্রচণ্ড এবং

লোমহর্ষণ-জনকভাবে চলিল! নাগরিক সৈন্যবৃন্দ ক্রুদ্ধনিশ্বাসে আপনাদের বিক্রম নিঃশেষে একবার ভীষণ যুদ্ধোৎসাহ দেখাইল। কিন্তু উদ্বেলিত সাগর-প্রবাহের ন্যায় মুসলমান সৈন্যের শব্দ-গতি রোধ করে কাহার সাধ্য? অসংখ্য পৌত্তলিক যোদ্ধার ছিন্নমস্তকে রণভূমি দুর্গম হইয়া উঠিল। মহাবীর সোলতান নিজাম শাহ বিশ্বাসঘাতক রাম রায়ের অনুসন্ধান করিতে করিতে তাহাকে মৃতদেহপুঞ্জের মধ্যে আত্মলুঙ্কায়িত ভাবে আবিষ্কার করিয়া টানিয়া বাহির করিলেন। তাহার এই আত্মগোপনের ভাবে সকলেই হাসা ও বিদ্রূপ করিতে লাগিল। অসংখ্য হিন্দু সৈন্যগণ রাম রায়কে তিরস্কার ও অভিসম্পাত করিতে লাগিল। ঘৃণা ও লজ্জায় কাপুরুষ রাম রাজা সহসা মর্মে ছুরিকা বিদ্ধ করিয়া আত্মহত্যা করিলেন।

নগরবাসিগণ নিজাম শাহের আনুগম্য ও প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া পনের লক্ষ টাকা নগর প্রদান করিলেন। নিজাম শাহ দুর্গশীর্ষ হইতে ত্রিশূল-অঙ্কিত পতাকা ভূতলে নিক্ষেপ করতঃ স্বকীয় ঐসলামিক পতাকা প্রোথিত করিলেন। মোসলের বীরগণ “আল্লাহ্ আকবর” রবে আকাশ-পাতাল কম্পিত করিয়া জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। এইরূপ তালিকোট যুদ্ধে বিজয় লাভান্তে বিজয়নগর অধিকৃত হইল। রাম রায়ের অদূরদর্শিতা এবং ঔদ্ধত্যের ফলে বিজয়নগর হিন্দু-শাসনের তামসী ছায়া হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়া ঐসলামিক সুশাসনের উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত হইল!

বিজয়নগরের বিজয় লাভের পরে মহাবীর ইসা খাঁ দাক্ষিণাত্যের সোলতান ও প্রধান প্রধান সেনাপতিগণ কর্তৃক উচ্চকণ্ঠে প্রশংসিত হইলেন। তিনি যে বাহুতে বিঘাত শূলের আঘাত পাইয়াছিলেন, তাহারও চিকিৎসার বিশেষ বন্দোবস্ত হইল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

কুলগুরু যশোদানন্দের ইসলামে দীক্ষা

শাহ সোলতান সুফী মহীউদ্দীন কাশ্মীরী শ্রীপুরে উপস্থিত হইবার অল্পকাল পরেই তাহার যশঃ-সৌরভে শ্রীপুর পূর্ণ হইয়া গেল। সহস্র সহস্র লোকের দুরারোগ্য ব্যাধি তাহার পবিত্র কর-স্পর্শে বিলুপ্ত হইতে লাগিল। চতুর্দিক হইতে ধনী দরিদ্র বহু মুসলমান আসিয়া তাহার উপদেশ-রসামৃত পান করিয়া পিপাসিত শ্রাণ শীতল করিল। অনেক হিন্দুও তাহার অমৃতনিস্যাম্বিনী বক্তৃতা এবং কোরানের ব্যাখ্যা শ্রবণে ইসলামের পবিত্র কলেমা পাঠ করিয়া আপনাদের জীবন পবিত্র করিল। ফলতঃ, শ্রীপুরের রাজবাটীতে দুর্গোৎসব এবং শ্রীপুরের ঘাটে সুফী সাহেবের নিকট লোক-সমাগম ও দীক্ষার উৎসবে শ্রীপুর অহোরাত্র জন-কোলাহলে মুখরিত হইতে লাগিল। হিন্দু-ধর্মত্যাগী নব মুসলমানদের জন্য হিন্দু

সমাজে বিষম আন্দোলন উপস্থিত হইল।

পূজার উৎসব শেষ হইলে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সম্মিলিত হইয়া হিন্দু ধর্ম রক্ষা করিবার জন্য এক বিরাট সভার আয়োজন করিলেন। শ্রীপুরেশ্বরের কুলগুরু মহাপণ্ডিত সার্বভৌম যশোদানন্দ ঠাকুরকে মুখপাত্র করিয়া সেই সভাস্থলে সুফী সাহেবকে আহ্বান করা হইল। সুফী সাহেবও বহু আলেম, ফাজেল এবং সম্ভ্রান্ত মুসলমানে পরিবেষ্টিত হইয়া সভাস্থলে গমন করিলেন। এই মহাসভার বিচার, বিতর্ক ও মীমাংসা শ্রবণ করিবার জন্য চতুর্দিক হইতে বিপুল জনতা আসিয়া সভাকক্ষে সমবেত হইল। দাস্তা-হাস্তামার ভয়ে সহস্রাধিক যোদ্ধা মুক্ত তরবারি করে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা কার্যে ব্যাপৃত হইল। যথাসময়ে রাজা কেদার রায়ের আদেশে সার্বভৌম যশোদানন্দ ঠাকুর বেদের প্রশংসা কীর্তন করিয়া ইসলাম ধর্ম এবং সুফী সাহেবের অযথা কুৎসা কীর্তন করিতে লাগিলেন। তিনি হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব, মহত্ব এবং গৌরবের কথা কিছুমাত্র প্রমাণ না করিয়া কেবল ইসলাম ধর্মের আক্রোশপূর্ণ কুৎসা কীর্তন করায় সমবেত হিন্দু-মুসলমান ভদ্রমণ্ডলী সকলেই দুঃখিত হইলেন। মুসলমানগণ ভয়ানক উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন কিন্তু সুফী সাহেব সকলকেই ধৈর্য ধারণ করিতে অনুরোধ করিলেন। অতঃপর আসরের নামাজের সময় উপস্থিত হইলে পণ্ডিত যশোদানন্দ ঠাকুর বিদ্বেষ-হলাহল উদ্‌গীরণ হইতে নিবৃত্ত হইলেন এবং সুফী সাহেবও সমবেত মুসলমানগণও লইয়া উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

উপাসনা শেষ হইলে সুফী সাহেব উচ্চৈঃস্বরে “লাইলাহা ইল্লাল্লাহ মোহাম্মদুর রসুলুল্লাহ” এই কলেমা সমস্ত মুসলমানকে লইয়া প্রমত্ত অবস্থায় পাঠ করিতে লাগিলেন। কলেমার ধ্বনিতে চতুর্দিক প্রতিধ্বনিত হইল। কলেমা পাঠ করিতে করিতে সুফী সাহেব উন্মত্ত হইয়া পড়িলেন। তাহার বদনমণ্ডল হইতে দিবাভ্যোতিঃ নির্গত হইল। তাহার প্রভাব এবং প্রতাপে সভাস্থল যেন প্রদীপ্ত এবং কম্পিত হইয়া উঠিল! তৎপর তিনি সভা মধ্যে সহসা দণ্ডায়মান হইয়া পণ্ডিত যশোদানন্দের দিকে তর্জনী তুলিয়া তিনবার গুরুগভীর মেঘমন্ত্রে বলিলেন, “হে যশোদানন্দ! তুমি সত্য গ্রহণ কর।”

শাহ সাহেব এইরূপ বলিবার পরে যে অদ্ভুত ব্যাপার সাধিত হইল, তাহাতে সকলেই বিস্মিত এবং স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন। ঠাকুর যশোদানন্দ বেগে সভামধ্যে উৎখিত হইয়া গভীর রবে “লাইলাহা ইল্লাল্লাহ মোহাম্মদুর রসুলুল্লাহ” এই কলেমা অনবরত পাঠ করিতে লাগিলেন এবং যজ্ঞসূত্র আকর্ষণ করতঃ ছিড়িয়া ফেলিলেন! অতঃপর পণ্ডিতবর যশোদানন্দ ক্রন্দন করিতে করিতে শাহ সুফী মহীউদ্দীন সাহেবের চরণতলে নুষ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। মুসলমানগণ আনন্দে “আল্লাহ আকবর” রবে আকাশ-পাতাল কাঁপাইয়া জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

যশোদানন্দ কাতর কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, “হজরত, আমাকে পবিত্র ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করুন। ধর্মের আন্তর আমার প্রাণের ভিতরে জ্বলে উঠেছে: আমার

পাপ অস্ত্রকরণ দণ্ড হচ্ছে। আমি আর কাঠ-পাথরের পূজা করব না।” এই বলিয়া ঠাকুর দীক্ষিত হইবার জন্য বিষম ব্যগ্রতা প্রকাশ ও আরও গভীরভাবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

সুফী সাহেব তখন তাহাকে ক্ষৌর কার্য ও স্নান সম্পন্ন করিতে আদেশ দিলেন। অল্পক্ষণ মধ্যেই পণ্ডিত যশোদানন্দ মস্তকের টিকি কাটিয়া নখ ও কেশাদি সংস্কার-পূর্বক স্নান করিয়া, সভ্যজনোচিত আচকান পায়জামা ও টুপী পরিয়া দিব্যমূর্তিতে সুফী সাহেবের চরণপ্রাপ্তে স্থান গ্রহণ করিলেন। সুফী সাহেব তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া বিশ্বাসের মন্ত্রে তাঁহাকে দীক্ষিত করিলেন এবং তাঁহার নাম জহিরুল হক রাখিলেন। মুসলমানগণ পুনরায় আনন্দোচ্ছ্বাসে আকাশ-পাতাল কাঁপাইয়া “আল্লাহ আকবর” ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। রাজকুলগুরু সর্বজনমান্য মহাপণ্ডিত যশোদানন্দ ঠাকুরের ইসলাম গ্রহণে হিন্দুগণ হাহাকার করিতে লাগিল! রাজা কেদার রায় দুঃখে এবং লজ্জায় সভাস্থল পরিত্যাগ করিয়া ক্ষুণ্ণমনে প্রাসাদে ফিরিলেন।

পণ্ডিত যশোদানন্দ ইসলাম গ্রহণ করিবার কয়েকদিন পরে, একদিন রাজা কেদার রায় তাঁহাকে পূর্ববৎ সমাদরে রাজ-দরবারে আহ্বান করিলেন। নবীন মুসলমান জহিরুল হক দুই চারিজন মুসলমান বন্ধুসহ রাজ-দরবারে আগমন করিলেন। রাজা সম্মানের সহিত তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া কৃতঘ্নতাপূর্বক সহসা বন্দী করতঃ দুর্গাভ্যন্তরস্থ কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। রাজকীয় প্রহরী এবং অন্যান্য কর্মচারিগণ জহিরুল হকের প্রতি বিষম অত্যাচার করিয়া মনের ক্ষোভ মিটাইতে লাগিল। তাঁহার সমস্ত ভূসম্পত্তি রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত হইল।

জহিরুল হকের নিদারুণ লাঞ্ছনা এবং নির্ধাতনে কারাগৃহের পাষাণ-প্রাচীর এবং কক্ষতল অশ্রুজলে বিধৌত এবং আর্তনাদে শব্দায়মান হইতে লাগিল! দুর্গের অভ্যন্তরস্থ অতি নিভৃত কারাগারের সংবাদ বাহিরে কেহ অবগত না হইলেও, দুর্গের অভ্যন্তরস্থ ব্যক্তিদ্বিগের কাহারও জ্ঞানিতে বাকী থাকিল না। যশোদানন্দের নির্ধাতন এবং লাঞ্ছনায় সকলেই আনন্দিত হইল। অনেকের নিকট তাহা বৈঠকী গল্প, হাসি-ঠাট্টা এবং বিদ্রূপের বিষয়ে পরিণত হইল। কেবল করুণাময়ী স্বর্ণময়ীর কোমল প্রাণ যশোদানন্দের দুঃখে ব্যথিত হইল। স্বর্ণময়ী মধ্যে মধ্যে কাহারও সন্মুখস্থ উদ্যানে বেড়াইতে যাইয়া লৌহ-দ্বারের গরাদের ভিতর দিয়া যশোদানন্দকে দেখিয়া আসিত। উদ্যানে কোন ফল পাইলে তাহাও প্রহরীকে বলিয়া গোপনে কুলগুরুকে দিয়া আসিত। যশোদানন্দ কারাগারের অসীম দুঃখ এবং নির্ধাতনের মধ্যেও করুণাময় পরাৎপর পরম পিতা পরমেশ্বরের ধ্যান-ধারণা এবং অর্চনা-আরাধনায় মনোনিবেশ করিয়া হৃদয়কে স্থির ধীর করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার নিষ্ঠা এবং গভীর ধর্মভাব দেখিয়া প্রহরীদিগের মধ্যে কয়েকজন তাঁহার প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধাবান হইয়া উঠিল। হিন্দু থাকিতে

যশোদানন্দকে তাহারা যেরূপ শ্রদ্ধা করত, একগে তাহা অপেক্ষাও বেশী শ্রদ্ধা করিতে লাগিল। ক্রমে তাহারা যশোদানন্দের উপদেশে ইসলাম ধর্মের প্রতিও গভীর অনুরাগ প্রকাশ করিতে লাগিল। অতঃপর স্বর্ণ তাহাদের সহানুভূতি এবং সাহায্যে জহিরুল হকের খাদ্যের অসুবিধা দূর করিল। নানা প্রকার উৎকৃষ্ট ভোজ্যভাত সরবরাহ করিতে লাগিল। স্বর্ণময়ী জহিরুল হকের উদ্ধারের জন্য যত্ন বিলোড়ন করিতে লাগিল বটে, কিন্তু সহসা কোন নিরাপদ পন্থা উদ্ভাবন করিতে পারিল না। স্বর্ণ নিজের জীবনকে বিপদাপন্ন করিয়াও জহিরুল হককে মুক্ত করিবার জন্য প্রহরীকে অর্ধলোভে বশীভূত করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু জহিরুল হক কিছুতেই সেরূপ ভাবে অন্যের জীবনকে বিপদাপন্ন করিয়া কারাগার হইতে পলায়ন করিতে রাজি হইলেন না।

অতঃপর স্বর্ণ সহসা একদিবস শিরঃপীড়ার ভাণ করিয়া আহর নিদ্রা পরিত্যাগ করিল। কোনও রূপেই সে শিরোবেদনার লাঘব হইল না, বরং শিরঃপীড়ার সহিত নানা উপসর্গ আবির্ভূত হইয়া স্বর্ণকে যারপর-নাই ব্যতিত করিয়া তুলিল। কবিরাজ এবং হাকিমগণ স্বর্ণের এই আকস্মিক ব্যাধির কোন প্রতিকার করিতে পারিলেন না। অবশেষে স্বর্ণ একদিন শেষরাত্রিতে গভীর চীৎকার করিয়া নিদ্রা হইতে শয্যায় উঠিয়া বসিল। স্বর্ণের জননী এবং পিতা সে-চীৎকারে ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা হইলে, স্বর্ণ বলিল, “উপাস্য কালিকাদেবী এসে রোষ-কষায়িতনেত্র গভীরভাবে আমাকে বললেন যে, ‘তুই যদি বাঁচতে চাস, তা হলে তোর পিতাকে বলে কুলশুককে শীঘ্র মুক্ত করে দে। নতুবা এই অগ্নিময় মুখে তোকে গ্রাস করব।’ এই বলে মুখব্যাদান করলেন, অমনি তাঁর মুখ হতে ভীষণ অগ্নিশিখা বহির্গত হতে লাগল! ভয়ে আমি চীৎকার করে উঠলাম।”

স্বর্ণময়ীর স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনিয়া কেদার রায় তাহা স্বার্থ বলিয়া বিশ্বাস করিলেন এবং কন্যার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় পরদিন প্রত্যুষেই জহিরুল হককে কারামুক্ত করে দিলেন। জহিরুল হক স্বর্ণের উপস্থিত-বুদ্ধি এবং অসাধারণ সহানুভূতির পরিচয় পেয়ে পরমেশ্বরের সমীপে তাহার অজস্র মঙ্গল কামনা করিলেন। বলা বাহুল্য, সেইদিন দ্বিপ্রহর হইতে স্বর্ণময়ীর শিরঃপীড়া আরোগ্য হইল।

উসবিংশ পরিচ্ছেদ

উৎকর্ষা

ঈসা খাঁ দারুণগাতো জেহাদের জন্য গমন করিবার পরে স্বর্ণময়ী দুর্ভাবনায় উদ্ভিগ্ন হইয়া উঠিল। পিতার অসম্মতি প্রকাশে এবং ঈসা খাঁর জেহাদ গমনে তাহার চিন্তা বিষম ব্যাকুল হইয়া পড়িল। হায়! সে যাহাকে সম্পূর্ণরূপে আপনার হৃদয়-মন

সমর্পণ করিয়া প্রেমদেবতা রূপে বরণ করিয়া অন্তরের অন্তস্তম প্রদেশে প্রীতির সিংহাসনে বসাইয়াছে—যাঁহার স্বাক্ষর চরণে আপনার সর্বত্র বিকসিত বসিয়াছে—নেত্রের যাঁহার পরমরূপ সর্বদা দীপ্তি পাইতেছে—কর্ণে যাঁহার প্রীতিমাখা মধুরবাণী সর্বদা পীযুষধারা বর্ষণ করিতেছে—হৃদয়ের প্রতি অণু-পরমাণু যাঁহার প্রেমসুধায় আকৃষ্ট এবং বিহ্বল, তাহার সেই সুখদ বসন্তের প্রাণ-জুড়ান, মন-মাতান মলয় সমীরণ, তাহার হৃদয়-আকাশের সেই শব্দস্র, তাহার জীবন-মরুর সেই বর্ষণশীল-বারিদধৌ, তাহার আতপদম পথের সেই সুশীতল বটচ্ছায়া, তৃষ্ণার্তজীবনের সেই অমৃতনির্ঝরিণী, জীবন-তরণীর সেই ধ্রুবতারা, মানসকুঞ্জের সেই বসরায় গোলাপ, তাহার পিতার অসম্মতিতে এবং স্বীয় জননী অমতে তাহাকে আদর করিয়া চরণতলে স্থান দিতে কি সমর্থ হইবেন? তাহাকে কি তিনি স্মরণ করিতেছেন? তিনি কি তাহাকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইবেন? যদি না হন, কিংবা হয়! যদি ইচ্ছা না করেন, তবে কি হইবে? হয়! আমি যাঁহার পদে জীবন-যৌবন ডালি দিয়া বসিয়াছি, তাঁহাকে আমি পাইব না! তাঁহার চরণে আমাকে সমর্পণ করা হইবে না। কিন্তু যাহাকে আমি জানি না—চিনি না—চাই না, আমাকে নাকি তাহার হস্তেই দেওয়া হইবে। বিধাতঃ! ইহাই যদি ধর্ম হয়, তবে আর অধর্ম কাহাকে বলে? ইদিলপুরের শ্রীনাথ চৌধুরীর সঙ্গে বিবাহের কথা নাকি পাকাপাকি হইয়াছে, অথচ আমি তাহার বিন্দু-বিসর্গ পর্যন্ত অবগত নহি, ইহা অপেক্ষা স্ত্রীজাতির প্রতি ভীষণ অত্যাচার আর কি হইতে পারে? হয়! হিন্দুজাতির বিচারে কি স্ত্রীলোকের আত্মা নাই!—বিচার নাই! নিজেই সুখ-দুঃখ বোধ নাই! স্ত্রীলোক কি জড় পদার্থ কিংবা খেলার দ্রব্য, যে তাহার রুচি, অনুরাগ, ইচ্ছা এ-সমস্ত সম্বন্ধে কিছুই বিবেচনা করা হয় না—জিজ্ঞাসা করা হয় না! হা বিধাতঃ! এমন জাতিতে স্ত্রীলোক কেন জানে? যদি জানে তবে বাল্যেই মরে না কেন? যদি না মরে, তবে তাহার রুচি, অনুরাগ, বিচারশক্তি হরণ করা হয় না কেন?

ধাক সে সব। এক্ষণে কোন্ পস্থা অবলম্বন করিব? হয়! কি কৃষ্ণগেই ইসা খাঁর সেই চাঁদ বদন দর্শন করিয়াছিলাম। হয়! কিছুতেই যে সে মুখের শোভা, সে বিস্ফারিত আঁখির মধুময়ী দৃষ্টি, সে কণ্ঠের অমৃত-নিস্যন্ধিনী-বাণী ভুলিতে পারি না। সে-হৃদয় যেন অকুরন্ত প্রেমপারাবার, তাহাতে ডুবিলে যেন সমস্ত জ্বালা জুড়াইয়া যায়। সমস্ত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়। তাহাকে পাইলে আর কিছুই পাইতে বাকী থাকে না। তাঁহার কথা স্মরণে কত আনন্দ, কত উদ্ভাস। সে নাম স্মরণেও হৃদয়ের পরতে পরতে সুখা সঞ্চিত হয়! হয়! তেমন সুন্দর, তেমন প্রিয়, আনন্দকর আর কে? এইরূপ দৃষ্টিভ্রায় রায়-নন্দিনী দিন যাপন করিতে লাগিল।

আশ্বিন মাস যাইয়া কার্তিক মাস যায়। বর্ষময়ীর বিবাহের জনা আয়োজন হইতে লাগিল। অগ্রহায়ণ মাসের ২৭শে তারিখে বিবাহ। রাজবাড়ীর দাস-দাসী,

ভূতা, কমচারী, ঐ ও পুরুষ সকলের মুখেই আনন্দ। সকলের মুখেই বিবাহের কথা। যতই বিবাহের দিন নিকটবর্তী হইতে লাগিল, স্বর্ণ ততই নিদাঘ-তাপ-দগ্ধ শোলাপের ন্যায়, গুহ এবং কর্ণমে পতিত কমলের ন্যায় মলিন হইতে লাগিল। কি উপায় অবলম্বন করিলে, এ বিবাহ-পাশ হইতে উদ্ধার পাওয়া যাইবে, তাহা ভাবিয়া ভাবিয়া আকুল হইল। ঈসা খাঁকে প্রাণ-মন সমর্পণ করিয়া, তাঁহাকে হৃদয়-সিংহাসনে বরণ করিয়া বসাইয়া,—অন্যকে পানিদান করিবে? না! না! তাহা কখনও হইবে না। এমন ব্যভিচার, এমন বিশ্বাসঘাতকতা, এমন অধর্ম কিছুতেই কবিতো পারিবে না। তৎপরিবর্তে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা শতগুণে শ্রেয়ঃ। স্বর্ণ ভীষণ দুর্ভাবনায় দিনদিন বিবর্ণ ও বিগুহ হইতে লাগিল। তাহার পিতা, ঈসা খাঁর প্রস্তাবে অস্বীকৃত জ্ঞাপনের পরে, ঈসা খাঁর মানসিক মতিগতি বা কি নাড়াইল, তাহাও জানিতে পারিল না। স্বর্ণের এই গভীর মনোবেদনা, চিন্তের অস্থিরতা, সবলা নাম্নী একজন সখী ন্যতীত আর কেহই জানিত না। স্বর্ণ তাহাকে জীবনের সুখ-দুঃখভাগিনী জানিয়া প্রাণের কথা মর্ম-ব্যথা সমস্তই অকপটে তাহার নিকট প্রকাশ করিত।

সরলা তাহার বাল্য-সখী। শিশুকাল হইতে উভয়ের গভীর অনুরাগ। স্বর্ণের বিপদে, স্বর্ণের দুর্ভাগ্যে সরলাও ব্যাকুল হইয়া পড়িল। অবশেষে ঠাকুর যশোদানন্দ বা জহিরুল হকের নিকট পরামর্শ গ্রহণ করিবার জন্য স্বর্ণ সরলাকে কৌশল করিয়া পাঠাইয়া দিল। শাহ সোলতান মহীউদ্দীনের নিকট হইতে পানিপড়া আনিবার উপলক্ষে সরলা জহিরুল হককে সমস্ত কথা নিবেদন করিল।

যশোদানন্দ সুকুমারী স্বর্ণময়ীকে বাল্যকাল হইতেই আপন কন্যার ন্যায় ভালোবাসিতেন এবং স্নেহ করিতেন। কারণারে যখন যশোদানন্দের নির্যাতন ও লাঞ্ছনায় তাহার পূর্বের ভক্ত ও অনুরক্ত শিষ্য-শিষ্যাগণ আনন্দবোধ করিতেছিল, তখন একমাত্র স্বর্ণের চক্ষেই তাহার জন্য সহমর্মিতার পবিত্র অশ্রুবিন্দু ফুটিয়াছিল। স্বর্ণ অবসর এবং সুবিধা পাইলেই চঞ্চল চরণে করুণাপূর্ণ আঁখি ও মমতাপূর্ণ হৃদয় লইয়া কিরূপ ব্যাকুলভাবে কারাগৃহের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইত এবং কিরূপ পরিপূর্ণ সহৃদয়তার সহিত তাহার দুঃখে সহানুভূতি জানাইত এবং পরিশেষে তাহার বুদ্ধি-কৌশলে জহিরুল হক সেই সাক্ষাৎ নরক হইতে কিরূপে প্রমুক্ত হইলেন, তাহা স্মরণ করিয়া অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। স্বর্ণের প্রাণের যত্ননা এবং মহাবিপদের কথা শুনিয়া তাহার স্নেহ-মমতা আরও উজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। কোমলপ্রাণা, উদ্ভিন্ন-যৌবনা স্বর্ণময়ীর সরল হৃদয়খানি প্রেমানুরাগে কিরূপে দগ্ধ হইতেছে—নৈরাশ্যের ভীষণ ঝটিকা, তাহার আশা-আনন্দ ও আলোকপূর্ণ মানস-তরুণীকে কিরূপভাবে বিষাদের অগাধ সলিলে ডুবাইয়া দিতেছে, তাহা ভাবিয়া একান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

স্বর্ণময়ী যে ঈসা খাঁর প্রেমে আবদ্ধ হইয়াছে, জহিরুল হক তাহা স্বপ্নেও

জানিতেন না। ঈসা খাঁর বিবাহ-প্রস্তাবে তিনি যদি আপত্তি উত্থাপন না করতেন, তাহা হইলে স্বর্ণময়ীর জীবন-পূর্ণিমা আজ এমন অমাবস্যায় পরিণত হইত না। তিনিই যে স্বর্ণময়ীর প্রণয়-পথে কষ্টকর রোপণ করিয়াছেন, তাহা স্বরণ করিয়া লঙ্কিত এবং মর্মান্বিত হইলেন। এক্ষণে প্রাণপাত করিয়াও সে কষ্টকর উদ্ধার করিতে পারিলে, তিনি সুখী হইতে পারেন! স্বর্ণের ভবিষ্যৎ কি হইবে? কিরূপে ইদিলপুরের শ্রীনাথ চৌধুরীর সহিত বিবাহ-সম্পর্ক তন্ন করিয়া ঈসা খাঁর সহিত স্বর্ণময়ীর উদ্ধাহ ক্রিয়া সম্পন্ন করিবেন, তাহাই জাহিরুল হকের একমাত্র চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিল। স্বর্ণকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করিতে পারিলে শ্রীনাথ চৌধুরীর পাপ-পাণিপীড়ন হইতে তাহাকে রক্ষা করিতে পারা যায় বটে, কিন্তু ঈসা খাঁর জননী আয়েশা খানমের অমতে ঈসা খাঁর সহিত কিরূপে তাহাকে পরিণয়সূত্রে সম্বন্ধিত করা যাইবে, ইহাও এক গভীর সমস্যার বিষয়। অন্যদিকে স্বর্ণ মুসলমান হইলেই বা তাহাকে কোথায় আশ্রয় দেওয়া যাইবে? কেদার রায়ের রোমানলে দম্বিত হইতে কে স্বীকার করিবে!

জাহিরুল হক স্বর্ণময়ী সম্বন্ধে অনেক চিন্তা করিলেন, কিন্তু মস্তিষ্ক-সিদ্ধ আলোড়ন করিয়াও কিছু স্থির করিতে পারিলেন না। অবশেষে অধীর হইয়া তাহার ধর্মগুরু ধর্মান্বিতা হজরত সুফী মহীউদ্দীন শাহের চরণে সমস্ত বৃন্তান্ত বিশদরূপে বিবৃত করিলেন। শাহ সাহেব ক্ষণকালের জন্য নেত্র নিম্নলিত করিয়া ধ্যানস্থ হইলেন। তৎপর বলিলেন, “কয়েকদিন অপেক্ষা কর, কি করতে হবে জানতে পারবে।”

বিংশ পরিচ্ছেদ

আজ্ঞাদান

অগ্রহায়ণ মাসের প্রথমমাংশ বিগতপ্রায়। স্বর্ণময়ীর বিবাহের আর দশ দিন মাত্র অবশিষ্ট। শ্রীপুরের রাজবাটিতে বিবাহের জন্য বিশেষ সমারোহ ব্যাপার। স্বর্ণের উদ্বেগ ও অশান্তি চরমে উঠিয়াছে। তাহার পরিণাম যে কি ভয়াবহ হইবে, তাবিয়া তাহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিতেছে। স্বর্ণের তত্ত্ব স্বর্ণের ন্যায় বর্ণ বিবর্ণ হইয়াছে। তাহার মুখ শুষ্ক, বদনমণ্ডল মলিন! জাহিরুল হকও বিশেষ চিন্তিত এবং উদ্বিগ্ন। তবে তাহার পীর মহাজ্ঞানী মহীউদ্দীন সাহেবের বাক্যের উপরে নির্ভর করিয়াই কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত রহিয়াছেন।

ইতিমধ্যে অগ্রহায়ণ মাসের ১৫ই তারিখ বৃহস্পতিবার প্রাতে সুফী মহীউদ্দীন সাহেব জাহিরুল হককে ডাকিয়া বলিলেন, “এখনি তুমি রায়-নন্দিনীকে লয়ে বিজয়নগরে যাত্রা কর। ওথায় গেলেই তোমাদের অতীষ্ট সিদ্ধ হবে।”

জাহাঙ্গীর হক স্মৃতি সাহেবের আদেশে আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন। বিজয়নগর নগর কটসাধা হইলেও, তথায় গমন করিলে সোনামণির অতীত সিদ্ধ হইবে এই আশায় তাঁহার হৃদয়ে উৎসাহের সঞ্চার হইল। তাঁহার পরম স্নেহপাত্রী, দুর্দিনের সঙ্গম বন্ধু সোনার মঙ্গল চিন্তায় জাহাঙ্গীর হক ডুবিয়া গিয়াছিলেন; কাজেই তাহার সুখের জন্য যে কষ্ট স্বীকার, তাহা তাঁহার কাছে নূতন সুখের নিদান বলিয়াই বোধ হইল।

পৰদিন নিশাশেষে উষার শুভ হাসারেখা প্রকাশিত হইবার পূর্বেই জাহাঙ্গীর হক স্বর্ণময়ীকে লইয়া ছদ্মবেশে অশ্বারোহণে শ্রীপুর ত্যাগ করিলেন। জাহাঙ্গীর হক দুইজন বিশ্বস্ত ভৃত্যকেও সঙ্গে লইলেন। স্বর্ণময়ী অশ্বারোহণে অনভ্যস্তা হইলেও কিছু দিনের মধ্যে অল্পে অল্পে কিছুকিৎ পটুতা লাভ করিল। জাহাঙ্গীর হক সকল বিষয়েই পিতার ন্যায় স্বর্ণময়ীর যত্ন লইতে লাগিলেন। স্বর্ণময়ী নানাদেশ ও জনপদ, অসংখ্য নদী ও মাঠ, নগর ও পল্লী অতিক্রম করিয়া উনত্রিশ দিনে বিজয়নগরে উপস্থিত হইলেন।

ঈসা খাঁ তখন ঘোরতর পীড়িত। সেই বিষদিক্ত শাল্যের আঘাতে তাঁহার বাহুর কিয়দংশ পচিয়া গিয়াছে। জ্বরের প্রভাব অত্যন্ত বেশী। শরীর শীর্ণ, কান্তি-শ্রী মলিন। সোলতান নিজাম শাহের খাস চিকিৎসক 'জোব্দাতল হোকামা' আহমদুল্লাহ খান সাহেব বিশেষ যত্নে তখন চিকিৎসা করিতেছিলেন। ক্ষতস্থানের পচনক্রিয়া কিছুতেই বন্ধ হইতেছে না। ক্ষত শুষ্ক না হওয়ার জন্য জ্বরও বন্ধ হইতেছে না। ঈসা খাঁর নিজের অনুচর ও ভৃত্যগণ এবং সোলতানের নিয়োজিত ব্যক্তিগণ প্রাণপণে তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিতেছেন। স্বয়ং সোলতান নিজাম শাহ প্রতি শুক্রবারে তাঁহাকে দেখিতে আসেন।

ঈসা খাঁর যখন এই অবস্থা, ঠিক সেই সময়ে স্বর্ণময়ী ও জাহাঙ্গীর হক বিজয়নগরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা প্রাণপণে শুশ্রূষায় যোগদান করিলেন। ঈসা খাঁর শোচনীয় অবস্থা বিলোকনে স্বর্ণ, অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। ঈসা খাঁ তাঁহার রোগশয্যা-পার্শ্বে হৃদয়-প্রতিমা স্বর্ণকে অপ্রত্যাশিত এবং অচিন্তনীয়রূপে উপস্থিত দেখিয়া ধ্রুমাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। স্বর্ণের মুখ দেখিয়া ঈসা খাঁ প্রথমতঃ প্রফুল্ল, তৎপর তাহার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া বড়ই বিমর্ষ হইলেন।

স্বর্ণ উপস্থিত হইবার তিন দিবস পরেই আয়েশা খানমও অনুচর, সৈন্য ও ভৃত্যসহ পুত্রকে দেখিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। বিজয়নগরের জলবায়ু অতীব স্বাস্থ্যপ্রদ ছিল বলিয়া চিকিৎসকগণ ঈসা খাঁকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনে মত দিলেন না। বিশেষতঃ সুদূর পথ অতিক্রমের নানা অসুবিধায় তাঁহার শরীর আরও দুর্বল হইতে এবং পীড়ার উপসর্গ আরও বৃদ্ধি পাইতে পারে। দাক্ষিণাত্যের সোলতান চতুর্দশ নিজ নিজ প্রধান চিকিৎসকদিগের দ্বারা পরম আগ্রহে ঈসা খাঁর চিকিৎসা

করাইতে লাগিলেন। রাজার্চিকিংসকগণ বহু চেষ্টায় জ্বর বন্ধ করিতে সক্ষম হইলেন বটে, কিন্তু ক্ষত আরোগ্য হইল না। বরং জ্বর বন্ধ হইবার পরে ক্ষত কিছু বাড়িতে লাগিল। তাহাতে ঈসা খাঁ জীবন সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া পড়িলেন। তাহার বাহু হইতে ছয় অঙ্গুলি দীর্ঘ এবং তিন অঙ্গুলি চওড়া স্থানের ক্ষত কাটিয়া ফেলিয়া সেই স্থলে যদি কোন সুস্থ এবং নির্দোষ-রক্ত যুদাব্যক্তির বাহুর সেই মাংস কাটিয়া বসাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে এই ক্ষত আরোগ্য হইতে পারে।

'জোবদাতল হোকামা' আহমদুল্লাহ খানের এ মত, অন্যান্য হাকিমগণের দ্বারা সমর্থিত হইলে, সোলতান নিজাম শাহ প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত আসামীদিগের মধ্য হইতে একজন সুস্থকায় যুবকের বাহুর মাংসচ্ছেদ করিয়া ঈসা খাঁর ক্ষতস্থানে বসাইবার প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু ঈসা খাঁ তাহাতে ঘোরতর আপত্তি প্রকাশ করিলেন। তাহার জন্য আর এক ব্যক্তির প্রাণসংশয় ব্যাপার এবং ভীষণ ক্রেশ উপস্থিত হইবে, তাহা তিনি সহ্য করিতে পারিবেন না। তাহাকে অনেক বুঝান হইল, কিন্তু তিনি কিছুতেই সম্মত হইলেন না। বরং উত্তরোত্তর বিরক্ত এবং উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। তাহার জন্য কোন ব্যক্তির মাংসচ্ছেদ করিলে তিনি নিজের গলায় ছুরি লইবেন, ইহাও দৃঢ়তার সহিত জানাইলেন। স্বর্ণ নিজ বাহু হইতে মাংস দিবার জন্য বিষম আকুলতা প্রকাশ করিতে লাগিল, কিন্তু ঈসা খাঁ তাহাতেও সম্মত হইলেন না। স্বর্ণ অনেক বুঝাইল, অনেক কাঁদিল, অবশেষে ঈসা খাঁর পদতলে লুটাইয়া পড়িয়া অনেক কাকুতি-মিনতি করিল, কিন্তু ঈসা খাঁকে কিছুতেই সম্মত করিতে পারিল না।

স্বর্ণ বলিল : আপনার প্রাণই যদি রক্ষা না হয়, তা হলে আমার প্রাণের জন্য কিছুই মমতা নাই। আপনার জীবনেই আমার জীবন। আমি প্রাণ দিয়েও আপনাকে রক্ষা করব। আপনি না বাঁচলে, আমিও বাঁচব না। আমি প্রাণ দিয়ে আপনার জীবন রক্ষা করতে পারলেও সুখী হব। মাংস ছেদনে যে কষ্ট হবে, তা আমার সুখ এবং শান্তির কারণ হবে। আমাকে বেহঁস করেও কাটতে হবে না। আমি নিজ হস্তে মাংস ছেদন করে দিব।

কিন্তু ঈসা খাঁ কিছুতেই সম্মত হইলেন না। অগত্যা স্বর্ণ নিরুপায় হইয়া আরও উদ্ভিগ্ন হইয়া পড়িল। ঈসা খাঁর প্রাণরক্ষার জন্য স্বর্ণের ব্যাকুলতা এবং কাতরতা দর্শনে সকলেই বিস্মিত হইলেন। ঈসা খাঁর প্রতি স্বর্ণের স্বর্ণীয় প্রেম এবং অপার্থিব অনুরাগ সন্দর্শনে সকলেই তাহার প্রতি শ্রদ্ধাবান হইয়া পড়িলেন। তাহার স্নিগ্ধ এবং সুন্দর মুখমণ্ডলের পুণ্যশ্রী এবং উদার ও কাতরদৃষ্টিতে সকলেই তাহার দেব-রুদয়ের পরিচয় পাইয়া পরম পুলকিত হইলেন। আয়েশা খানম পর্যন্ত স্বর্ণকে পরম যত্ন ও আদর করিতে লাগিলেন। স্বর্ণের গুণে এবং অনুরাগে আয়েশা খানম এইরূপ মুগ্ধ এবং লুপ্ত হইয়া পড়িলেন যে, স্বর্ণকে তিনি পুত্রবধূরূপে পাইবার জন্য মনে মনে কল্পনা করিতে লাগিলেন।

পরদিন প্রভাতে হাকিম আহমদুল্লাহ খান যখন ইসা খাঁর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাঁহাকে অনেক মাংসচ্ছেদে মত দিবার জন্য বুঝাইতেছিলেন, স্বর্ণ সেই সময় হাকিম সাহেবকে ইঙ্গিতে দৃঢ়তার সহিত বলিল, “আপনি বীরবর খাঁ সাহেবের ক্ষতস্থান কেটে পরিষ্কার করুন, আমি আপনাকে মাংস দিচ্ছি।” ‘জোবদাতল হোকামা’ স্বর্ণময়ীর দৃঢ়তা ও ব্যাকুলতা দেখিয়া ইঙ্গিতে অন্যান্য সহকারীদিগকে সত্বে অস্ত্র-চিকিৎসার সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করিতে বলিলেন। আয়োজন সম্পন্ন হইবার পরে সকলে বিশ্বয় বিক্ষারিত নেত্রে স্তম্ভিতভাবে দেখিলেন যে, একখানি শর্পিণ্ড ছুরিকা দক্ষিণ হস্তে ধারণপূর্বক স্বর্ণময়ী অবিকম্পিত হস্তে শাস্তভাবে অথচ ক্ষিপ্ততার সহিত তাহার বাম বাহুর উপরিভাগের অংশে গভীরভাবে বসাইয়া দিয়া মাংস কাটিতে লাগিল। ‘জোব দাতল হোকামা’ আহমদুল্লাহ খান মুহূর্ত মধ্যে ইসা খাঁর ক্ষত কাটিয়া পরিষ্কার করিলেন। অন্য একজন হাকিম ‘জোব দাতল হোকামার’ ইঙ্গিতে চকিতে স্বর্ণময়ীর বাহু হইতে মাংস লইয়া ইসা খাঁর ক্ষতস্থানে বসাইয়া দিলেন। ইত্যবসরে আর একজন অতি সত্বর একটি হরিণের জানুদেশের উপরিভাগের মাংসচ্ছেদ-পূর্বক স্বর্ণের বাহুতে বসাইয়া এক প্রকার সূক্ষ্ম চূর্ণের প্রলেপ দিয়া তাহার উপরে বরফ চাপিয়া ধরিলেন!

এত ক্ষিপ্ততার সহিত এবং নীরবে এই গুরুতর অস্ত্র-চিকিৎসার কার্যসম্পন্ন হইল যে, ইসা খাঁ স্বর্ণময়ীকে বাধা দিবার অবসর পর্যন্ত পাইলেন না। একবার তিনি “ওকি”! মাত্র বলিয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু সে শব্দ উচ্চারণের পূর্বেই স্বর্ণ তাহার বাহু হইতে মাংস বিচ্ছিন্ন করিয়া কেলিয়াছিল। ছয় অঙ্গুলি দীর্ঘ, তিন অঙ্গুলি প্রশস্ত এবং এক অঙ্গুলি পরিমিত গভীর ক্ষতের জন্য স্বর্ণময়ীর মুখে কেহ যন্ত্রণার বিন্দুমাত্র চিহ্নও দেখিতে পাইল না। সকলেই স্বর্ণের ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিতে লাগিল। আয়েশা খানম স্বর্ণকে জড়াইয়া ধরিয়া আনন্দাপ্রবর্তন করিতে লাগিলেন। অনন্ত আশীর্বাদ ও গভীর স্নেহ জানাইয়া স্বর্ণের মুখ চুম্বন করিলেন। সোলতান নিজাম শাহ স্বর্ণের এই অতুলনীর সংসাহস এবং স্বার্থত্যাগ দর্শনে যার-পর-নাই প্রীত এবং মুগ্ধ হইলেন। প্রেমের স্বর্গীয় দৃশ্য দর্শনে সমগ্র বিজয়নগরবাসী নরনারী,—কি হিন্দু, কি মুসলমান সকলেই ধন্য ধন্য করিতে লাগিল! স্বর্ণময়ীর পূণ্য-কথা যত্রতত্র আলোচিত হইতে লাগিল। রাজ-কবিগণ স্বর্ণময়ীর এই পূণ্য প্রেমাসক্তি স্বার্থত্যাগের কবিতা রচনা করিয়া শাহী-দরবারে এবং সভা-সমিতি ও সম্মিলনীতে পাঠ করিতে লাগিলেন।

স্বর্ণকে দেখিবার জন্য বেগম ও শাহজাদী হইতে আরম্ভ করিয়া স্বর্ণের গৃহে নানাশ্রেণীর অসংখ্য রমণী সমাগম হইতে লাগিল। সোলতান ও বেগমগণ স্বর্ণময়ীকে ধর্মকন্যা বলিয়া সমাদর ও সম্বর্ধনা করিতে লাগিলেন। স্বর্ণের সূচিকিৎসা এবং সুখ-স্বাস্থ্য ও আরাগের জন্য সর্বপ্রকারের শাহীবন্দোবস্ত করা হইল। ইন্দুরেণ্ডায় অল্পদিনের মধ্যেই ইসা খাঁ এবং স্বর্ণময়ী আরোপ্যলাভ

করিলেন।

ঈসা খাঁর রুগ্ন ও জীর্ণ দেহে আবার নবযৌবনের কাণ্ডি-শ্রী ফিরিয়া আসিতে লাগিল। হিমালী-পীড়িত শ্রীহীন-উদ্যান যেমন বসন্ত-সমাগমে নব-পত্র-পল্লব এবং ফল-ফুল মঞ্জুরীতে বিভূষিত হইয়া পিকবধূর আনন্দবিধান করে, ঈসা খাঁর স্বাস্থ্য-শ্রীও তেমনি স্বর্ণময়ীর প্রাণে অতুল আনন্দ দান করিতে লাগিল। জীবনের স্বার্থকতার পূর্ণ পরিভূক্তি বোধে, জীবনানুভূতি স্বর্ণের নিকটে নিতান্তই সুবিধাময় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। নিজের দুঃখ-কষ্ট বা অসুবিধার বিষয় স্থান পাইতে পারে, এমন একটু স্থানও হৃদয়ে রহিল না। তাহার হৃদয়-মন্দিরের প্রেমদেবতা, অন্তর-আকাশের পূর্ণচন্দ্রমা, মন-উদ্যানের মন্দাকিনীধারা জীবনকুঞ্জের শোভন গোলাপ—ঈসা খাঁকে যে মৃত্যুর কবল হইতে নব-জীবনে ফিরাইয়া আনিতে পারিয়াছে, তাঁহার জন্য যে নিজ বাহুর মাংসচ্ছেদ করিয়া দিবার সুযোগ পাইয়াছে, সেই মধুর ঘটনা ও উল্লাসে স্বর্ণময়ীর হৃদয়ের কুঞ্জে অপার্থিব প্রেমের সুধা রাগিণীর যে বিনোদ ঝঙ্কার বাজিয়া উঠিয়াছে, তাহাতে তাহার হৃদয় স্তবপুর হইয়াছে। প্রেমাঙ্গদের জন্য স্বার্থত্যাগ এবং আত্মত্যাগে যে আনন্দ, তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত অন্যের পক্ষে ধারণা করা অসম্ভব! স্বর্ণে সে আনন্দ নাই।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

মিলন

মাসাধিক কাল পরে বীরবর ঈসা খাঁ সম্পূর্ণ সুস্থ ও পূর্ববৎ বলিষ্ঠ হইলেন। সোলতান নিজাম শাহ উৎফুল্লচিত্তে এক দরবার আহ্বান করিয়া ঈসা খাঁর স্বার্থত্যাগ, স্বজাতি-প্রেম এবং প্রবর বীরত্বের জন্য মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা কীর্তন করিয়া সোলতান চতুষ্টয়ের পক্ষ হইতে হীরকের মুষ্টিযুক্ত একখানি বহুমূল্য তরবারি, বহুমূল্য রাজকীয় পরিচ্ছদ, একটি অত্যদ্ভুদ ঘটিকা-যন্ত্র, একছড়া বৃহদাকারের মুক্তার মালাসহ "বাবর-জঙ্গ" উপাধি প্রদান করিলেন।

অতঃপর নিজাম শাহের বেগম জান্নাত মহলের আগ্রহ এবং উদ্যোগে বিজয়নগরেই ঈসা খাঁ এবং স্বর্ণময়ীর বিবাহ-ব্যাপার সম্পন্ন হওয়া স্থিরীকৃত হইল। সোলতান নিজাম শাহ বিপুল উদ্যোগে বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিলেন। উষাহ-ক্রিয়ার জন্য বিরাট মহফেল সংগঠিত হইল। রাজ্যময় ধূমধাম হৈচৈ পড়িয়া গেল। দশ হাজার লোক বসিতে পারে, এমন বিরাট সভামণ্ডপ নির্মিত হইল। নানাশ্রেণীর দর্পণ, ময়ূরপুচ্ছ, পতাকা, ফুল ও পাতা দ্বারা মঞ্জলিস আরস্তা করা হইল। দশ সহস্র বেলওয়ার ও স্বর্ণ-রৌপ্য নির্মিত বিচিত্র-দর্শন ঝাড়

১. বাবর-জঙ্গ. মুক্তের সিংহ।

ও ফানুসের দ্বারা মজলিস রওশন করা হইল। অতিসূক্ষ্ম 'আড়বফত' ও 'শবনম' দ্বারা দ্বারসমূহের যবনিকা প্রস্তুত করা হইল। কিম্বাণ দ্বারা চতুর্দিকের কানাৎ রচিত হইল। বহুসংখ্যক মূল্যবান 'কালিন'^২ বিছাইয়া তদুপরি নানাশ্রেণীর চিত্র-বিচিত্র কুসী, সোফা ও তখত স্থাপন করা হইল। নির্দিষ্ট দিনে বিপুল আড়ম্বরে শত ভোপধ্বনি এবং অযুতকণ্ঠে মঙ্গল-কামনার মধ্যে ইসা খাঁ এবং শামসুন্নেসার (স্বর্ণময়ীর ইসলাম নাম) শুভ উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল। অতঃপর দুই দিন ধরিয়৷ নগরে সমস্ত হিন্দু ও মোসলেম অধিবাসী এবং সমাগত সমস্ত ব্যক্তিকে রাজ-ভোজে পরিভূক্ত করা হইল। বেগম জান্নাত মহল নব-দম্পতিকে মূল্যবান পরিচ্ছদ, মণিমুক্তাখচিত অলঙ্কার এবং বহু জিনিসপত্র দান করিলেন। সোলতান চতুর্দশ প্রত্যেকে একশত করিয়া পারস্য-সাগরজাত মুক্তা এবং নিজ নিজ রাজ্যের একসহস্র করিয়া সুবর্ণ মুদ্রা, একটি করিয়া আরব্য অশ্ব এবং একটি করিয়া হস্তী দান করিলেন। আমীর ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ কেহ মৃগনাভি, কেহ মুক্তা, কেহ সুবর্ণমুদ্রা প্রভৃতি উপহার প্রদান করিলেন। ইসা খাঁ এবং স্বর্ণময়ী যে পরিমাণ মুক্তা উপহার পাইয়াছিলেন, তাহার ওজন ৩০২ তোলা হইয়াছিল।

বিবাহের পরে ইসা খাঁ এবং স্বর্ণময়ী দীন-দুঃখী এবং পাছু ও বিপন্ন ব্যক্তিদিগকে তিন দিন পর্যন্ত অর্থ বিতরণ করিলেন। এই বিতরণে এক লক্ষ সত্তর হাজার টাকা ব্যয়িত হয়। অতঃপর সোলতান, বেগম এবং আমীর ওমরাহ ও আলেমদিগকে তিন লক্ষ টাকা মূল্যের টুপি, পাগড়ী, ছড়ি, তরবারি, পরিচ্ছদ, অঙ্গুরী প্রভৃতি উপহার প্রদান করেন।

অতঃপর ইসা খাঁ বিজয়নগরে স্মৃতি-চিহ্নরূপ একটি করিয়া অনাথ আশ্রম এবং শামসুন্নেসা লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে একটি বৃহৎ মসজিদ প্রতিষ্ঠা করিয়া মাঘ মাসের শেষে স্বদেশ প্রত্যাগমনে উদ্যোগী হইলেন।

সোলতানগণ আমীর ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ গভীর সহানুভূতি, ভ্রাতৃত্ব এবং প্রগাঢ় প্রেমের সহিত সাশ্রুনেত্রে বিদায় প্রদান করিলেন। সহস্র সহস্র কণ্ঠের মঙ্গলধ্বনির মধ্যে বিদায় গ্রহণ করিয়া ইসা খাঁ তিন দিন অশ্বারোহণে যাইবার পরে কৃষ্ণা-নদীর কূলে জাহাজে যাইয়া আরোহণ করিলেন। জাহাজ ছুটিবার সঙ্গে সঙ্গেই তীরস্থ জনগণ ক্রমাল উড়াইয়া "জাজাকাত্বাহ" "জাজাকাত্বাহ"^৩ বলিয়া উচ্চকণ্ঠে মঙ্গলধ্বনি করিতে লাগিলেন। যতক্ষণ দেখা বাইতে লাগিল, ততক্ষণ পর্যন্ত জাহাজ ও তীরস্থ ব্যক্তিবৃন্দ ক্রমাল উড়াইতে লাগিলেন।

কৃষ্ণা-নদী বহিয়া জাহাজ পাঁচ দিনে সমুদ্রে যাইয়া উপস্থিত হইল। অতঃপর পনের দিন পরে জাহাজ উড়িষ্যার উপকূল প্রদেশে যাইয়া উপনীত হইল।

২. কালিন—গালিচা।

৩. জাজাকাত্বাহ—জাহাজে ভোয়ার মঙ্গল করুন।

একদা প্রাতঃকালে উড়িষ্যার উপকূলে চিহ্নদ্রুদের তীরে শিকার করিবার মানসে বীরপুরুষ ঈসা খাঁ কতিপয় শিকারী যোদ্ধাসহ ক্ষুদ্র তরনীযোগে জাহাজ হইতে তটে আসিয়া অবতরণ করিলেন। তাঁহারা যখন চিহ্নার তট-প্রদেশে নানা জাতীয় হংস, সারস ও চক্রবাক শ্রেণীর পক্ষী শিকার করিয়া হরিণ শিকারের জন্য চিহ্নার পশ্চিমদিকস্থ কাননাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন, সেই সময় পথিমধ্যে একস্থানে চিহ্নার তীরে বহু লোকসমাগম এবং বাদ্যধ্বনি ঈসা খাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। ঈসা খাঁ অচিরেই বুঝিতে পারিলেন যে, একটি হিন্দু-রমণীকে তাহার মৃতপতির চিতায় একসঙ্গে পোড়াইবার জন্য এই সমারোহ ব্যাপারের সূচনা। ঈসা খাঁ নিজ রাজ্যের সহমরণ প্রথা কঠোর রাজ্যদেশ প্রচারি করিয়া একেবারেই বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। তজ্জন্য সহমরণ প্রথা যে কিরূপ নিষ্ঠুর ও পৈশাচিক কাণ্ড, তাহা নিজে কর্বনও প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ পান নাই। ঈসা খাঁ এক্ষণে সুযোগ পাইয়া অশ্ব ছুটাইয়া যাইয়া জনতার নিতান্ত সন্নিকটবর্তী হইয়া দেখিতে পাইলেন যে, একটি পরমাসুন্দরী যুবতী রমণীকে হস্তপদ বন্ধাবস্থায় তাহার স্বামীর চিতায় তুলিয়া দিয়া আগুন ধরাইয়া দিবার আয়োজন করা হইতেছে। নারীটি অতি কৰুণকণ্ঠে আর্তধ্বনি করিতেছে! এদিকে নারীহত্যার উদ্যোগী পাষাণগণ সেই কৰুণ ক্রন্দনরোলকে কোলাহলে ডুবাইয়া দিবার জন্য বিপুল উদ্যমে বাজনা বাজাইতেছে।

দেখিতে দেখিতে চিতার আগুন জ্বলিয়া উঠিল। রমণী ভীষণ চীৎকার করিয়া প্রাণরক্ষা সঙ্কল্পে অস্তিম চেষ্টায় চরম বল-প্রয়োগে চিতা হইতে মাটিতে পড়িবার চেষ্টা করা মাত্র একটি পাষাণ হিন্দু ভীমবংশদণ্ড দ্বারা নারীর কটিদেশে আঘাত করিল! ঈসা খাঁ মুহূর্ত মধ্যে ব্যাপার বুঝিয়া অত্যন্ত বিস্মিত এবং যার-পর-নাই শোকসন্তপ্ত কণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিলেন, “কি কর! কি কর!!” ঈসা খাঁর সঙ্গীয় যোদ্ধাগণও মুহূর্তমধ্যে ঈসা খাঁর নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। হিন্দুগণ ঈসা খাঁকে মুসলমান, সুতরাং সহমরণের নিষ্ঠুর প্রথার তীব্র বিরোধী মনে করিয়া বংশদণ্ড, কুঠার, দা, লণ্ড ও পাথর হস্তে তাহাকে আক্রমণ করিবার জন্য ছুটিয়া আসিল। ইহাতে ঈসা খাঁ নিতান্ত উত্তেজিত এবং ক্রুদ্ধ হইয়া ভীমবেগে তরবারি হস্তে তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। কয়েকজন আহত হইয়া ভূপতিত হইবার পরেই সকলে বৃকতাড়িত মেঘবৎ উর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিতে লাগিল। ঈসা খাঁ বিদ্যুৎবেগে যাইয়া চিতার উপর হইতে নারীকে স্বহস্তে উঠাইয়া লইলেন। তৎপর তাহার হস্তপদের বন্ধন খুলিয়া দিলেন।

রমণী বন্ধনমুক্ত হইয়া ভক্তিভরে তাহার জীবনদাতা ঈসা খাঁর পাদস্পর্শ করিতে করিতে বাম্পাবরুদ্ধকণ্ঠে বলিল, “আমি অরুণাবর্তী।” বহুদিনের মৃতব্যক্তিকে সহস্র জীবিতাবস্থায় দর্শন করিলে যে-পরিমাণ বিস্ময় ও কৌতূহল জন্মিতে পারে, সেই প্রকার বিপুল বিস্ময় ও কৌতূহলে উদ্ভীণ হইয়া ঈসা খাঁ

বলিলেন যে, “কি অকুণ্ণাবতী! আচার্য! আচার্য! সেকি কথা!। তুমি তো অনেক দিন হল বসন্তরোগে মারা গিয়েছ! তুমি এখানে কিরূপে? তুমি কোন্ অকুণ্ণাবতী? আমি তোমাকে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের কন্যা রূপেই দেখতে পাচ্ছি বটে, কিন্তু মনে হচ্ছে তুমি অন্য কোনও অকুণ্ণাবতী! শীঘ্র তোমার পরিচয় দাও।”

অকুণ্ণাবতী বলিল, “জাঁহাণনা, আমি যশোহরের অধিপতি মহারাজ প্রতাপাদিত্যের কন্যা অকুণ্ণাবতীই বটে; আমি মাহতাব খাঁর বাগদস্তা ভার্যা। আমি বসন্তরোগে মারা যাই নাই। আমার বসন্ত হবার কথাটাই সম্পূর্ণ মিথ্যা! পিতা আমাকে মাহতাব খাঁর সাথে পূর্বে বিয়ে দিতে স্বীকৃত হলেও পরে যুদ্ধে পরাস্ত হওয়ার জন্য এবং স্বর্ণময়ীকে হস্তগত করতে না পারায় আপনাদের প্রতি যার-পর-নাই জাতক্রোধ হন। মাহতাব খাঁর প্রতি তিনি যার-পর-নাই ক্রুটি এবং বিরক্ত। তাঁহার শ্রাণ বধের জন্য তিনি নিতান্তই অধীর ও উন্মত্ত। শুধু দায়ে পড়েই তিনি মাহতাব খাঁর হস্তে আমাকে সমর্পণ করতে চেয়েছিলেন। আমাকে বাটীতে লয়ে বাবার কয়েক দিন পরেই আমাকে একটি বিশেষ ঘরে আবদ্ধ করে, চতুর্দিকে রাত্তি করে দিলেন যে, আমি বসন্তরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছি। পরে অন্য একটি রমণীকে বাটী হতে রাজ-আড়ম্বরে শাশানে লয়ে দাহ করা হয়! তাতেই আপনি ভ্রমে পড়েছেন। বস্তুতঃ, আমি মারা যাই নাই। পিতৃদেব আপনাদের হস্ত হতে অব্যাহতি পাবার জন্য আমাকে মেয়ে ফেলবার জন্যই সংকল্প করেছিলেন; কিন্তু আমার জননী এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের অনুরোধে অবশেষে বীরেন্দ্রকিশোর দস্ত নামক জনৈক নিরাশ্রয় শুদ্রসন্তানের সহিত আমাকে বলপূর্বক বিবাহ দিয়া লোকজনসহ জগন্নাথধামে অতি সঙ্গোপনে পাঠিয়ে দেন। আমাদের জন্য বার্ষিক পাঁচ সহস্র মুদ্রার বৃত্তি বন্দোবস্ত করে দেন। নগদ দশ হাজার টাকা আমাদের বাটী ও সরঞ্জামী খরচের জন্য সঙ্গে দিয়েছিলেন। আমি সমস্ত পথই অশ্রুপাত করতে করতে জগন্নাথক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হই। স্থলপথে এবং জলপথে ২০ দিনে আমরা পুরীতে এসে হাজির হই।

পুরী যাবার পঞ্চম দিবসে বীরেন্দ্র দস্ত অস্বাভাবিকভাবে নির্বিঘ্নে যেতেছিলেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে এক অরণ্যের অন্তর্ভুক্তি পন্থায় সহসা ব্যস্ত-দর্শনে অশ্বটি উধাও হয়ে তাঁকে পৃষ্ঠ হতে ফেলে দিয়ে ছুটে পলায়ন করে। একখণ্ড প্রস্তরের উপর মস্তক ও কটিদেশ পতিত হওয়ায় তিনি অতি সাংঘাতিক রূপে আহত হন। সেই আঘাতে তিনি যার-পর-নাই দুর্বল এবং পীড়িত হয়ে পড়েন। অনবরত কয়েক দিন রক্তবমন করেন। পুরীতে এসে হাকিম ইকবাল খাঁর চিকিৎসায় অনেকটা আরোপ্য লাভ করেন। তৎপর হাকিমের উপদেশে চিকিৎসার তীরবর্তী দুই নামক স্থানে জলবায়ু উৎকৃষ্টতর বলে সেইখানেই আমরা বাস করতে থাকি। কিন্তু মুরীতে এসে বীরেন্দ্র দস্ত কাবও কথা না শুনে হাকিমী ঔষধ সেবন পরিত্যাগপূর্বক ময়ূরভাঞ্জের জনৈক অবধূত সন্ন্যাসীর ঔষধ সেবন করতে

থাকেন । তাতে প্রথমতঃ একটু ভালো ফল দেখা যায় । কিন্তু কয়েক দিন পরেই অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় হয়ে দাঁড়ায় ।

তারপর, ঠিক নয় দিবস পরেই গভীর রাত্রিতে মৃত্যুমুখে পতিত হন । তাঁর মৃত্যুতে আমি পলায়ন করে কোনওরূপে আমার একমাত্র স্বামী—যাঁকে আমি এক মুহূর্তের জন্যও ভুলি নাই, যাকে বেচ্যায় আমি হৃদয়-বন্দিরের সিংহাসনে প্রেম-রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতিরূপে বরণ করে নিয়োছি—সেই মাহতাব খাঁর শ্রীচরণে আশ্রয় ও শান্তি লাভের সুবিধা হবে মনে করে উৎফুল্ল হয়েছিলাম । কিন্তু আমার সঙ্গে লোকজন আমার গহনাপত্র, মণিমুক্তা এবং অর্থলাভের জন্য বলপূর্বক সহমরণে বাধ্য করে । আমার অনুনয়-বিনয় এবং কাতর ক্রন্দন কিছুতেই তাদের পাষণ্ড হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হয় না । আমি যখন বেচ্যায় স্বীকৃত হলাম না, তখন বলপূর্বক হস্তপদ বন্ধন করে আমাকে চিন্তায় তুলে দিল । আমি যখন করুণকণ্ঠে আর্তনাদ করতে লাগলাম, তখন পাষণ্ডগণ বিকট শব্দে ঢাকঢোল করতাল বাজাতে এবং উচ্চৈঃস্বরে হরিধ্বনি করতে লাগল । তারপর সর্ববিপদহস্তা মঙ্গলময় আত্মার কৃপায় আপনি এসে উদ্ধার করলেন ।”

ঈসা খাঁ অরুণাবতীর মুখে স্বপ্নরাজ্যের অগোচর এবং চিন্তার অতীত অপূর্ব-কাহিনী শ্রবণ করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া মুক্তকণ্ঠে “ছোবহান আল্লাহ্!” “ছোবহান আল্লাহ্!” বলিয়া উঠিলেন । তাঁহার নয়নে আনন্দাশ্রুর উন্মেষ হইল । অরুণার দিকে চাহিয়া বলিলেন, “দেখছি করুণাময় বিধাতা একনিষ্ঠ প্রেমিক-প্রেমিকাদিগকে কদাপি বঞ্চিত করেন না ।”

একপে চল, আমার সঙ্গে চল । আমি দাক্ষিণাত্য হতে দেশে ফিরছি । মাহতাব খাঁ তোমার মিথ্যা-প্রচারিত মৃত্যু-সংবাদে মরমে মরে আছে । সে আবার তোমার অপ্রত্যাশিত-দর্শনে রাহুমুক্ত মাহতাবের (চন্দ্রের) ন্যায় নবজীবন লাভ করবে । তোমার বাসনাও সিদ্ধ হবে । চল, আর বিলম্ব না করে জাহাজে চল । এখান কালবিলম্বে অনেক বিপদ ঘটতে পারে ।”

অতঃপর অরুণাবতীকে লইয়া ঈসা খাঁ ‘বাবরজঙ্গ’ জাহাজে প্রত্যাগমন করিলেন ।

উপসংহার

প্রায় একমাস পরে বসন্তকালের মধুর সময় ফাল্গুনের শেষে গাজী ইসা খাঁ বিজিরপুর রাজধানীতে মাতা, বণিতা, বন্ধুবর্গ এবং সৈন্যাদি-সহ উপস্থিত হইলেন। মাগুরিকগণ বিপুল আড়ম্বরে নব-দম্পতিকে অভ্যর্থনা করিল। কয়েকদিন পর্যন্ত রাজধানী এবং অনেক পল্লী ও মফঃস্বলের রাজ-কাচারিতে আন্দোলসজ্জা এবং পুষ্প-পতাকার বাহার খেলিল। দীনদুঃখিগণ প্রচুর দান পাইল। ভনী ও জ্ঞানী ব্যক্তিগণ স্বচ্ছন্দে সংসার-যাত্রা নির্বাহের জন্য 'লাখেবাজ' এবং 'মদদে মাল'* প্রাপ্ত হইলেন।

কয়েক দিবস পরে ইসা খাঁ নিজে উদ্যোগী হইয়া রাজ-ব্যয়ে প্রতাপ-কন্যা অক্ষয়াবতীকে মাহতাব খাঁর পরিণয়-পাশে আবদ্ধ করিলেন। এই বিবাহে প্রতাপ নিমন্ত্রিত হইয়াও ঘৃণা ও লজ্জায় উপস্থিত হইলেন না। কিন্তু শ্রীপুরাধিপতি কেদার রায় ও চাঁদ রায় দুই ভ্রাতা আসিয়া ইসা খাঁর সহিত গভীর আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হন।

অহিকুল হক প্রচুর জায়গীর লাভ করতঃ সপরিবারে বিজিরপুরে আসিয়া নিকৃৎসে ধর্ম ও জ্ঞান-চর্চা করিতে লাগিলেন। তাঁহার চেষ্টায় বহুতর উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ-পরিবার ক্রমশঃ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন।

* ক্রীড়িকানির্বাহের জন্য প্রদত্ত ভূমি।

.

তারাৰঙ্গ

তারাৰাঈ

' উদ্বোধন, ' ' উচ্ছ্বাস, ' ' নব উদ্দীপনা, ' ' স্ত্রীশিক্ষা, ' ' স্পেনীয়
মুসলমান সভ্যতা, ' ' সুচিন্তা, ' ' আদব কাযদা শিক্ষা, '
' তুরস্ক ভ্রমণ, ' ' তুৰ্কী নারীজীবন, ' ' সঙ্গীত-
সঞ্জীবনী, ' ' স্পেনবিজয় কাব্য,
' প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা—

গাজী

সৈয়দ আবু মোহাম্মদ ইস্‌মাইল হোসেন সিরাজী

(কবি সোলতান ও ওয়াযেজল এস্‌লাম)

প্রণীত।

গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত।

১৯০৮

মূল্য ১/০ আনা

PRINTER—K. C. DASS.

METCALFE PRINTING WORKS.

34, Mechuabazar Street, Calcutta.

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিজাপুরের সোলতানের অধীনে কৃষ্ণনগর পরগণার জায়গীরদার সরফরাজ খান নিরুদ্বেগে জাতীয় ভোগ করিতেছিলেন। সুকালে সোলতানকে দুই হাজার পদাতিক এবং পাঁচশত অশ্বারোহী সৈন্য দিয়া সাহায্য করিতে হইত। আর সোলতানের সৈন্যদের রসদের জন্য প্রতি বৎসর পাঁচ শত গো এবং এক হাজার মেঘ ও ছাগল প্রদান করিতে হইত। ইহা ছাড়া একটি পয়সাও খেবাজ বা খাজনা স্বরূপ দিতে হইত না। সরফরাজ খান প্রায় ছয় শত সত্তর বর্ষ মাইল পরিমিত রাজ্যে সাড়ে দশ লক্ষ প্রজা লইয়া স্বাধীনভাবে বাস করিতেন। শাসন ও বিচারের সমস্ত বন্দোবস্তই তাঁহার নিজের অধীনে ছিল। কেবল মৃত্যুদণ্ড দিতে হইলে বিজাপুরের দারোল-এন্-ছাফের অর্থাৎ হাইকোর্টের কাজী-উল-কোছাত অর্থাৎ প্রধান জজের হুকুম লইতে হইত। মারাঠা দস্যুপতি শিবাজী সরফরাজ খানের সঙ্গে বরাবরই সখ্যবহার করিয়া উভয়ের মধ্যে সন্তাবের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কিন্তু সলিমগড়ের মীর্জা ওবায়দুল্লাহ্ বেগের সহিত সরফরাজ খান কন্যা আমিনা বানুর বিবাহের অসম্মতি জ্ঞাপন করায়, পরস্পরের মধ্যে যখন মনোমালিন্যের সঞ্চার হইল, সেই সময় ওবায়দুল্লাহ্ বেগের নিকট হইতে প্রচুর অর্থবল এবং সৈন্যবল লাভ করিয়া শিবাজী সহসা কৃষ্ণগড় আক্রমণ করিয়া বসিলেন।

সরফরাজ খান এই আক্রমণ সম্বন্ধে একেবারেই কিছু অবগত ছিলেন না। সুতরাং সহসা আক্রান্ত হইয়া প্রথমতঃ নিভাস্তই অপ্রতিভ এবং উদ্ভিগ্ন হইলেন। পরে সত্ত্বরতা সহ প্রস্তুত হইয়া কৃষ্ণগড়ের পার্বত্যদুর্গে আশ্রয় গ্রহণপূর্বক ভীষণভাবে সমরাজনে অবতীর্ণ হইলেন। দুর্গ হইতে মধ্যে মধ্যে ধাওয়া করিয়া শিবাজীর বহু সৈন্য হতাহত করিতে লাগিলেন। কিন্তু শিবাজীর সৈন্য-সংখ্যা অনেক বেশী থাকায়, সরফরাজ খান বিশেষ কিছু সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিলেন না। দুর্গের রসদ ক্রমে ফুরাইয়া গেল। অথচ বিজাপুর সোলতানের কোনও সৈন্যদল সাহায্যের জন্য আগমন করিল না।

সরফরাজ খান ক্রমশঃ হতাশ হইয়া যার-পর-নাট ভীষণ হইয়া উঠিলেন। তিনি অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া অপেক্ষা সৈন্যদল ও একমাত্র বীরপুত্র আলী হায়দর খানকে সঙ্গে লইয়া শিবাজীর সৈন্যদলকে ভীষণভাবে আক্রমণ করিলেন। প্রচণ্ড আক্রমণে শিবাজীর সৈন্যদল রণক্ষেত্রে তিষ্ঠিতে না পারিয়া বহুদূরে হটিয়া গেল। শিবাজীর প্রচুর রসদ তোপ-বন্দুক এবং গোলাগুলি

সরফরাজ খানের হস্তগত হইল। কিন্তু এই যুদ্ধে তাঁহার একমাত্র বীরপুত্র আলী হায়দর খান যুদ্ধ করিতে করিতে সমরক্ষেত্রে পতিত হইলেন। এদিকে শিবাজী আরও মাওয়ালী ও মারাঠা সৈন্যদল সংগ্রহ করিয়া পুনরায় নবীন উদ্যম এবং বিপুল তেজে দুর্গ আক্রমণ করিলেন। আবার ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। দুর্গ-প্রাচীর ভগ্ন করিবার জন্য মারাঠা গোলন্দাজগণ অনবরত এক স্থান লক্ষ্য করিয়া গোলা নিক্ষেপ করিতে লাগিল। সরফরাজ খান, তাঁহার সেনাপতি মোতামদ খান এবং কন্যা আমিনা বানু দুর্গের প্রাচীরের উপরে তোপ পাতিয়া শত্রুসৈন্য সংহারের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের জুলন্ত উৎসাহ এবং উদ্বেজনাপূর্ণ সঙ্গীতবাহী বাণীতে কৃষ্ণগড়ের সৈন্যদলের মধ্যে প্রবল উৎসাহ ও বীরত্বের সঞ্চার হইল। কৃষ্ণগড়ের গোলন্দাজগণের অব্যর্থ লক্ষ্যে শিবাজীর সৈন্যদল যখন ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িবার উপক্রম হইল, ঠিক সেই সময় একটি শেল আসিয়া বীরপুরুষ সরফরাজ খানের বক্ষদেশে পতিত হইল। সেই শেলের দাক্ষণ আঘাতে তাঁহার দেহ একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া উড়িয়া গেল। সৈন্যদলে ভীষণ হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল। শত্রুগণ যাহাতে সরফরাজ খানের নিধনবার্তা অবগত না হইতে পারে, তজ্জন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বিত হইল।

গভীর রক্তনীতে পরামর্শ-সভা আহৃত হইল। মোতামদ খান এবং অন্যান্য প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ নিরাশ হইয়া শিবাজীর সহিত সন্ধি করিবার প্রস্তাব করিলেন। সরফরাজ খানের পত্নী হামিদা বানুও সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, কিন্তু বীর্যবতী কুমারী আমিনা বানু বলিলেন : “বিধর্মী ও বেইমান কাকেরের সহিত সন্ধি অপেক্ষা যুদ্ধ করাই ভালো। আমাদের প্রেরিত দূত বিজ্ঞাপুরে পৌঁছে থাকলে, নিশ্চয়ই এতদিনে সোলতান-বাহিনী আমাদের সাহায্যের জন্য রওয়ানা হয়েছে। এ সময় হীন শর্তে সন্ধি করলে, পরে পস্তাতে হবে। শিবাজী যেমন, যখন ইচ্ছা সন্ধি উল্লঙ্ঘন করতে দ্বিধাবোধ করেন না, স্বাভাবিক ধর্মভীকৃতার জন্য আমাদের পক্ষে সেরূপ করা সম্ভব হবে না। সুতরাং ভবিষ্যতে আমরা শক্তিশালী হলেও এই বেইমান ও অসভ্য কাকেরদিগের অধীনে বহু হীনতা ও নীচতা স্বীকার করতে হবে। সুতরাং কমবস্ত মারাঠা কাকেরের সঙ্গে যুদ্ধ করাই সর্বতোভাবে সম্ভব।”

“যুদ্ধে যদি জয়লাভ করি, শত্রুর নিপাত হবে। আর যদি মৃত্যুমুখে পতিত হই, তাহাও মহাসৌভাগ্যের কারণ হবে। কারণ, মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদ (দঃ) বলেছেন, ‘যুদ্ধ করতে করতে যে মৃত্যু, তাহাই শ্রেষ্ঠ মৃত্যু। এরূপ মৃত্যু মানুষকে বিনা হিসাবে বেহেশতে লয়ে যাবে।’ সুতরাং সকলে যুদ্ধের জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত হউন। আমার বিশ্বাস, চরম বিক্রমে আক্রমণ করলে, শত্রুগণ নিশ্চয় পর্যুদস্ত হয়ে পলায়ন করতে বাধ্য হবে।”

আমিনা বানুর উৎসাহ এবং যুদ্ধপ্রিয়তা সন্দর্শন করিয়া সকলেই যুদ্ধের জন্য আবার মাতিয়া উঠিলেন। সুতরাং দুর্গবাসী সকলেই প্রাণপণ যত্নে দুর্গ-প্রাচীরের ভগ্নস্থানগুলি রাতারাতি মেরামত করিয়া প্রভাতে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। মোতামদ খান এবং কুমারী আমিনা বানু অশ্বারোহণে দুর্গের সর্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া সকলকে উৎসাহিত এবং উদ্বোধিত করিতে লাগিলেন। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই কুমারী আমিনা বানু বর্মমণ্ডিত অবস্থায় অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া স্বয়ং সেনাপতির পদ গ্রহণপূর্বক ভীম বিক্রম এবং অটল সঙ্কল্পে গৈরিক প্রাবনের ন্যায় শিবাজীর বাহিনীর উপরে যাইয়া আপতিত হইলেন। ভীষণ প্রতাপে শিবাজীর ব্যূহ বিদীর্ণ হইয়া গেল। আমিনা বানু অনেক দূর পর্যন্ত মাওরানী ও মারাঠা সৈন্যের পশ্চাৎপন করিয়া দুর্গে ফিরিয়া আসিলেন। শিবাজীর সৈন্যের প্রচুর রসদ-পত্র তোপ-বন্দুক ও গোলাগুলী হস্তগত করিয়া কুমারী আরও দুর্জয় বিক্রমশালিনী হইয়া উঠিলেন। মধ্যে মধ্যে দুর্গ হইতে ধাওয়া করিয়া মারাঠাদিগকে ভীষণ মার দিতে লাগিলেন। শিবাজীর সৈন্যদল বহু উৎসাহ এবং পুরস্কারের প্রলোভনে উদ্বুদ্ধ এবং প্রলুব্ধ হইয়াও কুমারীর সহিত সম্মুখ-সংগ্রামে ব্যূহ বাঁধিয়া দাঁড়াইতে সমর্থ হইল না।

কুমারী আমিনা বানু যেমন বীর্যশালিনী, তেমনি অসাধারণ রূপবতী ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই সমর-শাস্ত্রে তাঁহার গভীর অনুরাগ ছিল। অশ্বারোহণে, অস্ত্র-সঞ্চালনে, ব্যূহ-বিন্যাস কৌশলে, তোপ পরিচালনায়, তিনি অসাধারণ দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। এক্ষণে সমরক্ষেত্রে সক্ষাৎভাবে তাঁহার বীরত্ব, প্রতাপ, সাহস ও কৌশল দেখিয়া সকলেই বিমোহিত হইল।

শিবাজী এই কুমারীর প্রতাপ ও সাহস দেখিয়া শুষ্কিত হইয়া পড়িলেন। রমণীর রমণীয় রূপলাবণ্যের সহিত এই প্রকার বিস্ময়কর বীর্যশৌর্যের অপূর্ব সমাবেশ দেখিয়া শিবাজী এই রমণীরত্নকে লাভ করিবার জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। বলে পরাস্ত করিতে না পারিয়া কৌশল ও প্রলোভনে কুমারীকে হস্তগত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিছুদিনের জন্য যুদ্ধ বন্ধ রাখিয়া সন্ধির প্রস্তাব উত্থাপিত করা হইল। আমিনা বানুর অসাধারণ বীরত্ব ও কৌশলে শিবাজী নিতান্ত মুগ্ধ ও বিস্মিত হইয়াছেন, এইরূপ ভান করিয়া তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করা সম্ভব নহে বলিয়া প্রকাশ করিলেন। অতঃপর শিবাজী কৃষ্ণগড়ের অধিকারিণী আমিনা বানুর সহিত সন্ধি-বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। তিনি আর কখনও কৃষ্ণগড় আক্রমণ করা দূরে থাকুক, অন্য কেহ আক্রমণ করিলে, তিনি আততায়ীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন।

অতঃপর উভয় পক্ষ হইতে মিত্রতা স্বরূপ উভয় পক্ষকেই বিপুল আড়ম্বরে ভোজ্য প্রদান করা হইল। ভোজ্য শেষ হইলে, শিবাজী বহুমূল্য নানাবিধ বিলাস

দ্রব্য, করাচী হইতে লুণ্ঠিত এক জোড়া হীরকের কঙ্কণ এবং লক্ষ টাকা মূল্যের পারস্যাসাগর-জাত একটি মুক্তামালা আমিনা বানুকে উপহার প্রদান করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে শিবাজীর রূপ-গুণ যশঃ-বিক্রম প্রভৃতি ভিলে তাল করিয়া বর্ণনা করিবার জন্য উপযুক্তরূপে শিক্ষিতা কড়িগর ধূর্ত স্বীলোক দাসী-স্বরূপ প্রেরিত হইল। ইহাদের কর্তব্য ছিল—ক্রমশঃ শিবাজীর গুণকীর্তন করিয়া আমিনা বানুকে শিবাজীর প্রতি অনুরক্ত ও মুগ্ধ করা।

শিবাজীর উদারতা এবং মহত্ব দেখিয়া সকলেই ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। বীরাত্মনার প্রতি এই প্রকার সম্মান ও দয়া প্রকাশ করায় দাক্ষিণাত্যের মুসলমানগণও শিবাজীর প্রশংসা কীর্তন করিতে লাগিল। অতঃপর যথাসময়ে বিজাপুরের প্রধানমন্ত্রী এবং যুবরাজ যাইয়া নির্দিষ্ট সময়ে আমিনা বানুকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া 'মালেকা' অর্থাৎ রাণী উপাধি প্রদান করিলেন। প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং মুকুট পরাইয়া দিলেন। যুবরাজ বিজাপুরের হুকুমতের তরফ হইতে একখানি মূল্যবান তরবারি উপহার প্রদান করিলেন। শেখ-উল-ইসলাম জামে মসজিদে যাইয়া আক্কাহ তালার মঙ্গল আশীর্বাদ মালেকা আমিনার জন্য প্রার্থনা করিলেন। শিবাজীও তাঁহাকে অনেক ভেটঘাট প্রদান করিয়া যথেষ্ট সম্বর্ধনা করিলেন। মালেকা আমিনা বানু রাজ্যাভিষেকের পরে বিজাপুরের সোলতানের হজুরী-নজর স্বরূপ পাঁচটি উৎকৃষ্ট হস্তী, এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা এবং ২৫টি বৃহৎ মুক্তা প্রেরণ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শীত ঋতুর অবসান হইয়াছে। মলয় সমীরণের মধুর সঞ্চরণে উদ্ভিদ এবং প্রাণীজগতের প্রাণে প্রাণে নব-জীবন এবং নব আনন্দের সঞ্চরণ হইয়াছে। নবীন পত্র-পল্লবে এবং মগ্ধরী-মৌনী-ভূষণে ভূষিত হইয়া নানা জাতীয় বৃক্ষলতা অপরূপ শোভা বিস্তার করিতেছে। অনন্ত আকাশের অনন্ত নীলিমা উজ্জ্বলতর হইয়া আক্কাহতালার অনন্ত মহিমা প্রকাশ করিতেছে! পানীর কণ্ঠে ললিত ছন্দে নানাবিধ মধুর ও মনোহর কুল্লন স্কুরিত হইয়া দিলদিলন্ত সুখরিত এবং পুলকিত হইয়া উঠিয়াছে। এমন মধুর ও মনোহর বসন্তকালে শিবাজী আমিনা বানুকে বিশেষ সম্বর্ধনা পূর্বক রাজধানী রাজপড়ে বিশেষ পরামর্শের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন।

মালেকা প্রথমে নিমন্ত্রণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিলেন, নানা প্রকার ওজুহাত দেখাইতে লাগিলেন। অবশেষে বহু সাধ্য-সাধনা এবং অনুরণ-বিনয়ে বাধ্য হইয়া

জননী হামিদা বানু, দুইশত সিপাহী এবং বকীর সহচরীগণ সহ রায়গড়ে
প্রভাগমন করিলেন।

শিবাজী বিপুল আড়ম্বর ও ধুমধামে মালেকাকে অভ্যর্থনা করিলেন। ফলতঃ
শিবাজী দ্বারা মালেকা আমেনা বানুর আদর-অভ্যর্থনা যতদূর হওয়া সম্ভবপর,
তাহার কিছুই ক্রটি হইল না। আমিনা, তাহার মাতা এবং সন্নীঃ লোকজন
সকলেই শিবাজীর ভদ্রতা, সৌজন্য ও শিষ্ট ব্যবহারে পরম ক্রীতি লাভ করিলেন।

শিবাজী এই সময়ে কৌশলে আমিনা বানুর রূপ-লাবণ্য বিশেষরূপে দর্শন
করিয়া যার-পর-নাই লুব্ধ এবং মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। আমেনা বানুর ভাসা ভাসা
পটল-চেরা ভূবন-মোহন-অক্ষিযুগল এবং সর্বাত্মের সুঠাম সুগঠন ও সৌন্দর্য
দেখিয়া সকলেই প্রশংসা করিতে লাগিল। শিবাজী অলোকসামান্য সুন্দরী,
অগ্নিতুল্য তেজস্বিনী এবং প্রখর রাজনীতিজ্ঞা, এই রমণীরত্নকে পত্নীরূপে লাভ
করিতে পারিলে, সমগ্র ভারতের অধিপতি হইবার আশাও পোষণ করিতে
লাগিলেন। মুসলমান কখনও কাফেরকে কন্যা দান করিতে পারে না, শিবাজী
এই চিন্তাতেই অস্থির হইতে লাগিলেন। সুতরাং অসম্ভব কার্যকে সম্ভব করিবার
জন্য শিবাজী কাল্পনিক পন্থা উদ্ভাবনে ব্যস্ত হইলেন। অনেক চিন্তা করিলেন, কিন্তু
কিছুই নির্ধারিত হইল না। মন ক্রমেই মাতিয়া উঠিতে লাগিল। ক্রমেই লালসা
বায়ু-প্রাণ বহির ন্যায় অতীব প্রচণ্ড হইয়া উঠিল।

শিবাজী মালেকার সৌন্দর্য-সুধার এমনি পিপাসু হইয়াছিলেন যে, ক্রমশঃ
তাঁহার হিতাহিত-জ্ঞান ও পরিণামদর্শিতা একেবারেই লোপ পাইল। মালেকাই
তাঁহার ধ্যান-জ্ঞান-চিন্তাকে আশ্রয় করিয়া ফেলিল। অবশেষে তাঁহার পরামর্শদাতা
গুরু রামদাস স্বামীর পরামর্শে, ভানপূর্বক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া মালেকা
আমেনা বানুর পাণিগ্রহণের জন্য চেষ্টা করিতে বলিলেন। বিবাহ করিবার পরে
সুবর্ণ-নির্মিত কৃত্রিম গাভীর গর্ভে প্রবেশ করিয়া প্রসব-দ্বার দিয়া নির্গত হইয়া
সেই গুরু ব্রাহ্মণদিগকে দান করিলেই প্রায়শ্চিত্ত হইয়া যাইবে। আবার তিনি
হিন্দুত্ব লাভ করিতে পারিবেন। রাজা, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে মোস্লেম-ললনার
পাণিপীড়ন করিতে পারেন, রামদাস স্বামী একরূপ ব্যবস্থাও দিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ঐএ মাসের পূর্ণিমা তিথি। পূর্ণকলা শনধরের জয়ল-ধবল জ্যোৎস্নালহরীতে
গগন-ভূবন সুখ-ভরসে ভাসিতেছে। কৃষ্ণগড়ের দুর্গ-মধ্যস্থ মনোহর উদ্যানে নানা

জাতীয় ফুল ফুটিয়া কৌমুদী-স্নাত হইয়া মৃদু মন্দ পবনে মধুর গন্ধ বিতরণ করিয়া হাসিতেছে, নাচিতেছে এবং খেলিতেছে। সরোবরে জলজ পুষ্পদাম প্রস্ফুটিত হইয়া মনোহারিণী শোভার সৃষ্টি করিয়াছে। নবগঙ্গাপল্লবাসনে সুখে সমাসীন হইয়া কোকিল ও পাখিয়া সুধামাখা কুঞ্জে অনন্ত শূন্য বক্ষে যেন কি এক পীযুষ-স্রোত প্রবাহিত করিতেছে! জলে-স্থলে শূন্যে সর্বত্র জ্যোৎস্নার মধুর ও শান্তোজ্জ্বল বিকাশ! মলয়া হওয়ার অবিরাম সুখ-স্পর্শ মৃদু সঞ্চারণ। ফুলে ফুলে হাসির ঢলাঢলি! মীলিম গগন-পটে তারকাবলীর স্নিগ্ধোজ্জ্বল সমাবেশ! এ হেন মধু-যামিনীতে মালেকা আমিনাবানু প্রিয় সহচরী রোকিয়াকে সঙ্গে লইয়া উদ্যান মধ্যস্থ সরোবর ঘাটে গালিচা পাড়িয়া বসিয়া প্রকৃতির চিত্তবিনোদন দৃশ্য উপভোগ করিতেছিলেন। মালেকা এবং রোকিয়া উভয়ে নীরব। কিছুক্ষণ পরে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া রোকিয়া বলিল, “মালেকা! এ মধু-যামিনী এমন করে একেলা ভোগে সুখ কি? হৃদয়-রাজ্যে প্রেমের জ্যোৎস্না না ফুটলে বাইরের জ্যোৎস্নায় কেবল অন্ধকারই বৃদ্ধি করে!”

মালেকা : কেন? এই তো তুমি আছ! তোমার সঙ্গেই মধু-যামিনীর জ্যোৎস্না-লহরী পান করছি।

রোকিয়া : ঠাট্টা রাখ। দুধের সাধ কি ঘোলে মিটে? এমন করে যৌবন-জীবন যাপন করার ফল কি? বিবাহ করাই সঙ্গত।

মালেকা : কথা তো ঠিক! কিন্তু যাকে-তাকে তো আর স্বামীত্বে বরণ করতে পারি না। বীরপুরুষ-মা হলে, কাকেও বিবাহ করব না, এই সংকল্পই তো এখন বাধা হয়ে পড়ছে।

রোকিয়া : কেন, মোতামদ খান কি উপযুক্ত নন?

মা : মোতামদ খান একজন উপযুক্ত সেনাপতি ব্যতীত আর কিছুই নন। তাঁকে বীরপুরুষ বললে অন্যায় হয় না বটে, কিন্তু আমি যে শ্রেণীর বীর-পুরুষ চাই, সে শ্রেণীর নহেন। মোতামদ খান যদি বাহুবলে রাজ্য সংস্থাপন করতে পারতেন অথবা কৃষ্ণগড়কে স্বাধীন করতে পারতেন, তা হলে তাঁকে বীরপুরুষ বলে স্বীকার করতাম।

রো : তবে শিবাজী?

মা : বটে! শিবাজী সাহসী পুরুষ এবং রাজ্য সংস্থাপনেরও চেষ্টা করছেন। কিন্তু অতি নীচ প্রকৃতি বিশিষ্ট। শিবাজীকে বীরপুরুষ বলা কিছুতেই সঙ্গত নহে, দস্যু বল। বীরপুরুষের মহত্ব ও বীরত্ব তাঁতে নাই। ‘পার্বত্যমূষিক’ উপাধিই তাঁর পক্ষে যথার্থ।

রো : কেন, আপনার প্রতি তো খুবই উদার ও সদয় ব্যবহার করেছেন।

মা : নিশ্চয়ই। কিন্তু তাঁর ভিতরে তাঁর মংলব আছে।

রো : মংলব ছাড়া দুনিয়ার কে কি করে থাকে?

মা : তা বটে! কিন্তু মংলবের মধ্যেও পার্থক্য আছে। নিজের স্বার্থসিদ্ধিই যার একমাত্র উদ্দেশ্য, সে মংলব অতীব ঘৃণিত।

রো : শিবাজীর মংলব ঘৃণিত কিসে?

মা : তাঁর এই সদয় ও উদার ব্যবহারের উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমাকে লুপ্ত করে বিবাহ করা। কিন্তু তাঁর জানা উচিত যে, মুসলমান মহিলা কখনও কাফেরকে পাণিদান করতে পারেন না।

রো : তিনি তো আপনার জন্য ইসলাম ধর্ম পর্যন্ত অবলম্বন করতে প্রস্তুত আছেন। আপনি বিবাহে স্থির-নিশ্চয় সম্মতি দিলে তিনি পৈতৃক হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে পবিত্র ইসলাম ধর্ম অবলম্বন করবেন। এতে তাঁকে নানাবিধ অসুবিধা ও কষ্ট ভোগ করতে হবে বটে; কিন্তু তবুও তিনি আপনার জন্য সে-সমস্ত সহ্য এবং বহন করতে প্রস্তুত আছেন। প্রেমের এমন আদর্শ এবং প্রেমের জন্য এরূপ স্বার্থত্যাগ নিতান্তই বিরল নহে কি?

মা : নিশ্চয়ই। এরূপ ভগ্নামী এবং এরূপ শয়তানী নিশ্চয়ই নিতান্ত বিরল!

রো : ভগ্নামী কিরূপ? হায়! একেই বলে 'যার জন্য করি চুরি সেই বলে চোর!'

মা : ভগ্নামী না হয়ত, ষগ্নামী তো বটেই। সাত সাতটি স্ত্রী এবং কয়েক গজ উপপত্নী থাকতেও যাঁর আমার জন্য ঘুম হয় না, সে যদি আদর্শ প্রেমিক হয়, তবে আদর্শ লম্পট এবং পিশাচ আর কে?

রো : যে-ব্যক্তি যাকে তনুমন সমর্পণ করেছে, সে যদি তাকে না পায়, তা হলে তার ঘুম না হওয়াই তো স্বাভাবিক। এ অবস্থা তো বেচারী শিবাজীর প্রতি দয়া হওয়াই স্বাভাবিক।

মা : বটে, বলিস্ কি? তুই পাগল নাকি! এরূপ লোকের প্রতি যদি দয়া হয়, তা হলে, বাম পদাঘাত করবার প্রবৃত্তি হবে আর কাকে?

রো : ছিঃ! ছিঃ! এমন কথা বলা কি সঙ্গত?

মা : যে ব্যক্তি নারী লাভের জন্য পৈতৃক ধর্ম ত্যাগ করতে প্রস্তুত, তার প্রতি ইহা অপেক্ষা সদুক্তি আর কি হতে পারে? যদি শিবাজী আজ ধর্মের জন্যই ধর্ম পরিত্যক্ত করতেন, তা হলে নিশ্চয়ই মুক্তকণ্ঠে তাঁর প্রশংসা কীর্তন করতাম। শিবাজী ইসলাম ধর্ম পরিত্যক্ত করলেও কদাপি তাতে স্থিরতর থাকবেন না। কোনও রূপে আমার রাজ্য এবং আমাকে হস্তগত করবার জন্যই ইসলাম গ্রহণের তান করা হচ্ছে। শিবাজী ইসলামের পরম শত্রু। তিনি মসজিদগুলি চূর্ণ এবং তাহা শূকর-বন্ধে অপবিত্র করে পরম আনন্দ লাভ করেছেন। শিবাজীর ন্যায় নৃশংস দস্যু যদি দমিত না হয়, তা হলে ইসলামের সমূহ অমঙ্গল বুঝতে হবে। আমি এহেন অস্পৃশ্য পাষাণ কাফেরের পাণিগ্রহণ করব, এরূপ আশা করা

হাতুলের পক্ষেই শোভা পায়। বরং শিবাজী এ-বিষয়ে যতই চেঁচা করবেন, আমার ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা ততই বৃদ্ধি পাবে। আমি শ্রাণান্তেও এমন যুগিত দস্যু ও জাহান্নামী কাকেরকে কিছুতেই স্বামীত্বে বরণ করতে স্বীকৃতি নহি। এমন কি, এ-বিষয়ের আলোচনা করলেও আমি ঘৃণা এবং বিরক্তি বোধ করে থাকি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

উষা তাহর অক্ষয়িমা জ্বালের চাঁপা আঙ্গুলের কোমলস্পর্শে ঘন আঁধার রাশিকে উরল করিয়া নিদ্রিত বিশ্ববন্ধে নব চেতনার সঞ্চার করিতেছে। প্রভাতবায়ু কুসুম-গন্ধ হরণ করিয়া মৃদুমন্দ গতিতে স্বাস্থ্য ও স্নিগ্ধতা বিতরণ করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। মধুরকণ্ঠ বিহঙ্গগণ নানাছন্দে সুললিত তানে বিশ্বপিতার মহিমা কীর্তন করিতেছে। ধীরে ধীরে মৃতবৎ জগৎ বন্ধে কেমন মনোহর ও মধুরভাবে নবজীবনের আবির্ভাব সূচিত হইতেছে।

এ হেন মধুর প্রভাতকালে অতি প্রত্যুষেই রায়গড়ের রাজপথের পার্শ্বে লোক সমাগম পরিদৃষ্ট হইতেছে। আমরা যে-সময়ের কথা বলিতেছি, রায়গড় তখন অতি ক্ষুদ্র শহর।

এই ক্ষুদ্র শহর আজ বিজাপুরের সেনাপতি মহাবীর আফজাল খাঁর অভ্যর্থনাহেতু পরম রমণীয়ভাবে সজ্জিত হইয়াছে। পথের মধ্যে মধ্যে নানাস্থানে বিচিত্র তোরণসমূহ নির্মিত হইয়াছে! পতাকা, পুষ্প এবং কদলী বৃক্ষে সমস্ত রাত্তা গোল্জার করা হইয়াছে। মহারাষ্ট্রগণ যথাসম্ভব উৎকৃষ্ট বেশ-ভূষায় সজ্জিত হইয়া সোৎসুকচিত্তে অপেক্ষা করিতেছে! মহারাষ্ট্র রমণীগণ পুষ্পগন্ধে কুস্তল সাজাইয়া বিচিত্র ভঙ্গীতে কোঁচা ও কাছা দিয়া শাটী পরিয়া অট্টহাস্যে এবং কোলাহলে গগন-গবন মুখরিত করিয়া রাত্তার এক এক স্থানে জটলা পাকাইতেছে। বহু সংখ্যক বালক ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতেছে।

এদিকে বাদ্যোদ্যম সহ মহারাষ্ট্রদিগের রাজা শিবাজী সহস্র সংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্যসহ মুসলমান-পোষাকে উৎকৃষ্টরূপে সজ্জিত হইয়া সপারিষদ আসিয়া নগর তোরণের মূলে শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হইলেন।

সহসা দূরে একটি তোপ গর্জন করিয়া উঠিল। সেই তোপ গর্জনের সঙ্গেই সর্বত্র একটি অক্ষুট কলরব উদ্ভিত হইল। শিবাজী অশ্বারোহী সৈন্য এবং পারিষদগণকে সঙ্গে লইয়া বেগে অশ্ব ছুটাইলেন। নহবতে নহবতে শাহানার সুরে শানাই বাজিয়া উঠিল। রাত্তার পার্শ্বের বাটী হইতে লক্ষ্যধ্বনি হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে শিবাজী, বিজাপুরের সেনাপতি বীরবর আফজাল খাঁকে পরম

সমাপরে এবং বিপুল আড়ম্বরে অভ্যর্থনা করিয়া রাজপ্রাসাদের দিকে অগ্রসর হইলেন। শিবাজীর সৈন্যগণ পতাকা উড়াইয়া এবং বিপুল বাজাইয়া অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিল। পশ্চাতে আফজাল খাঁ সহস্র সংখ্যক খাঁর-পুরুষসহ শিবাজীর সহিত অশ্বারোহণে ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলেন। পশ্চাতে বাদ্যকরণ বিপুল উৎসাহে নানাবিধ শ্রুতিমধুর বাদ্য বাজাইতে বাজাইতে অগ্রসর হইল। তৎপশ্চাতে বিপুল জনতা ও পদাতিক সৈন্যগণ চলিতে লাগিল। মারাঠা রমণীরা চতুর্দিক হইতে হুধুধনি দিতে লাগিল।

আকাশে সূর্য উঠিয়াছে! তরুণ অরুণের লোহিত কিরণরাগে গগন-ভুবন মনোমোহন সৌন্দর্যে ভূষিত হইতেছে। কিন্তু বিশ্বলোচন সর্বিতা-দেবের প্রতি আজ কাহারো দৃষ্টি নাই। যে-সমস্ত হিন্দু সূর্যোদয়ে “জ্বা কুসুম সঙ্ঘাণ” প্রভৃতি স্তব আওড়াইয়া প্রত্যহ সূর্যের উপাসনা করিত, তাহাদেরও আজ সেই উপাস্য সূর্য-দেবতার দিকে নজর নাই। আজ সকলের দৃষ্টিই বিজাপুরের বীর সেনানী রূপবান্ ও তেজীয়ান্ আফজাল খাঁর প্রতি! আফজাল খাঁর অশ্বারোহণে চলিয়াছেন! তেজীয়ান্ অশ্ব নৃত্যশীল গতিতে ধীরে ধীরে কি বাঁকা ভঙ্গিমাতেই চলিয়াছে! আফজাল খাঁ রূপের ছটায় এবং বীর্যগরিমায় চারিদিক যেন আলোকরিয়া চলিয়াছেন। কিবা কমণীয় কাস্তি! কিবা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিব্যঞ্জক আয়ত লোচনযুগল! কিবা অঙ্কিত জ্র! কিবা প্রশস্ত ললাট! কেমন বলিষ্ঠ ও পুষ্ট দেহ! মরি! মরি! কি তেজঃপুঞ্জ মূর্তি! কি বীরত্বব্যঞ্জক গৌফ। যে দেখিল, সেই মুগ্ধ হইল। রমণীমহলে এই অপরূপ রূপের অক্ষুট স্বরে সমালোচনা উঠিল। সকলেই আফজাল খাঁর কোনও-না-কোনও অঙ্গের প্রশংসা করিতে লাগিল! তাঁহার সঙ্গীয় অশ্বারোহী সৈন্য এবং দেহরক্ষিগণেরই বা কি মনোরম গঠন-পারিপাট্য! কি বাঁকা ঠাম!

আফজাল খাঁর বাম পার্শ্বে শিবাজী চলিয়াছেন। শিবাজী মারাঠাদিগের মধ্যে সূত্রী এবং সাহসী বীরপুরুষ বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। কিন্তু আজ মারাঠারা দেখিল,—শিবাজীর শ্রী, চেহারার তেজঃ, গঠন-পারিপাট্য এবং পুষ্ট, আফজাল খাঁর তুলনায় কত নগণ্য! চন্দ্রের নিকট তারকা যেমন, পদ্মের নিকট শাপলা যেমন, কর্পূর আলোর নিকট মৃৎপ্রদীপের আলো যেমন, ময়ূরের নিকটে পাতিহংস যেমন, আফজাল খাঁর নিকটে শিবাজীও সেইরূপ প্রতিভাত হইতেছেন। শিবাজীও বিস্মিত দৃষ্টিতে এক একবার নেত্রকোণে আফজাল খাঁর কমণীয় কাস্তি, রমণীয় গঠন এবং তেজঃপুঞ্জ মূর্তি দর্শন করিতেছেন, আর হৃদয়ে ঈর্ষার সর্প দংশনে জ্বলিয়া উঠিতেছেন! হায়! শত্রুর এত রূপ! এত বীর্য! একি কখনও সহ্য হয়! তাঁহার স্বজাতীয় মারাঠাদিগের নিকট আজ যে তাঁহার সর্বপ্রকার হীনতাই সূচিত হইতেছে।

যাহা হউক, নগরের দূশা দেখিতে দেখিতে অল্প সময়ের মধ্যেই শিবাজী আফজাল খাঁকে লইয়া রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বারে উপনীত হইলেন!

এইখানে শিবাজীর আত্মীয়-বন্ধন এবং তাহার গুরু রামদাস স্বামী অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। আফজাল খাঁর উপস্থিতি মাত্রেরই একশত এক তোপ সম্মুখস্থ প্রাসাদের গর্জন করিয়া উঠিল। এই তোপ গর্জনের সঙ্গে সঙ্গেই সহসা এক মহাবিপদের সঙ্কার হইল! শিবাজীর একটি প্রকাণ্ড হস্তী ভয়ে চঞ্চল হইয়া জনতার মধ্যে বেগে ছুটিতে লাগিল! মাহত প্রাণপণে হস্তীটাকে থামাইবার চেষ্টা করিয়াও কিছুতেই কৃতকার্য হইতে না পারিয়া ভীষণ প্রহার করিতে লাগিল। ভীষণ ডাকশের প্রহারে হস্তীটি উন্মত্তপ্রায় হইয়া মাহতকে সবলে ঝুঁক দেশ হইতে আকর্ষণপূর্বক পদতলে নিষ্পেষিত করিয়া ফেলিল। ভীষণ পদাঘাতে এবং গুরুত্বরে মাহত মুহূর্ত মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হইল।

মাহতকে নিহত করিয়া হস্তীটি আরও উন্মত্ত এবং ভীষণ হইয়া পড়িল। তাহার উন্মত্ততা এবং ভীষণতায় সেই সুসজ্জিত এবং সুশৃঙ্খল মিছিলের অগ্রভাগ একেবারেই বিশৃঙ্খল ও বিপর্যস্ত হইয়া উঠিল! সর্বত্র ভীতির কোলাহল পড়িয়া গেল। হস্তীর সম্মুখ হইতে সকলেই বেগে পলায়ন করিতে লাগিল। হস্তীটি বেগে ছুটিতে ছুটিতে তাহার দক্ষিণ পার্শ্বের এক স্থানে, যেখানে মারাঠা স্ত্রীলোকেরা দাঁড়াইয়া মিছিল দেখিতেছিল, সেই দিকে ধাবিত হইল। স্ত্রীলোকেরা ভয়ে উর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিতে লাগিল।

কিন্তু রত্নখচিত কৌষেয়বস্ত্র-সুসজ্জিত রাজকুমারী তারা পলায়ন করিতে যাইয়া মঞ্চে কাপড় আটকাইয়া পড়িয়া গেল। হস্তীটি এমন সময়ে বিকট চীৎকার করিয়া উঠায়, তারার দাসীগণ তারাকে কেলিয়াই পলায়ন করিল। চতুর্দিকে ভীষণ আতঙ্কজনক উচ্চ কোলাহল উত্থিত হইল! এক পলকের মধ্যে হস্তী তারাকে পাদ-বিমর্দিত করিবে! সকলেই হাহাকার করিয়া উঠিল!

শিবাজী-তনয়া তারার কোমল-দেহ-কুসুম কুঞ্জরপদতলে দলিত হইতে আর বেশী বিলম্ব নাই। হস্তী এক পা উঠাইয়াছে! সর্বনাশ! সর্বনাশ! সকলেই তারার মৃত্যু সম্বন্ধে নিশ্চিত হইয়া গেল।

কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার! সহসা কেন হস্তীটা ভীষণ আতঙ্ক-চীৎকার করিয়া উঠিল! সকলেই বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে অবাধ হইয়া দেখিল যে, উন্মত্ত হস্তীটা কর্ণালে তীর বিদ্ধ হইয়া তারাকে ত্যাগ করিয়া অন্যদিকে ছুটিয়া যাইতেছে। তীর একহস্ত পরিমিত মস্তিষ্কের মধ্যে বিদ্ধ হইয়াছিল। সুতরাং হস্তীটা কিয়দূর যাইয়া ভূপতিত হইল। রক্তধারা প্রবাহিত হইয়া জমিন সিক্ত হইয়া গেল! দেখিতে দেখিতে হস্তীটি প্রাণ ত্যাগ করিল!

কে এই আসন্নবিপদ হইতে তারাকে রক্ষা করিল? কে এমন অব্যর্থ লক্ষ্যে

ভীষণ তেজে তাঁর নিক্ষেপ করিয়া এই মহাবিপদের অবসান করিল? কাহার বাহতে এমন দুর্ভয় শক্তি যে, হস্তীর মস্তকের মস্তিষ্ক পর্যন্ত তাঁরে বিদ্ধ করিয়াছে?

সকলেই দেখিতে পাইল যে, বীরকুল-চূড়ামণি আফজাল খাঁই মুহূর্ত মধ্যে ধনুকে জ্যা আরোপণ করিয়া সবল ও নিপুণ হস্তের অব্যর্থ লক্ষ্যে রাজকুমারী তারাবাসীকে আকস্মিক মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছেন। চতুর্দিকে আফজাল খাঁর নামে জয়ধ্বনি হইতে লাগিল। সকলেই মুক্তকণ্ঠে আফজাল খাঁর সাহস এবং তেজের কথা আলোচনা করিতে লাগিল।

অতঃপর বিচ্ছিন্ন মিছিল আবার সুশৃঙ্খল করা হইল। শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সৈনিকগণ তিনবার করিয়া কুর্গিস করতঃ আফজাল খাঁ এবং তাঁহার প্রভু বিজাপুরের সোলতানের দীর্ঘজীবন উচ্চকণ্ঠে কামনা করিল।

আফজাল খাঁ অশ্ব হইতে অবতরণ করিলে সর্বপ্রথমে রামদাস স্বামী ধান্দা-দূর্বা দ্বারা আফজাল খাঁর মঙ্গলার্চনা করিলেন। অতঃপর পুরুষ ও রমণীরা মিলিয়া আফজাল খাঁর শিরে ও সর্বাঙ্গে রাশি রাশি পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিল। এত পুষ্প বর্ষণ হইতে লাগিল যে, আফজাল খাঁর নিঃশ্বাস রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইল। উপদ্রব দেখিয়া রামদাস স্বামী সকলকে ধমক দিলেন। কিন্তু যুবতীদিগের মধ্যে একটি রমণী নিষেধের পরও গোলাপের পাপড়ী আফজাল খাঁর মুখে বর্ষণ করিতে লাগিল। রামদাস স্বামী তখন বিরক্ত ভাবে বলিয়া উঠিলেন, “কি তারা, কি করছ! তোমার কি হাঁস নাই?” কিন্তু তারা তবুও আর এক মুষ্টি পুষ্প বর্ষণ করিয়া ক্ষান্ত হইল। তারার ভঙ্গী ও পুষ্প বর্ষণে মত্ততা দেখিয়া আফজাল খাঁ ঈষৎ স্মিতহাস্য করিলেন।

অতঃপর পরম যত্নে সুসজ্জিত প্রাসাদাভ্যন্তরে আফজাল খাঁকে লইয়া রামদাস স্বামী এবং শিবাজীর পিতা শাহজী তাঁহার সেবায় ও পরিতোষ-বিধানে নিযুক্ত হইলেন। সৈনিকপুরুষদিগকেও যথাযোগ্য বাসস্থান এবং আহার প্রদান করা হইল। আদর-অভ্যর্থনা এবং সম্মান-সম্বর্ধনা পুরামায়ায় চলিতে লাগিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পশ্চিম রাত্রি। জন-প্রাণীর সাড়াশব্দ নাই। আকাশে কৃষ্ণা পঞ্চমীর চন্দ্র কিরণধারায় সমস্ত পৃথিবীকে পুলকিত করিয়া রাখিয়াছে! নানা জাতীয় নৈশ-কুসুমের গন্ধ বাহিয়া মৃদুমন্দ গতিতে বায়ু বহিয়া যাইতেছে। এমন সময় রায়গড়ের একটি বৃহৎ উদ্যানমধ্যস্থ ক্ষুদ্র অট্টালিকায় শিবাজী, তাঁহার পিতা শাহজী, ওরু রামদাস স্বামী, বলবন্ত রাও, মালজী প্রভৃতি মারাঠাপ্রধানগণ ও

পবামর্শের জন্য নিভ্ৰতে সমবেত হইয়াছেন। সকলেই গভীর চিন্তায়ুক্ত—সকলেই নীরব। এই নৈশ গুপ্ত সভাধিবেশনের কথা আর কেহই অবহত নহে। রাজপুরীর আর কোনও নরনারী এ-সভার কোনও সংবাদ রাখে না এবং রাখিবারও কোনও প্রয়োজন নাই।

সকলেই নীরবে গৃহতলে সমাসীন। সকলেই গভীর চিন্তায় নিবিষ্ট। মৌনতা ভঙ্গ করিয়া সহসা শাহজী বলিলেন, “বৎস শিবা! অकारणे राजविद्रोहिता महापाप। আমরা বিজাপুরের সোলতানের অধীনে বেশ আরাম ও স্বচ্ছন্দে দিন গুজরান করছি। রাজ্যের সর্বত্র শান্তি বিশেষ রূপে প্রতিষ্ঠিত। চোর-দস্যুর উৎপাত একেবারেই নাই। ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শিল্প-কৃষি অসাধারণ উন্নতি লাভ করেছে। জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকলেই তুল্যভাবে শাসিত এবং পালিত হচ্ছে। মুসলমান শাসনে ব্রাহ্মণ শূদ্রের বিচারে কোনও পার্থক্য নাই। উচ্চ রাজকার্যে হিন্দু-মুসলমান সকলেরই সমান অধিকার। তার পর বিজাপুরের সোলতান, শুধু আমাদের রাজাই নহেন;—আমাদের প্রভু এবং অনুদাতা। আমি, যে-রাজ্যের একজন অমাত্যের মধ্যে গণ্য, সেই রাজ্যের বিরুদ্ধাচরণ করা পাপ—মহাপাপ! ধর্ম এ-পাপ কখনও সহাবে না। এতে কেবল ধ্বংস ও অকীর্তিই আনয়ন করবে।

“প্রবলপ্রতাপ সোলতানের বিরুদ্ধাচরণ করা ছেলেমী এবং পাগলামী মাত্র। হঠাৎ আক্রমণ করে তাঁর দু'চারটি দুর্গ এবং দশ-বিশখানা গ্রাম দখল করেছে বলে, সম্মুখসমরে তাঁর পরাক্রান্ত বাহিনীকে কোনও রূপে পরাজিত করতে পারবে, এরূপ কল্পনা তুমি স্বপ্নেও পোষণ করো না।

“সোলতান অত্যন্ত সরলচেতা এবং উদার প্রকৃতির লোক। তিনি যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং রক্তপাতের পক্ষপাতী নহেন। তাই আমাকে বিনা যুদ্ধে গোলযোগ মিটাবার জন্য পাঠিয়েছেন। বৎস, যদি তোমার পিতা জীবনকে বিপন্ন না করতে—অধিকতর নিজেকেও রক্ষা করতে চাও, তা হলে সোলতানের বশ্যতা স্বীকার করে রাজচক্র প্রজ্ঞারূপে বাস করাই সর্বথা যুক্তিসঙ্গত। তুমি যে-সমস্ত দুর্গ অধিকার করেছে, তুমিই তার অধ্যক্ষ নিযুক্ত থাকবে। এ অপেক্ষা মহামাননীয় সোলতানের নিকট আর কি অনুগ্রহ পেতে চাও? ইহা বাস্তবিক লোকাভীত মহানুভবতা। দেবতারাও ইহার অধিক অনুগ্রহ করতে পারে না।

“প্রিয় শিবা! সোলতান আমার বিলম্ব দেখলে নিশ্চয়ই সন্দিগ্ধ হবেন। তুমি সেনাপতি আফজাল খাঁর নিকটে আগামী কল্য বশ্যতা স্বীকার করলেই, সমস্ত অশান্তি ও গোলযোগ মিটে যায়। এ উত্তরকার্যে আর বিলম্ব করা উচিত নহে। চিন্তা করে দেখ—সামান্য অবস্থায় সামান্য বংশে অনুগ্রহণ করে এবং সামান্য লোক হয়ে বিজাপুরের সম্মানিত সামন্তের মধ্যে গণ্য হওয়া ভাল, কি জনসমাজে কুকুর তুলা ঘৃণিত দস্যু বলে অভিহিত হয়ে সর্বদা বনজঙ্গলে উৎকণ্ঠিতভাবে

জীবনযাপন করা ভাল।”

পিতার কথায় শিবাজী ক্ষণকাল নীরব রহিলেন। তারপরে বলিলেন, “বাবা! আপনি যা বললেন, তা উচ্চাকাঙ্ক্ষাবিহীন হীনচেতা ন্যক্তিদিগের নিকট নিতান্তই যুক্তিসঙ্গত বটে, যশোলোলুপ রাজ-পদাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিদিগের পক্ষে এ-উপদেশ গ্রাহ্য হতে পারে না। রাজ্য কাহারও পৈতৃক বা বিধিনির্দিষ্ট নিষ্ক্রম বস্তু নহে। যে বাহুবলে অধিকার করতে পারে, তারই হয়ে যায়। সুতরাং রাজ্যবিদ্রোহীতা কথাটার কোন মূল্য নাই। বিশেষতঃ, ইহা যে কোনও পাপ কার্যের মধ্যে গণ্য, তা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি না।

“পৃথিবীতে রাজপদ যখন সর্বশ্রেষ্ঠ পদ, তখন ছলে-বলে কলে-কৌশলে যে-কোনও প্রকারে হউক, তা লাভ করাই আমার মতে পরম ধর্ম। যখন আমি সেই ধর্মে দীক্ষিত হয়েছি, তখন আর সোলতানের নিকট বশ্যতা স্বীকার করা আমার পক্ষে অসম্ভব।”

শাহজী : বৎস শিবা! তুমি যা বললে, তা অনেকটা সত্য বটে। কিন্তু তুমি কি বাহুবলে রাজ্য অধিকার করেছ? কিম্বা করতে সমর্থ? তুমি অত্যন্ত ভুল বুঝছ! তুমি যে-বৃষ্টি অবলম্বন করেছ, তা বীরপুরুষ বা রাজধর্মী ব্যক্তির বৃষ্টি বলে কদাপি অভিহিত হতে পারে না, পূর্বেই বলেছি, ইহা অতি জঘন্য দস্যুবৃষ্টি! দস্যু সকলেরই ঘৃণার পাত্র এবং শূল-দণ্ডে বধ্য।

শিবা : কিন্তু এই দস্যুবৃষ্টি ব্যতীত যখন অন্য কোনও উপায়ে অতীষ্ট সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই, তখন এই দস্যুতাবেই আমাকে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সাধনা করতে হবে। আমি এই কর্তব্য হতে কিছুতেই আর এখন বিচলিত হতে পারি না। আপনি আর বিজ্ঞাপুরে ফিরে যাবেন না। পর্বত ও অরণ্যসঙ্কুল দুর্গম কঙ্কন প্রদেশের দুর্গে যেয়ে সুখে বাস করুন। আপনার কেহ কেশও স্পর্শ করতে পারবে না। আমি এদিকে ছলে-বলে কলে-কৌশলে যে-রূপেই হউক, সোলতানের আধিপত্য নষ্ট করে রাজ্যস্থাপনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করব। যদি কোনও বিপদ ঘটে, তা আমার প্রতিই ঘটবে। যদি কিছু অধর্ম হয়, তা আমারই হবে। সে জন্য আপনার কোনও চিন্তা নাই। আপনি আমার আর কোনও কার্যেরই আলোচনা করবেন না।

শিবাজীর কথা শুনিয়া শাহজী একটু রুট হইয়া রুদ্ধ স্বরে বলিলেন, “কি আশ্চর্য, তোমার পাপ কার্য-মহাপাপ কার্যেরও সমালোচনা করতে পারব না! আমি এমন রাজ্যদ্রোহী দস্যু পুত্রের মুখ দেখতেও ইচ্ছা করি না। তোমার যা ইচ্ছা, তাই করতে পার, কিন্তু পরিণামে এই ঔদ্ধত্য এবং পাপের জন্য তোমাকে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে।” এই বলিয়া শাহজী নিতান্ত ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত অবস্থায় সেই নিভৃত গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

শাহজাদী নিভৃত গৃহ হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেলে, শিবাজী এবং রামদাস স্বামী প্রভৃতি মিলিয়া যে-পরামর্শ করিলেন, তাহা যার-পর-নাই ঘৃণিত এবং পাপজনক! আফজাল খাঁকে সহসা আক্রমণ করিয়া বধ করাই তাঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। তাঁহাকে বধ করিতে পারিলে, বিজাপুরাধিপের দক্ষিণ হস্ত ভগ্ন হইবে বলিয়া শিবাজীর দৃঢ় বিশ্বাস। কারণ আফজাল খাঁর ন্যায় একরূপ তেজীযান্ এবং মহাবীর সেনাপতি লাভ বহু ভাগ্যের কথা। শিবাজী অনেকবার বলিলেন যে, 'আফজাল খাঁর ন্যায় বীর পুরুষের সাহায্য পাইলে তিনি দশ বৎসরের মধ্যে সমস্ত দক্ষিণাত্যে জয়পতাকা উড্ডীন করিতে পারেন।' এহেন আফজাল খাঁকে কোনও রূপে নিহত করিতে পারিলে, তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথ যে অনেকটা নিশ্চল হয়, তদ্বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ নাই। সুতরাং আফজাল খাঁকে গুণ্ডভাবে হত্যা করিবার জন্য আয়োজন চলিতে লাগিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অস্তঃপুরস্থ একটি অট্টালিকার সজ্জিত কক্ষে তারাবাঈ একটি জানালার ধারে বসিয়া গভীর চিন্তাসাগরে নিমগ্ন। তারাবাঈয়ের সখী মঞ্জরীমালা এবং ধাত্রী সারদা উভয়েই গাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত। কেবল নীরব প্রশস্ত কক্ষে শিবাজীর প্রাণাধিক-প্রিয় দুহিতা, উদ্ভিন্ন-যৌবনা তারাবাঈ রূপের ছটায় সমস্ত কক্ষ আলোকিত করিয়া জাগিয়া জাগিয়া কি-যেন চিন্তা করিতেছে। বাতায়ন-পথে হেমস্তের ঈষৎ শীতল সমীরণ ধীর গতিতে প্রবাহিত হইয়া যুবতীর কুঞ্চিত অলকরাঞ্জি এবং চেলাঙ্কল লইয়া ক্রীড়া করিতেছে।

যুবতী যেমনি সুন্দর সূঠাম তেমনি বেশ তেজস্বিনী অথচ কমনীয় মূর্তিবিশিষ্ট। যুবতী শিশিরসিক্ত বালার্কেব নব অক্লমিমা-ব্রাগ-রঞ্জিত বসরায় গোলাপের ন্যায় মনোহর! অথবা শারদীয় উষার ন্যায় চিন্তহারিণী। সমগ্র মহারাষ্ট্রে তারাবাঈয়ের ন্যায় সুন্দরী যুবতী আর একটি আছে কি-না সন্দেহ। তারাবাঈকে দেখিলে, তাহাকে আদৌ মারাঠা-কন্যা বলিয়া বোধ হইত না। মনে হইত, যেন কোনও ইরানী-সুন্দরী মারাঠী পরিচ্ছেদে দেহ সাজাইয়া অস্তঃপুর আলো করিয়া বিরাজ করিতেছে। যৌবনসমাগমে তারা বর্ষার নদীর ন্যায়, বসন্তের গোলাপের ন্যায়, শরতের পদ্মের ন্যায়, উষার তারকার ন্যায়, পরিপুষ্ট, কমনীয়, লোভনীয় এবং শোভনীয় হইয়াছে! তাহার অন্তরের পর্দায় পর্দায় কি যেন এক নব ভাবাবেশের অনন্ত সৌন্দর্য উথলিয়া উঠিয়াছে। পূর্ণিমার চন্দ্রদর্শনে নদনদী সমুদ্রের স্থির জল যেমন ক্ষীণ হইয়া উঠে, তারাবাঈয়ের স্থির অচঞ্চল হৃদয়ও আজ তেমনি

অসাধারণ সৌন্দর্যশালী পুরুষরত্ন আফজাল ঝাঁকে দর্শন করিয়া প্রেমানুরাগে অধীর ও আকুল হইয়া উঠিয়াছে। যে মালোজীর সঙ্গে তারার বিবাহের কথা হইয়াছে, যে মালোজীর বীরত্বের কথা শুনিয়া এবং বীর্যপুষ্ট-দেহ-কান্তি এবং রূপশ্রী দেখিয়া তারাবাঈ মুগ্ধ হইয়াছিল, আজ সেই মালোজীর স্ত্রী ও কান্তি তারার কাছে তেমন চিন্তাবিনোদন বলিয়া আর প্রতিভাত হইতেছে না। তারা মনে মনে তাহার ইষ্টদেবতা শঙ্করকে ধন্যবাদ দিতে লাগিল যে, মালোজীর সহিত বিবাহের পূর্বেই সে আফজাল ঝাঁর ন্যায় পুরুষরত্নের দর্শন পাইয়াছে। আশার সহিত দারুণ নিরাশায় তাহার চিত্ত ঝঞ্ঝানিল-সস্তাড়িত সরসীর ন্যায় উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে।

আফজাল ঝাঁকে দেখিয়া তারার হৃদয়-মন তাঁহার চরণতলে লুটাইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু হায়! প্রকাশ্যে তাহা উৎসর্গ করিবার কোনও উপায় হইবে কি? পিতার শত্রুপক্ষীয় সেনাপতির প্রতি অনুরাগ, কি ভয়ানক কথা! কি অসম্ভব ব্যাপার! তারাবাঈ প্রেমোষেল চিন্তকে নানা প্রকারে শান্ত ও সংযমিত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিল; কিন্তু কৃতকার্যতার অপেক্ষা পরাজয়ের মাত্রাই আরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তারা বড়ই বিপদে পড়িল। সে আফজাল ঝাঁকে যতই ভুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, আফজাল ঝাঁর মূর্তি ততই উজ্জ্বল ও তাঁহার প্রতি প্রেমাশক্তি ততই শত গুণে দৃঢ় বন্ধমূল হইতে লাগিল। তারার দুই কপোল বহিয়া অশ্রুধারা মুক্তাধারার ন্যায় গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

তারা যতই পাঠানবীরকে ভুলিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল, মন ততই বলিতে লাগিল, আহা! তাঁহাকে কি ভোলা যায়! কি চমৎকার মোহিনী মূর্তি! মরি! মরি! কি রূপেরই বাহার! কি কান্তির ছটা! কি তেজঃ! কি সাহস! কি স্কৃতি! যেন সাক্ষাৎ কার্তিক। কি লাবণ্যের জোয়ার! কি ভুবনভুলানো অক্ষিযুগল! এমন নব্য যুবক, এমন সূচাম ও সূশ্রী তেজস্বী পুরুষ। হায়! উহার চরণে আশ্রয়বলিদানেও যে সুখ। উহার কথা শ্রবণ করিতেও যে হৃদয় অমৃতরসে সিক্ত হইয়া যায়!

তারাবাঈ আফজাল ঝাঁকে ভুলিবার জন্য চেষ্টা করিয়া, আফজাল ঝাঁর প্রেমোন্মাদনায় আরও উন্মত্ত হইয়া পড়িল। ধৈর্যের বাঁধ একেবারেই ভাঙিয়া গেল। মনে হইতে লাগিল, কিসে যেন হৃৎপিণ্ডটাকে আফজাল ঝাঁর দিকে সবেগে আকর্ষণ করিতেছে! তাহার শরীরের অণু-পরমাণু যেন শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আফজাল ঝাঁর প্রতি ছুটিয়া যাইতে চাহিতেছে। কি ভীষণ ব্যাপার। কি অভূতপূর্ব ঘটনা। যুবতী বিন্মিত এবং স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। বহুতঃ প্রেমের আকর্ষণের নিকট সকল আকর্ষণই পরাস্ত। প্রেমের প্রভাবের নিকট সকল প্রভাবকেই ধ্বংস হইতে হয়। মানব ক্ষুদ্র জীব। তাহার হৃদয়টি আরও ক্ষুদ্র। কিন্তু এই ক্ষুদ্র হৃদয়-সজ্জাত প্রেমের ধারা সারা বিশ্বকে ভাসাইয়া দিতে পারে।

এই প্রথম যৌবনের প্রথম প্রেমের উদ্‌গীর্ণিত আবেগে তারা অধীর ও আকুল হইয়া উঠিল। তারা বাই আকুল প্রাণ লইয়া ঘরের বাহির হইয়া পড়িল। এদিকে সেদিকে, প্রাসঙ্গের ধারে, দীঘির পাড়ে চিন্তা-ভারাক্রান্ত চিন্তে ভ্রমণ করিতে লাগিল। আর পুনঃ পুনঃ উচ্ছ্বাস হৃদয়ে আফজাল খাঁর অবস্থান অটোলিকার দিকে দৃকপাত করিতে লাগিল। তাবা বেড়াইতেছে কিন্তু হৃদয়ের উদ্বেগ ও কামনার আন্তন তাহাকে উন্মত্তপ্রায় করিয়া রাখায় কিছুতেই শান্তি পাইতেছে না। তারা ক্রমশঃ বেড়াইতে বেড়াইতে আপন মনে বাগানের দিকে চলিল। যাইতে যাইতে ক্রমশঃ বাগানটির রমণীয় সৌধের নিকটবর্তী হইল। সৌধ দেখিয়া মনে হইল, এই নির্জন সৌধে আফজাল খাঁকে পাইলে সে অশ্রুজলে তাঁহার পদতল অভিষিক্ত করিয়া দিত। কিন্তু হয়! তাহার দৃষ্টি অদৃষ্টে এ-সুযোগ কখনও জুটিবে কি? এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সেই নির্জন সৌধের যেমনি নিকটবর্তী হইল, অমনি গুনিতে পাইল, “আফজাল খাঁকে যে-রূপেই হউক, হত্যা করতে হবে। শত্রুকে ছলে-বলে-কৌশলে যে-কোনও প্রকারে হত্যা করাই পরম ধর্ম।”

সহসা বহুঘাত হইলেও তারা বাই কখনও এরূপ চমকিত ও আতঙ্কিত হইত না। তাহার প্রেমের পাত্র আফজাল খাঁর হত্যার সিদ্ধান্ত গুনিয়া তাহার হৃদয়ের স্পন্দন যেন ক্রুদ্ধ হইয়া গেল! একজন মহা পরাক্রান্ত ক্ষমতাশালী সেনাপতিকে বন্ধু ভাবে গ্রহণ করিয়া বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক হত্যা করিবার মত এমন পৈশাচিক প্রবৃত্তি এবং ভীষণ হীনতা যে মানুষের মনে স্থান পাইতে পারে, ইহা কিছুতেই সেই সরলা তরলা প্রেম-বিহ্বলা কুমারীর পক্ষে বুঝিয়া উঠা বা ধারণা করা সহজ ছিল না। তাহার পিতা শিবাজী ডাকাতি করেন বটে, কিন্তু এমনি করিয়া ছলনা-পূর্বক যে ঠগীর ন্যায় নির্দোষ ব্যক্তির প্রাণবধ করিতেও পটু, তাহা জানিতে পারিয়া পিতার প্রতি বিষম ঘৃণা ও অশ্রদ্ধার ভাবে হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিল।

এক্ষণে কিরূপে তাহার হৃদয়-আকাশের শরচ্ছন্দ্রমা, জীবন-উদ্যানের রসালবৃক্ষ আফজাল খাঁকে হত্যাকাণ্ড হইতে রক্ষা করিবে, তচ্চিন্তায় শিবাজীনন্দিনী যৎপরোনাস্তি আকুল হইয়া উঠিল। নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়াও তাহার আকাজিকত প্রেম-দেবতা আফজাল খাঁকে দস্যুধর্মী পিতার নিদারুণ ষড়যন্ত্র এবং নৃশংস হত্যাকাণ্ড হইতে বাঁচাইবার জন্য তারা বাই ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

মানব-হৃদয়ে যখন নবীন প্রেমের সঞ্চার হয়, তখন উহা গিরিতলা-নির্গত তরঙ্গিনীর ন্যায় তীব্রবেগে প্রবাহিত হয়। নাধাবিশ্ব অতিক্রম করিয়া ছুটিতে থাকে। নদীর সম্বন্ধে—

“পর্বত গৃহ ছাড়ি,
বাহিরায় যবে নদী সিঁকুর উদ্দেশে

কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি।”

ইহা যেমন সত্য, প্রেমের স্বন্ধেও তেমনি নীচের কবিতাটি অটুট সত্য।

মানস কন্দর হতে যৌবন-উষায়,
যে প্রেমের মন্দাকিনী কারো পানে ধায়,
কার সাধ্য তার গতি করে অবরোধ?
রোধিতে যে চায়, সেই নিতান্ত নির্বোধ!
বায়ু জল উচ্চা তীর কত ধরে বেগ
তাহার অধিক জ্ঞান প্রেমের উদ্বেগ!
প্রেমের সমুখে হায়! কঠিন পাষণ
হয়ে যায় সুকোমল ফুলের সমান!
সাগর গোম্পদ হয়, মরু হয় বন,
দুঃখে উপজয় সুখ, মরণে জীবন!
যত দুঃখ যত ক্লেশ যত নির্যাতন,
প্রেম করে সকলেরে সুখা-প্রসবণ!
বিষেরে অমৃত করে, আঁধারে আলোক,
নরকেরে স্বর্গ করে বিষাদে পুলক,
আপনারে ভুলে যাওয়া পরের কারণ
ইহাই প্রেমের বটে প্রথম লক্ষণ।
দ্বিতীয় লক্ষণ শুধু স্বরণ, সেবন
প্রেমাম্পদ হেতু শেষে আনন্দে মরণ!

ভারাবান্ধি নিঃশব্দ পদ-সজ্জারে প্রাচীরের গায়ে কান লাগাইয়া রুদ্ধ নিঃশ্বাসে
শিবাজীর সমস্ত পরামর্শ শ্রবণ করিল। আফজাল খাঁকে হত্যা করিবার জন্য
ষড়যন্ত্রের সমস্ত মন্ত্রণা ওনিয়া ব্যাকুল চিন্তে ক্রম চরণে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ভরুণ অকারণে কনক-কিরণ-রাগে চতুর্দিক আলোকিত হইয়াছে। প্রভাতপবন
বনভূমির স্বভাবজাত কুসুমগন্ধ বহন করিয়া মৃদুমন্দ সম্ভরণ করিতেছে। শিশির-
সিক্ত পাতায় পাতায় সূর্যের রশ্মি পতিত হইয়া শ্যামলমাত্র অঙ্গ লালিমার কি
অপূর্ব বাহার খুলিয়াছে। নানাজাতীয় বিচিত্র-বর্ণ বিচিত্র-পক্ষ সুধাকণ্ঠ বিহঙ্গগণ
কৃষ্ণন-লহরীতে বিমাল আরণ্য প্রকৃতিতে মুগ্ধবিত্ত এবং পুলকিত কণিয়া
ভুলিয়াছে। এমন সময়ে কৃষ্ণগড় ও রায়গড়ের সীমানাস্থিত অরণ্যে মৃগয়াত জন

শিবাজী এবং আফজাল খাঁ কতিপয় শিকারী অনুচর, বহুসংখ্যক কুকুর, বাজপক্ষী ও পালিত চিড়া বাঘ সহ প্রবেশ করিলেন। পক্ষীশিকারী হস্তী শিকারী ও শিকারের সরঞ্জাম বহন করিয়া নিবিড় অরণ্য ভোলপাড় করিয়া ক্রমশঃ গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করিল। হস্তিযুথের ভয়ে বিহঙ্গণ ত্রাসিত হইয়া চতুর্দিকে ছত্রস্তম্ভ অবস্থায় উড়িতে লাগিল। মৃগ, কৃষ্ণসার ও অন্যান্য আরণ্যজন্তু চতুর্দিকে ভয়ে ছুটিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। শিকারিগণ কেহ ভীর, কেহ বা বন্দুকের দ্বারা মৃগ শিকার করিতে লাগিল।

শিকার করিতে করিতে ক্রমশঃ আফজাল খাঁ এবং শিবাজী একটি ক্ষুদ্র পার্বত্য-নদীর তটে গভীর বনে উপস্থিত হইলেন। এই নিবিড় বনের একটানা শ্যামল-শোভা দেখিয়া আফজাল খাঁ নিতান্তই বিমোহিত হইলেন। এই বনে সিংহ বাস করিত বলিয়া সাধারণ শিকারীরা প্রায় এ দিকে পদার্পণ করিত না। কিন্তু আফজাল খাঁর সিংহ এবং ব্যস্ত্র শিকারের অপরিমিত কৌতূহল ছিল বলিয়া এই বনে বেচ্ছায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বনের নিবিড় প্রদেশে উপস্থিত হইয়া আফজাল খাঁ দুই হস্তে বক্রমুখ ক্ষুদ্রাকৃতি দুইখানি তরবারি ধারণপূর্বক হস্তিপৃষ্ঠ হইতে অবতরণপূর্বক দুইজন অনুচর সহ পদব্রজে বনের ভিতরে প্রবেশ করিলেন। এই সিংহ-নিবাস বনে প্রবেশ করিতে অনেকেরই অমত ছিল। কিন্তু পল্টন বীর আফজাল খাঁর জ্বলন্ত উৎসাহ এবং দৃঢ়তার নিকট সকলের আপত্তি ও তীতি প্রাবনের মুখে ভূগণ্ডম্ভের ন্যায় ভাসিয়া গেল। আফজাল খাঁর পশ্চাতে আরও পাঁচজন বীরপুরুষ তরবারি মাত্র হস্তে ধারণ করিয়া সেই স্বাপদ-সঙ্কুল ভ্রমাবহ বনে প্রবেশ করিলেন। শিবাজী এবং তাঁহার অন্যান্য মারাঠা অনুচর এবং আফজাল খাঁর সঙ্গীয় অন্যান্য যোদ্ধা ও শিকারী হস্তিপৃষ্ঠে সেই নিবিড় বনের মধ্যে খাঁ সাহেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রবেশ করিল।

বনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সকলেই প্রকাণ্ড শাল, গজারী, দেবদারু, তমাল, ভাল প্রভৃতি বৃক্ষ দর্শনে ত্তিত হইলেন। বহুকালের বৃক্ষরাজিতে পরিপূর্ণ হইয়া এই নিবিড় বন যাব-পর-নাই গভীর দৃশ্য ধারণ করিয়াছিল। এই কারণে সূর্যরশ্মি কদাচিত্ প্রবেশ করিত। আফজাল খাঁ অনুচর পঞ্চকসহ সেই নিবিড় বনে সিংহ শিকারের জন্য তরবারি হস্তে ক্রমশঃ ধীরে ধীরে জঙ্গল ভাসিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অগ্রসর হইতে হইতে এক ক্ষুদ্র পর্বতমূলে একটি গহ্বর সম্মুখীন হওয়া মাত্র সহসা দুইটি সিংহ তীষণ গর্জনে অরণ্যভূমি প্রকম্পিত করিয়া উল্লঙ্ঘনপূর্বক আফজাল খাঁর উপরে পতিত হইবার উপক্রম করিল। তখন মহাবীর আফজাল খাঁ এবং সহচরণ যুহুর্ভ মধ্যে সাবধান হইয়া দৃঢ়যুক্তিতে সিংহ গল্ফে তরবারি ধারণ করিলেন। এই সময় বীরবর আফজাল খাঁ এবং তাঁহার সঙ্গীদের বদনে অপূর্ব দৃঢ়তা এবং বীরত্বের ভেজাঃ অতি চমৎকাররূপে ফুটিয়া

চতুর্দিকে একটি ভীতিজনক অক্ষুট রব উদ্ভিত হইল। শিবাজীর হস্তের তরবারিখানি ভূপতিত হইবার সময়ে দূরে ছিটকাইয়া পড়িয়াছিল। কোষে আর একখানি তরবারি থাকিলেও শিবাজী ভয়ে মূর্ছিত হইয়া আত্মরক্ষার উদ্যোগ করিতেও অসমর্থ ছিলেন।

সকলেই শিবাজীর আসন্নমৃত্যু কল্পনা করিয়া যখন ভীত ও ব্যাকুল হইতেছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে সকলে বিশ্বয়-বিস্ফারিত-নেত্রে দেখিতে পাইল যে, মহা সাহসী আফজাল খাঁ হস্তিপৃষ্ঠ হইতে তরবারি হস্তে বেগে লক্ষ প্রদানপূর্বক ভূমিতলে দণ্ডায়মান হইবার পূর্বেই প্রচণ্ড আঘাতে ব্যাঘ্ররাজকে দ্বিখণ্ড করিয়া মূর্ছিত শিবাজীকে ভূমি হইতে উত্তোলন করিলেন। চতুর্দিক হইতে হর্ষ-রসাপ্লুত কণ্ঠে "সাবাস! সাবাস!" শব্দ উদ্ভিত হইল।

আফজাল খাঁর সাহস, কার্যতৎপরতা এবং সত্বরতা দেখিয়া সকলেই অবাক হইয়া গেল! শিবাজী ভক্তিগদগদ কণ্ঠে তাঁহার প্রাণদাতা বীরবরকে পুনঃপুনঃ মুক্ত কণ্ঠে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। নিজের আসন্ন মৃত্যুর আশঙ্কা জানিয়াও যিনি পরের প্রাণ রক্ষার জন্য ভীষণ ব্যাঘ্রের মুখে লক্ষ প্রদানপূর্বক পতিত হইতে পারেন, তাঁহার বীরত্ব ও পরহিতৈষণার তুলনা কোথায়?

এই ঘটনার পরে আফজাল খাঁর লোকজন আর অগ্রসর না হইয়া রায়গড়ে ফিরিয়া যাইবার জন্য মত প্রকাশ করিলেও, শিবাজী অত্যন্ত অগ্রহাতিশয্যে পুনঃ পুনঃ কৃষ্ণগড়ের প্রান্ত পর্যন্ত যাইবার জন্য জেদ ও উৎসাহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার উৎসাহে মহাবীর আফজাল খাঁ সাহেব উৎসাহিত হইয়া আরও অগ্রসর হইয়া রাত্রি যাপনের মত প্রকাশ করিলেন, সুতরাং শিকারীর দল আবার অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

বেলাও তখন খুব বেশি ছিল না। খুব দ্রুত গমন করিলেও এক প্রহর রাত্রির পূর্বে কৃষ্ণগড়ের প্রান্ত পর্যন্ত উপস্থিত হইবার কোনই আশা ছিল না। সুতরাং মাহুতেরা হস্তিযুথকে খুব দ্রুত গমনের জন্য বিশেষ তাড়া করিল। কিয়দূর অগ্রসর হইবার পরে সকলেই বিশ্বিত দৃষ্টিতে দর্শন করিল যে, নিবিড় অরণ্যানীর মধ্য হইতে সহসা সর্বাঙ্গ-বর্মমণ্ডিত একজন অশ্বারোহী এক ক্ষুদ্র পর্বতের পার্শ্ব হইতে আফজাল খাঁর সম্মুখীন হইয়া অস্তিবাদনপূর্বক একখানি পত্র প্রদান করতঃ পর মুহূর্তেই বিদ্যুৎবেগে অশ্বচালনা করিয়া সেই নিবিড় বনের অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেল। আফজাল খাঁ পত্র পাঠ করিয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। জনৈক পার্শ্বচর পত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিলে আফজাল খাঁ বলিলেন যে, পত্রখানি বিজাপুর হইতে আসিয়াছে। সোলতান তাঁহাকে শীঘ্রই রাজধানীতে ফিরিবার জন্য লিখিয়াছেন।

শিবাজী সহসা সেই অশ্বারোহীর আগমন এবং দ্রুত গমনে কিঞ্চিৎ বিচলিত

হইয়া কয়েকজন সৈনিককে তাহার অনুসরণ করিবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন। কয়েকজন মারাঠী অশ্বারোহী সেই অশ্বারোহীর পশ্চাদ্ধাবনের উপক্রম করায় আফজাল খাঁ কঠোর দৃঢ়তার সহিত তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া বলিলেন যে, অশ্বারোহী বিজাপুর সোলতানের খাস সংবাদবাহক। তাহাকে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। সুতরাং অশ্বারোহিগণ আর তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইল না। কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইবার পরে আফজাল খাঁ শিবাজীর পশ্চাতে পড়িবার চেষ্টা করিয়া শিবাজীকে বলিলেন, “এখানের পথ নিতান্তই সঙ্কীর্ণ বিশেষতঃ অন্ধকার হয়ে আসছে, আমার মাহুত ভাল দেখতে পাচ্ছে না, আপনার হাতীটাকে আগে চালান। তা হলে আমার হাতী তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাওয়ার সুবিধা পাবে।”

শিবাজী অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া বলিলেন, “হায়! তাও কি হয়! আপনাকে পিছে রেখে আমি অগ্রে যাব, তা কখনও মনে করবেন না। আমা দ্বারা একরূপ বে-আদবী কখনও হবে না।”

আফজাল খাঁ হস্তী থামাইয়া শিবাজীকে অনেক পীড়াপীড়ি করিলেন; কিন্তু শিবাজী কিছুতেই অগ্রগমনে সম্মত হইলেন না। সুতরাং অগত্যা আফজাল খাঁই পূর্বের ন্যায় অগ্রগামী হইলেন। এক সঙ্কীর্ণ গিরিবর্ধের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আফজাল খাঁ শিবাজীকে আবার অগ্রগমনের জন্য পীড়াপীড়ি করিলেন। শিবাজী পুনরায় অস্বীকৃত হইলেন। আফজাল খাঁ তখন সেই স্থলে হস্তী হইতে অবতরণপূর্বক সঙ্গী সৈন্যদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, “তোমরা কয়েক খণ্ড গুরুভার প্রস্তর এই রাস্তার উপর দিয়ে সাবধানে সম্মুখের দিকে গড়িয়ে লয়ে যাও। এই রাস্তায় ঘোড়াডুবি-গর্ত আছে।”

অষ্টম পরিচ্ছেদ

আফজাল খাঁর আদেশ মাত্রই কতিপয় সৈন্য দুইটি গুরুভার প্রস্তর গড়াইয়া কিয়দূর লইয়া যাইতেই সহসা একখণ্ড প্রস্তর শ্যামল দুর্বাযুক্ত মৃত্তিকা ভেদ করিয়া ভীষণ শব্দে নিম্নে পতিত হইল। এই ভীষণ ও ভয়াবহ বিশ্বাসঘাতকতা দেখিয়া সকলেই শিহরিয়া উঠিল। আফজাল খাঁর সর্বনাশ সাধনের জন্যই যে, এই ভীষণ ষড়যন্ত্র করা হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে কাহারও আর বাকী থাকিল না। এই ভীষণ ষড়যন্ত্র লইয়া বিশেষ আলোচনা হইবার পূর্বেই শিবাজী সহসা এক বংশীধ্বনি করিলেন। সেই বংশীধ্বনির সঙ্গে সঙ্গেই বহুসংখ্যক লুকায়িত মাওয়ালী সৈন্য, প্রতি প্রস্তর খণ্ড, প্রতি বৃক্ষ ও প্রতি ঝোপের আড়াল হইতে নির্গত হইয়া চতুর্দিক হইতে আফজাল খাঁ এবং তাহার মুষ্টিমেয় দেহরক্ষী সৈন্যকে ভীষণ ভাবে

আক্রমণ করিল। অগণ্য হস্তী বা মহিষ-যুগ কর্তৃক আক্রান্ত হইলে সিংহ যেমন ভীষণ প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, আফজাল খাঁ এবং তৎসঙ্গিগণও সেইরূপ রোষ-ক্ষোভে-দুঃখে প্রজ্বলিত হতাশন প্রায় নিতান্ত প্রদীপ্ত হইয়া ভীষণ তেজে উলঙ্গ কৃপাণ করে অরাতি নিধনে প্রমত্ত হইলেন। সন্ধ্যার তরল অন্ধকারে তাঁহাদের কাফের-শোণিত-পিপাসু তরবারি বিদ্যুৎ চমক প্রদর্শন করিতে লাগিল। ত্রিশজন মোসলেম প্রায় দুই সহস্র শত্রুর বিরুদ্ধে যুঝিতে লাগিল।

এক সঙ্কীর্ণ গিরিবর্ষের সম্মুখস্থ মাওয়ালী সৈন্যগণের ভিড় ঠেলিয়া এবং প্রচণ্ড প্রহারে তাহাদিগকে তরল পারদের ন্যায় চঞ্চল করিয়া আফজাল খাঁ সেই গিরিপথের মধ্যে প্রবেশ করতঃ আত্মরক্ষা করিবার জন্য বিপুল চেষ্টা ও উদ্যোগ করিলেন।

আফজাল খাঁ এবং তাঁহার সৈন্যগণ কেহই বর্মপরিহিত ছিলেন না। সুতরাং শরীরের নানাস্থানে গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়া সন্ত্রস্ত হিংসের ন্যায়, পবনহত পাবকের ন্যায়, উন্মত্ত কুঞ্জরের ন্যায়, আহত ফনীর ন্যায়, সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায়, ভীষণ বাতাবর্তের ন্যায়, নিতান্ত উগ্র এবং একান্ত আত্মবিশ্বস্ত হইয়া তেজঃদৃপ্ত ও সংহারক হইয়া পড়িলেন! “দীন দীন” রবে ভীষণ গর্জন ও হুঙ্কার করিয়া শত্রু বধ করিতে লাগিলেন। ভীষণ ও অসম যুদ্ধে দশজন মোসলেম বীরপুরুষ নিহত হইলেন। মারাঠাদিগের প্রায় অর্ধেক সৈন্য নিহত হইয়া ভূপতিত হইল। তথাপি রণে ভঙ্গ না দিয়া আফজাল খাঁকে নিহত বা বন্দী করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল। ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার বিচ্ছিন্ন করিয়া চন্দের জ্যোৎস্নাজাল পৃথিবীকে আলোকিত করিয়া তুলিল। আফজাল খাঁ বিশ্বাসঘাতক ও বেইমান শিবাজীর প্রতি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতিহিংসা সাধন মানসে, শত্রুশ্রেণী ভেদ করিয়া তাঁহার প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। শিবাজী আফজাল খাঁর ভয়াবহ সংহারক মূর্তি দর্শনে কম্পিত এবং ক্রম্ব হইয়া উঠিলেন। কিন্তু আর উপায় নাই দেখিয়া সম্মান রক্ষার্থ মরিয়া হইয়া ভঙ্গ বিস্তারপূর্বক তেজের সহিত ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। বহুসংখ্যক মাওয়ালী ও মারাঠী যোদ্ধা আসিয়া আফজাল খাঁর ভীষণ আক্রমণ হইতে দস্যুপতি শিবাজীকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে গুলাকারে বেটন করিয়া দাঁড়াইল। আফজাল খাঁকে লক্ষ্য করিয়া সকলেই ভীষণ বেগে বিষাক্ত শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিল। কয়েকটি শীর আফজাল খাঁর হৃদয়ে এবং শরীরের নানাস্থানে বিদ্ধ হইলেও, পুরুষসিংহ তৎপ্রতি কিছুমাত্র ক্রম্বেপ না করিয়া দুর্বিসহ পরাক্রমে শত্রু হনন করিতে লাগিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রত্যবে শিবাজীর দেহরক্ষী কতিপয় দস্যুযোদ্ধার মস্তক ছেদনপূর্বক শিবাজীর প্রতি মালেকল মউতের জিহ্বার ন্যায় ভয়াবহ রক্তরঞ্জিত তরবারি প্রসারণ করিয়া ধাবমান হইলেন। কিন্তু সহসা একটি বিষাক্ত শীর তাঁহার পেশানীতে বিদ্ধ হইল। রক্তধারায় মুহূর্তমধ্যে

তাঁহার মুখমণ্ডল এবং মনোহর শূশ্রুশি আপুত হইয়া গেল। যন্ত্রণায় তিনি অধীর ও বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। শিবাজী এবং তাঁহার সঙ্গী যোদ্ধাগণ ক্রীষণভাবে প্রাণপণ করিয়া আফজাল খাঁকে আক্রমণ করিতে লাগিল।

আফজাল খাঁ সেইরূপ জখমী অবস্থাতেও দুর্ভয় বাহবলে কয়েকজন মারাঠী দস্যুকে নিধন করিয়া শিবাজীকে প্রচণ্ড তরবারি প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু বহু রক্তপাতে ও বিপুল পরিশ্রমে সহসা মূর্ছিত প্রায় হইয়া ভূপতিত হইলেন।

সোলেমান খাঁ নামক জনৈক বীরপুরুষ অগ্রসর হইয়া আফজাল খাঁর দেহ রক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। আফজাল খাঁকে ভূপতিত দেখিয়া শিবাজী এবং অন্যান্য দস্যুগণ তাঁহার শিরচ্ছেদ মানসে মাংস-লোলুপ শকুনির ন্যায় ছুটিয়া আসিল। সোলেমান খাঁ গুরুতররূপে আহত হইয়া শক্তির চরম বিন্দুতে নির্ভর করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু আর রক্ষা করা অসম্ভব! মোসলেম সৈনিকগণ প্রায় সকলেই নিহত কিংবা গুরুতররূপে আহত হইয়া ভূতলশায়ী। যে দুইজন বাঁচিয়া আছে, তাহারাও বহু দূরে আফজাল খাঁ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। সাংঘাতিকরূপে আহত সোলেমান খাঁ-মাথা আর ঠিক রাখিতে পারিতেছেন না! হস্ত শিথিল হইয়া আসিতেছে!

এমন সময় সহসা সমস্ত কোলাহল নিবারণ করিয়া অতি ঘন চটপট অশ্বপদ ধ্বনি শ্রুত হইল। দেখিতে দেখিতে পঞ্চবিংশতি মোসলেম বীর-পুরুষ বিদ্যুৎগতিতে ভীষণ তরবারি হস্তে সংহারক বেশে শিবাজীর সৈন্যদলের উপর প্রচণ্ড বার্তাবহ কিংবা সামুদ্রিক উচ্চ ও উর্মির ন্যায় ছুটিয়া পড়িল! তাহারা সকলেই বর্মমুক্ত ছিল। একজন যুবক বীরপুরুষ ভীষণ তেজে শিবাজীর উপরে আসিয়া পড়িলেন! তরবারির ভীষণ আঘাতে শিবাজীর লৌহ-ঢাল বিদীর্ণ করিয়া তাঁহার মস্তক আহত করিয়া ফেলিল।

শিবাজী ভীষণ চীৎকার করিয়া দ্রুত অশ্ব ধাবন করতঃ প্রাণ রক্ষার্থ জঙ্গলের অভ্যন্তরে পলায়ন করিলেন। অত্যন্ত সময় মধ্যোই সমরক্ষেত্র নির্জন হইয়া পড়িল। শীতল জলধারা অনবরতঃ মস্তকে বর্ষণ করায় এবং ক্ষত-স্থানে প্রলেপ দিয়া পটি বাঁধিয়া দেওয়ায় অল্পক্ষণ মধ্যোই আফজাল খাঁর চৈতন্য সঞ্চার হইল। অতঃপর তাঁহাকে এবং আহত মোসলেম সৈন্যদিগকে কোনওরূপে অশ্বপৃষ্ঠে সমারূঢ় করিয়া কৃষ্ণগড়ের কেদার দিকে আগস্তুক বীর-পুরুষ অগ্রসর হইবার উপক্রম করিলে, আফজাল খাঁ বলিলেন, “হে বীরপুরুষ! আপনার দয়া ও মহানুভবতা অপরিসীম। আপনার ঋণ অপরিশোধ্য। আপনার সহানুভূতি অতুলনীয়। আপনি মঙ্গলের জন্যই আমাকে কৃষ্ণগড়ের দুর্গে লয়ে যেতে চাচ্ছেন, আমি সেজন্য আপনার নিকট কৃতজ্ঞ। কিন্তু, হে মিত্রবর! আপনার ন্যায় মহাজন

ও বন্ধুজনের পরিচয় প্রদান করলে প্রাণের ভিতরে গভীর শান্তি ও আরাম পাব।”

আগভুক্ত বীর পুরুষ কিয়ৎকাল নীরবে দণ্ডায়মান রহিলেন। অতঃপর বামাকণ্ঠে সকলের বিষয় উৎপাদনপূর্বক বলিলেন, মহানুভব সেনাপতে! আমার পরিচয় অতি সামান্য। আমি কৃষ্ণগড় দুর্গের জায়গীয়দার সরফরাজ খাঁর কন্যা আমিনা বানু। সুদক্ষ ও সজ্ঞানীর নিকট আপনার তত্ত্ব এবং আপনাকে নিহত করবার জন্য নৃশংসপ্রকৃতি শিবাজী যে ভীষণ ষড়যন্ত্র করেছিলেন, তা' অবগত হয়ে অতীব ব্যস্ততা সহকারে দ্রুত রণসজ্জাপূর্বক বীরপুরুষগণকে সঙ্গে লয়ে আপনার সাহায্যের জন্য এখানে আগমন করেছি।”

আফজাল খাঁ আমিনা বানুর পরিচয় লাভ করিয়া নিতান্ত প্রীত ও আনন্দিত হইয়া পুনঃ পুনঃ আশীর্বাদ করিলেন। অনন্তর আমিনা বানু আফজাল খাঁকে লইয়া দুর্গের দিকে অগ্রসর হইলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

একটি মনোহর ও প্রশস্ত কক্ষমধ্যে একটি অনতিউচ্চ পর্যাঙ্কে মহাবীর আফজাল খাঁ শায়িত রহিয়াছেন। একজন হাকিম, দুইজন দাসী এবং স্বয়ং তারাবাই প্রাণপণে তাঁহার সেবা-ওশ্রমায় পরিলিঙ রহিয়াছেন। গৃহের ছাদের দোদুল্যমান শতবাহুবিশিষ্ট ঝাড় প্রজ্বলিত হইয়া উজ্জ্বল আলোকে গৃহতল আলোকিত করিয়াছে। ক্রমে রাত্রি বেশী হইলে, হাকিম সাহেব চলিয়া গেলেন। দাসী দুইটিও কক্ষান্তরে যাইয়া শয়ন করিল। তখন তারাবাই সময় পাইয়া ধীরে ধীরে আফজাল খাঁর ললাটে ও মস্তকে হস্ত বুলাইতে লাগিলেন। দুইজন দুইজনকে দর্শন করিয়া গভীর প্রেমাবেশে অভিভূত হইতে লাগিলেন। আফজাল খাঁ দেখিলেন, তারা অসাধারণ সুন্দরী। তাহার প্রশস্ত ললাট, আয়ত চক্ষু, উন্নত নাসিকা, আরক্তিম গণ্ড, শঙ্খবিনিন্দিত কণ্ঠ সমস্তই চিত্তাকর্ষক এবং মনোহর। তাহার টানাটানা বাঁকা ভুরু আর তাহার নিম্নে সেই ডাগর ও উজ্জ্বল চক্ষুর লাস্যময় বিদ্যুৎ-কটাক্ষে মুনির মনও বিচলিত হইয়া যায়। সুন্দরীর যৌবন-কুসুম মনোহর ভঙ্গিতে বক্ষ-সরোবরে বিকাশোন্মুখ হইয়া পড়িয়াছে। প্রতি পদসঞ্চালনে তাহার মনোহর মৃদু কম্পনে যুবজনের মনে চাঞ্চল্যের সঞ্চার করে। সুন্দরীর বাহু, অধরোষ্ঠ, তালু, অংস, বক্ষ সমস্তই সুবিভূত এবং সুবিন্যস্ত। আফজাল খাঁ তারাবাই-এর সৌন্দর্য দেখিয়া আশ্চর্যাব্বিত হইয়া গেলেন। কৃষ্ণবর্ণ মারাঠীর ঘরে ইরান-তুরানের এই অপক্লপ সৌন্দর্য কেমন করিয়া জন্মগ্রহণ করিল! বস্তুতঃ, তারাবাই-এর বেশ পরিবর্তন করিয়া, কোনও শাহজাদীর পোশাকে তাহাকে

সজ্জিত করিলে কেহই তাহাকে মারাঠী-সুন্দরী বলিয়া অনুধাবন করিতে পারিবে না। আফজাল খাঁ তারাকে যতই দেখিতে লাগিলেন, ততই মুগ্ধ হইতে লাগিলেন। তারার গোলাপের ন্যায় সুন্দর ও কমনীয় হস্তখানি নিজ হস্তে ধীরে ধীরে চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, “ভারা! তোমার স্বর্ণ শোধ করা সুকঠিন। তোমার সতর্কতা, বুদ্ধিমত্তা এবং প্রেমেই আমার জীবন রক্ষা হয়েছে। তুমি যদি সেদিন সৈনিকের ছদ্মবেশে সাবধানতাসূচক পত্রখানি না দিতে, তা হলে আমি সমস্ত দেহরক্ষী সৈন্যসহ ঘোড়াডুবি-গর্তে পড়ে প্রাণ হারাতাম। তোমার পিতা যে এরূপ নিদারুণ বিশ্বাসঘাতকতা এবং ষড়যন্ত্র করবেন, তা আমার স্বপ্নের অগোচর ছিল।

“এমন কঠিন পিতার ঔরসে জন্মিলেও তোমার অন্তঃকরণ অতি পবিত্র ও মহৎ। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তুমি কেমন করে তোমার পিতার এই গভীর ষড়যন্ত্রের বিষয় অবগত হয়েছিলে? আর কি কৌশলেই বা তুমি রায়গড় পরিত্যাগ করে সেই নিবিড় বনরাজিপূর্ণ দুর্গম স্থানের সন্ধান পেলে?”

তারাবাদী ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন, “সেনাপতে! আপনাকে দর্শন করবার পর হতেই আমার প্রাণে ধীরে ধীরে আসক্তির তীব্র অনল প্রজ্বলিত হয়। তারপর আমাকে উন্মত্ত হস্তীর পদতল হতে ক্ষিপ্ততা এবং বীরত্ব ও কৌশলের সহিত রক্ষা করায়, আমি আপনার চরণেই আত্ম বিকিয়ে বসি। আমি সেই গভীর রজনীতে বিমনায়মান চিন্তে উদ্যানবাটিকায় বেড়াতে বেড়াতে উদ্যানমধ্যস্থ গৃহের নিকটবর্তী হয়ে বুঝতে পারলাম যে, গভীর নিশীথে সেই গৃহের দ্বার রুদ্ধ করে আমার পিতা, গুরু রামদাস স্বামী, মালোজী প্রমুখ কি যেন পরামর্শ করছেন।

“অতঃপর নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সেই গৃহের অবরুদ্ধ জানালা সংলগ্ন হয়ে এই ভীষণ ষড়যন্ত্রের সমস্ত কথাই শুনে পেলাম। শিকারে যাবার কথা এবং শিকারে লয়ে যেয়ে কৃষ্ণগড়ের নিকটবর্তী গিরিসঙ্কটে ঘোড়াডুবি-গর্তের মধ্যে কৌশলে নিক্ষেপপূর্বক প্রাণবধ করবার সমস্ত কথা শ্রবণ করে আমি যার-পর-নাই আকুল ও অস্থির হয়ে উঠি।

“কি করব, কোন্ উপায়ে আপনাকে রক্ষা করব, একান্ত মনে কেবল তাই অবিরাম কয়েকদিন পর্যন্ত চিন্তা করি। অবশেষে মনে করলাম, গোপনে কোনও রূপে দেখা করে বা পত্র দিয়ে আপনাকে সাবধান করে দিব। এইরূপ চিন্তায় একান্ত উন্মনা হয়ে আমার ধাত্রীমাতাকে সমস্ত কথা খুলে বলে তাঁর চরণ ধারণ করলাম। তিনি আমাকে নিবৃত্ত হবার জন্য অনেক বুঝালেন; কিন্তু তাতে আমি আরও অধীর ও ব্যাকুল হয়ে পড়লাম। আপনার অহিত বা অনিষ্ট হলে আমি যে গলায় ছুরি নিব, তা তাঁকে বিশেষ দৃঢ়তার সহিত বললাম। তিনি গোপনে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করে আপনাকে সাবধান করে দিবেন বলে যে-দিন স্বীকার করলেন, দুঃখের বিষয় যে সেই দিনই আপনি পিতার সহিত সহসা

শিকারে বহির্গত হয়ে পড়লেন।

“আপনার মৃগয়ায় গমনের পরে আমি ধাত্রীমাতার সাহায্যে আপনার উদ্দেশে জনৈক ভৃত্যকে আমার বহুমূল্য হার প্রদানের অঙ্গীকারে সঙ্গে লয়ে গভীর নিশীথের অন্ধকারে অস্বারোহণে কৃষ্ণগড়াভিমুখে যাত্রা করি। অনুমানের উপর নির্ভর করে আমার সেই প্রাচীন ভৃত্যটির ইঙ্গিতে একটি পার্বত্য পথ দিয়ে আপনার নিকট উপস্থিত হই। পাছে কেউ ধরে ফেলে, এই ভয়েই চকিতে বিদ্যুৎ-গতিতে পত্র দিয়েই পলায়ন করি এবং অবিলম্বে কৃষ্ণগড়ের রানী মালেকা আমিনা বানুর নিকটে উপস্থিত হই। তিনি যখন আমাদের বাটী গিয়েছিলেন, তখন তাঁর সহিত আমার গভীর প্রণয়ের সঙ্কর হয়। তাঁর নিকটে উপস্থিত হয়ে আপনার পথের বিপদ এবং গুপ্ত সৈন্যের অবস্থানের কথা নিবেদন করে, আপনাকে রক্ষা করবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করি।

“সেই সূত্রে তিনি একশত তেজস্বী ও বিক্রান্ত অস্বারোহী পাঠান সৈন্য লয়ে আমাদের উদ্ধারের জন্য সহসা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়েছিলেন। পরমেশ্বরকে অনন্ত ধন্যবাদ যে, এই হতভাগিনীর চেষ্ঠা ও উদ্যম, আপনার জীবন রক্ষায় কতকটা সফল হয়েছে। আর কিছু পূর্বে মালেকার সৈন্যদল, ঘটনাস্থলে পৌঁছতে পারলে, আপনি একরূপ গুরুতরভাবে জখম হতেন না। যা হোক, পরমেশ্বরের ইচ্ছায় এবং হাকিম সাহেবের চেষ্ঠায় আঘাত প্রায় আরোগ্য হয়ে এসেছে। আর দু’চার দিনের মধ্যেই আপনি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করবেন।”

আফজাল খাঁ বলিলেন, “বিশ্বসৃষ্টার কৌশল ও মহিমা অপরিসীম! যিনি তোমার পিতার অন্তঃকরণে ভীষণ কুটিলতা ও হিংসার বিষ প্রদান করেছেন, সেই তিনিই আবার তোমার অন্তঃকরণ কোমলতা এবং প্রেমের সুধায় পরিপূর্ণ করেছেন! যিনি পাষাণকে কঠিন ও নীরস করে সৃষ্টি করেছেন, সেই তিনিই পাষাণের বক্ষ ভেদ করে তরল নির্মল জলের ধারা প্রবাহিত করেছেন।

“একই বৃক্ষে একই উপাদানে তিনি কুসুম ও কন্টক সৃষ্টি করেছেন। তাঁর রহস্য, তাঁর মহিমা সকলই বিচিত্র ও কৌশলময়! তিনি কোমল কুসুমেই কঠিন ফলের জন্ম দেন। আবার কঠিন ফলের মধ্যেই সুমিষ্ট রস ও সুশীতল স্নিগ্ধ বারি রক্ষা করেন। অনন্ত তাঁর মহিমা! অপরিসীম তাঁর কুদ্রত! তাঁকে ধন্যবাদ দাও।

“যিনি তোমার হৃদয়ে প্রেমের আঙন জ্বলিয়ে আমাকে রক্ষা করেছেন, তিনি তোমাকে কল্যাণের পথে পরিচালিত এবং তোমার প্রেমতৃষ্ণাকে তৃপ্তি দান করুন, এই প্রার্থনা করি।”

তারাবাই বলিলেন, “সেনাপতে! হৃদয়ের আকুল উন্মাদনায় তোমার জন্য গৃহত্যাগ করে আজ অরণ্যে চলে এসেছি। এখন তোমার পূজার মন্দিরে যদি স্থা দাও, তোমার পূজায় লাগব, আর যদি স্থান না পাই, তবে অকালে জীবনকুসুম

সক হয়ে ঝরে পড়বে। ৫ দিন হতে তোমাকে দেখেছি, সেই দিন হতেই সব ভুলে তোমাতে মজেছি। সেই দিন হতে তোমার চরণকমলের ধ্যান ব্যতীত দেবাদিদেব মহেশ্বর শিবের ধ্যান আর করতে পারি নাই। মহেশ্বরকে যে ফুল ও বিষ্ণুপত্র যুগিয়েছি, তা' তোমার চরণোদ্দেশেই যুগিয়েছি। সেই দিন হতে তোমার মোহনমূর্তি আমি শয়নে-স্বপনে, নিদ্রা-জাগরণে এক মুহূর্তের জন্যও বিস্মৃত হতে পারি নাই।

“মনকে যত বুঝাতে লাগলাম, মন ততই অবুঝ হয়ে উঠতে লাগল; যতই ধৈর্যধারণ করতে চেষ্টা করলাম ততই অধীর ও উন্মত্ত হয়ে উঠল! চুষক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে, তোমার হৃদয় তেমনি আমাকে আকর্ষণ করেছে! এ আকর্ষণে—এ সম্মিলনে বাধা দিবার শক্তি কারও নাই।

“তুমি বিজ্ঞাপুর রাজ্যের প্রধান সেনাপতি। তুমি একজন মস্ত বীর পুরুষ। তোমার সম্মুখে যশঃ-সম্মান ও উচ্চপদ নিয়তই তোমাকে প্রলুব্ধ করছে। তুমি আমার জীবন-বসন্তের মলয়ানিল, হৃদয়-আকাশের পূর্ণ চন্দ্রমা এবং উষার আকাশে শুকতারা হলেও, আমি তোমার সম্পূর্ণ অযোগ্য। কিন্তু আমার হৃদয়ের ক্ষুদ্র নদী আজ তোমার উদ্দেশে—তোমার প্রেম-পরিপূর্ণ হৃদয়-পারাবার পানেই ছুটে চলেছে।

“তার গতি অবাধ! সে আজ আত্মহারা অবশভাবে ছুটে চলেছে। তার পরিণাম কি হবে, ভবিষ্যে সে কিছুমাত্র চিন্তা না করেই তোমাতেই আত্ম বিকিয়ে বসেছে! হে প্রাণেশ্বর! হে স্বামিন্! হে আমার জীবন-প্রভাতের মোহন উষা! হে জীবনবারিধির কৌস্তভ রতন! এখন তোমার আদর-অনাদরেই এ হতভাগিনীর জীবন-মরণ নির্ভর করে।”

শিবাজী-নন্দিনী আর কিছু বলিতে পারিলেন না। উচ্ছ্বসিত প্রেমাবেগে সন্দেহ এবং আশঙ্কায় তাহার পদপলাশলোচন হইতে তরল মুক্তাধারা নির্গত হইতে লাগিল।

যে রমণী অনিশ্চিত প্রেমের আশায় চিন্তের উন্মাদনায় পিতামাতা আত্মীয়-স্বজনের স্নেহের বন্ধন খণ্ডন করিয়া তাহার প্রেমাস্পদের সেবায় উপস্থিত হইয়া পিপাসা পরিতৃপ্তি করিতে পারিতেছে না, তাহার পক্ষে প্রেমাস্পদের নিকটে নিজের অবস্থার বিবরণ খুলিয়া বলিতে যাইয়া শোকাবেগে ক্রন্দন করা নিতান্তই স্বাভাবিক।

আফজাল খাঁ সুন্দরীর প্রেমোচ্ছ্বাস এবং হৃদয়ের আবেগ দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন। মনের ভিতরে দ্রবীভূত হইয়া নিতান্ত চাঞ্চল্যে অভিভূত এবং প্রেমের ধারায় অভিষিক্ত হইলেন। অন্তরে বাহিরে তখন মহাবীর আফজাল খাঁর তুমুল ঝটিকা প্রবাহিত হইল। প্রাণের পরতে পরতে অনন্ত পুলক শিহরিয়া উঠিতে

লাগিল! নব বসন্তের মলয়া হাওয়ার প্রথম অনন্ত পুলক শিহরিয়া উঠিতে লাগিল! নব বসন্তের মলয়া হাওয়ার প্রথম চুধনে শীত-সঙ্কুচিত কুসুমকলিকাতুলি যেমন শিহরিয়া উঠিয়া কুটিয়া উঠে, আফজাল খাঁর হৃদয়-মালকু ডেমনি শিহরিয়া উঠিয়া প্রেমের পুষ্পে ভরিয়া গেল।

অনন্ত প্রেমের কুসুম-সুষমার মোহিনী আভা, সঙ্ক্যাকাশে স্বর্ণমেঘের ন্যায় হৃদয় ছুড়িয়া বসিল। হৃদয়ে হৃদয়ে আভা কুটিল। মরমে মরমে বাণ ছুটিল। তখন অম্বাহ ও বাঘতায় হৃদয়-কুঞ্জ প্রেমের কোকিল পাণিয়া অবিরাম কৃষ্ণনে ডাকিতে লাগিল!

আফজাল খাঁ প্রেমাবেশে সেই নির্জন দীপালোক-আলোকিত-কঙ্কে শিবাজী-নন্দিনীকে বুকের ভিতরে টানিয়া লইয়া তাহার গোলাপী গণ্ডে কয়েকটি চুষনদান করিলেন। প্রদীপ-শিখা একটু কাঁপিয়া উঠিল! যুবতীর হৃদয় লজ্জা ও প্রেমে সঙ্কুচিত অথচ সহর্ষ হইয়া উঠিল!

উভয়েই ক্ষণকাল নীরব। উভয়ের বকের স্পন্দন দ্রুত চলিতে লাগিল। উভয়ে উভয়ের গভীর প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ। মারাঠা রাজকুমারীর নেত্র-কুবলয় হইতে প্রেমের মুক্তাধারা বর্ষিত হইয়া পাঠানবীরের বক্ষস্থল বিপ্লাবিত করিতে লাগিল।

দশম পরিচ্ছেদ

বিজাপুরের সোলতানের পক্ষ হইতে পঞ্চদশ সহস্র পদাতিক, দুই সহস্র অশ্বারোহী, সাত শত গোলন্দাজ সৈন্য কৃষ্ণগড়ে সমাগত হইয়াছে। শিবাজীর বিশ্বাসঘাতকতা এবং নৃশংস ব্যবহারের সংবাদ শ্রবণে ক্রুদ্ধ এবং বিরক্ত হইয়া বিজাপুর দরবার শিবাজীকে সমস্ত দস্যু-সৈন্যসহ ধ্বংস করিতে এই সৈন্যদল প্রেরণ করেন।

আফজাল খাঁ কৃষ্ণগড়ে রাজকীয় বাহিনীর আগমন আশায় অপেক্ষা করিতেছিলেন। যথাসময়ে এই নূতন বাহিনী কৃষ্ণগড়ে সমাগত হইলে, মহাবীর আফজাল খাঁ শিবাজীর সহিত যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। শিবাজীর প্রতি নিতান্ত কষ্ট এবং বিরক্ত হইয়া মালেকা আমেনা বানুও ইসলামের মহাশত্রু শিবাজীর ধ্বংস সাধন মাননে মহাবীর আফজাল খাঁর সহিত যোগদান করিলেন।

ক্রমাগত যুদ্ধ চলিতে লাগিল। শিবাজী সম্মুখ-সমরে অক্ষয় হইয়া ক্রমাগত পশ্চাদবর্তন করিতে করিতে সহ্যাদ্রি পর্বতের দুর্গম অরণ্য এবং গিরিগহ্বর পরিপূর্ণ স্থানে গাইয়া অশ্রয় লইলেন। হঠাৎ আক্রমণ, গুপ্ত আক্রমণ এবং মৈশ আক্রমণ এই তিন প্রকার আক্রমণ দ্বারা মধ্যে মধ্যে হোসলেয় বাহিনীকে

বিপদাপন্ন এবং চঞ্চল করিতে লাগিলেন। মোসলেম সৈন্য তাহার দস্যুসৈন্যের অনুসরণ করিলে তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া নিবিড় অরণ্যানী এবং পর্বতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ফেরুপালের ন্যায় লুকাইয়া হইয়া পড়িত। ফলতঃ শিবাজীর মাওয়ালী দস্যুগণ পলায়নে এবং হঠাৎ আক্রমণে যার-পর-নাই অভ্যস্ত হইয়াছিল।

তাহাদের পলায়ন এবং আক্রমণ বস্তুতঃই শৃগালের ন্যায় দ্রুত এবং কৌশলপূর্ণ ছিল। ফলতঃ শিবাজীর নামের অর্থ তাহার কার্যের সঙ্গে বেশ সার্থক হইয়াছিল। তখনকার দিনে “শিবাজী দরহকিকত শিবাজী আন্ত্।” অর্থাৎ শিবাজী কার্যতঃ যথার্থই “শৃগাল”, একথা দাক্ষিণাত্যের সর্বত্রই প্রবাদবাক্যের ন্যায় প্রচলিত হইয়াছিল।

শিবাজীর ধূর্ততা, হলনা এবং মিথ্যাবাদিতার কিছু ইয়ত্তা ছিল না। স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা তাহাকে এমনি অধীর ও আকুল করিয়া তুলিয়াছিল যে, তিনি তাহার অভীষ্ট সাধন মানসে কোনও প্রকার পাপ ও অন্যায়কে বিন্দুমাত্রও পরওয়া করিতেন না।

খুন, জখম, চৌর্য, দস্যুতা, প্রবঞ্চনা তাহার জীবনের নিত্য কর্তব্যকর্ম মধ্যে পরিগণিত ছিল। এহেন ধূর্ত শিবাজীর সহিত পুনঃ পুনঃ সম্মুখ-সমরে চেষ্টা করিয়াও আফজাল ঋী কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। তরঙ্গায়িত উচ্চাবাস ভূমি, নিবিড় অরণ্য, পর্বতের অসংখ্য গুহা এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্বত্য-নদীর গর্ভ ও উচ্চপাড়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শিবাজী মধ্যে মধ্যে ‘রাতহানা’ দিয়া বিজ্ঞাপুরের সুশিক্ষিত বাহিনীকে যার-পর-নাই ত্যক্ত-বিরক্ত করিতে লাগিলেন।

পার্বত্য প্রদেশে দস্যুদলের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করা বহু বিলম্ব এবং ক্ষতি সাপেক্ষ দেখিয়া, বীরাজনা মালেকা আমেনা বানু শিবাজীর জনভূমি রায়গড় আক্রমণ করাই ন্যায়সঙ্গত মনে করিলেন। রায়গড় আক্রমণ করিলে, শিবাজী বাধ্য হইয়া সম্মুখ-যুদ্ধ দান করিতে বাধ্য হইবেন বলিয়া, মালেকা আমেন বানু আফজাল ঋীকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন।

কিন্তু আফজাল ঋী এই পার্বত্য প্রদেশেই শিবাজীকে হীনবল এবং ধৃত করিবার জন্য নানা প্রকার কায়দা-কৌশল এবং ফন্দি খাটাইতে লাগিলেন। মাওয়ালী ও মারাঠী দস্যুগণ ছদ্মবেশ ধারণ এবং চৌর্যকার্যেও বিলক্ষণ পটু ছিল। স্বাতিতে তাহারা নানা প্রকার পণ্ড, বিশেষতঃ গরু-ঘোড়ার কৃত্রিম বেশে আসিয়া মুসলমান শিবিরের ঝোঁজ-খবর লইয়া যাইত। পার্বত্য রমণীদিগের রূপ ধারণ করিয়া দিবসে তাহারা নানা প্রকার ফলমূল এবং তরিতরকারীও বিক্রয় করিতে আসিত।

মধ্যে মধ্যে সম্বেদবশে কয়েকজনকে ধৃত করায়, তাহারা মারাঠী গুণ্ডার বলিয়া প্রকাশ পাওয়ায় তাহারা আরও কড়া কড়া করা হইল। মালেকা আমেনা বানু

বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহাকে এবং শিবাজী-নন্দিনী ভারাবাহীকে কোনওরূপে বন্দী বা নিদ্রিতাবস্থায় চুরি করিয়া লইবার জন্য শিবাজীর দলপতিগণ বিশেষ উদ্ভবির করিতেছেন।

মালেকা এবং ভারাবাহী সাবধানতার জন্য অস্ত্র-পাণি হইয়া শয়ন করিতেন। মারাঠীরা যে-কোনওরূপে এই সুখরীষয়ের কাহাকেও অপহরণ করিতে সমর্থ হইবে, তাহা কেহ স্বপ্নেও চিন্তা করিলেন না। মোতামদ খান স্বয়ং রাত্রিতে মালেকা এবং তাঁহার শিবিরের প্রহরীদিগের সতর্কতার জন্য বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিলেন।

কিন্তু মানুষ যখন যে-বিষয়ে অতিরিক্ত সাবধান হয়, অনেক সময় যেমন তাহাতেই অসম্ভবিতরূপে বিপদ ঘটিয়া থাকে; তেমনি এই সাবধানতার মধ্যেও ওকতর বিপদ সংঘটিত হইল।

সহসা এক দিন প্রভাতে দেখা গেল যে মালেকার শিবিরে মালেকা নাই। তাঁহার শিবিরের মধ্যে একটি গর্ত রহিয়াছে। অনুসন্ধানে দেখা গেল, তাহা গর্ত নহে সুড়ঙ্গ। অক্র বক্র পথে পনের শত হস্ত পরিমিত সুড়ঙ্গ কাটিয়া মালেকাকে গভীর নিশীথে নিদ্রিতাবস্থায় বেহঁশ করিয়া অপহরণ করিয়াছে।

অন্তঃপর সেই সুড়ঙ্গ পথে নামিয়া ধীরে ধীরে সকলে এক বনের মধ্যদেশে একবৎ পরিষ্কৃত ভূমি দেখিতে পাইলেন। সেখানে কিছু পূর্বেও লোক ছিল, তাহা বেশ বুঝিতে পারা গেল। সুড়ঙ্গের মাটিগুলি একস্থানে রাশীকৃত না করিয়া ক্রমশঃ নদীর জলে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

সুড়ঙ্গের মুখে একটি লতাগুলোর ঝোপ রহিয়াছে। এমন কৌশলপূর্ণ স্থান যে, দেখিয়াও সহসা কেহ কিছু নির্ধারণ করিতে পারে না।

মালেকা আমেনা বানুকে যে মারাঠীরা অচিন্ত্যভাবে সুদীর্ঘ সুড়ঙ্গ খনন করিয়া অপহরণ করিয়া লইয়াছে, সে-বিষয়ে কাহারও আর কোনও সন্দেহ রহিল না। মালেকার জন্য মোসলেম শিবিরে সীষণ হাহাকার পড়িয়া গেল। আকজাল বা যার-পর-নাই শোকাক্ত হইয়া পড়িলেন। সৈন্য-সামন্ত সকলেই বিষাদ-সাগরে নিমগ্ন হইল।

ভারাবাহী তাঁহার আশ্রয়দাত্রী এবং পরম হিতৈষিনী মালেকার অপহরণে যার-পর-নাই ক্রোধমনা এবং বিষাদে বিমলিন হইয়া অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

আমেনা বানুর মাতা শোকে পাগলিনী হইয়া উঠিলেন। পাছে বা ধর্মধর্ম জ্ঞানশূন্য পাষাণ কাফেরগণ এই মোসলেম সুন্দরীকে কলঙ্কিত অথবা নিহত করে, ইহা ভাবিয়া সকলেই পেরেশান ও লবেজান হইয়া উঠিলেন।

দরী-গিরি, বন-জঙ্গল, নদী-নালা, সমস্ত ভুল ভুল করিয়া অনুসন্ধান করা হইল। মারাঠীদিগকে সীষণ ভাবে যত্রতত্র আক্রমণ করিয়া বিপর্যস্ত ও বিধ্বস্ত

করতঃ বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান করা হইল! কিন্তু কোথাও কোনও খোঁজ পাওয়া গেল না।

অনেক মারাঠীকে বন্দী করিয়া বিশেষ প্রলোভন এবং প্রাণদণ্ডের ভয় দেখাইয়াও তাহাদের নিকট হইতে কোনও তথ্য পাওয়া গেল না। চতুর্দিকে বহু গুপ্তচর প্রেরণ করিয়াও কোনও সূত্র আবিষ্কার করা গেল না। সকলেই যাবৎ-পর-নাই বির্মষ ও শোকাকুল চিন্তে দিন যাপন করতে লাগিলেন।

মহাবীর আফজাল খাঁ এবং বীরবর মোতাম্মদ খান নানা প্রকার নূতন নূতন পন্থা এবং কৌশল অবলম্বন করে মালেকার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। শিবাজীকে বন্দী করিতে পারিলে, সমস্ত উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হইবে দুখিয়া, শিবাজীকে বন্দী করবার জন্য অনেক চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু বিশেষ অনুসন্धानে জানা গেল যে, শিবাজী তখন আহবক্ষেত্রে উপস্থিত নাই। সেনাপতি আবাজী তখন শিবাজীর প্রতিনিধি স্বরূপ যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান করিতেছেন। অতঃপর শিবাজীর অবস্থান নিরূপণের জন্য বিশেষ চেষ্টা হইতে লাগিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

গভীর রজনী। চতুর্দিক নিবিড় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। পশ্চিমঘাট গিরিগহ্বরের একটি মনোহর কক্ষ বিশেষরূপে সজ্জিত। এই নির্জন গিরিকক্ষ রাজা অশোকের সময় শ্রমণদিগের নিবাস জন্য নির্মিত হইয়াছিল।

গভীর নির্জনে বাস করিবার উদ্দেশ্যেই এই সমস্ত কৃত্রিম গুহা খোদিত করা হইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে তিনি শত্রুর অনুসরণ হইতে অব্যাহতি এবং যুদ্ধ হইতে বিশ্রাম লাভ করিবার জন্য এই নির্জন গিরিগুহায় বাস এবং স্বকীয় ভোগলালসা পরিভৃষ্টি করিতেন।

এইখানেই ভীষণ হত্যা এবং লুণ্ঠনের গুণ্ড পরামশ হইত। গভীর বনরাজিপূর্ণ এই দুর্গম পর্বতের পাদমূলে গুহার একটি দ্বার, তাহার কৌশলে প্রস্তর দ্বারা এমন ভাবে আবরুদ্ধ থাকিত যে, কেহ গুহা-দ্বার বলিয়া বিবেচনা করিতে পারিত না।

এই বিশাল গুহার মধ্যে ক্ষুদ্র তিনটি এবং বৃহৎ চারটি সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠ ছিল। গুহার সম্মুখের ভীষণ অরণ্যের সম্মুখে একটি পরিখা খোদিত ছিল। লোকে তাহাকে পার্বত্য নদী বলিয়াই মনে করিত।

পরিবার উভয় পার্শ্বে উচ্চ গড়; তাহা নান্যাত্মীয় বৃক্ষলতা বিশেষতঃ বৃহৎ বৃহৎ শাল ও তালবৃক্ষে সমাচ্ছন্ন হইয়া স্বাভাবিক ক্ষুদ্র পর্বতের রূপ বলিয়া ভ্রম

জন্মাইত। গড়ের উপরে নানা স্থানে বৃক্ষরাজির পাদমূলের অন্তরালে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ তোপ সজ্জিত ছিল।

প্রত্যহ্নাত বনের নানা স্থানে অদৃশ্য ভাবে তোপ সজ্জা ছিল। বনের মধ্যে যুক্তিকার নীচে কয়েকটি পাতালপুরী বা গুপ্ত-কক্ষ ছিল। এই সমস্ত পাতাল-গৃহে নানাবিধ যুদ্ধের উপকরণ, লুপ্তিও সামগ্রী এবং ধন-ভাণ্ডার সংস্থাপিত ছিল। এই গোপনীয় গুহাবলীর একটি প্রশস্ত এবং অধিকতর রমণীয় গুহাতে ললনাকুল ললায়-ভূতা এক ঘোড়শী রূপসী রূপের ছটায় কক্ষ আলোকিত করিয়া একখানি পালঙ্কোপরি অর্ধহেলিত অবস্থায় অবস্থিত!

রমণীর ঈষৎ কৃষ্ণিত সুচিকণ ঈষন্নীলাভ কেশকলাপ ললাট এবং গণ্ডে পতিত হওয়ায় তাহার মুখখানি শৈবালে ঈষদাঙ্কন প্রভাত-প্রস্ফুটিত কমলের ন্যায় অথবা মেঘ-কিরীট-চন্দ্রমার ন্যায় শোভা পাইতেছে। সে মুখের ও চক্ষুর ছটায় ভেজবিতা, দৃঢ়তা এবং পবিত্রতার আভাই কেবল বিকীর্ণ হইতেছে।

গৃহস্থিত প্রদীপের আলোক, রমণীর বিশ্ববিমোহন রূপের ছটায় যেন মলিন বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। উন্নত বিশাল বক্ষ শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে বাত্যাহতা ক্ষীতবক্ষ তরঙ্গায়িত পদ্মার ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে উন্নত এবং অবনত হইতেছে।

রমণীর নেত্রকূবলয়ের প্রশান্ত এবং স্থির দৃষ্টি হইতে উন্নত চিন্তার ইঙ্গিতই সূচিত হইতেছে। রমণী যুবর্তী—প্রস্ফুটিত-যৌবনা এবং অসাধারণ সৌন্দর্যশালিনী হইলেও, তাহাকে দর্শন করিয়া কাম-গন্ধী প্রেমের উদ্বেক না হইয়া সশ্রদ্ধ ভালোবাসারই সজ্জার হয়।

রমণী অলৌকিক সুন্দরী। তাহার মুখমণ্ডলে তরুণ অক্লণের অক্লণিয়া, নয়নে বর্ষণ-মুক্ত শারদাকাশের নীলিয়া, পঠন-বৈচিত্র্যে কারু-কৌশলের অপূর্ব মহিমা পরিদৃশ্যমান! রমণী নির্বাপিত সমুদ্রের জলরাশির ন্যায় তরল সৌন্দর্যে ভরপুর হইয়াও অচঞ্চল! সুতরাং, তাহাকে দর্শন করিলে আনন্দ এবং শ্রদ্ধারই উদ্বেক হয়। সে সৌন্দর্য—সে লাষণ্য কেবল কবিত্বময়, রসময় এবং আনন্দময়! তাহাতে স্বপ্নের আবেশ এবং মদিরার বিহ্বলতা নাই, তাহা স্পষ্ট, মুক্ত এবং ব্যক্ত; সুতরাং সহসা তাহাতে মনচ্যঞ্চলা ঘটে না।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা! এই পরীক্ষণী সুখমা-সম্পন্ন মহিমময়ী রমণী আশ্বাসেরই সেই মালেকা আমেনা বানু। রমণী অর্ধশায়িতাবস্থায় বাম হস্ত বাম কপোলে রাখিয়া দক্ষিণ হস্তে “দেওয়ান হাকেক” ধারণ করিয়া পড়িতেছিলেন।

এমন সময় শিবাজী তথায় আসিয়া একাকী উপস্থিত হইলেন। মালেকা আমেনা তখন অন্যদিকে মুখ কিরাইদা বসিলেন। শিবাজী দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ

করিয়া নিকটবর্তী একখানি সোফাতে উপবেশন করিলেন। ঋণকাল নীরবে যাপন করিবার পরে বলিলেন, “মালেকা! মালেকা! আমার প্রাণের মালেকা! একবার তুমি আমার দিকে মুখ ফিরাও। একটিবার মাত্র কথা শুন। আমি তোমার জন্যই উন্মত্ত হয়েছি। তোমার প্রেমামৃত পানের জন্যই মানস-চকোর চঞ্চল হয়েছে। কিছুতেই তোমাকে পরিণয়পাশে আবদ্ধ করতে স্বীকৃতা করতে না পেয়ে অবশেষে তোমাকে হরণ করতে বাধ্য হয়েছি।”

তোমাকে বশীভূত করবার জন্যই অপহরণ করে এই নিভৃত নির্জন গিরিগুহায় নিয়ে এসেছি। তোমার প্রেমে প্রমত্ত হয়ে রাজ্য, ধন-সম্পদ সমস্তই নিসর্জন দিয়েছি। তোমাকে লাভ করতে না পারলে, জীবনের আর কোনও প্রয়োজন নাই।

হে সুন্দরি! হে মানসি! নব-বসন্তের নব-বিকাশোন্মুখ অবস্থায় অভিমানভরে তোমার এই প্রেমদাসকে তুচ্ছ করে উভয়ের অকল্যাণ ও অমঙ্গল আনয়ন করো না। বসন্ত এসেছে, তবে সৌরভ-সুধা বিতরণে বিলম্ব কেন?

হে মানিনী! শিবাজী দস্যু হলেও রাজা, মারাঠী হলেও বীর-পুরুষ, কাফের হলেও প্রেমিক এবং মূর্খ হলেও কৃতজ্ঞ। সুতরাং একেবারে তোমার অযোগ্য নহে। তোমার প্রেম-প্রবাহের রসসিক্ত হলে, শিবাজী ভারত-সিংহাসনে সমারুঢ় হবারও কল্পনা করে।

হে বীর্যবতী! তোমার বীরত্ব এবং সাহস সহায় হলে, এ বাহু আরও বলশালী হবে, এ মস্তিষ্কে আরও উচ্চ উচ্চ রাজনৈতিক চিন্তা-স্রোত প্রবাহিত হবে। তাই বলি, মালেকা! তুমি আমার হৃদয়রাজ্যের মালেকা হয়ে মালেকা নামের সার্থকতা সম্পাদন কর। নিশ্চয় জানিও, তোমার প্রেমে হতাশ করলে এ জীবন-তরু অকালে শুষ্ক হবে। এস মালেকা! এস, আমার বক্ষে এস! নতুনা এই বক্ষে শাণিত ছুরিকা বিদ্ধ করে এ বিদগ্ধ অভিনয় শেষ কর।

ক্রমাগত আজ দু'মাস কাল তোমার সাধনা করে মন বড়ই চঞ্চল এবং বিধুর হয়েছে, আর ধৈর্যধারণ অসম্ভব। মনের স্বৈর্য ক্রমশঃ নষ্ট হচ্ছে। এস তুমি! এস, আমার এ মরুভূমিতুল্য দগ্ধবক্ষে তুমি ত্রিতাপ-জ্বালা-নিবারণী মন্দাকিনীর শীতল ধারার ন্যায় প্রবাহিত হও।

এস মালেকা! এস, তাতে কোন কলঙ্ক নেই। আমি তোমাকে কলঙ্কিনী করব না। আমি তোমাকে রাজ-আড়ম্বরে গণ্যকীর্তি বিবাহ করব। ডগবান্‌ রামদাস হার্মী আমার অনুকূলে। বাহুবল, অর্থবল, বুদ্ধিবল সমস্তই আমার পদতলে।

মালেকা! একবার তুমি সম্মতি প্রকাশ কর। আজ দীর্ঘ দু'টি মাস ধরে তোমার সাধনা করছি। তোমার রূপবর্জিত পতঙ্গের ন্যায় আত্মবিসর্জন করতে বসেছি।

হায়! তবুও কি তুমি পাষণী হয়ে থাকবে? মালেকা! আজ সাধনার শেষ দিন।

“আজ যেমন করেই হউক মনের বাসনা পূর্ণ করব। আজ আর তোমার সম্বন্ধি-অসম্বন্ধির অপেক্ষা করতে পারি না। এস রূপসি! এস, এস, বন্ধে এস!”

এইরূপ উন্মত্ত প্রলাপ বকিতে বকিতে শিবাজী দুই বাহু প্রসার করিয়া মালেকাকে সহসা আবেষ্টন করিয়া অধর-চুষনে উদ্যতপ্রায়। রোষোন্মত্তা মালেকা আমেনা বানু সহসা ক্রুদ্ধা ব্যাঘ্রীর ন্যায় ভীষণ বলে উদ্ভিত হইয়া শিবাজীকে দূরে ঝটকাইয়া ফেলিলেন। দেওয়ালে আহত হইয়া শিবাজী কক্ষতলে ঘূর্ণিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন, উঠিবার উপক্রম করিলেন। কিন্তু শক্তিশালিনী মালেকা সহসা ভীমবলে পদতলে শিবাজীকে চাপিয়া ধরিয়া দৃঢ়মুষ্টিতে শানিত ছুরিকা বন্ধ-লক্ষ্যে উদ্যত করিয়া বলিলেন, “বল্ দুরাত্মন! বল জাহান্নামী কাফের! বল্ কাম-কুকুর! পাষণ্ড শয়তান! আর কখনও নারী হরণ করবি? পাষণ্ড, আজ হতে তোমার জীবনের পাপাভিনয়ের শেষ করব।”

মালেকা ভীষণ ক্রুদ্ধ মূর্তিতে ক্রুকুটি-কুটিল আঁধিতে অগ্নি বিকীরণ করিয়া এবং ক্রোধাবেগে কম্পিত হইতে হইতে ভীষণ গর্জন করিয়া শিবাজীকে পদতলে আরও ভীষণভাবে চাপিয়া ধরিলেন। ছুরিকার শানিত ফলক মৃত্যুর করালী জিহবার ন্যায় শিবাজীর চক্ষে প্রতিভাত হইল!

শিবাজী ভীতি-বিহ্বলচিত্তে ক্রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে বলিলেন, “মালেকা! মালেকা! আমায় ক্ষমা কর। আর না, যথেষ্ট হয়েছে। দোহাই তোমার, প্রাণবধ করো না! আর কখনও পরনারী হরণ করব না! আর কখনও তোমার প্রতি লালসার দৃষ্টিপাত করব না। আজ হতে বুঝলাম, মুসলমান রমণী যথার্থ সতী। সতীত্বের মহিমা এবং ধর্মের সম্মান মুসলমান রমণীর মত আর কোনও জাতীয়রা রমণীর কাছে আদৃত এবং রক্ষিত নহে।”

মালেকার তর্জন-গর্জনে এবং শিবাজীর করুণ প্রার্থনায় সমস্ত গিরিওহা শদায়মান হইয়া উঠায়, ভিতরের প্রহরী এবং দাস-দাসীগণ ব্যস্ত হইয়া ছুটিয়া আসিল। তাহারা আসিয়া দেখিল যে, মালেকা আমেনা বানু ভীষণ রণরঙ্গিনী মূর্তিতে ক্রুকুটি-কুটিল নেত্রে শিবাজীকে পদতলে চাপিয়া দণ্ডায়মানা! একজন দাসী আনন্দ-উল্লাসিত কণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, “ঠিক হয়েছে, মা! এ যে, উগ্রচণ্ডী কালী করালী মূর্তি! পদতলে কাম-কুকুর শিবাজী! আজ নরোধমের উপযুক্ত প্রতিশোধ হয়েছে। কি বলব, মা! এই নরোধম কাম-কুকুরই আমাকে পাপ-লালসায় ভাসিয়ে বকীর ঘূর্ণিত পাপ-লিকা চরিতার্থ করেছে। আমি এক্ষণে পুরাতন হয়েছি। তাই নূতন রস ভোগের জন্য নবীনা তোমাকে হরণ করে এনেছে। বেশ হয়েছে, মা! পাষণ্ডের উপযুক্ত প্রতিশোধ গ্রহণ কর!”

এই বলিয়া দাসী আনন্দে করতালি দিয়া অট অট হাসো সমস্ত ওহা প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। মালেকা ভীষণ গর্জনে, দস্তে দস্ত সংঘর্ষণ করিয়া আবার বলিলেন, “বল্ নরাধম কুকুর! আর কখনও পরনারীর প্রতি কুভাব পোষণ করবি কি-না?” এই বলিয়া মালেকা আমেনা বানু ছুরিকাখানি বক্ষের দিকে আরও বিনত করিলেন।

শিবাজী ভীত এবং আতর্কণ্ঠে বলিলেন, “মালেকা! মালেকা! রক্ষা কর! দোহাই তোমার! আজ হইতে তুমি আমার মাতা! তোমাকে মাতৃ-সম্বোধন করছি। রক্ষা কর, মা! সত্যই তুমি দানবদলনী পাপ-তাপ-নাশিনী দুর্গা। এতদ্ব্যতীত নারীতে কখনও এমন তেজঃ ও সাহসের সম্ভার সম্ভব নহে।

“ক্ষমা কর, মা! আমায় ক্ষমা কর! আজ হতে তোমাকে পরম পূজনীয়া জননী বলেই পূজা করব। ধন্য সতী! তুমি শত ধন্য! তোমায় ও পবিত্র পদাঘাতেই কাম-বিকারের নেশা আজ হতে ছুটে গেল। কিন্তু মা! এই পাপী সন্তানের বক্ষ হতে তোমার পাদপদ্ম অপসারিত কর, মা! আমার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছে!”

প্রহরী ও দাসদাসীগণ মালেকা বানুর ভীষণ রণরঙ্গিনী প্রলয়ঙ্কারী মূর্তি সন্দর্শনে সকলেই স্তম্ভিত এবং বিস্মিত হইয়া পড়িয়াছিল। এতক্ষণে তাহাদের মোহ ভঙ্গ হওয়ায় সকলেই “একি কাণ্ড, মা! ছাড় ছাড়! মহারাজার প্রাণ বধ করো না” — বলিয়া সমস্বরে করুণ চীৎকার করিয়া উঠিল।

মালেকা বক্ষ হইতে দক্ষিণ পদ তুলিয়া লইয়া একটু দূরে সরিয়া দাঁড়াইলেন। শিবাজী উঠিয়া দাঁড়াইয়া আলুলায়িতকেশা মালেকা আমেনা বানুর পাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া যুক্তকরে বলিলেন, “মা! অধম সন্তানের অপরাধ মার্জনা কর। তোমার পুত্র পদস্পর্শে আমার দিব্যজ্ঞানের উদয় হয়েছে। আমি মহাপাতকী সন্তান, তুমি পুণ্যবতী সাক্ষাৎ জগন্মাতা ভবানী। আমার অপরাধ লইও না। আমার ধর্ম-বুদ্ধি সম্ভারের জন্যই তুমি এ মায়া-প্রপঞ্চ বিস্তার করেছ।” সকলেই দেখিল, শিবাজীর চক্ষু অশ্রুপূত। সত্যই তাঁহার প্রাণে তীব্র অনুতাপের অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত হইয়াছে।

গভীর অন্ধকার ভেদ করিয়া বিশ্বপ্রহ্লাদিনী উষার মৃদু হাস্য যেমন বিশ্ববক্ষে নবজীবনের সঞ্চার করে, তেমনি অদ্যকার এই ভীষণ পাপলিলা এবং কামাসক্তির সৃষ্টিভেদ্য অন্ধ ভ্রমসা ভেদ করিয়া দিব্যজ্ঞানের কিরণ শিবাজীর কলুষিত অন্তঃকরণে পদ্মের ন্যায় নির্মল সৌন্দর্য এবং বিমল সৌরভ ফুটাইয়া তুলিল। অকস্মাৎ যেন মেঘরাশি বিচ্ছিন্ন করিয়া চন্দ্রমার বিমল জ্যোতিঃ গগনবক্ষে ফুটিয়া উঠিল!

ছাদন পবিত্বেদ

নৈশ-অন্ধকার দূর করিয়া উষার ওত্র আলোক-রেখা পূর্ব-গগনে ফুটিয়া উঠিয়াছে। নানাভাষীয়া বিহঙ্গরাজি সুমধুর কূজনে কাননরাজি মুখরিত করিয়া ভুলিয়াছে। বিহঙ্গকণ্ঠে নানা ছন্দে বিশ্ববিধাতার বন্দনাগীতি গীত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই আফজাল খাঁর শিবিরে ফজরের নামাজের সুধাবর্ষী আজানধ্বনি ধ্বনিত হইল। যোদ্ধগণ শীঘ্র শীঘ্র অস্ত্র করিয়া উপাসনায় মনোনিবেশ করিলেন।

উপাসনা শেষে মোস্লেম শিবিরের প্রধান গ্রহরী আসিয়া আফজাল খাঁকে নিবেদন করিলেন যে, শেরমর্দান খান এবং তাহার অনুচরগণ কেহই তাম্বুতে নাই। পরে প্রকাশ পাইল, তারা বাঈও তাম্বুতে নাই। তাহার জিনিসপত্র সমস্তই পড়িয়া রহিয়াছে। তখন চতুর্দিকে একটি মহা ঝোঁজ পড়িয়া গেল! নাই—নাই—নাই তো শেরমর্দান খানের দলের কোনও লোকই নাই! চারিদিকে সবাই খুঁজিতে লাগিল। কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না।

শিবিরে মহা হলহুল পড়িয়া গেল। সুদক্ষ ওচরদিগকে চতুর্দিকে মারাঠী শিবিরে শ্রেয়ণ করা হইল। ক্রমশঃ জানিতে পারা গেল যে, শেরমর্দান খানই তারা বাঈকে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছে। শেরমর্দান খান এবং তাহার অনুচরগণ কেহই মুসলমান নহে, সকলেই মারাঠী।

তারা বাঈকে হরণ করিয়া লইয়া যাইবার জন্যই তাহারা মুসলমানের বেশে আসিয়া আফজাল খাঁর সৈন্যদল-ভুক্ত হইয়াছিল।

শেরমর্দান—স্বয়ং মালোজী। এই মালোজীর করেই শিবাজী তারা বাঈকে সমর্পণ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। মালোজী তারার রূপ-মাধুরী দর্শনে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। তারাকে মুসলমান শিবির হইতে উদ্ধার করিবার আর কোনও পথ না পাইয়া অবশেষে মালোজী ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া আফজাল খাঁর সৈন্যদলে ভর্তি হইয়াছিলেন।

ক্রমশঃ সেনাপতির নিকট কৃতিত্বের পরিচয় প্রদানপূর্বক বিশ্বাসভাজন হইয়াছিলেন। অবশেষে সেনাপতি ইহার দলভুক্ত লোকের উপরেই তারার শিবির রক্ষার ভার সমর্পণ করিয়াছিলেন। সেই সুযোগে মালোজী ঔষধ প্রয়োগে তারাকে বেহঁস করিয়া গভীর নিশীথে হরণ করিয়া লইবার সুবিধা পাইয়াছিলেন। মালোজীর চাতুরী এবং কৌশলে সকলেই ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন।

মারাঠীদিগের চাতুর্য এবং ধূর্ততা সঙ্কটে এতদিন যাহারা অবিশ্বাসী ছিল, আজ তাহারাও মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা কীর্তন করিতে লাগিল। তারা বাঈয়ের অপহরণে

আফজাল খাঁ নিতান্তই বিমনায়মনা হইয়া পড়িলেন। মালেকা এবং তারার উদ্ধারের জন্য নানাবিধ পরামর্শ ও প্রচেষ্টা চলিতে লাগিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

শিবাজী : মা! তুমি সাক্ষাৎ ভবানী। তুমি দয়া করে সন্ধি করে দাও। এ ভীষণ যুদ্ধের শাস্তি হলেই রক্ষা পাই। অসংখ্য লোক এই সমরান্ধিতে পতনের ন্যায় ভয়ভীত হচ্ছে। দেশের কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প ক্রমশঃ বিলুপ্ত হচ্ছে। আর কিছুদিন এই সমরানল প্রজ্বলিত থাকলে, একবারেই উৎসন্ন যাবে।

মালেকা : আমি এখনও তোমার বন্দি। এই পশ্চিমঘাট গিরিগুহার নির্জন প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ থেকে কেমন করে সন্ধির প্রস্তাব করতে পারি? আর সন্ধি করার মত থাকলে, মহামতি আফজাল খাঁর নিকটে সে-প্রস্তাব পেশ করলেই তো হতে পারে।

শিবাজী : আফজাল খাঁ সন্ধি করবেন, এরূপ তো কিছুতেই মনে হয় না। মারাঠী শক্তিকে সমূলে নির্মূল করাই তাঁর উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য প্রতিপালনের জন্য তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করছেন।

মালেকা : অপহৃত রাজ্য ও দুর্গ ফিরিয়ে দিলে এবং বিজাপুরের আধিপত্য স্বীকার করলে, তিনি নিশ্চয়ই তোমাকে ক্ষমা করবেন।

শিবাজী : তা হলে আমার কি লাভ হবে? আমার স্বাধীনতা বজায় না থাকলে, সন্ধি করে লাভ কি? যাতে আমার স্বাধীনতা থাকে, অথচ সন্ধি হয়, তোমাকে সেইরূপ চেষ্টাই করতে হবে।

মালেকা : অসম্ভব বলে বোধ হয়। তোমাকে "পুনর্মুখিক" হতেই হবে। বিজাপুর দরবারের কঠোর আদেশ যে, তোমাকে বন্দী বা নিহত করতে হবে। এর জন্য অর্থব্যয় ও বলক্ষয় করতে বিজাপুর দরবার কুণ্ঠিত নহে। সোলতান তোমার প্রতি ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়েছেন।

শিবাজী : তবে উপায় কি?

মালেকা : উপায়—রাজ্য প্রত্যর্পণ করে ক্ষমা প্রার্থনা করা।

শিবাজী : প্রাণান্তেও বেচ্যায় রাজ্য ফিরিয়ে দিতে পারব না।

মালেকা : তবে সন্ধির কথা মুখে আনিও না। যথার্থ বীরপুরুষের ন্যায় যুদ্ধার্থ প্রকৃত হও।

শিবাজী : মা! তুমি অন্ততঃ আমার অনুকূল হও।

মালেকা : অসম্ভব! তুমি মুসলমানের প্রতি যেমন ভীষণ অভ্যুত্থার আরাধ

মালেক : শেরমর্দান খাঁই তবে মালোজী!

শিবাজী : হাঁ।

মালেকা : সাবাস বটে! অদ্ভুত সাহস এবং ছদ্মবেশ ধারণে অপারিসীম নৈপুণ্য! আমরা কোনও সন্দেহ করতে পারি নাই। বাস্তবিকই মারাঠারা কি তীষণ দৃষ্ঠ! তোমাদের অসাধ্য কর্ম কিছু নাই!

শিবাজী : প্রেমের দায়ে সকলি সম্ভব।

এই সময়ে মালেকা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

শিবাজী : মা! তুমি বুঝি তারাকে খুব ভালবেসেছ?

মালেকা : হাঁ, খুবই! নিজের ছোট ভগ্নী এবং সখির মত! তারাকে মালোজী হরণ করেছে এ-সংবাদ শেলসম অন্তঃকরণকে বিদ্ধ করেছে। হায় তারা! তারাকে বোধ হয় রায়গড়ে নিয়ে গিয়েছে?

শিবাজী : না। তারাকে কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে আমি তা ঠিক অবগত নহি। তবে শুনেছি, তার মাতুলালয়ে আছে।

মালেকা : এ অপহরণে কোনও ফল হবে না। তারা, আফজাল খাঁ ব্যতীত অবগত নহি। তবে শুনেছি, তার মাতুলালয়ে আছে।

মালেকা : এ অপহরণে কোনও ফল হবে না। তারা, আফজাল খাঁ ব্যতীত আর কাকেও স্বামীত্বে বরণ করবে না। জোর জবরদস্তি করে কুফল ব্যতীত কোন সুফল হবে না।

শিবাজী : তা খুবই বুঝছি। কিন্তু মালোজীর করে কন্যা সমর্পণ না করলে, মালোজী বিদ্রোহী হবে। আত্মীয়-স্বজন ক্রুদ্ধ এবং বিরক্ত হবে। মহাসঙ্কট! তারার মৃত্যুই এক্ষণে মঙ্গলজনক। এমন কুলত্যাগিনী কন্যার পিতা হওয়া বিষম পাপের ফল! লোক-সমাজে মুখ দেখাতে ইচ্ছা করে না!

মালেকা : তুমি অন্যের কুলের প্রতি হস্ত প্রসারণ করেছিলে, কাজেই তোমার কুলে কলঙ্ক হবেই। প্রত্যেক ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া, প্রত্যেক নিঃশ্বাসের প্রশ্বাস, প্রত্যেক ধ্বনির প্রতিধ্বনি এবং প্রত্যেক দানের প্রতিদান আছে। অনুতাপ বৃথা! এ তোমার স্বকৃত কর্মফল।

শিবাজী লজ্জায় অধোবদন হইলেন। একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া আবার ঠিক হইয়া বসিলেন। ক্রিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন, “আফজাল খাঁকে কন্যা দান করলেই বা কি লাভ হবে? তিনি কি আমার পক্ষাবলম্বন করে বিজয়পুর দরবারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন?”

মালেকা : তা নহে। মুসলমান হয়ে তিনি কখনো বিশ্বাঘাতকতা করতে পারেন না। তিনি আদর্শ মুসলমান। তবে আপনার জায়গীয় যাতে বাজেয়াপ্ত না হয়, তার চেষ্টা করতে পারেন।

শিবাজী : আফজাল খাঁই আমার প্রধান শত্রু । তাঁর মত দক্ষ সেনাপতি না থাকলে বিজয়পুর বাহিনীকে অনেক পূর্বেই পর্যুদস্ত করতে পারতাম!

মালেকা : আফজাল খাঁকে কন্যা দান করলে সন্ধি হতে পারে এবং তারার জীবনও রক্ষা পেতে পারে ।

শিবাজী : দেখা যাক কোথাকার ঘটনা কোথায় যেয়ে দাঁড়ায়! তোমাকে আগামী কালই কৃষ্ণগড়ে পৌছিয়ে দিচ্ছি । মা! তুমি আমার বিরুদ্ধাচরণ করবে না, এটাই আমার বিশেষ উরসা ।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

গভীর নিশীথে সুড়ঙ্গপথে বেহঁশ অবস্থায় তারাবাঈকে হরণ করিয়া লইয়া মালোজী এক পর্বত গুহায় লুকাইয়া রাখিলেন । কিন্তু সেখানে আফজাল খাঁর চরণ আশু অনুসন্ধান পাইতে পারে বলিয়া পিত্রালয় রায়গড়ে পাঠাইবার কথা হয় । কিন্তু সেখানে রাখিলে পাছে আফজাল খাঁ রায়গড় আক্রমণ করিয়া বসেন, এই ভয়ে শিবাজী তাহাকে মাতুলালয়ে রাখিতে আদেশ করেন । কঙ্কন প্রদেশের বিঠঠলপুরের এক গিরি-উপত্যকায় তারার মাতুলালয় । স্থানটি নিতান্ত দুর্গম, অথচ প্রাকৃতিক দৃশ্যে নিতান্তই মনোরম । তারার মাতামহ মল্‌হর রাও একজন বড় জ্যোতদার এবং হায়দ্রাবাদ নিজামের তহশীলদার । সুতরাং বিঠঠলপুরে তিনি একজন ক্ষমতা ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি । তারাকে এখানে বিশেষ যত্নে গোপনে রাখা হইল । তারার মনের গতি পরিবর্তনের জন্য নানাবিধ উপায় অবলম্বন করা হইল । কোনওরূপে একটি সন্ধি স্থাপিত হওয়া মাত্রই মালোজীর সঙ্গে তাহার উদ্বাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইবে, এই আশায় সকলেই উদ্ভিগ্ন রহিল ।

তারা সহস্র যত্ন এবং আদর পাইলেও কিছুতেই আফজাল খাঁর অতুল গরিমাপূর্ণ সৌন্দর্য এবং প্রেমের মাদকতা ভুলিতে পারিল না । স্বাধীন বনচারী বিহঙ্গকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিলে তাহার মানসিক অবস্থা যে রূপ হয়, তারার অবস্থাও তদ্রূপ ।

তারার প্রাণের ব্যাকুলতা এবং চাক্ষু্য দিনের পর দিন বাড়িয়া যাইতে লাগিল । পলায়ন করিবার জন্য নানা চেষ্টা করিয়াও কোনও সুযোগ করিয়া উঠিতে পারিল না ।

জীবন, তারার কাছে নিত্যই দুর্বল বলিয়া বোধ হইতে লাগিল । তাহার মনের কথা, প্রাণের ব্যথা, ব্যস্ত করিবার জন্য একটি লোকও নাই । তাহার প্রণয়-দেনতা আফজাল খাঁর কোনও সংবাদ না পাইয়া সে আরও অধীর ও চঞ্চল হইয়া

উঠিল। সে কাহারও সহিত মিশিত না বা কথা কাঁহিত না। মনের অশান্তি ও চাঞ্চল্য হাজার চেষ্টা করিয়াও তারা লুকাইতে পারিত না। তাহার মনের প্রতি অণুপরমাণু তুম্বানলে যেন দৃষ্ট হইতে লাগিল।

হায়! সে দুঃখ এবং সে জ্বালা ব্যক্ত করিবার ভাষা নাই। তারার মাতামহী তাহার মানসিক শাস্তি বিধানের জন্য অনেক চেষ্টা ও তর্ক করিলেন। অনেক হোম এবং যজ্ঞ করিলেন। তারার চিস্তরঞ্জনের জন্য গান-বাদ্যের বন্দোবস্ত করিলেন। কিন্তু জলের পিপাসা কি দৃষ্টে নিবারিত হয়? ক্ষুধার পেট কি কখনও কথায় ভরে? তারার কিছুতেই শাস্তি হইল না।

তারা পুড়িয়া পুড়িয়া ছাই হইতে লাগিল। ক্রমশঃ তাহার সুবর্ণ কাণ্ডি বিমলিন হইতে লাগিল। তারার উজ্জ্বল কটাক্ষপূর্ণ চক্ষু ক্রমশঃ উদাস ও কাঁতর-দৃষ্টিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কেশ বেশ এবং অঙ্গরাগে তাহার আর কিছুই যত্ন রহিল না। কিছুদিন মধ্যে তারাতে কিছু কিছু উন্মাদের লক্ষণও পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল।

বায়ু শাস্তির জন্য নানা প্রকার আয়ুর্বেদীয় তৈল এবং ঔষধের ব্যবস্থা হইল। কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোনও সুফল পরিদৃষ্ট হইল না। তারার নখর ও পুষ্টি তনু ক্রমশঃ ক্ষীণ ও শ্রীহীন হইতে লাগিল। সকলেই বুঝিল, প্রেমাস্পদ লাভের দারুণ নৈরাশ্যেই তারার শরীর-মন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে।

তারার মাতামহী অম্বুজা বাঈ তারাকে চক্ষের তারার ন্যায় দেখিতেন। তারার শোচনীয় বিষণ্ণ অবস্থা অবলোকন করিয়া তিনি যার-পর-নাই মর্মপীড়িত হইলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

বিঠলপুরে বিঠলজীর একটি মন্দির ছিল। এই বিঘ্নহের নামানুসারে গ্রামের নাম বিঠলপুর হইয়াছিল। বাসন্তী পূর্ণিমার তিথিতে এই বিঠলদেবের মন্দিরে কোথা হইতে এক তেজঃপুঞ্জতনু তণ্ডকাঙ্কনকাণ্ডি ললনা-কুল-ললাম-ভূতা মহাতেজস্বিনী ভৈরবী আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

প্রভাত হইতে হইতেই ভৈরবীর আগমন-সংবাদ সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। দলে দলে নরনারী কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তে এই নবীনা ভৈরবীকে দেখিবার জন্য সমবেত হইতে লাগিল। ভৈরবী অনেক পীড়িত ব্যক্তিকে ঔষধ দান করিয়া অল্প কয়েক দিনের মধ্যে আরোগ্য করিলেন। ভৈরবীর রূপে গুণে জানে আকৃষ্ট হইয়া দলে দলে লোক চতুর্দিক হইতে উপস্থিত হইতে লাগিল।

বিঠলপুর লোকের হলহলায় সজাগ হইয়া উঠিল। নানাপ্রকার উপহার দ্রব্য,

নজর-নেয়াজ এবং মানভের ফল-ফুল, নানাপ্রকার উপাদেয় ভোজ্য জাত, বস্ত্র এবং মুদ্রায় মন্দির পূর্ণ হইয়া উঠিল। সন্তান লাভ কামনায় নারীদিগের বিপুল জনতা হইতে লাগিল। ভৈরবী এই বিপুল খাদ্যসামগ্রী এবং অর্থরাশি প্রফুল্ল চিত্তে গরীব-দুঃখীদিগকে দান করিতে লাগিলেন।

ভৈরবীর রূপের ছটা, ডেজবিনী মূর্তি, বিনয়নয়ন ব্যবহার, সরল ধর্মোপদেশ এবং রোগ আরোগ্য-শক্তি অবলোকন করিয়া সকলেই বিমুগ্ধ হইতে লাগিল। চতুর্দিকে ভৈরবীর নামে ধন্য ধন্য রব পড়িয়া গেল।

ভৈরবীর প্রশংসায় আকৃষ্ট হইয়া একদিন স্বয়ং তারার মাতামহী অম্বুজা বাঈ তারাকে লইয়া ভৈরবী সন্দর্শনে বিঠঠলজীর মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। ভৈরবীর অনিচ্ছাসুন্দর কমণীয় মূর্তি এবং মধুর বাক্যালাপে অম্বুজা বাঈ এবং তারা উভয়েই মোহিত হইয়া পড়িলেন। তারার অসুখের কথা উঠিলে ভৈরবী বলিলেন যে, তিনি এককাত্তি তারাকে নির্জনে নিজের কাছে রাখিয়া একটি মন্ত্র জপ করিয়া গভীর রাত্রে হোম করিবেন।

অম্বুজা বাঈ আনন্দের সহিত তাহাকে অনুরাগপূর্ণ সম্মতি প্রকাশ করিলেন। অতঃপর নির্দিষ্ট রাত্রে তারা বাঈকে লইয়া ভৈরবী মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। কিছু রাত্রি পর্যন্ত মন্ত্র জপ করিবার পরে, ভৈরবী তারাকে বলিলেন, “তোমার এ মানসিক বিকার প্রেমের জন্যই সংঘটিত হয়েছে। তুমি নিশ্চয়ই কারও প্রেম-পাশে আবদ্ধ হয়েছে। তিনি কে, আমাকে বলে বল।”

তারা বাঈ ভৈরবীর কথা শুনিয়া লজ্জায় অধোবদন হইল, তাহার গণ্ড রক্তাক্ত হইয়া আবার মলিন হইয়া গেল। তারা নীরবে হতাশের দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল।

ভৈরবী বলিলেন, “আমি পণনায় দেখছি যে, সেই নাগররাজ মুসলমান কুলোদ্ভব। তুমি মারাঠী-রাজকুমারী হয়ে কিরূপে মুসলমান নাগরের রূপে মুগ্ধ হলে, ইহা তো নিতান্তই আশ্চর্যের বিষয়! যা হবার তা তো হয়ে গিয়েছে। এক্ষণে তাকে ভুলে যাবার চেষ্টা করাই সম্ভব। ভুলবার চেষ্টা করলে, ভুলে যাওয়ারটা কঠিন নহে?”

তারা কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, “তা’ সম্পূর্ণ অসম্ভব।”

ভৈরবী : বটে! প্রেম কি এতই গভীর হয়েছে? এত কাঁসিয়া গেলে তো মুশকিল! জাতি-কুল মজাইয়া প্রেম করা তো ভাল নয়!

তারা : প্রেম কি জাতি-কুল বুঝিয়া চলে? তটিনী যেমন নিভৃত গিরিকন্ধর হতে নির্গত হয়ে আপনার মনে আপনার তাবে পথে কাটিয়ে সাগর-সমুদ্রে প্রবাহিত হয়, প্রেমও তেমনি উচ্চায় গতিতে আপনার মনের পথে ছুটে চলে। নদী যেমন পথে চলতে কাকেও জিজ্ঞাসা করে ছুটে যায় না, প্রেমও তেমনি

কারও পরামর্শ বা উপদেশের তোয়াক্কা রাখে না। নদী যেমন সমুদ্রের সন্মিলন লাভ না করে কিছুতেই কান্ত হয় না, প্রেমও তেমনি আকাঙ্ক্ষিতকে প্রাপ্ত না হয়ে স্থির হতে পারে না।

ভৈরবী : তুমি দেখছি, প্রেম-রাজ্যের মন্ত দার্শনিক পণ্ডিত হয়ে পড়েছ! তোমার সঙ্গে এঁটে উঠা কঠিন!

তারা : আপনার বিনয় প্রকাশের কায়দা অতি চমৎকার! এই অধীনা এবং অধমাকে আর লজ্জিত করবেন না। আপনার চেহারা দেখে এবং কথা শুনে আমি একরূপ অনির্বচনীয় শাস্তি লাভ করেছি। আপনার স্বর যেন কত কালের পরিচিত! আর আপনাকে যেন কতই প্রাণের জন বলে বোধ হচ্ছে! কেন একরূপ হচ্ছে, তা ঠিক বুঝতে পারছি না?

ভৈরবী : আমিও সত্য সত্যই তোমার জন্য প্রাণের ভিতরে গভীর মমতা বোধ করছি। তোমাকে নিতান্তই আত্মীয়তম, মধুরতম এবং প্রিয়তম বলে বোধ হচ্ছে। এক্ষণে আমি তোমার অতীষ্ট সিদ্ধ হবার কোনও আনুকূল্য করতে পারলেই কৃতার্থ এবং সুখী হতে পারি।—এই বলিয়া ভৈরবী গভীরভাবে ধ্যানমগ্না হইলেন। দীর্ঘ ধ্যানের পর সহসা ধীরে চক্ষুরুন্মিলন পূর্বক প্রভাত-প্রস্ফুটিত গোলাপের ন্যায় স্থিত হাস্যে বলিলেন, “তোমার ভাগ্যাকাশ উষালোকে আলোকিত দেখে আশ্চর্য হলাম।”—এই বলিয়া ভৈরবী গভীর মূর্তি ধারণ করিলেন।

তারা : কি দেখলেন? বিশদরূপে বুঝিয়ে বলুন।

ভৈরবী : আর কিছু বুঝিয়ে বলতে হবে না। অতীষ্ট সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হবে।

তারা : এখানে বসেই কি অতীষ্ট সিদ্ধ হবে?

ভৈরবী : নিশ্চয়ই না।

তারা : তবে কোথায় যেতে হবে?

ভৈরবী : তা আমি জানি। সমুদ্র-সঙ্গম ব্যতীত গতি আর কোথায়?

তারা : কে আমাকে নিয়ে যাবে?

ভৈরবী : যে তোমাকে নিতে এসেছে।

তারা : আপনি! আপনি!! আপনি আমাকে নিতে এসেছেন! বটে, প্রেমাস্পদের সহিত মিলনের জন্য, কিংবা দেবতার মন্দিরে বলিদানের জন্য! ভৈরবীর প্রাণ যে অতি কঠোর। আমার জন্য আপনার এত গরজ কি? কে আপনি?

ভৈরবী : বেশী কথা বলো না। স্থির হও। আমি কে, এই দেখ।

ভৈরবী এই বলিয়া তাহার বাহুর উপরের অংশে একটি দাগ দেখাইল। এতক্ষণ ইহা বস্ত্রাবৃত ছিল।

তারা এই অশ্রুলেখা দেখিয়া বিস্মিত এবং আশ্চর্য হইল। ভৈরবীর কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া তারার বকে মুখ লুকাইয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল। ভৈরবী আনন্দোৎসেহিত-চিত্তে তারার পেলবগণে দুইটি গাড় চূষন করিয়া স্নেহভরে বলিলেন, “আর অশ্রু বর্ষণ করো না। ডোয়ার ক্রম্ভনে আমার হৃদয় মথিত হচ্ছে। প্রকৃত হও। নদীর ঘাটেই নৌকা। এখনই এই স্থান ত্যাগ করে নৌকার আরোহণ করতে হবে।”

তারার মুখমণ্ডল সহসা মেঘাবরণ মুক্ত শরচ্ছত্রের মত সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল! আনন্দোচ্ছ্বাসে তারার হৃদয়ের স্তরে স্তরে এবং শোণিতের কণায় কণায় বিদ্যুৎ চমকিতে লাগিল!! নৈরাশ্যের গ্রীষ্ম-জ্বালা পরিত্যক্ত হৃদয়-তটিনীতে আশা ও আনন্দের বর্ষাকালীন জীমূত-ধারা মুবলধারে বর্ষিত হইতে লাগিল। সে বর্ষণে শ্রেয়ের দু'কূল-প্রাণী বান ডাকিয়া যুবতীর হৃদয় ভোলপাড় করিয়া দিল। ঝটিকা-সংস্কৃত-অধুনিয় ন্যায় তাহা চঞ্চল এবং উত্তাল হইয়া উঠিল।

অতি সত্ত্বর ভৈরবীও বেশ পরিবর্তন করিয়া সাধারণ মারাঠী যুবকের ন্যায় সজ্জিত হইলেন। অস্তঃপর আবশ্যিকীয় দ্রব্যাদি সহ নির্গত হইবার উপক্রম কালে তারা বিঠঠলজীর প্রতিমাটি ভূপাতিত করিয়া পদাঘাতে তাহা ভগ্ন করিয়া ফেলিল! ভৈরবী বলিলেন, “তারা! ছি! ছি! এ করলে কেন? প্রতিমার সহিত প্রতিহিংসা কিসের?”

তারা : প্রতিহিংসার জন্য নহে। মারাঠীদের ভ্রমাপনোদনের জন্য। তাহারা এই মূর্তিকে জঘন্য এবং জীবিত বলিয়া জানে। আমার সঙ্গে কত দিন এ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক হয়েছে। আমি এই প্রমাণ করে পেলাম যে, ইহা প্রস্তর ব্যতীত আর কিছুই নহে। এতে তাদের অনেকের ভ্রান্তি দূর হবে।

ভৈরবী : দেখছি, তুমি মূর্তিগূজক কাকেরের ঘরে জন্ম গ্রহণ করলেও হজরত ইব্রাহিম খলিলুল্লাহর ন্যায় প্রতিমা চূর্ণ করতে বিশেষ আনন্দ লাভ কর।

অস্তঃপর ভৈরবী এবং তারা নিশীথের পতীর অন্ধকারের মধ্যে যথাস্থানে ঘাইয়া নৌকার আরোহণ করিলেন। সুবাতাস বহিতেছিল। নৌকা পালভরে তীরের মত ছুটিয়া চলিল। পাঠক-পাঠিকা! বোধহয় বুঝিতে পারিতেছেন যে, এই ভৈরবী আর কেহ নহে, ভৈরবী—আমাদেরই অসাধারণ ভেজগণিনী বিচিত্রকর্মা মালেকা আমেনা বানু।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

নৌকা ভরাপালে জোর বাতাসে কল কল হয়ে নদীর জলরাশি কাটিয়া তীরের মত বেগে ছুটিয়া গেল। রাতারাতি নৌকা অনেক দূরে সরিয়া পড়িল। প্রত্যন্ত সমাঙ্গমে

বায়ুর বেগ কিছু মন্দ হইয়া আসিল। দৌঁধতে দৌঁধতে বায়ুর প্রবাহ একেবারেই
 রুদ্ধ হইয়া গেল। সুতরাং মাল্লারা নৌকার পাল নামাইয়া দাঁড় ধরিল। ঝড়ের মত
 যে নৌকা বায়ুত্তরে ছুটিয়া যাইতেছিল, এক্ষণে তাহা অপেক্ষাকৃত ধীর মন্থরভাবে
 যাইতে লাগিল। মালেকা এবং তারা কিছু চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। মাল্লাদিগকে
 যতদূর সম্ভব দ্রুতগতিতে দাঁড় ফেলিবার জন্য পুনঃ পুনঃ আদেশ করিতে
 লাগিলেন। মাল্লারা যতদূর সম্ভব তীব্রবেগে দাঁড় ফেলিতে লাগিল।

ক্রমশঃ আঁধার ভেদ করিয়া প্রভাতের অকর্ণিমাল্লাল পূর্বগগনে দেখা দিল।
 বিহঙ্গ-কণ্ঠে বিশ্ব-বিধাতার বিবিধ বন্দনা ললিত-স্বরে গীত হইয়া পৃথিবীকে ঝড়ত
 করিয়া তুলিল! স্নিগ্ধ গন্ধবহ মৃদু মন্দ সঙ্ঘারে কুসুম গন্ধ বহন করিয়া বিশ্ব-
 বিধাতার মঙ্গলাশীর্বাদের ন্যায় সর্বত্র প্রবাহিত হইয়া নব জীবনের সূচনা করিতে
 লাগিল।

নিশাচর প্রাণীদিগের মনে নৈরাশ্য ও ভীতির সঙ্কার এবং দিবাচরদিগের মনে
 আনন্দ উৎসাহের স্রোত প্রবাহিত করিয়া দেখিতে দেখিতে দিবসের আবির্ভাব
 হইল। দিবা আবির্ভাবে মালেকা এবং তারা স্বীলোকের পরিচ্ছদ পরিত্যাগ পূর্বক
 মারাঠী পুরুষের বেশে সজ্জিত হইয়া নৌকার ভিতরে অবস্থান করিতে লাগিলেন।
 নৌকায় কয়েক জন পাঠান বীরপুরুষ আসিয়াছিলেন; তাঁহারা বীর-পরিচ্ছদ
 পরিবর্তন পূর্বক সাধারণ মাল্লাদিগের সাজে সজ্জিত হইলেন।

নৌকা ভরাপালে তীর বেগে গেলে যেখানে তিন দিনে নিরাপদ স্থানে যাইয়া
 উপস্থিত হইতে পারিত, সেখানে বায়ুর গতি রুদ্ধ হওয়ায় শুধু কেপনী সাহায্যে
 চারি দিনে অর্ধপথে যাইয়া উপস্থিত হইল।

এদিকে বিষ্ঠলপুর হইতে ভৈরবী এবং তারার সহসা অন্তর্ধানে এবং দেবমূর্তির
 ভগ্নদশা দর্শনে পরদিবস প্রাতঃকালেই এক হুলস্থূল কাণ্ড পড়িয়া গেল! দেবমূর্তির
 ভগ্নাবস্থা এবং দারুণ অবমাননা দর্শনে সকলেই ক্রুদ্ধ এবং মর্মান্বিত হইল!
 ভৈরবীর সম্বন্ধে নানাজনে নানা মত প্রকাশ করিতে লাগিল।

কেহ ভৈরবীকে নাস্তিক, কেহ উন্মত্ত বলিতে লাগিল। কিন্তু একটি তীক্ষ্ণবুদ্ধি
 বৃদ্ধা বলিল যে, এই ভৈরবী বাস্তবিক পক্ষে ভৈরবী নহে। এই ভৈরবী নিশ্চয়ই
 কোন মুসলমান রমণী। রমণী অসাধারণ সাহসিনী এবং প্রখর বুদ্ধিশালিনী।
 তারাকে বহিষ্কৃত করিয়া লইয়া যাইবার জন্যই ভৈরবীবেশে এখানে আসিয়াছিল।
 মারাঠীদের ধূর্ততা এবং কৌশলকে এবার মুসলমান রমণী বেশ টেকা দিয়াছে।
 ধন্য রমণীর সাহস এবং বুকের পাটা! সমস্ত মারাঠীর মুখ ভোঁতা করিয়া দিয়াছে!
 কথা তড়িৎবেগে সর্বত্রই রাট্ট হইয়া পড়িল। ঘটনা শুনিয়া সকলেই অবাক হইল!
 ভগ্নপ্রতিমা সন্দর্শনে সহস্র সহস্র নরনারী সমাগত হইল। ভৈরবী এবং তাহার
 উদ্দেশ্যে মহস্রকণ্ঠে সহস্রভাবে অজস্র অভিসম্পাত এবং সহস্র গালাগালি বর্ষিত

হইতে লাগিল। কোনও কোনও প্রাচীন বৃদ্ধ-বৃদ্ধা তাহাদের আরাধ্য এই ভগ্নমূর্তির লোকে অশ্রুধারা বহাইতে লাগিল! নবীন-নবীনারাও অনেকে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। কেবলমাত্র একটি মারাঠী কুমারী বিশ্বয়-বিজড়িত কণ্ঠে বলিল, “ওমা! বিঠলজী আমাদের কেমন প্রভু! একজন মুসলমান রমণীর সঙ্গে যুদ্ধেই চুরমার হয়ে গিয়েছে। তবে দেখছি, এসব দেবতা-টেবতা কিছুই নয়—সবই মাটি! সবই ভূয়া! সবই মিথ্যা!”

তাহার কথা শুনিয়া সকলেই জিব কাটিয়া বলিল, “সর্বনাশ! সর্বনাশ! হীরা বলে কি! হিন্দুর মেয়ের মুখে একি সর্বনেশে কথা! ঘোর কলি! ঘোর কলি!! ধর্ম আর থাকে না।” এই বলিয়া হীরার প্রতি সকলেই তর্জন-গর্জন করিতে লাগিল। হীরাবাই তাহাতে আরও ত্যক্ত বিরক্ত হইয়া উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, “আমি কি অন্যায় বলছি? যে-দেবতা নিজেকে রাখতে পারে না, সে আমাদিগকে কেমন করে রাখবে, আমাকে বুঝিয়ে দাও। আমি দিব্য দেখতে পাচ্ছি, এটি একটি বড় পাথরের মূর্তি ছাড়া আর কিছুই নয়! উহাতে ভক্তি করা আর লাধি মারা, সমান কথা।” হীরার কথার ধারে সকলেই হতভয় হইয়া পড়িল। কেহ কেহ হীরার প্রতি কুখিয়া উঠিল। হীরা ক্রুদ্ধ হইয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল।

তাহার মাতামহ মল্‌হর রাও নানাস্থানে নানাদিকে অনুসন্ধানী লোক পাঠাইলেন। নানুপুরে মালোজীর নিকট একজন অশ্বারোহীকে অবিলম্বেই পাঠান হইল। মালোজী তখন বিশেষ কার্যের জন্য নানুপুরে অবস্থিত করিতেছিলেন।

সংবাদ শুনিয়া মালোজী বজ্রাহতের ন্যায় প্রথম স্তম্ভিত হইলেন, কিন্তু পর মুহূর্তেই পনের জন অশ্বারোহী সহ তুঙ্গা নদীর তীর ধরিয়া দুই পর্বতের মধ্যবর্তী ভবানীপুর নামক স্থানে—যেখানে নদী সঙ্কীর্ণ অথচ গভীর প্রবাহে প্রবাহিত হইতেছে, সেই ভবানীপুর লক্ষ্য করিয়া বিদ্যুৎবেগে ঘোড়া ছুটাইলেন। ঘোড়াগুলি পদাঘাতে প্রস্রব-গাত্রে স্কুলিঙ্গ ছুটাইয়া এবং পর্বত ও বন-প্রান্তরে পদধ্বনির প্রতিধ্বনি তুলিয়া তীব্রবেগে ছুটিয়া চলিল। তরুশাখাসীন বিহঙ্গাবলী এবং ক্ষেত্রমধ্যস্থ বাবুই পক্ষীর ঝাঁক কেবল চকিতে চঞ্চল হইয়া কোলাহল করিতে করিতে উড়িয়া উঠিল। পথিকগণের চক্ষে কেবল মারাঠী সৈন্যদিগের রবিকর-প্রতিফলিত বর্শাফলকগুলি ঝলিতে লাগিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

নৌকা চলিয়াছে। একটু বাতাস বহিতেই মাঝি আবার নৌকায় পাল তুলিয়া দিল। সকলেই নিরুদ্বেগচিত্তে নানা প্রকার গানগল্পে মগ্ন! ভবানীপুর আর

বেশী দূর নহে। ভবানীপুর পার হইলেই নৌকা প্রশস্ত নদীবন্ধে পাড়বে।

মালেকা বলিলেন, “যে পর্যন্ত ভবানীপুর না ছাড়াও, সে-পর্যন্ত বিশেষ সাবধানে চলবে।” মালেকা নিজে নৌকার ছইয়ের উপর বসিয়া নদীর দক্ষিণ পার্শ্বের যেখানে যেখানে বন ছিল, সেখানে সেখানে নিপুণ দৃষ্টিতে দৌঁচিয়া যাইতে লাগিলেন। ক্রমশঃ সন্ধ্যার প্রাকালে নৌকা ভবানীপুরের নিকটবর্তী হইল। নৌকা ভবানীপুর পার হইয়াছে, এমন সময় কতিপয় অশ্বারোহী মারাঠী চীৎকার করিয়া নৌকা থামাইতে বলিল। মালেকার বুঝিতে বাকি রহিল না, ইহারা শত্রু পক্ষেরই লোক। সুতরাং মাঝিকে অপর তীরে নৌকা চলাইতে ইঙ্গিত করিল। নৌকা নদীর অত্যন্ত প্রশস্ত স্থানে আসিয়া পড়িয়াছে। এ অবস্থায় দস্যুদের পক্ষে নৌকা আক্রমণ করা সহজ নহে! নৌকা অপর তীরে দূর দিয়া চলিয়া যাইতেছে দৌঁচিয়া মারাঠীরা ভীষণ চীৎকার করিতে লাগিল। তাহারা চীৎকার করিয়া বলিল, “আমরা দস্যু নহি। আমরা কোতরাণীর লোক। তোমরা কোনও রমণীকে চুরি করে নিয়ে যাচ্ কি-না, তাই মাত্র আমাদের প্রতি দেখবার হুকুম। আমরা তোমাদের কোনও অনিষ্ট করব না। অল্পক্ষণের জন্য তোমাদের নৌকা থামাও, নতুবা আমরা গুলী চালাব। অনর্থক খুন-জখম হবে।”

মালেকার ইঙ্গিতে মাঝি বলিল, “আচ্ছা, তবে আমরা সম্মুখের বাঁকে থামাচ্ছি। তোমরা অনুসন্ধান করে দেখ।” বাতাস খুব জোরে বহিতেছিল, সুতরাং অল্প সময়ের মধ্যেই নৌকা বাঁকে আসিয়া লাগিল। নদীবন্ধ তখন অন্ধকারে আচ্ছন্ন। তবে নির্মেষ আকাশ বলিয়া দৃষ্টি একেবারে অবরুদ্ধ নহে। মালেকার নৌকার ভিতরে মাত্র একটি ক্ষীণ বাতি মিটিমিটি করিয়া জ্বলিতেছিল। বাহিরে তাহার আলোক প্রায় কিছুই দেখা যাইতেছিল না।

মালেকা সকলকে যাহার যাহা কর্তব্য বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। নৌকার ভিতরে অব্যর্থ-লক্ষ্য সৈনিকগণ নৌকার পার্শ্বের ছইয়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রের মুখে বন্দুকের নল সংযোগ করিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিল। দ্বাদশ ছিদ্রে দ্বাদশটি বন্দুক সংস্থাপিত হইল। আট জন মারাঠা এবং এক জন মাঝি মাত্র বাহিরে রহিল। তাহারা সকলেই আপন আপন কার্য সম্পাদনে অত্যন্ত পটু।

দস্যুরা দুইটি প্রকাণ্ড মশাল জ্বলাইয়া নদীর তীরে সারিবন্দী অবস্থায় দণ্ডায়মান রহিল।

মাঝি বিনীতভাবে মালেকাকে বলিল, “সর্দার সাহেব! আপনি যে কয় জন ইচ্ছা লোক লইয়া নৌকার ভিতরে এসে দেখে যান। তবে ভিতরে একপ স্থানান্তর যে, ৩/৪ জনের অধিক লোকের দাঁড়াবার জায়গা হবে না। জিনিসপত্র বোঝাই হয়ে রয়েছে।”

মালোজী : বেশী লোক নিয়ে উঠবার দরকার কি? আমি মাত্র দু'জন লোক নিয়ে উঠছি। তোমাদিগকে মিছামিছি জ্বালাতন করব না।—এই বলিয়া মালোজী তরবারিধারী দুইজন সৈনিকপুরুষ সহ নৌকার সিঁড়িতে পদার্পণ করিলেন। মালোজী করেকজন আসিয়া মস্তক মস্ত করিয়া বিশেষ শ্রদ্ধাভরে সালাম করিল। মালোজী সৈনিক পুরুষদ্বয় সহ নৌকায় যেমনি উঠা, অমনি তাহাদের ঘাড়ে বস্ত্রের ন্যায় ভীষণ মুট্যাবাত আর সেই সঙ্গে একেবারে ছাদশ বন্দুকের এক সঙ্গে আওয়াজ। ছাদশটি অশ্বারোহী সৈন্য মুহূর্ত মধ্যে অস্থপৃষ্ঠ হইতে ভূপতিত হইল। ঘোড়াগুলি ভড়কাইয়া দির্ঘদিকে উধাও হইয়া পলায়ন করিল। অবশিষ্ট তিনজন অশ্বারোহী প্রাণভয়ে চিৎকার করিয়া উর্ধ্বদ্বাসে পলায়মান হইবার উপক্রমেই মালোজীদিগের গুলীর আঘাতে হতজীবন হইয়া ভূপতিত হইল।

এদিকে নৌকার সমাগত মালোজী, সঙ্গীদ্বয় সহ মুহূর্ত মধ্যে বন্দী হইয়া পড়িলেন। অস্ত্র-শস্ত্র কাড়িয়া লইয়া লৌহশৃঙ্খলে কঠোরভাবে আবদ্ধ করিয়া তিন জনকে নৌকার ডহরে রজ্জুবদ্ধ কূর্মে ন্যায় ফেলিয়া রাখা হইল।

এদিকে তিন চার জন মালোজী তীরে উঠিয়া নিহত মারাঠীদিগের অস্ত্র-শস্ত্রগুলি নৌকায় উঠাইয়া তাহাদের লাশগুলি নদীতে ফেলিয়া দিয়া তাড়াতাড়ি নৌকা ছাড়িয়া দিল।

শ্রবণ পবনে তখন নৌকা বিজয়ী বীরের মত ক্ষীণ বক্ষে ছুটিতে লাগিল। এই ঘটনার বর্ণনা করিতে যে-সময় লাগিল, তাহার দশমাংশ সময়ের মধ্যে সমস্ত কার্য সম্পন্ন হইয়া গেল। অন্তঃপর সকলে করুণাময় খোদাওন্দতলাকে প্রাণ ধুলিয়া ধন্যবাদ দিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

চৈত্রমাসের শেষ। বসন্তের পূর্ণ বিকাশ এবং গ্রীষ্মের সমাগমে শিবাজী ক্রমশঃ পরাস্ত হইয়া নিবিড় কাননে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাঁহার সৈন্যদল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ঝাড়ে-জঙ্গলে এবং পাহাড়-পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। মালোজী বন্দী হওয়ার শিবাজী যার-পর-নাই হতাশ এবং বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। রামদাস ঘাষী, আকাজী প্রকৃতি তখন সন্ধি করিবার জন্য শিবাজীকে বিশেষভাবে উপদেশ দিতে লাগিলেন। কিন্তু আকাজাল খাঁ শিবাজীকে সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত এবং উৎসাদিত করিবার জন্যই বহুপরিকর হইলেন। শিবাজী অনেক হীনতা স্বীকার করিয়া সন্ধি করিবার জন্য বাধ্য হইয়া পড়িলেন। সন্ধির জন্য পুনঃ

পুনঃ আবেদন-নিবেদন এবং প্রার্থনা ও মিনতি চলিতে লাগিল। অবশেষে শিবাজী এক দিন মালেকা আমেনা বানুর চরণে লুপ্তিত হইয়া তাঁহার কৃপাভিখারী হইলেন।

মালেকা আমেনা বানু তখন আফজাল খাঁকে বিশেষরূপ অনুরোধ করিলেন। পরামর্শ হইল যে, শিবাজী বেছায় আনন্দ-উল্লাসে তারাবাদ্দিয়ে রাজ্যোচিত আড়ম্বরে আফজাল খাঁর করে সমর্পণ করিবেন। আর আফজাল খাঁ শিবাজীকে তাঁহার অধিকৃত পরগণা এবং কেদ্বাতুলির মাত্র এক-চতুর্থাংশ ছাড়িয়া দিবেন। শিবাজী দস্তুরমত বিজাপুর সোলতানের আধিপত্য ধর্মতঃ এবং কার্যতঃ স্বীকার করিবেন।

শিবাজী মুসলমানদের যে-সমস্ত মসজিদ ভগ্ন করিয়াছেন, তাহা সমস্তই যথাযথরূপে প্রস্তুত করিয়া দিবেন। শিবাজী রণতরী রাখিতে পারিতেন না। এই সমস্ত শর্ত যথারীতি লিখিয়া বিজাপুর দরবারে প্রেরণ করা হইল। বিজাপুর দরবার একবারেই শিবাজীর উৎসাদনের পক্ষপাতী ছিলেন; কিন্তু আফজাল খাঁর অনুরোধে এই সমস্ত শর্ত স্বীকার করিয়া সন্ধি স্থাপনের জন্য অনুমতি প্রদান করিলেন।

আফজাল খাঁর সহিত তারাবাদ্দিয়ের বিবাহ সম্বন্ধে বিজাপুরের সোলতান প্রথমতঃ আপত্তি তুলিলেন। কিন্তু তারাবাদ্দি-এর কক্ষণ প্রার্থনা এবং গভীর ব্যাকুলতাপূর্ণ পত্র পাইয়া পরে অনুমোদন করিলেন।

অতঃপর ২১শে চৈত্র শুক্রবারে উভয় পক্ষের প্রধান প্রধান সামন্তদিগের সম্মুখে যথারীতি সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল। শিবাজীর প্রার্থনানুযায়ী মালোজীকে আমেনা বানু বিনা নিষ্ক্রেয়ে মুক্তি প্রদান করিলেন। মালেকা বলিলেন, “মালোজী আপনি তারাকে বেহঁস করে চুরি করে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু আমি সচেতন এবং সশস্ত্রাবস্থায় আপনাকে বন্দী করেছি। সুতরাং আশা করি, আমাতে কোনও হীনতা দর্শন করবেন না।”

মালোজী লজ্জায় অধোবদন হইয়া বলিলেন, “আপনার সাহস যেমন অপরিসীম, দয়াও তেমনি তুলনাহীন! আপনি আমাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করলেন।” অনন্তর যথাসময়ে বৈশাখী পূর্ণিমাতে বিবাহের দিন নির্ধারিত হইল।

শিবাজী তারাকে লইয়া বাড়ী ফিরিলেন। তারার প্রতি যাহাতে কোনও উৎসীড়ন না হয়, সেজন্য মালেকা শিবাজীকে বিশেষভাবে সাবধান করিয়া দিলেন। তারার প্রতি অন্যায় ব্যবহার হইলে শিবাজীকে যে সকল-হারা হইতে হইবে, তাহা বিশেষরূপে বুঝাইয়া দেওয়া হইল।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

আজ বৈশাখী শুক্লপক্ষের চতুর্দশী। অমল ধবল শশীর মনোহর কৌমুদী জাদে গগনমত্তল ও ভূতল কি সুন্দর ও শোভন দৃশ্য ধারণ করিয়াছে! রায়গড়ে শিবাজীর বাটী আজ বিশেষরূপে ধ্বংসতাকা আলোকমালায় সুসজ্জিত! বিরাট সভামণ্ডপে অসংখ্য আলোকের সমাবেশ! রাজবাড়ীর ফটকে ফটকে নহবতে নহতে মধুর সুরে শাহানা বাজিতেছে! সৈনিকেরা উৎকৃষ্ট বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া নিতান্ত জাঁকজমকের সহিত রাত্তার দুই পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বহুসংখ্যক নারী বিচিত্র পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছে। ফলতঃ শিবাজীর রাজপুরী আজ উজ্জ্বলিত নাট্যশালার ন্যায় মনোহারিণী শোভা ধারণ করিয়াছে।

একটু রাত্রি হইতেই “বর আসিতেছে, বর আসিতেছে” বলিয়া সর্বত্রই একটু হুম পড়িয়া গেল। সুবর্ণখচিত মনোহর পরিচ্ছদ পরিহিত দুই শত অশ্বারোহী রৌপ্য-নির্মিত বর্শাফলকে রক্তবর্ণ রেশমী পতাকা বিধূনন করিয়া সকলের অগ্রে নমুদার হইল। অতঃপর পঞ্চাশটি হস্তী স্বর্ণস্তরণে আকৃষ্ট এবং স্বর্ণমুকুট পরিহিতাবস্থায় অগ্রসর হইল। অতঃপর নানা শ্রেণীর তুরী, ভেরী, বাঁশী, স্বরুদ, কুদ, কুপচাগ, সেতার, সারেসী, বীণ, রবাব, তানপুরা, বেহালা প্রভৃতি কোমল সুরের বাদ্যের ঐক্যতান বাজাইতে বাজাইতে বাদ্যকরগণ অগ্রসর হইল।

তৎপর খাসপেলাফ, আসাসোটা, অসংখ্য প্রকার ফুলের ঝাড় সহ বাহকগণ অগ্রসর হইল। তৎপর সুবর্ণ তাঞ্জামে চড়িয়া বীরকুঞ্জর, রূপসাগর, বর নাগর আফজাল বা আপমন করিলেন। তাঁহার পশ্চাতে বিজাপুরের কতিপয় অমাত্য সর্দার ও সামন্ত উৎকৃষ্ট অশ্বারোহণে নিতান্ত জাঁকজমকের সহিত আগমন করিলেন। অতঃপর সোলতানী “তবলখানা,” নানাজাতীয় বিগল, কর্ণাল, ভেরী, দফ, তবল, নাকারা প্রভৃতি নানা প্রকার বাদ্যে গুরু গভীরভাবে উৎসবের বাজনা বাজাইতে বাজাইতে অগ্রসর হইল।

তৎপর সাধারণ সৈনিক, অন্যান্য লোক এবং রাত্তার জনতা অগ্রসর হইল। ক্রমশঃ বরঘাত্তীদল শিবাজীর দীর্ঘ প্রাসাদের সন্মুখে যাইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। শিবাজী এবং তাঁহার পিতা শাহজী, মালোজী, গুরু রামদাস স্বামী, বলবন্তরাও এবং অন্যান্য কর্মচারিগণ পরম যত্নে সকলকে আদর অন্তর্ধান এবং সাদর সম্বোধনে শ্রীত এবং সমুদ্র করিয়া যথাযোগ্য আহার ও আবাসস্থান প্রদান করিলেন।

আফজাল খাঁর আনীত নানাধরকারের উৎকৃষ্ট মিষ্টান্ন, মোরফা, হালুয়া এবং ফলমূল সমস্ত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চুপড়িতে করিয়া অন্তঃপুরে নীত হইল।

আফজাল খাঁ এবং তাঁহার সঙ্গীয় কতিপয় বিশিষ্ট লোককে প্রাচীর বেষ্টিত একটি উদ্যানবাটিকার মধ্যস্থ সুন্দর গৃহে স্থান দেওয়া হইয়াছিল। শিবাজী সেইখানে আসিয়া আফজাল খাঁ এবং অমাত্যবর্গকে বিশেষভাবে অভ্যর্থনা এবং সম্বর্ধনা করিলেন। শিবাজীর বিনয়নম্র ব্যবহার, মধুর সাদর সম্বাষণ ও সশ্রদ্ধ যত্নে সকলেই পরম পরিতোষ লাভ করিলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ

আজ বৈশাখী পূর্ণিমা। জ্যোৎস্না-জ্বলে জগনুজল যেরূপ মনোহারিণী শোভা ধারণ করিয়াছে, রায়গড়ের রাজবাটীও আজ তেমনি আলোক ও পুষ্প পতাকা সম্ভ্রায় পূর্ব দিন অপেক্ষাও যেন অধিকতর শোভায় শ্রদীপ্ত এবং পুলকিত হইয়া উঠিয়াছে! সমস্ত দিন ভোজের বিপুল উৎসব অন্তে মগরেবের নামাজের পরে যথারীতি ইসলাম প্রথানুযায়ী উদ্বাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইল।

অতঃপর জামাতা আফজাল খাঁকে অন্তঃপুরে আনয়নের ব্যবস্থা হইল। অন্তঃপুরের একটি নির্দিষ্ট অটালিকা বাসরের জন্য পূর্বে হইতেই আরাধ্য করা হইয়াছিল। আফজাল খাঁকে সেই অটালিকায় লইয়া বসাইবার কিছু পরেই অন্তঃপুরে ভীষণ আর্তনাদ উদ্ভিত হইল। সে আর্তনাদে অন্তঃপুরের যে যেখানে ছিল সকলেই চকিত হইয়া শিহরিয়া উঠিল!

“খুন! খুন! তারা খুন হয়েছে!” এই ভীষণ অশনিপাততুল্য শব্দ পুনঃ পুনঃ শ্রুত হইতে লাগিল! শিবাজী এবং আফজাল খাঁ উঠিতে পড়িতে প্রাঙ্গণে ছুটিয়া গেলেন! ত্রীলোকদিগের ভিড় ঠেলিয়া সত্যই দেখিতে পাইলেন যে, সালঙ্কারা সুসজ্জিতা তারা বৃকে শানিত-ছুরিকা-বিদ্ধ-অবস্থায় ভূতলে পতিত রহিয়াছে! রক্তে মেদিনী ভাসিয়া যাইতেছে! ছুরিকা তনুহর্ভেই বন্ধ হইতে তুলিয়া লওয়া হইল। চিকিৎসার যথারীতি বন্দোবস্ত হইল! কিন্তু হায়! সকলি বৃথা! তীক্ষ্ণধার ছুরিকায় হৃদপিণ্ড বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছিল! সূতরাং অল্পকালের মধ্যেই তারা প্রাণত্যাগ করিল। এই গোমহর্ষণকর নিদারুণ সাংঘাতিক ঘটনার বৃত্তান্ত এই যে, তারাকে যখন নববধূবেশে সাজাইয়া বাসর ঘরের দিকে লইয়া যাওয়া হইতেছিল, তখন প্রাঙ্গণে অবস্থিত একখানি পাঙ্কির ভিতর হইতে সহসা মালোজী নির্গত হইয়া শানিত-ছুরিকা তারার বক্ষে বিদ্ধ করিয়া দেন। ছুরি বিদ্ধ করিয়াই মালোজী উর্ধ্বদ্বাশে দরজার দিকে ছুটিয়া যান! দ্বারবান বাধা দিতেই দ্বারবানকেও ছুরি

মালিয়া নিজেৰ পথ মুক্ত করেন। কিন্তু অন্তঃপুরেৰ ঘাৰ হইতে ছুট পাইলেও বাহিৰেৰ ঘাৰে সৈনিক-গ্ৰহী কড়ক শ্ৰেণীত হন।

মহা আনন্দেৰ মধ্যে মহা বিষাদেৰ তৰঙ্গ উখিত হইল। পূৰ্ণিমাৰ শোভা আমাৰণ্যেৰ অন্ধকাৰে ডুবিয়া গেল। আশাৰ কমল নিরাশাৰ পক্ষে মগ্ন হইল। স্বৰ্গগড়ে মহা হাহাকাৰ পড়িয়া গেল। তাৰাৰ শোকে সকলেই আত্মহারা হইল। সেই বিবাহোৎসব দিনেৰ এই মৃৎস হত্যাকাণ্ডেৰ শোকেৰ বিষয় পাঠক-পাঠিকা অনুমানে বুঝিয়া লউন। আৰ যদি সহানুভূতি থাকে, তবে এক বিন্দু অশ্রুপাত কৰুন।

পৰদিন প্ৰত্যুষে মালোজীকে শূলে চড়ান হইল। মুহূৰ্ত্ত মধ্যে নৈরাশ্যদিগ্ৰ হিংসাপৰাণ আত্মা শূন্যে মিশিয়া গেল। শয়নগড়েৰ বিষাদ ভাৰ আৰও বাড়িয়া গেল। কাৰণ সকলেই বুঝিল যে, মালোজী তাৰাৰ প্ৰতি একান্তই আসক্ত এবং অনুরক্ত ছিলেন। কিন্তু তাৰা তাহাকে একেবাৰেই চাহিত না। সে আফজাল খাঁৰ হৃদয়ৰোবৰেই প্ৰেমেৰ কমল ডুলিতে সাঁতাৰ দিয়াছিল। কিন্তু হায়! হতভাগিনীৰ আশা পূৰ্ণ হইল না। দৃষ্টজীৱনেৰ অতৃণ আকাঙ্ক্ষা এবং প্ৰেমেৰ আগ্ৰেয়-পিপাসা লইয়াই জীৱন ত্যাগ কৰিল! প্ৰেম-সৰোবৰে ডুবিয়াও এক বিন্দু প্ৰেমসুধা পানেৰ পূৰ্বেই তাহাৰ জীৱনলীলা শেষ হইল। কি তীব্ৰ বিষাদপূৰ্ণ ভয়াবহ ঘটনা! শিৱাজী কন্যাৰ শোকে নিতান্ত বিমনায়মান এবং কিংকৰ্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। আফজাল খাঁৰ নিকটে গভীৰ দুঃখ ও কৰুণ বিলাপ প্ৰকাশ কৰিলেন। আফজাল খাঁৰ চকু হইতে অশ্রুধাৰা নিৰ্গত হইল।

অনন্তৰ আফজাল খাঁৰ সহিত আত্মীয়তা এবং কুটুম্বিতা বজায় ৰাখিবাৰ জন্য শিৱাজী তাহাৰ ভগ্নী কামিনীবাইকে আফজাল খাঁৰ কৰে সমৰ্পণ কৰিবাৰ প্ৰস্তাব কৰিলেন; কিন্তু আফজাল খাঁ কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না। আফজাল খাঁ তৎপৰ দিবস প্ৰান্তকালে বিজাপুৰে কুচ কৰিবাৰ জন্য প্ৰস্তুত হইলেন। শিৱাজীও অপত্যা তাহাকে সম্বত হইলেন। পৰদিন প্ৰত্যুষে সেনাপতি সাহেব ৰাজধানীতে প্ৰত্যাবৰ্ত্তন কৰিবাৰ জন্য প্ৰস্তুত হইলে, শিৱাজী, ৰামদাস স্বামী প্ৰভৃতি সকলেই বিদায় দিতে আসিলেন। শিৱাজী দুঃখ প্ৰকাশ কৰিয়া বলিলেন, “মহাবীৰ সেনাপতে! আমাৰ আশা পূৰ্ণ হল না। নৌকা কূলে লেগেও ডুবে গেল। আপনি আমাৰ প্ৰবল শত্ৰু ছিলেন। আপনি অসাধাৰণ বীৰপুৰুষ! আপনি আমাৰ দক্ষিণ হস্ত হলে, দিল্লীৰ সিংহাসন দখল কৰাও অসম্ভৱ ছিল না। আমাৰ আশা পূৰ্ণ হল না! আপনাৰ সহিত যুদ্ধে কখনও পাৰব না! আমাৰ ৰাজ্যলীলা কখনও দৰ্মিত হৰে না; সে পথেৰ আপনি কষ্টক। যে উপায়ে সে কষ্টক দূৰ কৰাৰ জন্য আশা কৰেছিলাম, তা ব্যৰ্থ হল! সূতৰাং একগুণে দস্যুবৃত্তি ব্যতীত আৰ উপায় নাই।”

শিৱাজীৰ কথা শেষ হইতে না হইতেই আফজাল খাঁ তীব্ৰ চীৎকাৰ কৰিয়া

উঠিলেন। বিশ্বয়-বিস্ফারিতনেত্রে সকলে চমকিত এবং ব্যস্ত ভাবে দেখিল— শিবাজী ভীষণ ব্যাঘ্র-নখাকৃতি তীক্ষ্ণধার ছুরিকা আফজাল খাঁর বুকে আমূল বসাইয়া দিয়াছেন। সকলে ভয়ে আর্তনাদ করিয়া উঠিল! আফজাল খাঁর লোকজন প্রকৃত হইবার পূর্বেই শিবাজী এবং মাওয়ালী সৈন্যগণ মুসলমানগণকে আক্রমণ করিয়া বিপর্যস্ত এবং বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিল। বহু সন্ত্রস্ত ব্যক্তি নিহত হইলেন। হতী, অশ্ব, আসাসোটা এবং অন্যান্য সমস্ত মূল্যবান পদার্থই লুপ্তিত হইল। বাদ্যকরণ বাদ্যযন্ত্রাদিসহ ধৃত হইল।

অল্পসংখ্যক লোকই প্রাণ লইয়া বিজাপুরে প্রত্যাবর্তন করিতে সক্ষম হইল। শিবাজী অনতিবিলম্বেই আবার নামান্বানে লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন। আফজাল খাঁ এবং তাঁহার সহকারী যুদ্ধবিশারদ তেজস্বী বীরপুরুষদিগের নিধনে শিবাজী অতিমাত্রায় স্পর্ধিত এবং সাহসী হইয়া উঠিলেন। শিবাজীর ভীষণ ও তর্যাবহ বিশ্বাসঘাতকতা এবং মহাবীর আফজাল খাঁর সদলবলে নিধন-সংবাদে বিজাপুর দরবার এবং বিজাপুরের যাবতীয় অধিবাসী যার-পর-নাই শোকে মুহুমান এবং ক্রোধ ও প্রতিহিংসায় উদ্দীগু হইয়া উঠিলেন। শিবাজীর এই অমানুষিক হত্যাকাণ্ড এবং বিশ্বাসঘাতকতায় সমগ্র দক্ষিণ-ভারত চঞ্চল হইয়া উঠিল। যেখানে-সেখানে এই লোমহর্ষক এবং পৈশাচিক হত্যার নিদাক্ষণ কাহিনী একমাত্র আলোচ্য বিষয় হইয়া উঠিল।

শিবাজীর এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড এবং জ্বলন্ত বিশ্বাসঘাতকতায় দাক্ষিণাত্যের সমস্ত রাজরাজড়াই শিহরিয়া উঠিলেন। সকলেই বুঝিল, শিবাজীর অসাধা পাপকর্ম কিছু নাই!

উপসংহার

আফজাল খাঁর হত্যাকাণ্ডের পরে শিবাজী নানা দুর্গ এবং পরগণা অধিকার করিয়া ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠেন। অবশেষে বিজাপুরের প্রবল বাহিনীর বিপুল প্রতাপে শিবাজী পুনরায় পর্যুদন্ত এবং নিতান্ত হীনবল হইয়া বিজাপুরের বশ্যতা স্বীকার করেন।

এই যুদ্ধে মোতামদ খান বিশেষ পরাক্রম এবং প্রতিভা প্রদর্শন করায় মালেকা আমেনা বানু তাঁহাকে পরিণয়-পাশে আবদ্ধ করেন।

এই সময়ে দাক্ষিণাত্যে মারাঠীদিগের পুনরভ্যুত্থানের আশা সমূলে নির্মূল হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু অতীব পরিতাপের বিষয় যে, এই সময়ে ভারতেই অস্বতর্কমা উপনী সন্ন্যাসী মহাপরাক্রান্ত মহাযশঃ বাদশাহ্ আওরঙ্গজেব সমগ্র ভারতের একমুখে প্রভুত্বের লালসায় অকারণে গোলকুণ্ডা এবং বিজাপুর রাজ্যদ্বয় আক্রমণ করেন। এই দুই রাজ্য পূর্ব হইতে দিল্লীশ্বরদিগের বন্ধুতা সূত্রে আবদ্ধ ছিল এবং শাহজাহানের সময় হইতে উভয় রাজ্য 'সালানা নজরানা' দিল্লীর দরবারে পেশ করিতেন। তথাপি আওরঙ্গজেব এই উভয় রাজ্য আক্রমণ করেন।

গোলকুণ্ডা এবং বিজাপুর ক্ষুদ্র রাজ্য হইলেও সমৃদ্ধ এবং বলদৃঢ় ছিল। জ্ঞানচর্চা, শিল্পচর্চা এবং বিজ্ঞানচর্চার উভয় রাজ্যই বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। উভয় রাজ্যের সোলতান, মন্ত্রী এবং সেনাপতিগণ নিতান্ত দক্ষ ও যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। আওরঙ্গজেবের মহীয়ান চরিত্রে এবং পরীক্ষণী বীরবলতা ও দূরদর্শিতার গুণ-যশে এই উভয় রাজ্য আক্রমণ করাই হইতেছে অদূরদর্শিতা এবং স্বজাতিদ্রোহিতার দূরপনের কলঙ্ককালিমা। এই রাজ্যদ্বয় দখল করিবার জন্য তাঁহাকে প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল ভীষণ লোকহত্যা করিবার যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। মুসলমান বাদশাহ্ এবং সোলতানদিগের এই ভীষণ আত্মকলহের সুযোগে শিবাজী বাদশাহ্ এবং সোলতানদিগের এই ভীষণ আত্মকলহের সুযোগে শিবাজী অবসর বুঝিয়া বহু পরগণা ও বহু দুর্গ দখল করিয়া স্বাধীন রাজ্য পত্তন করেন। মারাঠীগণ প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া ওঠে। অবশেষে আওরঙ্গজেবকে এই মারাঠী শক্তি দমনের জন্য বিশেষ বেগ পাইতে হয়। আওরঙ্গজেব বিজাপুর আক্রমণ না করিলে, শিবাজী আর কখনও মাথা তুলিবার সুবিধা পাইতেন না। বিজাপুরের রাজশক্তিই শিবাজীকে চিরকাল দমন রাখিতে সমর্থ হইত।

ফিরোজা বেগম

ফিরোজা বেগম

' উদ্বোধন, ' ' উচ্ছ্বাস, ' ' নব উদ্দীপনা, ' ' স্ত্রীশিক্ষা, ' ' স্পেনীয়
মুসলমান সভ্যতা, ' ' সুচিন্তা, ' ' আদব কাযদা শিক্ষা, '
' তুরস্ক ভ্রমণ, ' ' তুর্কী নারীজীবন, ' ' সঙ্গীত-
সঞ্জীবনী, ' ' স্পেনবিজয় কাব্য,
' প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা—

গাজী

সৈয়দ আবু মোহাম্মদ ইস্‌মাইল হোসেন সিরাজী

(কবি সোলতান ও ওয়ায়েজল এস্‌লাম)

প্রণীত।

গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত।

১৯২৩

মূল্য ১/০ আনা

PRINTER—K. C. DASS.

METCALFE PRINTING WORKS.

34, Mechuabazar Street, Calcutta.

প্রথম পরিচ্ছেদ

শারদীয় পৌর্ণমাসী শশধরের ন্যায় নির্মল কৌমুদীজাল বিতরণ করিয়া মোসলেম-প্রতিভা-শশী কালের অলঙ্ঘনীয় নিয়মে ব্যঞ্জনিত হইয়া পড়িয়াছে। অতুলনীয় কীর্তিকিরীটিনী নগরীকুলশিরোমণি দিল্লীর প্রতাপ ও গৌরব খর্ব হইয়া পড়িয়াছে। ভুবনবিখ্যাত তৈমুরনংশে বীরচূড়ামণি বাবর, বিচিত্রকর্মা হুমায়ুন, প্রতিভাশালী আকবর, তীক্ষ্ণবুদ্ধি জাহাঙ্গীর, কীর্তিমান শাহজাহান এবং তাপস-সন্ত্রাট আওরঙ্গজেবের পরে ক্রমশঃ হীনবীর্য অদূরদর্শী বাদশাহগণ দিল্লীর তব্ধে বসিতে লাগিলেন। তাঁহাদের ব্যসন-বিলাস, অবিম্ভাচারিতা এবং উজ্জ্বল ও সেনাপতিগণের বিশ্বাসঘাতকতায় ভুবনবিখ্যাত দিল্লীসাম্রাজ্য ক্রমশঃ খণ্ড বিখণ্ড হইয়া হীনবল এবং হীনপ্রভ হইতে লাগিল।

অযোধ্যা, রোহিলাখণ্ড, সিদ্ধু, কাশ্মীর, বাঙ্গলা, হায়দ্রাবাদ, কর্ণাট, মালব প্রভৃতি বহু স্বাধীন রাজ্যের পতন হইল। এই সমস্ত রাজ্যের মধ্যে সর্বদাই যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হওয়ার সমগ্র ভারতবর্ষ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। এই সুবর্ণ সুযোগে মারাঠীরা দলবদ্ধ হইয়া শিরোস্তোলন করিল। তরবারি এবং অগ্নিমুখে তাহারা হিন্দুস্থানে এক মহাপ্রলয়কাণ্ডের সূচনা করিয়া দিল। শান্তিময় ভারত সাম্রাজ্যে মারাঠীরা বিধাতার অভিসম্পাত স্বরূপ আবির্ভূত হইয়াছিল। হত্যা, লুণ্ঠন, গৃহদাহ, বৃক্ষচ্ছেদন, শস্যদাহ, সতীত্বনাশ প্রভৃতি যত প্রকারের অত্যাচার এবং অবিচার শয়তানের মস্তিষ্কে থাকিতে পারে, তাহা সম্পূর্ণভাবেই মারাঠীদিগকে আশ্রয় করিয়াছিল। মারাঠীদিগের অত্যাচারে ভারতের সর্বত্রই 'ত্রাহি' 'ত্রাহি' আর্তনাদ উদ্ভিত হইয়াছিল। মারাঠী দস্যুদিগের নিকট ধনী-দরিদ্র, স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বৃদ্ধ, হিন্দু-মুসলমান কোনও প্রভেদ ছিল না।

সর্বত্রই তাহারা ভূমি-রাজস্বের চতুর্থাংশ (চৌথ) পাইবার জন্য ভীষণ জুলুম এবং অত্যাচার করিতে লাগিল। জগৎবিখ্যাত দিগ্বিজয়ী চঙ্গিজ খাঁর নৃশংস আক্রমণে এবং নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডে যেমন একদিন পশ্চিম-এশিয়ার মুসলমানগণ উৎপীড়িত, নিহত, লুণ্ঠিত এবং ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, আরব ও ইরান-ভূখণ্ডের বিপুল বিশাল বিমল সত্যতার আলোক-ভাগর যেমন নির্বাপিত হইয়া গিয়াছিল, ধূর্তচূড়ামণি নির্মমপ্রকৃতি মারাঠী দস্যুদলের অত্যাচার, উৎপীড়ন এবং হত্যা ও লুণ্ঠনে ভারতের বক্ষেও তেমনি ঘরে ঘরে দারুণ হাহাকার উঠিয়া গগন-পবন আলোড়িত করিতে লাগিল। এই অত্যাচার, হত্যা এবং লুণ্ঠনের মুখে হিন্দু ও মুসলমানের কোন পার্থক্য ছিল না। লুণ্ঠন করিতে করিতে মারাঠীরা তাহাদের গুরু শিবাজীর সময় হইতেই সাহসী, কৌশলী, ধূর্ত এবং নিষ্ঠুর হইয়া

পড়িয়াছিল।

এইরূপ যখন মারাঠীদিগের অত্যাচারে মন্দির ও মসজিদ চূর্ণীকৃত এবং হিন্দু ও মুসলমান উভয়ই লুপ্তিত এবং নিহত হইতেছিল, সেই সময়ে দিল্লী-লুপ্তনকারী মারাঠীদিগের বিক্রান্ত এবং রণনিপুণ সেনাপতি সদাশিব রাও এবং তাহার অধীনস্থ নায়ক, ভাস্কর পাণ্ডেদের মধ্যে দিল্লীর প্রান্তবর্তী একটি শিবিরে নিম্নলিখিত কথোপকথন হইতেছিল।

সদাশিব : কি অপরিসীম রূপ! ছবিতে যা দেখলাম, তাতেই অবাক হইয়েছি। রূপের সহিত এমন তেজের প্রভা এবং দৃঢ়তার গাভীর্য কখনও দেখা যায় না!

ভাস্কর : তা আর বলতে কি? বিধাতা নির্জনে বসে একটু একটু করে বোধ হয় যুগযুগান্ত ধরে সৃষ্টি করেছেন। বিশ্বের যে পদার্থে যতটুকু সৌন্দর্যের বিশেষত্ব এবং মাধুরী ছিল, তা তিল তিল করে কুড়িয়ে ললনা-কুল-ললামভূতা এই ত্রিলোকমোহিনী বরাননাকে সৃষ্টি করেছেন। বিদ্যুতের সহিত চাঁদের হাসি, গোলাপের সহিত কমল, কোমলতার সহিত কঠোরতা, শান্তির সহিত তেজঃ, শুভতার সহিত লালিমা, মণির সহিত কাঙ্ক্ষন, বসন্তের সহিত শরৎ, উষার সহিত সন্ধ্যার, শ্রীর সহিত বর্ণের, লাবণ্যের সহিত রূপের, মধুর সহিত সৌরভের, গাভীর্যের সঙ্গে সারল্যের, প্রেমের সহিত প্রভুত্বের একত্র সম্মিলন করে অপরূপ প্রেমপ্রতিমা এই বিশ্বমোহিনী নারীসন্তমাকে সৃষ্টি করেছেন। যে দেশে এমন নারীরত্ন অনুগ্রহণ করে, সে দেশ ধন্য! যে জাতিতে প্রতিভা ও সৌন্দর্যের এমন অপরূপ জীবন্ত নিক্রপম প্রতিমা অনুগ্রহণ করে, সে জাতিও ধন্য। এমন নারীর পিতা, ভ্রাতা, আত্মীয় হতে পারলেও গৌরব!

সদা : আর স্বামী হতে পারলে?

ভাস্কর : হায়! স্বর্গপ্রাপ্তি কোন্ ছার!

সদা : স্বর্গ! ছি! তার চরণ-তলেই শত স্বর্গ। এই স্বর্গপ্রাপ্তির জন্যই তো এত সাধ্যসাধনা। এই পরম স্বর্গকে লুপ্তন করতে না পারলে, আমাদের “বর্গী” বা “লুঠেয়া” নামটাই বৃথা।

ভাস্কর : এ যে পরম রত্ন! কত নির্জীব রত্ন লুপ্তন করেছি, আর এই সজীব রত্নকে কি লুপ্তন করতে পারব না?

সদা : কই, কোথায় পারলে? এত দিন হয়ে গেল, তবুও তো কিছু কুল-কিনারা করতে পারলে না। তার বিবাহের কথাও তো হচ্ছে। বিবাহের পরে উচ্ছিষ্ট হলে কি আমার ভোগে লাগবে?

ভাস্কর : আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। উচ্ছিষ্ট হবার পূর্বেই ভোগে লাগাব। আমার দেবতাকে কখনও উচ্ছিষ্ট ভোগ দিব না।

সদা : রোহিলাখণ্ডের পরাক্রান্ত সিংহ নজীব-উদ্দৌলার সঙ্গেই নাকি বিবাহ নির্ধারিত হয়েছে?

ভাস্কর : তাই বটে! তা হলে সিংহের সহিতই সিংহিনীর সংযোগ! নজীব-

উদ্দৌলাও পরম সুশ্রী এবং তেজীয়ায় পুরুষ ।

সদা : তার সঙ্গে তো আমাদের সন্ধি আছে । সুতরাং ফিরোজা বানুকে হরণ করলে বা ছিনিয়ে নিলে, তার সহিত যুদ্ধ অনিবার্য ।

ভাস্কর : আমরাও তো তাই চাই । সন্ধিতে আমাদের ক্ষতি । সন্ধি আছে বলেই তো রোহিলাদিগের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করতে পাচ্ছি না ।

সদা : কিন্তু রোহিলাদিগকে ঘাঁটান আর ভীমকলের চাকে আঘাত করা সমান কথা । রোহিলাদিগকে ঘাঁটালে আমাদের বিঘ্ন বেগ পেতে হবে ।

ভাস্কর : তেমন কিছু নয়, মহারাজ । রোহিলারা মহাতেজস্বী এবং বীরপুরুষ বটে; সম্মুখযুদ্ধে তারা চির জয়শীল । কিন্তু আমরা তো আর যুদ্ধ করব না । গভীর অন্ধকারে হঠাৎ তাদের উপর আপতিত হয়ে তাদের বিপর্যস্ত করে ফেলব । আর আসল কথা হচ্ছে, আমরা রোহিলাখণ্ডে না গেলে, তারাই বা কেমন করে এখানে এসে আক্রমণ করবে?

সদা : রমণী হরণ করলে, মুসলমান তার প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়বে না । সে প্রতিশোধে যতই প্রাণ বলি দিতে হোক না কেন, মুসলমান কখনই তাতে কুণ্ঠিত হবে না । এমন কি, সমস্ত ভারতেও এই অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হতে পারে । রমণীর ইচ্ছতাকে ওরা নিজের প্রাণ হতেও সহস্র গুণে শ্রেয়ঃ বোধ করে ।

ভাস্কর : এত আশঙ্কা করলে এ ভোগে লালসা না করাই সম্ভব । কি প্রয়োজন? মারাঠীদিগের মধ্যে না হয়, হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণদিগের মধ্য হতে শত শত সুন্দরী বিনা ক্রেশে বিনা ঝঞ্ঝাটে সংগৃহীত হতে পারে ।

সদা : কিন্তু অমৃতের পিপাসা কি জলে মিটে? ফিরোজাকে না পেলে তো জীবনই বৃথা । ফিরোজার ন্যায় সুন্দরী গুণবতী আর কে?

ভাস্কর : মহারাজ! গুড়, মধু, চিনি, মিশ্রী সবই মিষ্ট ।

সদা : মিষ্ট তো সবই বটে! কিন্তু তাই বলে গুড় ও মধুর মিষ্টতা তো এক নয় ।

ভাস্কর : এক তো নিশ্চয়ই নয় । কিন্তু কথা হচ্ছে, মধু খেতে গেলেই মৌমাছির হুলও খেতে হবে ।

সদা : সেইটা যাতে খেতে না হয়, অথচ মধুর চাক ভাঙ্গা যায়, এইরূপ বন্দোবস্ত করাই হচ্ছে বুদ্ধিমানের কার্য ।

ভাস্কর : সেই বুদ্ধি খাটাবার জন্যই তো এত মাথাব্যথা ।

সদা : মাথাব্যথা তো বটে, কিন্তু জিজ্ঞেস করি, মাথামুণ্ড করলে কি?

ভাস্কর : নিশ্চিন্ত হউন । সে ফন্দি এঁটেই বসে আছি ।

সদা : ফন্দিটা একবার শুনিই না কেন?

ভাস্কর : ফন্দি হচ্ছে এই যে, আপনি সেদিন নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য নজীব-উদ্দৌলার বরযাত্রী এবং বন্ধু ও হিতৈষীরূপে বিবাহে উপস্থিত থেকে আপনার হিতৈষণা এবং সৌজন্য প্রদর্শন করবেন । আমরা জাঠদিগের হস্তবশে

ক্ষিরোজ্জ্বলে হরণ করে নিব। এ জন্য আমি একদল জাঠ দস্যুরও বন্দোবস্ত করেছি। আর্পনি বরং আপনার মারাটী দেহরক্ষী সেনা নিয়ে আমাদেরকে বাধা দিবেন। দুই একটা জাঠকে কৌশলে ঘেঁষতারও করে দিব। তাদিগকে পূর্ব হতেই মৃত্যু পড়ায়ে রাখবো। তাদিগকে মুক্তিদানের অস্বীকার করলেই তারা ভরতপুরের মহারাজের সমস্ত ক্মরসাজী বলে ব্যস্ত করবে।

সদা : বাহবা ভাকর! বাহবা তোমার বুদ্ধি! তুমি যে শুধু সেনাপতি নও, পণ্ডিতও, তা যথার্থই বটে! এক টিলে দুই পানী শিকার!

ভাকর : মহারাজ! রথ দেখা এবং কলা বেচা দুটোই হবে। এই ব্যাপারে ভরতপুরের মহারাজের সঙ্গে সফদরজঙ্গের এবং তৎসঙ্গে নজীব-উদৌলার স্বয়ং বাদশাহের পর্যন্ত বিরোধ লেগে যাবে। ভরতপুরের মহারাজ আমাদের যেকোন বিকল্প আচরণ করছে, তাতে এইরূপ উপায়েই তাকে জয় করতে হবে। রোহিলাস বই তার বলি হবে।

সদা : কেন? আমরাও তো সফদরজঙ্গ এবং নজীব-উদৌলার সঙ্গে যোগ দিয়েই ভরতপুর লুণ্ঠন করবো। তাতে রোহিলাদিগের সঙ্গে আমাদের আরও সম্ভাব বেড়ে যাবে।

ভাকর : মহারাজ! এখন এ অধমের কন্দিটা পছন্দ হয়েছে তো?

সদা : তা কি আর বলতে হবে? ধন্য তোমার উদ্ভাবনী শক্তি। যাও, এখন কাজে যাও। কার্যসিদ্ধির পরে আশাতীত খেলাত!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দিল্লীর হেরেমের নিভৃত কক্ষে বাদশাহ শাহ আলম, শেখুল-ইসলাম মওলানা আমিনর রহমান, উজীর সফদরজঙ্গ, মালকের শাসনকর্তা আফতার আহমদ খান এবং মোসাহেব মালেক আনোয়ার উপস্থিত। বাদশাহ একখানি সোফায় উপবিষ্ট, আর সকলেই ঘিরদ-রদ-নির্মিত পুরু গদিবিশিষ্ট কুর্সীতে সমাসীন।

এইটি অস্তঃপুরের সন্মিলন-কক্ষ। একটি ১০১ ডালের স্বর্ণখচিত ঝাড়ে কর্পূরমিশ্রিত মোমবাতি জ্বলিয়া জ্বলিয়া উভ্র ও সুগন্ধি আলোক বিকীর্ণ করিতেছে। দেওয়ালে দুইফেননিষ্ঠ শ্বেত মর্মরের উপরে সুবর্ণের নানাবিধ চিত্র ও নকশা অঙ্কিত। সে কারুকার্য একদিকে যেমন সৃষ্টি কৌশলের অভিব্যক্তি, অন্যদিকে তেমনই পঠনপারিপাট্যের চরম পৌরবের পরিচায়ক! মধ্যখানে একটি হস্তিদন্ত এবং আবলুস কাষ্ঠনির্মিত মেজ। সে মেজের উপরে সমস্ত পৃথিবীর বিস্তৃত চিত্র সুবর্ণে অঙ্কিত। মেজের একপার্শ্বে কতকগুলি সচিত্র গ্রন্থ। দক্ষিণের দেওয়ালে জগদ্বিজয়ী বীরকুলের পৌরবকোভন মহাতেজী তাইমুরের অধারোহী কৃপাণ-পর্ণি মূর্তি! তাইমুরের চক্ষু হইতে প্রভাত-ভারকার ন্যায় বিশ্ববিজয়িনী প্রভা নির্গত

চিত্র দুইটি পাশপাশি থাকায় বীরত্ব ও জ্ঞানের প্রভাব ও পার্থক্য সুস্পষ্ট বুদ্ধিতে পারা যাইতেছে। আবার উভয়ের সম্মিলন কেমন শ্রীতিপূর্ণ আনন্দজনক এবং অপার্থিব শক্তি ও সৌন্দর্যের প্রকাশকর, তাহাও অনায়াসে বুদ্ধিতে পারা যায়। এ চিত্র প্রসিদ্ধ চিত্রকর আবসালান খানের রচিত। আওরঙ্গজেব এ চিত্রের জন্যও শত টাকা দান করিয়াছিলেন। ফলতঃ, এই দুইখানি চিত্র এমন সুন্দর স্বাভাবিক এবং শিক্ষাপ্রদ যে, দেখা মাত্রই সকলে মুগ্ধ হয়। ইউরোপের মাইকেল অঞ্জোলা বা র্যাফেলের পক্ষেও এমন ভাবপূর্ণ মহান চিত্র অঙ্কিত করা সম্ভবপর ছিল না। এই চিত্র ব্যতীত দিল্লীর অন্যান্য বহু সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর এবং বীরপুরুষের চিত্র শোভা পাইতেছে।

বাদশাহ্ শাহ আলম আলবোলা টানিতে টানিতে গৃহমধ্যে সুগন্ধি তাম্রকুটের ধূসব ধূমের কুণ্ডলী ত্যাগ করিয়া তাইমুরের চিত্রের দিকে তাকাইয়া একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তারপর একটু থামিয়া বলিলেন, “হায়! কি ভয়াবহ অধঃপতন! কি বীরত্বব্যঞ্জক প্রতিভামণ্ডিত মূর্তি! কিবা সাহস! পদভরে পৃথিবী কম্পিত! তরবারি-মুখে রক্তধারা পরিদৃশ্যমান! অশ্ব-পদাঘাতে অগ্নিস্কুলিস্ত বিকীর্ণ হইতেছে! সমস্ত পৃথিবীর রাজন্যবৃন্দ ভয়ে কম্পিত এবং করজোড়ে নজরহস্তে দণ্ডায়মান। আর আমরা?—এই ভুবনবিখ্যাত বীরবংশের সন্তান আমরা। আমাদের ভেজঃ-বীর্য, সাহস-শৌর্য কালের গর্ভে বিলীন! বিলাসব্যাসনে দেহ ক্ষীণ ও দুর্বল। মনের ভিতরে কেবলই আশঙ্কা ও ভীতি! মনুষ্যত্বহীন—চরিত্রহীন—অধ্যবসায়হীন—ধন মান রাজত্ব প্রত্যহ লুপ্ত হইতেছে। কিঙ্করেরাও মাথা তুলিতেছে। হা অদৃষ্ট! হায় বিধি! তোমার মনে কি ইহাই ছিল! অহো! সিংহের বংশে শূণাল, বনস্পতির বংশে ভৃগ এবং সম্রাটের বংশে ভিক্ষারী হইলাম। এমনি দুর্দশা যে, নিজের শরীরটা পর্যন্ত রক্ষা করিতে অক্ষম। যুদ্ধের দুলু ভিনাদে পূর্বপুরুষেরা এক দিন নাচিয়া উঠিতেন। আর আমরা বাঙ্গালীদিগের নূপুরের কনুঝু কনুঝু ধনিতে নাচিয়া উঠি। আমরা অগ্নিতে জন্মিয়া ছাই! দাহিকা-শক্তিহীন।

“অদৃষ্টের কি বিচিত্র গতি! যে মারাঠীরা দীর্ঘকাল পর্যন্ত চরণতলে পতিত ছিল, আজ তাহারাই আমাদের দণ্ডমুণ্ডের প্রভু হইয়া পড়িতেছে! হায়! যে দিল্লীর নামে জগৎ কম্পিত ছিল, আজ সেই দিল্লী দস্যুপদতলে দলিত, মথিত এবং লুপ্তিত। হা খোদা! এ লাঞ্ছনা, এ যন্ত্রণা তো আর সহ্য হয় না।” এই বলিয়া শাহ্ আলম অশ্রুপূত নেত্রে আরও একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

আফতাব : মুসলমানের প্রভাব ও প্রতিপত্তি ভারতবর্ষ হতে একেবারেই লুপ্ত হবে। এখনও যা আছে, তা'ও থাকবে না। হা খোদা! অবশেষে কি না বর্গীরা দিল্লীর ধনভাণ্ডারও লুণ্ঠন করল, বর্গীর পদচিহ্নে দিল্লী অপবিত্র হল! বাদশাহের সম্মানটুকুও রইল না! তাইমুর-খান্দানের এ অবমাননা একেবারেই অসহ্য!

সফদরজঙ্গ : আপনি বলছেন, অসহ্য! কিন্তু ভারতীয় অন্যান্য রাজা নবাবদের তো এতটুকুও টনক নড়ল না! আজ দিল্লীর অসম্মান হল, কালই অযোধ্যা,

হায়দ্রাবাদ, সিদ্ধু, বাঙ্গলা এবং কাশ্মীরের হবে। মারাঠীরা অত্যাচার হতে কেউই রক্ষা পাবে না। কিন্তু এই সমস্ত নিমকহারামের দল যদি অন্ততঃ আপনাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যও দিল্লীর তখতের সম্মান রক্ষা করতে প্রস্তুত হত, তা হলে মারাঠীদিগকে দমন করা কঠিন হত না।

মালেক : এরা একত্র হবে কি? এরা তো পরস্পর নিজেরাই যুদ্ধ-বিগ্রহে মগ্ন। কে কা'কে মেরে বড় হবে সেই চেষ্টায়ই রত! ফলে সকলেই মারা যাবে। জাতীয়তার ভাব একেবারেই বিলুপ্ত হয়েছে। খোদার কি মজী বোঝা যায় না।

শেখুল ইসলাম : খোদার মজী বুঝা যাবে না কেন? খোদাতালা তো তাঁর মজী সূক্ষ্ম করেই তাঁর কালামে বুঝিয়ে দিয়েছেন। চরিত্রহীন জাতির অধঃপতন অনিবার্য। ইহা তো খোদারই মজী। খোদা তো স্পষ্টই বলেছেন যে, 'যতদিন পর্যন্ত কোনও জাতি চরিত্রকে বিকৃত না করে, ততদিন তাদের সৌভাগ্য নষ্ট হয় না।' এক্ষণ স্পষ্ট ঘোষণার পরেও যদি আমরা চরিত্র রক্ষা করতে না পারি, তা হলে তার জন্য কে দায়ী হবে?

"চরিত্রবান হবার জন্যই ধর্মের আবশ্যিক। কিন্তু আমরা তা ভুলে গিয়েছি। সত্যবাদিতা, জিতেন্দ্রিয়তা, স্বার্থত্যাগ, ঐক্য, সখ্য, সহানুভূতি ও পরস্পরের প্রতি প্রেম, যে জাতির ভূষণ এবং নিত্যধর্ম ছিল; আজ তাদের ভিতরে কেবল অনৈক্য, হিংসা, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা এবং স্বার্থপরতাই একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেছে। কি ভয়ানক অধঃপতন! বাইরের অধঃপতন আপনারা যা' দেখছেন, ভিতরের অধঃপতন অর্থাৎ মনের অধঃপতন তার অনেক বেশী হয়েছে—সর্বান্তে হয়েছে।

"মনের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রের অধঃপতন, আর চরিত্রের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে বাইরের অধঃপতন হয়। মনের ভিতরে যেমন ভাবের, যেমন কল্পনার প্রদীপ জ্বলে, বাইরে তারই আলো পড়ে। চরিত্রের কেন্দ্র হচ্ছে মন, অথবা মনের বহির্বিকাশ হচ্ছে চরিত্র। আমরা সেই চরিত্রের বিকাশ হারিয়েছি। খোদার ইচ্ছা এবং আদেশের বিরুদ্ধে চলেছি। সুতরাং আমাদের অধঃপতন এবং দুর্গতি অনিবার্য। আমরা ধর্মকে রক্ষা করি নাই; সুতরাং ধর্মও আমাদের রক্ষা করবে না।

মালেক : কেন, আমরা ধর্ম রক্ষা না করলে ধর্ম কি আমাদের রক্ষা করতে পারে না?

শেখ : কখনই নয়। নদীতে নৌকা বাইবার সময় যেমন মানুষই নৌকাকে বহন করায় মানুষ নিজেও তৎসহ বাহিত হয়; ধর্মও ঠিক তাই। ধর্মকে রক্ষা করলে আমরাও রক্ষা পাই। নৌকা ডুবিয়ে দিলে আরোহী এবং মাঝি মাল্লা যেমন ডুবে মরে, ধর্ম ডুবাতে আমরাও তেমনি ডুবে মরি।

মালেক : কিন্তু ধর্মকে তো আমরা বুঝই মানি। কোরান ও হাদিসকে তো পূর্বের ন্যায়ই সম্মান করি। নামাজ রোজা তো আমরা ছেড়ে দেই নাই।

শেখ : কোরআন-হাদিসকে মানেন, ইহা মিথ্যা কথা। কোরান-হাদিসকে

মানলে বাসন-বিলাস, কামুকতা, মিথ্যাবাদিতা, কাপুকুশতা এবং অনৈক্য কখনই আমাদের ভিতরে প্রবেশ করত না।

“কোরআনকে যাম্মার অর্থ এ নয় যে, ভক্তির সহিত কোরআন শরীফকে মত্তকে রাধা বা চুম্বন করা। কোরআনকে মানার অর্থ এই যে, কোরআনের উপদেশ অনুসারে নিজের চরিত্রকে রক্ষা করা। নামাজ রোজার কপা যা’ বললেন, তা অনেকটা ঠিক। এখনও বহু লোকে নামাজ পড়ে ও রোজা রাখে বটে। কিন্তু তার নামাজ রোজার কোনও উদ্দেশ্য বুঝে না।

“তৌহদের তেজে তেজীযান করাই নামাজের উদ্দেশ্য। অর্থাৎ নামাজী ব্যক্তি অটুট বিশ্বাসী, সুতরাং অতুল বীর্যশালী হবে। তাঁরা অন্যায় অসত্যের প্রতি বহুদাঁপ কঠোর এবং সত্য ও ন্যায়ের প্রতি কুসুমাদপি কোমল হবেন। চরিত্রে বল ও তেজ লাভ করাই নামাজের উদ্দেশ্য। রসান দিলে স্বর্ণের বর্ণ যেমন উজ্জ্বল হয়, নামাজও মুসলমানের চরিত্রকে তেমনি উজ্জ্বল এবং প্রভামণ্ডিত করবে। কিন্তু আজকাল দেখা যায়, অনেক মুসল্লী নীচমনা, স্বার্থপর, হিংসুক ও কাপুকুশ। তাঁরা নামাজের অর্থ বা উদ্দেশ্য কিছুই অবগত নয়। অনেকে শুধু লোক দেখাবার জন্য নামাজ পড়েন।

“রোজা মুসলমানকে সংযম ও সহানুভূতি শিক্ষা দেয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের চরিত্রে সংযম ও লোকহিতৈষণা বা সহানুভূতির একান্তই অভাব হয়েছে। রোজা ও নামাজ আমাদের একটি ফ্যাসান এবং পদ্ধতি হয়ে পড়েছে। রোজা নামাজের দ্বারা চরিত্রে সংযম ও পরাক্রম লাভ করতে হবে, তা আমরা ভুলে গিয়েছি। নৌকায় বা যানে উঠে কেউ যদি নিজের গন্তব্য পথ ভুলে যায়, তা হলে সে যেমন আরও বিপাকে পড়ে, রোজা নামাজের উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য না রাখায় আমাদেরও তেমনি সর্বনাশ হচ্ছে। চরিত্রের উন্নতিই হচ্ছে যে একমাত্র ধর্ম, তা যেন আমরা ভুলে না যাই। এর উপরেও আরও একটি পরম ও চরম কর্তব্য আছে। তাই হচ্ছে ইসলামের বিশেষত্ব।

মালেক : তা কি?

শেখ : তা হচ্ছে সর্বদা সজ্জবদ্ধ থেকে সকল বিষয়ে ইসলামের প্রাধান্য রক্ষা করা।

সফদর : তবে তো আমরা ইসলাম হতে বহু দূরে সরে পড়েছি!

বাদশাহ : নিশ্চয়ই। সরে পড়েছি বলেই তো আজ এই দুর্দশা। কাঠ পচে গেলেই তাতে পোকা ধরে। তাজা কাঠে পোকা ধরে না। পানি পচে গেলেই তা হতে দুর্গন্ধ নির্গত হয় এবং শৈবাল জন্মে। নির্মল বিত্ত জলে দুর্গন্ধও হয় না এবং শৈবালও জন্মে না। তেমনি চরিত্রবান জাতিতে কখনও অধঃপতনের ঘূর্ণ ধরে না, তাদের মধ্যে দুর্গতির শৈবাল জন্মগ্রহণ করে না।

এমন সময় বাদশাহ শাহ আলমের শ্যালক আফসার-উদ্দৌলা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সালাম এবং সাদর সম্বোধনের পরে সকলেই সোৎসুক

চিন্তে তাঁহার কথা শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

বাদশাহ : কতদূর কি হল? কেমন বুঝলেন?

আফসার : কি আর বুঝব, সকলই পরিশ্রম। বাঙ্গলার নবাব আলৌদ্দীন বাঁ পীড়িত—উদরী রোগে আক্রান্ত। তিনি গভীর দুঃখ ও সহানুভূতি প্রকাশ করলেন। কিন্তু বেচারী দীর্ঘকাল পীড়িত—কি করে মহাসময়ের আয়োজন করেন। অযোধ্যার সুজা-উদ্দৌলা মারাঠীদিগের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ। তিনি যুদ্ধবিগ্রহের নামে ভীত এবং সঙ্কুচিত। কিছুতেই তাঁকে সম্মত করিতে পারলাম না। হায়দ্রাবাদের নিজামও অসম্মত।

বাদশাহ : সিক্কুর আমীর?

আফসার : তিনিও সম্পূর্ণ উদাসীন। তিনি কেবল নিজ রাজ্য রক্ষার জন্যই ব্যস্ত। রোহিলাদিগের অর্থাভাব সত্ত্বেও তারা জেহাদে যোগ দিতে প্রস্তুত। কিন্তু এই বিরাট ব্যাপারে শুধু রোহিলাদিগের সাহায্যে কি হবে?

বাদশাহ : হায় ইসলাম! তোমার আজ এই অসম্মান! মুসলমানের আজ কি ভীষণ পরিণতি!

শেখ : আমাদের কল্পনা ও আশা বর্তমান অবস্থায় অসম্ভব।

সফদর : দেখছি মারাঠীরাই ভারতের সার্বভৌম প্রভু হবে।

বাদশাহ : বৃথা পরিশ্রম! বৃথা পরিশ্রম! অদৃষ্টের ভীষণ পরিহাস!!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

উজীর সফদরজানের বাড়ীখানি আজ নয়নমোহন সাজে সজ্জিত। পত্রে-পুষ্পে, আলোকে এবং ধ্বজপতাকায় শ্বেতমর্মরনির্মিত বিরাট প্রাসাদ, প্রাসঙ্গ ও রাস্তা সুশোভিত ও সজ্জিত। ফটকের উপরের নহবতে মধুর শাহানা সুরে রওশনচৌকি বাজিতেছে। সেকরুপ মধুর বাজানা দিল্লী ব্যতীত আর কোথায়ও সহজে সম্ভবপর নহে। লাল, নীল, সবুজ, হলুদ, বেগুনে, শ্বেত প্রভৃতি নানাবর্ণের অর্ধচন্দ্রাচিত রেশমী পতাকা, সহস্রে সহস্রে উড্ডীয়মান হইয়া চমৎকার শোভার সৃষ্টি করিতেছে।

পথের মধ্যে মধ্যে নানা শ্রেণীর পুষ্প-পত্রসংবৃত্ত তোরণাবলী রচিত হইয়া পরম শোভা বিস্তার করিতেছে। হাজার হাজার নানাবর্ণের ফানুস এবং কন্দিল জ্বালাইয়া বাটী এবং পথ-ঘাট আলো করা হইয়াছে। রাজপথের দুই পার্শ্বে দশ দশটি করিয়া হিন্দু এবং মুসলমানদিগের জন্য সুসজ্জিত সুন্দর রমণীর আহার-আশ্রম খোলা হইয়াছে। বহুসংখ্যক লোক দিবারাত্র উৎকৃষ্ট পান ও ভোজনে রসনার পরিভূক্তি সাধন করিতেছে। আটটি পান ও আতরের আড্ডা বসান হইয়াছে। সন্ধ্যা পর্যন্ত যাহার যত ইচ্ছা নানা নানা প্রকারের মিঠাই মণ্ডা, রসকরা,

গোদা, মোরঝা, হালুয়া, কীর, কুটি, কাবাব, কোফতা, লাডু দোকানে বসিয়া বিনামূলো খাইতে পারিবে।

রাজপথগামী যে-কোনও লোককে আদর করিয়া ডাকিয়া বসাইবার জন্য কয়েকজন উচ্চশ্রেণীর কর্মচারী নিযুক্ত আছেন। বসিবার জন্য উৎকৃষ্ট মূল্যবান কাপেট চৌকির উপর বিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে। খাদেমগণ পরম যত্নে আগমুকদিগকে উৎকৃষ্ট মিষ্টান্ন প্রদানে তাহাদের মুখ মিষ্ট এবং উদর পূর্তি করিতেছেন। পানওয়ালারা রাশি রাশি উৎকৃষ্ট সুগন্ধি পান তৈয়ার করিয়া সোনার তবকে মোড়াইয়া নানা আকারের ঝাঙ্কায় সাজাইয়া রাখিয়াছে।

আন্তর'গণ প্রত্যেক লোকের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুক-শিশিতে উৎকৃষ্ট গোলাবী আতর ডরিয়া হাজার হাজার সাজাইয়া রাখিয়াছে। যাহার ইচ্ছা, সেই এক শিশি তুলিয়া লইয়া যাইতেছে।

যথাসময়ে রোহিলাখণ্ডের সর্দার-পুত্র তেজিয়ান্ ও পরম শ্রীমান যুবক নজীব-উদ্দৌলা বহু বরযাত্রীসহ হস্তিপৃষ্ঠে সুবর্ণ হাওদায় চড়িয়া আগমন করিলেন। কতিপয় রোহিলা সামন্ত ও যুবক অত্যুৎকৃষ্ট আরবীয় অশ্বে আরোহণপূর্বক জাঁকজমকের সাথে আগমন করিলেন। ঘোড়াগুলির গঠনভঙ্গিমা এবং চলনের কারদা দেখিয়া সকলেই প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

যাহা হউক, নওশাহ্-এর আগমানে বাদ্যকরগণ মহোৎসাহে বাদ্য বাজাইতে এবং মালাকরগণ সহস্র সহস্র আতশবাজী পোড়াইতে লাগিল। তোপটিগণ ক্রমাগত একশত একটি তোপধ্বনি করিল।

সফদরজঙ্গ এবং তাঁহার আশ্রয়-স্বজন পরম সমাদরে যথানিয়মে বর এবং বরযাত্রীগণকে লইয়া বিবাহসভায় বসাইলেন। অনন্তর নানা প্রকার চর্বা, চুষা, লেহা, পেয় প্রভৃতি লজ্জ ও নফিস্ খানা দ্বারা সকলকে পরিতৃপ্তিপূর্বক ভোজন করাইলেন। ভোজনান্তে যথারীতি ইসলামী কারদা অনুযায়ী উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন করা হইল। বিবাহান্তে আবার বাদ্যধ্বনির উচ্চ শব্দে এবং অবিরাম তোপ ও বোমের গর্জনে দিগ্বলয় কম্পিত হইতে লাগিল। নানা শ্রেণীর বিচিত্র আতশবাজীর অগ্নিক্রীড়ায় নভোমণ্ডল আলোকিত এবং সমবেত জনমণ্ডলী পরম পুলকিত হইলেন।

বিবাহান্তে দিল্লীর প্রসিদ্ধ বাঈজীদিগের নাচের বন্দোবস্তের উপক্রমেই মওলানা আমিনর রহমান এবং আরও কয়েকজন ধর্মতীক্ষু বৃদ্ধ লোক উঠিয়া যাইবার উপক্রম করিলেন। কেহই তাঁহাদিগকে উঠিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন না। তখন নজীব-উদ্দৌলা নিজেই তাঁহাদিগকে উঠিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মওলানা বলিলেন, “বাবা! দেখছ না বাঈজীরা সব এসে হাজীর। এমন ঘৃণিত ও হারাম দৃশ্য কেমন করে দেখব?”

নজীব : আপনি একেলা উঠে গেলে আপনি মাত্র পাপ হতে বাঁচলেন, কিন্তু অবশিষ্ট লোকের এই মহাপাপ দৃশ্য দর্শন হতে বাঁচবার কি উপায় করলেন?

তাদের পাপের জন্য আপনি কি দায়ী হবেন না?

মওলানা : আমি আর কি করব?

নজীব : কেন, আপনি নিষেধ করুন। সকলকে হেদায়েত করুন। বুঝিয়ে দিন যে, একরূপ নৃত্যগীতেই আমাদেরকে ইহলোকে ধ্বংসের আর্বেতে এবং পরলোকে জাহান্নামে নিয়ে যাচ্ছে।

মওলানা : আমার কথা কে শুনবে?

নজীব : সকলেই শুনবে। এমন কোন্ পাষণ্ড আছে যে, ধর্মের উপদেশ অস্বতঃ কিছুকালের জন্যও প্রতিপালন করবে না? আপনি এবং আপনার সঙ্গী আলেমগণ আল্লাহর প্রতি তওয়াঙ্কা রেখে একবার তেজস্বিনী রসনায় অনলময়ী বাণীতে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করুন; দেখবেন সকলেই এর অপকারিতা স্বীকার করবেন। আমি আপনার সাহায্য করতে সর্বদা প্রস্তুত আছি, আপনি মোহেরবানি করে ওয়াজ ফরমাতে আরম্ভ করুন।

নজীব-উদ্দৌলার অনুরোধ এবং প্ররোচনায় শেখুল ইসলাম মওলানা আমিনর রহমান সাহেব সভায় দণ্ডায়মান হইয়া গুরু-গম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন, “ভ্রাতৃবৃন্দ! আমাদের কতদূর অধঃপতন হয়েছে চিন্তা করুন! আল্লাহ এবং রসুলের আদেশ এবং উপদেশকে আগ্রাহ্য করে অদ্য আমরা পবিত্র উদ্বাহক্রিয়ায় ঘৃণিত-চরিত্রা নর্তকীদিগের অশ্লীল নৃত্য দেখবার নিমিত্ত সোৎসাহে বসে আছি! এই অশ্লীল নৃত্য-গীতে আমাদের যুবকদিগের মনে উত্তেজনা এসে প্রথমতঃ, তাদের মস্তিষ্ক বিকৃতি এবং দেহের ক্ষয় সাধন করে। দ্বিতীয়তঃ, তাদের মনে চাঞ্চল্য এবং তারল্য জন্মিয়ে দেয়। তৃতীয়তঃ, যারা পরস্পর একত্র হয়ে এই প্রকার ঘৃণিত গীতবাদ্য শ্রবণ করে, তারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি ভক্তিহীন এবং বেহায়া বা নির্লজ্জ হয়ে ওঠে। চতুর্থতঃ, যারা দেখে তাদের মধ্যে অল্পবিস্তর এই সমস্ত কুৎসিত সঙ্গীত এবং নৃত্যের অশ্লীল ভঙ্গিমার আলোচনা হয়, তার ফলে অনেকের চরিত্র একেবারেই নষ্ট হয়ে যায়।

“ফলতঃ এই শ্রেণীর গান-বাজনা, বিলাসিতা ও ব্যসনের প্রধান অঙ্গ। এই শ্রেণীর পাপের পরাক্রমেই আমাদের জাতির ভিতরে হতে সহিষ্ণুতা, তেজস্বিতা, বীর্যবস্তা একেবারে লোপ পেয়েছে। যদি আমাদের পূর্বপুরুষেরা এই সমস্ত বিষয়ে দেখতেন, তা হলে তাঁরা নিশ্চয়ই আমাদের মৃত্যুকামনা করতেন।

“ভ্রাতৃবৃন্দ! আপনারা এখন সাবধান হউন! তওবা করে এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করুন। একরূপ পাপের ফলে আমাদের আরও ধ্বংস এবং অধঃপতন হওয়া স্বাভাবিক। যারা একদিন পৃথিবী হতে এই শ্রেণীর সমস্ত কদাচার, পাপাচার ও অশ্লীলাচারকে নির্মূল করেছিলেন, আজ তাঁদেরই বংশধরদিগের মধ্যে এইরূপ পাপকার্যাদি বর্ষাসমাগমে তুণ্যের ন্যায় বেড়ে উঠছে। কি শোচনীয় অধঃপতন! কি ভয়াবহ ব্যাপার! কি ঘৃষিত পরিণতি!

“আওরঙ্গজেবের সময়ে যে দিল্লীতে একটিমাত্র বাঈজী বা রূপজীবিনী ছিল

না, আত্ম ওধায় সাধ চারশত পঞ্চাশত নগরবাসীদিগের ধর্ম, মনুষ্যত্ব, নীতি একেবারে চৰণ করছে। আজ এই পবিত্র বিবাহ-সভায় যেখানে বর ও পাত্রীর সম্মুখে সংযম, সাধুতা এবং শ্রীলতার আদর্শ স্থাপন করা কর্তব্য ছিল, তার পরিবর্তে তাদের সম্মুখে অশ্রীলতার কি বিঘাট ও উলঙ্গ অভিনয়!”

মওলানা সাহেব এই পর্যন্ত বলা মাত্রই অনেকেই তওবা পড়িতে লাগিলেন। অনেকেই চীর্ণনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। অনেকেই বলিয়া উঠিলেন, “এইরূপ পাপাচারেই তো ধ্বংস হলাম।”

উল্লীর সফদরজঙ্গল লজ্জায় নতবদন হইলেন। বাঈজীর দল তখন তখনই বিদায় লাভ করিল। স্থির হইল, পর দিবস বিবাহের উৎসব সম্পন্ন করিবার জন্য সৈন্যদিগের কৃত্রিম যুদ্ধ এবং প্রসিদ্ধ পাহলোয়ানদিগের কুস্তি হইবে। এই নির্দোষ আয়োজনের ব্যবস্থায় মওলানা সাহেব সন্তুষ্ট হইলেন। অন্যান্য সম্ভ্রান্ত মণ্ডলী এবং রোহিলা প্রধান ও সর্দারবর্গ আনন্দ প্রকাশ করিলেন। রাত্রি প্রভাতেই কৃত্রিম যুদ্ধ এবং মল্লযুদ্ধের বন্দোবস্ত ঠিক হইয়া গেল। তখন নজীব-উদৌলা শ্বিতহাস্যে মওলানা সাহেবের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, “দেখলেন হজরত! আপনাদের সামান্য উপদেশে এবং সামান্য দৃঢ়তার কত বড় বড় পাপ এবং কদাচার কত শীঘ্র বিলুপ্ত হতে পারে! চাই একটু মনের বল এবং হেদায়েত করবার ইচ্ছা।”

মওলানা সাহেব বলিলেন, “বাবা! আপনার মঙ্গল হোক! খোদা আপনার ইমান এবং হিম্মতকে মজবুত করুন।”

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বরযাত্রীর দল বিবাহের পর-দিবস আহাৰাভে ফিরোজা বেগমকে লইয়া রোহিলাবাদের দিকে রওয়ানা হইলেন। সফদরজঙ্গলের বহুবর্গ, বাদশাহ শাহ আলম, মারাঠী সেনাপতি সদাশিব রাও এবং দিল্লীর অন্যান্য আর্মীর রইসগণ যে-সমস্ত বহুমূল্য উপঢৌকন দান করিয়াছিলেন, তৎসমস্ত এবং তদ্ব্যতীত সফদরজঙ্গলের নিজ প্রদত্ত অনেক মূল্যবান আসবাবপত্র, যথা—হস্তিদন্তনির্মিত ৪ খানি কুর্সী, সুবর্ণনির্মিত আভরদান, গোলাবশাল, স্বর্ণ ও রৌপ্যনির্মিত নানা শ্রেণীর রেকাব, পেয়ালা, জাম, তশতরী, পানদান, আকলুস কাঠের বাত্র, চন্দন কাঠের পালঙ্ক, কাশ্মীরে নির্মিত জরীজড়োয়া পাপড়ী, বোখারায় নির্মিত সুবৃহৎ দর্পণ, বৃহৎ মুক্তার হার, লাহোরে নির্মিত সুবর্ণখচিত কার্পেট, দামেস্কে নির্মিত হীরকের বাটবিশিষ্ট তরবারি এবং একটি বিচিত্রি কৌশলময় বৃহৎ গটিকায়ত্র প্রভৃতি মূল্যবান উপহার এবং তাহার হেফাজতের জন্য একদল সৈন্য সহ নজীব-উদৌলা আনন্দ-উৎফুল্লচিত্তে স্বদেশাভিমুখে চলিলেন।

সদাশিব রাও প্রত্যাগমনের জন্য নজীব-উদৌলার সঙ্গে সঙ্গেই গমন

করিলেন। সন্ধ্যার পরে বরযাত্রীর মিছিল আরামপুর অতিক্রম করিয়া একটি বিশাল প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে চলিতে লাগিল। কিয়দূর মাঠ অতিক্রম করিবান পরই নিবিড় বন। গুরুপক্ষের 'তৃতীয়'র কীর্ণ জ্যোৎস্না বনের অন্ধকার দূর করিতে সমর্থ নহে দেখিয়া, মশালটীরা বৃহৎ বৃহৎ মশাল প্রজ্জ্বলিত করিয়া বনভূমি আলোকিত করিয়া ফেলিল। সাবধানে সকলেই সেই বনভূমি অতিক্রম করিল। বন অতিক্রম করিয়া সকলেই হর্ষোৎফুল্ল মনে গমন করিতে লাগিল।

জঙ্গল অতিক্রম করিয়াই একটি প্রকাণ্ড দীঘি। দীঘির পাড়ের নীচ দিয়াই শাহী রাস্তা। দীঘির ধারে উপস্থিত হওয়া মাত্রই একদল অশ্বারোহী জাঠ দস্যু ভীষণবেগে অতর্কিত অবস্থায় বরযাত্রীদের উপরে যাইয়া মার মার করিয়া পতিত হইল। সহস্রাধিক দস্যুর সহিত একশত সৈন্য ভীষণ বিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিল। বরযাত্রীর দল গাফেল ছিল বলিয়া অনেকেই বিক্রান্ত এবং হতভম্ব হইয়া পড়িল। সর্দারগণ অল্পপাণি ছিলেন বলিয়া বেগমের পাণ্ডী রক্ষার জন্য দ্রুতবেগে তথায় ধাবিত হইলেন।

নজীব-উদ্দৌলা হস্তিপৃষ্ঠে থাকিয়া তরবারিযোগে যুদ্ধ করা অসম্ভব বলিয়া লক্ষ প্রদানপূর্বক একটি দস্যুর উপরে পতিত হইয়া মুহূর্তমধ্যে তাহার শিরশ্ছেদন করতঃ তাহার অঙ্গে আরোহণ করিয়া দস্যুদলকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিল। নজীব-উদ্দৌলা এবং তাহার সঙ্গীয় কয়েকটি যুবক ভীষণ পরাক্রম প্রদর্শন করিয়া দস্যুদিগকে নিহত করিতে লাগিলেন।

নজীব-উদ্দৌলা এবং তাহার সঙ্গিগণ কেহই বর্মমণ্ডিত ছিলেন না, সুতরাং সকলেই গুরুতররূপে আহত হইলেন। অনেকে বিপাকে বিঘোরে পড়িয়া নিহত হইলেন। জিনিসপত্র সমস্তই লুপ্তিত হইল। দস্যুদিগের মধ্যে প্রায় ৩০ জন নিহত হইয়া লুপ্তনকেদ্রেই পতিত হইল। নজীব-উদ্দৌলা গুরুতররূপে আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আঘাত পাইয়া তিনি মূর্ছিত হইয়া পড়েন।

দস্যুগণ চলিয়া যাইবার পরে তাহারা জীবিত এবং সচেতন ছিল, তাহারা মশাল জ্বালাইয়া সকলের অনুসন্ধান করিতে লাগিল। সকলকেই মৃত বা জীবিত অবস্থায় পাওয়া গেল। কিন্তু হায়! কিরোজা বেগমের কোনই সন্ধান হইল না। তাহার পাণ্ডীর বাহকেরা বলিল যে, দস্যুরা তাঁহাকে পাণ্ডীসহ বহন করিয়া লইয়া গিয়াছে। অল্প সময় মধ্যেই এ সংবাদ সর্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িল। দিল্লী এবং রোহিলাখণ্ডে হাহাকার পড়িয়া গেল। নজীব-উদ্দৌলা পৃথিবী অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন! হিন্দুস্থানের মুসলমানদিগের মধ্যে ভীষণ আতঙ্ক ও উত্তেজনার সঞ্চার হইল।

কিরোজা বেগম তৎকালে সৌন্দর্যের জন্য সর্বত্রই বিখ্যাত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি যেমন রূপবতী, তেমনি বিদূষী ছিলেন। পারস্য ভাষায় তিনি বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে সকলেই "মুনশী ফাজেলা" বলিয়া অভিহিত করিতেন। শাহ আলম তাঁহাকে নিজের কন্যার মত ভালোবাসিতেন। তাঁহার মধুর চরিত্র, নির্মল রূপ, অপূর্ব গঠনভঙ্গিমা, প্রগাঢ়

হর্মভাব এবং তাঁহার সরস কবিতা পাঠে দিল্লীর সকলেই মুগ্ধ ছিলেন।

চতুর্দিকে ফিরোজা বেগমের অনুসন্ধান হইতে লাগিল। অনেকেই সিদ্ধান্ত করিল যে, এই লুণ্ঠন ও হরণ ব্যাপারটা মারাঠীদিগের দ্বারাই সম্পাদিত হইয়াছে। কিন্তু সকলেই বলিলেন যে, আক্রমণকারীরা জ্ঞাঠ ছিল। সদাশিব রাও যে কয়েকটি দস্যুকে বন্দী করিয়াছিল, তাহারা জ্ঞাঠ ছিল। তাহাদিগকে মুক্তি দিবার প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় তাহারা প্রকাশ করিল যে, ভরতপুরের রাজাই এই লুণ্ঠনের কারণ। তাঁহার আদেশেই তাঁহার সৈনিকেরা রাতহানা দিয়া অতর্কিত অবস্থায় ফিরোজা বেগমকে লুণ্ঠিয়া লইয়াছে।

ইতিপূর্বে যখন মারাঠীরা ভরতপুর আক্রমণ করিয়াছিল, তখন ভরতপুরের রাজা ছত্রসিংহ রোহিলাদিগের নিকট এবং বাদশাহ্ শাহ্ আলমের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কিন্তু রোহিলা বা বাদশাহ্ কেহই ছত্রসিংহকে কিছুমাত্র সাহায্য করিয়াছিলেন না। সেই রাগেই ছত্রসিংহ রোহিলাদিগকে জব্দ করিবার জন্য ফিরোজা বেগমকে হরণ করিয়া লইয়াছে। সদাশিব রাও বিশেষ সহানুভূতি দেখাইয়া বলিলেন, “ইহা নিশ্চয়ই জ্ঞাঠদিগের কার্য। মারাঠীরা কখনও রোহিলা সর্দারের পুত্রবধু হরণ করিবেন না। মারাঠীদিগের কোনও দলই সেদিন কোথায়ও লুণ্ঠনে বহির্গত হয় নাই।”

সফদরজঙ্গ, নজীব-উদ্দৌলা এবং বাদশাহ্ স্বয়ং নানা স্থানে সুদক্ষ সন্ধানীদিগকে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু কোথায়ও কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না। ভরতপুরেও অনেক গুপ্তচর পাঠান হইল। কিন্তু হায়! কেহই কোনও খবর আনিতে পারিল না। ভরতপুররাজ লোকমুখে এবং জনশ্রুতি-পরম্পরা তাঁহার সম্বন্ধে ফিরোজা বেগমের হরণের কলঙ্কারোপ শুনিয়া দিল্লীস্বরকে এক পত্র লিখিলেন।

। পত্র ।

মহামহিমাবিত দিল্লীস্বর!

সহস্র সহস্র সালাম এবং কুর্ণিশ পর কৃতান্তলিপুটে বিনীত নিবেদন এই যে, অকারণে আমার প্রতি ফিরোজা বেগমের হরণের কথা বিশ্বাস করিতেছেন। আমার শত্রুরাই এই অলীক কলঙ্কালিমা আমার মস্তকে নিক্ষেপ করিবার চেষ্টা করিতেছে। এ অধীন দ্বারা এমন পাপকার্য কদাপি অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। আমি এই ঘটনার বিন্দুবিসর্গ পর্যন্ত অবগত নহি। অধুনা লোকমুখে শুনিতে পাইয়া মর্মান্তিক ক্রেশ ভোগ করিতেছি। দাসকে আর বৃথা সন্দেহ করিবেন না। দাস এখনও দিল্লীপতিকেই ভারতপতি বলিয়া মনে করে। পত্রের অপরাধ মার্জনা করিতে মর্জি হয়।

শাহানশাহের কৃপাভিচারী

ছত্রসিংহ,

ভরতপুর।

এই পত্র পাইয়া নজীব-উদ্দৌলা এবং শাহ আলম বলিলেন, “ইহা কদাপি ভরতপুরের কার্য নহে। ছত্রসিংহ চরিত্রবান এবং ধার্মিক। ইহা নিশ্চয়ই কোনও-না-কোনও মারাঠীদলেরই কার্য। তাহারা ব্যতীত এমন কার্য আর কাহারও দ্বারা সম্ভবে না।”

কিন্তু সদাশিব রাও বলিলেন, “ইহা নিশ্চয়ই জাঠদিগের কার্য। তাহা না হইলে ‘মাচার উপরে কে রে?’ তার উত্তর ‘আমি কলা খাই না।’ এরূপ গটনা ঘটিলে কোনও কারণ নাই। ভরতপুরপতি ছত্রসিংহ গায়ে পড়িয়া নিজেই নিজের দোষ কালন করিয়াছেন। আমরা তো তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি নাই যে, তিনি পত্র লিখিয়া নিজের সাক্ষ্যই গাহিবেন। অযাচিতভাবে এই পত্র লেখাতেই তাঁহার অপরাধ প্রতিপন্ন হইতেছে।”

অতঃপর সফদরজঙ্গ এবং বাদশাহের প্রেরিত কয়েকজন গুপ্ত-সহানীকে অর্থ দ্বারা বশীভূত করিয়া, সদাশিব রাও সন্ধান দেওয়াইলেন যে, ফিরোজা বেগম ভরতপুর-প্রাসাদেই আছে। এইরূপ ষড়যন্ত্রের ফলে বাদশাহ এবং সফদরজঙ্গ ক্রমশঃ বিশ্বাস করিলেন যে, ইহা ভরতপুর-রাজ্যেরই কার্য। কিন্তু নজীব-উদ্দৌলা কিছুতেই তাহা বিশ্বাস করিলেন না। তবে কঠোরভাবে প্রতিবাদও করিলেন না।

পরামর্শ ঠিক হইল যে, ভরতপুর আক্রমণ করিয়া ফিরোজাকে উদ্ধার করিতে এবং ছত্রসিংহকে কঠোর শাস্তি প্রদান করিতে হইবে। সদাশিব রাও সর্বপ্রকারে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেন। সুতরাং ভরতপুর আক্রমণে “সাজ সাজ” রব পড়িয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সেতারার সুসজ্জিত একটি প্রাসাদে ফিরোজা বেগমের বাসের বন্দোবস্ত হইয়াছে। ফিরোজা বেগমের নাম লক্ষ্মীবাই রাখা হইয়াছে। তাহার সেবার জন্য উপযুক্ত সংখ্যক দাসদাসীর বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। সুখ-সুবিধার জন্য কোনও ক্রটি নাই। কিন্তু হায়! বন্দীর মনে আবার সুখ কবে? স্বাধীন বন-বিহারী বিহঙ্গকে বহু যত্নে সুবর্ণ-পিঞ্জরে আবদ্ধ রাখিলে এবং পৃথিবীর নানা দেশের সুরসাল ও সুললিত ফলমূল দান করিলেও, তাহার প্রাণে অশান্তি এবং আত্মগ্যানি কখনও বিন্দুমাত্রও দূর হয় না।

আর মানুষ—জীবশ্রেষ্ঠ মানুষ, তাহার মধ্যে কোমলপ্রাণা রসবতী চরিত্রবতী যুবতী—তাহার জীবনের উচ্ছ্বসিত প্রেম-প্রবাহ যাহা শুধু পতির উদ্দেশ্যে মাত্র সঞ্চিত হইয়াছিল, কিন্তু প্রবাহিত হইবার সময় পায় নাই, তাহার অন্তর্বেদনার কে ইয়ত্তা করিবে? একে বিরহবেদনা, তাহার উপর বন্দীদশায় হীনতার জ্বালা, তদুপরি ধর্মনাশের আশঙ্কা। দারুণ দুঃখিত্তা এবং উদ্বেগে ফিরোজা বেগম বসন্তের

কীটদঃ মধর লড়িকার ন্যায় দিন দিন মলিন হইতে লাগিলেন । কর্দমে পতিত পশ্চের ন্যায়, রাঙ্গণ্ড চক্রেব ন্যায়, ধূমাঙ্কন বহ্নির ন্যায় একান্ত বিমনায়মানচিস্ত হইয়া পড়িলেন ।

মুরলা নামক একটি পরিচারিকা নিতান্ত চতুর এবং সুন্দরী ছিল । ফিরোজার সম্বাবহারে সে ক্রমশঃ ফিরোজার প্রতি একান্ত ভক্তিমতী এবং সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া পড়িল । মারাঠীরা তাহাকে মালব দেশ হইতে বন্দী করিয়া আনিয়াছিল; আনিবার পরে একটি ভৃত্যের সহিত বিবাহ দিয়াছিল । কিন্তু সে বিবাহের পরেই অল্পদিন মধ্যেই বিধবা হইয়াছে । ফিরোজার মনোমোহিনী দেবীদুর্লভ পরমা শ্রী, মধুর জায়া এবং সম্বেহ ব্যবহারে মুরলা এমনি মুগ্ধ হইয়া পড়িল যে, ফিরোজার সেবা করিতে পারিলেই পরমানন্দ লাভ করিত । ক্রমে সে ধাণ ঢালিয়া জলবাসিতে বাসিতে ফিরোজা-গত-চিস্ত হইয়া পড়িল ।

সে আনন্দের সহিত ফিরোজার রক্তকমলনিব্দিত হস্তপদ টিপিয়া দিত । ফিরোজার দুঃখে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিত । ফিরোজার সহিত মুক্তির উপায় অনুসন্ধান করিত । সেই যমদূতের ন্যায় প্রহরী-প্রহরিত বাটী হইতে নির্গত হইয়া কিরূপে দিল্লী গমন করিতে পারে, সে-বিষয়ে কত রজনী বিন্দ্র অবস্থায় পরামর্শ করিত । মুক্তির জন্য কত রূপ কল্পনা-জল্পনা করা হইল । কিন্তু কিছুই কূল-কিনারা হইল না । কোনও উপায় উদ্ভাবিত ও নির্দিষ্ট হইল না ।

ইহার মধ্যে ঘোষিত হইল যে, সদাশিব রাও আর কয়েক দিনের মধ্যেই দিল্লী হইতে সেতারায় আসিবেন । দালান-কোঠার চূণকাম হইতে লাগিল । বাগান ও বৃক্ষবাটিকা সকল পরিষ্কৃত হইতে লাগিল । রাজবাটীর সকলেই প্রফুল্ল হইয়া উঠিল । এ-সংবাদ অবশেষে মুরলা কর্তৃক ফিরোজা বেগমেরও গোচরীভূত হইল । ফিরোজা শিহরিয়া উঠিলেন । ভূমিতে মস্তক লুটাইয়া আত্মাহ্বর দরগার সেজদা করিলেন । তাহার পর অশ্রুপূর্ণ আঁখিতে মোনাজাত করিলেন :

“হে আত্মাহ্ব! হে আমার প্রভু! তুমিই ধর্ম ও ন্যায়ের রক্ষাকর্তা । হে এলাহি! কাকেরের হস্ত হতে আমাকে উদ্ধার কর । আমার ধর্ম ও সতীত্ব রক্ষা কর । হে প্রভু! তোমার অসাধ্য কর্ম কিছুই নাই । তুমি হজরত ইউনুসকে মৎস্যের উদর হতে, ইব্রাহীমকে অগ্নিকূণ্ড হতে, হজরত মুসাকে দরিয়া হতে রক্ষা করেছ । প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে তুমি অনন্ত কোটি জীবজন্তুকে লক্ষ লক্ষ বিপদ, মহিবত এবং লক্ষ প্রকারের অধঃপতন ও পাপ হতে রক্ষা করছ । তোমার মহিমা ও কৌশল অপরিসীম ।

“হে মালেক! তোমার এই ক্ষুদ্র ও অধম বাসীকে বন্দি হতে মুক্ত কর । তুমি পরমপিতা, পরমবন্ধু এবং পরমহিতৈষী! কীটাণুকীট আমি, হীনতম দাসী আমি, অধমাদপি অধম আমি, আমি তোমার দয়ার ভিচারী!

“হে বিশ্বপ্রভু! তোমার ইচ্ছায় সকলই সম্ভবপর । তুমি পর্বতকে সমুদ্র ও সমুদ্রকে পর্বতে পরিণত করতে পার । তুমি রাত্রিকে দিবস এবং দিবসকে রাত্রিতে

পরিণত করতে সমর্থ। তোমার ইচ্ছায় মৃত জীবিতে এবং জীবিত মৃত্তে পরিণত হয়। তুমি ইচ্ছা করলে অসম্ভব সম্ভব এবং সম্ভব অসম্ভব হয়। ককণাময় স্বামিন্। এ দাসীকে কাকেরের হস্ত হতে মুক্ত কর।”

এইরূপে উদ্বেগ অশান্তি এবং ধ্যান ও প্রার্থনায় আরও ক্রিয়ামুখী আত্মবাহিত হইয়া গেল। মুরলা বেগমের মুক্তির জন্য অবশেষে এক কৌশল খেলিল; ঘরের প্রহরীকে হাত করিবার জন্য ফন্দি আঁটিল। মুরলা প্রহরীর সহিত ক্রমশঃ বুঝ ভাবের পশার জাঁকাইয়া তুলিল। মুরলার যৌবনের প্রভাব, বঙ্গ-বস ও ভাব-কৌতুকপূর্ণ বাক্য এবং লোলকটাক্ষে প্রহরী হরি সিংহ ক্রমশঃ মুগ্ধ হইয়া গেল। মুরলা যে তাহার অত্যন্ত হিতৈষিণী, এ ভাব হরি সিংহের মনে ক্রমে ক্রমে দৃঢ় বদ্ধমূল হইল।

ফাফুন মাসের ১২ই তারিখ বুধবারে শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা উপলক্ষে সদাশিব রাওয়ের বাড়িতে মহা মহোৎসব ব্যাপার! সন্ধ্যার পরেও বহু নর-নারী বালক-বালিকা রাজপুরীতে যাতায়াত করিতেছে। মুরলা তাহার সঙ্গে মিশিয়া উৎসবের বাসন্তী বেশে সজ্জিত হইয়া অপরাহ্নেই বাহির হইয়া গিয়া সেতারা হইতে পলায়নের সমস্ত উদ্যোগ-আয়োজনে লিপ্ত রহিল। প্রহরী ঘুগাঙ্করেও কিছু টের পাইল না।

এদিকে মুরলাকথিত নির্দিষ্ট সময়ে ফিরোজাবানু মুরলার পরিত্যক্ত আটপৌরে কাপড়খানি মুরলার ভঙ্গীতে পরিয়া জনতার সহিত মিশিয়া ব্যস্তভাবে ঘর পার হইয়া নিকটবর্তী উদ্যানের দক্ষিণ দিকে বাইতেই দেখিলেন মুরলা তাহার জন্য ব্যস্তভাবে অপেক্ষা করিতেছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মারাঠী শিবির

সদাশিব : নজীব-উদ্দৌলা বোধ হয় আমাদেরকেই সন্দেহ করছে?

ভাস্কর : ভাব-ভঙ্গীতে তো তাই বোধ হয়। নজীব বড় ধূর্ত এবং চতুর।

সদাশিব : তেজস্বীও বুঝ। জাতীয় টানও বুঝ আছে। মারাঠীদিগকে বিখ্যাতকৈই দেখে।

ভাস্কর : তা তো দেখবেই। আমরা দিল্লী পর্যন্ত দস্তদারাজী করছি, এতে আর কি মুসলমানের চিন্তে স্থির থাকতে পারে?

সদাশিব : হিন্দুর চিন্তাই বা কোথায় প্রকৃত? গুণচরেরা সবাই বলে যে, হিন্দু-মুসলমান সকলেই দিল্লীপতির মহল কামনা করেন। দিল্লীর অধঃপতনে সকলেই মর্মান্তিক দুঃখিত।

ভাঙ্কর : দিল্লীখবের প্রায় কিছুই নাই। কিন্তু কি আশ্চর্য ব্যাপার, এখনও দিল্লীপতির সম্মান ও প্রতিপত্তি কি অপরিসীম! দিল্লীপতি এবং তাঁর উজীর ও আধীশ্বর্য তেজস্বী, কর্মঠ এবং উদ্যোগী পুরুষ হলে, এখনও আবার সমগ্র ভারতে দিল্লীর আধিপত্য স্থাপিত হতে পারে।

ভাঙ্কর পণ্ডিতের কথা শুনিয়া সদাশিবের সহকারী তুলাজী দেশপাণ্ডে বলিলেন, "তাহার জন্য যে ভিতরে ভিতরে চেঁচা-চরিত্র হচ্ছে না, তা কে বলবে? অগ্নি, শত্রু এবং সর্পকে কদাপি তুচ্ছ ভাবতে নাই। আমার মতে বাদশাহকে পদচ্যুত করে পেশোয়া স্বয়ং দিল্লীর তখতে বার দিন। দিল্লীর তখতে বসতে না পারলে, পেশোয়াকে কদাপি ভারতের বাদশাহ বা সম্রাট বলে কেউই মান্য করবে না। এখনও ভারতবর্ষে মুসলমানের যে শক্তি আছে, তা একত্র হলে মারাঠাদিগকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে উড়িয়ে দিতে পারে।

ভাঙ্কর : তা বটে। কিন্তু তা' আর হচ্ছে না। অতি শীঘ্রই বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তিগুলিকে আক্রমণ করে উৎপাটিত করবার বন্দোবস্ত করছি। বাঙ্গলা, অযোধ্যা ও সিন্ধু, আর্থাবর্তের এই তিনটি রাজ্যকে আত্ম ধ্বংস করা আবশ্যিক। দিল্লীর তখতে পেশোয়াকে না বসালে এবং দিল্লীর জামে মসজিদে ডবানী-মূর্তি স্থাপিত করতে না পারলে রাজ্যাধিকারের পূর্ণ আনন্দলাভ হচ্ছে না।

তুলাজী : কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয়, আমরা হিন্দুদিগের সহানুভূতি পাবার জন্য কোনও চেঁচা করছি না। আমরা ভারতবর্ষে হিন্দুপ্রাধান্য ও রাজস্ব স্থাপনের চেঁচা না করে কেবল হত্যা ও লুণ্ঠন করায় ভারতের প্রত্যেক লোকই আমাদের নাম শুনেই ভয়ে শিউরে ওঠে। বাঙ্গলা ও হিন্দুস্থানে আমাদের নামে যে-সব ছড়া ও কবিতা রচিত হয়েছে তাতে আমাদের জুলুমের কথাটা লোকের মনে একেবারে মুদ্রিত হয়ে গিয়েছে। আমাদের অত্যাচারে নিরীহ এবং দরিদ্র কৃষক-পল্লীতে পর্যন্ত হাহাকার উঠেছে।

সদাশিব : কিন্তু এরূপ অত্যাচার ও কঠোরতা প্রদর্শন না করলে কেউ আমাদের ন্যায় নগণ্য জাতিকে গ্রাহ্য করত কি? আজ যে সমগ্র ভারতে আমাদের নামে আতঙ্ক পড়ে গিয়েছে, ভারতের সমস্ত রাজা, নবাব এবং বাদশাহ পর্যন্ত যে আমাদের করুণাভিচারী, তা এই কঠোরতা এবং নৃশংসতারই সুফল। আমাদের আরাধনা করে আরও কঠোর ও নৃশংস হতে হবে। রাজপুত্র এবং আঠগণ যদি আমাদের সহায় হত, তা হলে ভারতময় একমাত্র হিন্দুরাজত্ব স্থাপন করা সহজসাধ্য হত। কিন্তু রাজপুত্রেরা আমাদের প্রাণের সহিত ঘৃণা করে থাকে। আমরা সমূলে উৎসাদিত হই, এটাই আমাদের আন্তরিক কামনা। তাদের ধারণা যে, রাজপুত্র ব্যতীত ভারতবর্ষে হিন্দুদিগের মধ্যে শাসনদণ্ড পরিচালনা করবার জন্য আর কোনও জাতি উপযুক্ত নয়। রাজপুত্রের অধিকাংশই এখনও দিল্লী সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থানকাষী।

তুলাজী : ওরা তো বলতে গেলে, অর্ধ-মুসলমান। এখন কোনও রাজপুত্র

নাই, যে মুসলমানকে কন্যাদান করে নাই। শিশোদীঘ, গিছোট, রাঠোর ও কনোজ-গোত্রীয় সকল রাজা, রাণা ও সর্দারই মুসলমানের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ। যে উদয়পুরের রাণা প্রতাপসিংহ মুসলমানকে কন্যাদি দিবেন না বলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করেছিলেন—যিনি, মানসিংহ আকবরকে সপ্তদান করেছিলেন বলে তাঁর সঙ্গে একত্রে আহাৰ করতেও সম্মত হন নাই, পরে তাঁরই কন্যা অশ্রমতী যুবরাজ সেলিমের প্রেমের বাণে বিদ্ধ হয়ে উন্মাদিনী হয়ে পেল।* সত্য কথা বলতে গেলে বলতে হয় যে, রাজপুতেরা মুসলমানের মাতুলকুল হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং তার যে দিক্কাই বাদশাহী প্রভাব বৃদ্ধিকল্পে বিশেষ চেষ্টা করবে, তা তো স্বাভাবিক। রাজপুতেরা এই মাতুলত্বের দাবীর জন্যই অন্যান্য সৰ্বজাতীয় হিন্দু অপেক্ষা বেশী প্রতিষ্ঠা এবং প্রতিপত্তি লাভ করেছে।

সদাশিব : ভরতপুরের রাজা তো রাজপুত নয়; কিন্তু সেও দিক্কার হিতৈষী। এই জাঠ বেটাকে সমুচিত শিক্ষা দিতে হবে।

ভাস্কর : ফন্দী তো খুবই খাটান হয়েছে। যার জন্য সে আমাদের সঙ্গে শত্রুতা করতে কুণ্ঠিত নয়, এবার সেই বাদশাহকে দিয়েই সাপ খেলাব।

তুলাজী : এই তো যথার্থ রাজনীতি,—‘যাক্ শত্রু পরে পরে।’ আমরা মজা করে তামাশা দেখব।

ভাস্কর : তামাশা আর মজা করে দেখতে হবে না। এ তামাশা দেখতে বহু সহস্র মারাঠীর মুও ধূলায় লুটবে। জাঠেরা সহজে হারবার পাত্র নয়।

তুলাজী : তা তো বটেই। পরিণাম কি হয় বলা কঠিন। ভিতরের কথা যদি ফেসে পড়ে, তা হলে সবই পশ্চন্ন হবে। অধিকন্তু মুসলমানদের সঙ্গে ভীষণ বিবাদ ও বিগ্রহ হবে।

সদাশিব : যতদূর সম্ভব সাবধানতা অবলম্বন করা গেছে।

তুলাজী : কিন্তু কথা হচ্ছে, পাপ কখনও লুকায়িত থাকে না।

সদাশিব : আরে! মুসলমানদের সঙ্গে বিরোধ যখন লেগেই আছে এবং আরও লাগবে, তখন আর ভাবনা-চিন্তা করবার কি আছে? হায়! যার জন্য এত করলাম, এখনও তার তো মুখকমল দেখা দূরে থাক, পা'খানিও দেখতে পেলাম না। সে অলোকসুন্দর প্রসূন্য কমলের দ্রাণ নেবার ভাগা আছে কিনা, কে বলবে।

ভাস্কর : তা হবে, মহারাজ। কমল যখন তোলা গেছে, তখন দ্রাণ নেওয়া তো নিজেই হাত। এদিকের বন্দোবস্ত করে যাঁ করে সেতারায় চলে যান।

সদাশিব : পেশোয়া টের পেলেও যে বিপদ!

ভাস্কর : পেশোয়া বড় কিছু মনে করবেন না। বরং কথা আছে যে, চোরে চোরে মাসভূত ভাই। তবে চুরির এই অমূল্য রত্নটি পাচ্ছে চেয়ে না বসেন।

সদাশিব : ওরে বাপরে! তবেই তো গেছি। মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়া! এমন অধর্ম কখন করবেন না।

* শ্রীকৃত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত ‘অশ্রমতী’ নাটক দেখুন।

তুলাঙ্গী : ও সব কথাই প্রয়োজন নাই। এখন এ যুদ্ধে আপনি স্বয়ং যাবেন, কি পণ্ডিতবরকে পাঠাবেন, তাই নির্ধারণ করে সৈন্যদলকে সজ্জিত হবার আদেশ প্রদান করুন।

সদাশিব : নজীব-উদ্দৌলার তো খোঁজ-খবর নাই। মাত্র দু'হাজার রোহিলা সৈন্যকে সর্দার আহমদ খান পাঠিয়েছেন।

তুলাঙ্গী : নজীব-উদ্দৌলা নাকি স্ত্রীর শোকে নিতান্ত উন্মাদ হয়ে পড়েছেন।

সদাশিব : বেশ কথা, বড় ভুল হয়ে গেছে। তাকে সে রাতে সাবাড় করে ফেলাই উচিত ছিল।

তুলাঙ্গী : সফরদরজ্ঞ যুদ্ধে যেতে প্রস্তুত। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস যে, ফিরোজা বেগম ভরতপুরেই আছেন।

সদাশিব : যথা লাভ। সফরদরজ্ঞ ভালো যোদ্ধা। দিল্লীর সেনাপতি শমশেরজ্ঞও ব্যূহ রচনায় বেশ পণ্ডিত। তা'হলে আপনি কাল সকালে ভরতপুরে কুচ করবার জন্য প্রস্তুত হোন। ভাস্করজী আমার পরিবর্তে দিল্লী থাকবেন। আমি দু'চার দিনের মধ্যেই সেতারায় রওয়ানা হব।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বেগমকে লইয়া মুরলা দ্রুতপদে অক্রমক্রম রাস্তা অবলম্বন করিয়া একটি পল্লীর মধ্যে প্রবেশ করিল। এই পল্লীতে একটি প্রাচীন শিব-মন্দির ছিল। শিব-মন্দিরের চতুর্দিকে নানাজাতীয় বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষাদি থাকায় স্থানটি অন্ধকারপূর্ণ ছিল। রাত্রিতে ভয়ে এ মন্দিরে কেহই প্রবেশ করিত না। মুরলা এবং ফিরোজা দুইজনে মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া প্রদীপ জ্বলাইল। প্রদীপ জ্বলাইয়া দুইজনে পরামর্শ করিতে লাগিল যে, কিরূপ বেশে সেতারায় হইতে বাহির হওয়া আবশ্যিক।

ফিরোজা বলিলেন, “আমরা উত্তরেই যুবতী। সুতরাং নারীবেশে দূর-দূরান্তরে গমন করা অসম্ভব।”

মুরলা : ঠিকই বলেছেন। নারীবেশে বের হলেই আবার বিপদে পড়তে হবে। আপনার কমণীয় কাপড়, রমনীয় শ্রী এবং ললিত লাবণ্য যে দেখবে সেই বিমোহিত হবে। আপনি যে মারাঠী মহিলা নন, তা স্পষ্টই ধরা পড়বে। অন্য দিকে পুরুষের বেশেও মহাবিপদের সম্ভাবনা। এক্ষণে আমি মনে করি, আমরা দু'জনেই সন্ন্যাসিনী বেশে বহির্গত হলে আর বিপদের আশঙ্কা থাকে না। আমি তার বন্দোবস্ত করে রেখেছি। আমরা মারাঠা রাজ্য ত্যাগ করে নিজাম-রাজ্যে পৌঁছলে সেখানে আপনি রাজসরকারেও অনেক সাহায্য পেতে পারবেন। অথবা তথা হতে দিল্লী বা রোহিলাখণ্ডে সংবাদ প্রেরণও বেশী কিছু কঠিন হবে না।

আপনি তো বলেছেন যে, নিজাম-দরবারে আপনার উচ্চপদস্থ আত্মীয় আছেন।

ফিরোজা : আমি তো সন্ন্যাসিনীর আচার-ব্যবহার কিছুই জানি না। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলেই বা কি বলব?

মুরলা : আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি ঠিক করে দিব। সন্ন্যাসিনীর নাম ধাম, ধর্মমত কেউ জিজ্ঞাসা করবে না। একরূপ জিজ্ঞেস করা নিয়মবিরুদ্ধ। জিজ্ঞেস করলেও নিরুত্তর থাকবেন। তাতে কেউই দোষ ধরবে না।

ফিরোজা : সঙ্গে অস্ত্র থাকা আবশ্যিক।

মুরলা : একটি একটি করে আমাদের দু'টি ত্রিশূল তো থাকবেই।

ফিরোজা : তরবারি হলেই ভালো হয়। আমি তরবারি ভালো চালাতে জানি।

মুরলা : তরবারি থাকলে লোকে সন্দেহ করবে। আমরা যে যথার্থ সন্ন্যাসিনী নই, তাই বুঝাবে। লোকের সন্দেহের উদ্বেক হবে।

ফিরোজা : তা হলে তরবারির আর প্রয়োজন নাই।

অতঃপর মুরলা বেগমকে ভৈরবী সাজাইতে আরম্ভ করিল। গিরিমাটি ঘষিয়া চুলগুলির তৈলাক্ত ভাব দূর করিয়া ললাটোপরি শিব-চূড়া বাঁধিয়া দিল। বস্ত্র পরিবর্তন করিয়া রক্তবর্ণ চেলী পরাইয়া দিল। হস্তে এবং গলে কুদ্রাক্ষের মালা, ললাটে রক্তচন্দনের ত্রিপুরক। ফিরোজার বর্ণ কিছু মলিন করিবার জন্য প্রথমে মুখে কিছু ছাই মাখিয়া পরে গৈরিক আমর্শন করিয়া দিল। এইরূপ ভাবে ফিরোজাকে সাজাইয়া দর্পণে মুখ দেখিতে বলিল। ফিরোজা আপনার মূর্তি দেখিয়া আনন্দে স্মিতহাস্য করিলেন।

মুরলা বলিল, “এবার এ ভৈরবীর রূপ দেখলে তেত্রিশ কোটি দেবতা স্বর্ণ ছেড়ে মর্ত্যে এসে শ্রীচরণতলে গড়াগড়ি দিবে। দেবাদিদেব মহাদেব ভৈরব পর্বত ত্রিলোকমোহিনী চির উদ্ভিন্মুখোবনা কমলাননা পার্বতীকে পর্বতে ত্যাগ করে তোমার নীলোৎপলনির্দিত নয়নের সম্মোহন বাণে বিদ্ধ হয়ে ঐ লোলিতাজ্জ-সঙ্কাশ শ্রেমিকজন-শরণ চরণতলে লুপ্তিত হবেন।”

মুরলার কথা শুনিয়া ফিরোজা স্মিতহাস্য করিয়া বলিলেন, “এখন রক্তরস রাখ। পলায়নের উপায় দেখ। নিজে শিশু সজ্জিত হও।”

“আমরা শহরের বাইরে বের হয়ে পড়েছি। সুতরাং রাত্রিতে রওয়ানা হলে আর কোন আশঙ্কা নাই।”—এই বলিয়া মুরলা নিজেও ভৈরবীর বেশে সজ্জিত হইয়া ফিরোজার হস্তে একগাছি ত্রিশূল ও তাঁহার হৃদয়ে গৈরিক একটি কুলি কুলাইয়া দিয়া তদনুরূপ নিজেও ত্রিশূল এবং কুলি ধারণ করতঃ নির্গত হইয়া পড়িল।

সমস্ত রাত্রি পমনের পরে প্রভাতে তাঁহারা ত্র্যম্বকনাথ নামক গ্রামে “বাবা একলিঙ্গের” মন্দিরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। ভৈরবীমূর্তিকে দেখিয়া মন্দিরের সেবাইতরা পরম যত্নে আহ্বারের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। উত্তর ভৈরবীর একত্র সম্মিলন এবং তদনুযায়ী একজনের বিনয়কর, রমণীয় কাণ্ডি ও তেজস্বিনী প্রকৃতি

বুগ বুগ ধরি সে রূপমাদুরী
দরশে না মিটে আশা;
দেখে তারে হত রূপ বাড়ে তত
সৃষ্টিয়া অসীম ভূষা ।

হেন রূপবতী হেন রসবতী
হেন গুণবতী বালা,
দেখিল যে জন মজিল সে জন
হইয়ে আপন ভোলা!

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বেগম এবং মুরলা ক্রমাগত সাত দিন গমনের পরে এক বিরাট কাননের পথে অগ্রসর হইলেন। এই কানন অতিক্রম করিবার পরেই বিদ্যা পর্বত পাওয়া যাইবে। বিদ্যা পর্বতে বিদ্যেশ্বরীর বিখ্যাত মন্দির অবস্থিত। উত্তর ও দক্ষিণ-ভারত হইতে বহু হিন্দুই পুণ্যলাভের আশায় এই তীর্থে বারমাসই সমবেত হইয়া থাকে। বিদ্যা পর্বতের প্রাকৃতিক দৃশ্যও নিতান্ত মনোহর। সুতরাং এই পথেই শ্যামল বনরাজির চিত্তবিনোদিনী শোভা, বন্য জন্তু এবং বিহঙ্গাদির রমণীর সৌন্দর্য, পার্বত্য-প্রকৃতির নিরুপম সুষমা সন্দর্শনে নয়ন-মনের তৃপ্তিসাধনপূর্বক হিন্দুস্থানের দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইবার জন্যই বেগম ও মুরলা সংকল্পাক্রম হইলেন।

কিরোজা বেগম এবং মুরলা সেই কাননপথে ত্রিশূল হস্তেই বিদ্যা পর্বত পানে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তখন ফাল্গুন মাস। বসন্তের চরম প্রকাশ। তরুপল্লবীর শ্যাম সুন্দর শোভা এবং নানাজাতীয় ফুলরাজির মনোহর বিকাশ দেখিয়া উভয়ে মোহিত হইতে লাগিলেন। এই অরণ্যভূমিতে অগণ্য ময়ূর, কুকুট ও ধনেশ পক্ষী দল বাঁধিয়া বিচরণ করিত। কাকাতুষা, টিয়া এবং ময়না ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িয়া কলরব করিয়া বনভূমিতে মুবরিত করিতেছিল। নানা জাতীয় বিচিত্র বর্ণের হরিণ যত্রতত্র বিচরণ করিতেছিল। সুগন্ধি পুষ্পগন্ধ বহন করিয়া সুকোমল স্নিগ্ধ গন্ধবহ মন্দ মন্দ গতিতে প্রবাহিত হইয়া সকলের শরীরে স্নিগ্ধতা এবং চিন্তে অসন্নতা দান করিতেছিল। কোকিলের মধুর কুঞ্জনে, পানিরার পিউতানে এবং বুলবুল প্রভৃতি নানা জাতীয় পক্ষীর ললিত গানে বনভূমি প্রাতঃসন্ধ্যা বহুত হইতেছিল।

কিরোজা বেগম স্বভাবতঃই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যপ্রিয় এবং রসবোধিকা ছিলেন। তদুপরি পারস্য-সাহিত্য-ভাণ্ডারের কাব্যরাশি বহুল-চর্চা করার তাঁহার অন্তর্করণ

দেখিয়া সকলেই ভয়, বিষয় এবং ভক্তিতে গড় করিতে লাগিল ।

সমস্ত দিন বিশ্রাম করিয়া অপরাহ্নে আনার দুইজনে পথাতিক্রমে বাহির হইয়া পড়িলেন । আমাদের ভৈরবীযুগল যে-পথ দিয়া যাইতে লাগিলেন, সেই পথের দুইপাশে বহু নরনারীর ভীড় হইতে লাগিল । অনেকেই বলিল, “বয়ং মা পার্বতী ভৈরবী মূর্তি ধারণ করে-সখীসহ দক্ষিণাত্য-শ্রমণে বের হইয়াছেন ।”

রমণীর তপ্তকাঞ্চন-সন্নিভ বর্ণের কথা অনেকেই শুনিয়াছে, কিন্তু কেহ কখনও চোখে দেখে নাই । কিন্তু আজ সকলে রক্ত-চেলী পরিহিতা ভৈরবীর প্রতাপ বর্ণ-সন্নিভ বর্ণ দর্শনে বিষয় মানিল । এমন টানা টানা বাঁকা বাঁকা জোড়া ভুজ, ভাসা ভাসা উজ্জ্বল অথচ প্রশান্ত চক্ষু, এমন প্রভাতপ্রসূতিত কমলের ন্যায় প্রফুল্ল বদনমণ্ডল, এমন উষার সিন্দুরসুবর্ণরাগমিশ্রিত রক্তিম মাখা পেলবগণ্ড তাহারা কখনও দেখে নাই । দেখা মাত্র মনে হয় :

বিরলে বসিয়া ভাবিয়া ভাবিয়া
একেলা গড়েছে বিধি
কামনার ধন ত্রিলোকমোহন
অতুল রূপের নিধি!

বাহনি করিয়া সুধমা লইয়া
সারাটি জগৎ হতে,
শতবার করি ভক্তি আর গড়ি
গড়িলা মনের মতে ।

সে রূপমাধুরী আহা! মরি! মরি!
দেখিয়া মেটে না আশা,
রূপের প্রতিমা প্রেমের মহিমা
কহিতে নাহি ক ভাষা ।

চরণ-পরশে ধরণীর অঙ্গে
ধরে ধরে ফুল ফুটে,
নয়ন-কটাক্ষে কাদম্বিনী-অঙ্গে
শতেক দামিনী ছুটে ।

গগনেরি গায় চাকু নীলিমায়
অমৃত তারকা জ্বলে ।
প্রেমিক সূজন পূলে দরশন
ভাসে প্রেমরস-জলে ।

পরিমাণেও, উন্নত এবং সরস হইয়াছিল। তিনি নিজেও কবি ছিলেন এবং অনেক কবিতাও রচনা করিয়াছিলেন। কবিসুলভ ভাবুকতা এবং রসের ধারা তাঁহার মধ্যে যথেষ্টই ছিল। সুতরাং বনভূমির কবিভূময় ললিত সৌন্দর্য তাঁহার হৃদয়ে অমৃতের ধারা প্রবাহিত করিল।

সমস্ত দিন বনভূমির সৌন্দর্য অবলোকন করিতে করিতে ধীরে ধীরে পথ অতিক্রম করিতে লাগিলেন। নানাবিধ বনা-ফল এবং সসের সঞ্চল ছাড়ু খাইয়া জঠরজ্বালা নিবারণ করিতেছেন। অষ্টম দিবস এক প্রহর বেলায় সময় উভয়ে এক বিশাল সরোবরতীরে উপনীত হইলেন। সে সরোবরের পানির পবিত্রতা ও স্বচ্ছতা দেখিলে পিপাসা যেন আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়। কাকচক্র মত নির্মল জল মন্দ সমীরসঞ্চারে টলমল করিতেছে। অসংখ্য শ্বেত ও রক্তপদ্ম এবং অন্যান্য নানা জাতীয় জলজ পুষ্পপুঞ্জ প্রস্ফুটিত হইয়া কি এক অনির্বচনীয় ও অপূর্ণ স্বর্গীয় সুসমার বিকাশ করিয়াছে। নানা শ্রেণীর বিচিত্র চন্দ্রক ও বর্ণবিভূষিত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ হংস, সারস, চক্রবাক, ডাহক, ফেঁপী, মরাল, টিটিভ, বলাকা প্রভৃতি জলচর পক্ষিকুলের কলরবে বিশাল সরোবরটি মুখরিত! তটভূমি শ্যামল তৃণ-আস্তরণে আচ্ছন্ন। মনে হয় যেন, কেহ সবুজ বর্ণ ইরানী গালিচা বিছাইয়া রাখিয়াছে। মধ্যে মধ্যে শাল, তমাল, তাল, নারিকেল প্রভৃতি বৃক্ষ দূরে দূরে মস্তক উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া শীতল ছায়াদানে কোমল তৃণপুঞ্জকে ভানুর প্রখর কিরণ হইতে রক্ষা করিয়া নিজেই মহত্ব ও উদারতা প্রদর্শন করিতেছে। মহতের লক্ষণই এই, নিজের ক্ষতি সাধন করিয়াও—সর্বত্র জলাঞ্জলি দিয়াও আশ্রিত যে, দুর্বল যে, তাহাকে রক্ষা করিবে।

এইসব তরুর ছায়ায় মৃগশাবকগণ মনের আনন্দে ধাবন ও কূর্দন করিয়া মাতার সহিত নব নব তৃণাকুরগুলি ভ্রমণ করিতেছিল। সন্ন্যাসিনীঘরের আগমনে নিকটবর্তী হরিণগুলি চমকিয়া উঠিয়া পলায়ন করিল। ফিরোজা এবং মুরলা বড় শ্রান্ত হইয়াছিলেন। সরোবরের শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। সরোবরের শীতল-সলিল-শীকর-সম্পৃক্ত সমীর সেবনে শরীর স্নিগ্ধ হইল। সরোবরের পাড়ে দাঁড়াইয়া বিশ্বয়বিহ্বল নয়নে ফিরোজা, মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় এই মোহনীয় পবিত্র সৌন্দর্যসুধা প্রাপ্ত করিয়া পান করিতে লাগিলেন। দিল্লীর শাহী-উদ্যানের চক্ষুবিনোদন শোভা এবং তনুধ্যাহু সরোবরে জলজ পুষ্পের চমৎকার বাহার অনেকবার দেখিয়াছেন; কিন্তু কৈ, এমন বিপুল ও বিমল শোভা এবং প্রশান্ত ও মধুর দৃশ্য তো কখনও দেখেন নাই! দেখিয়া দেখিয়া ফিরোজা মুগ্ধ হইলেন। মুরলাও হর্ষে উৎফুল্ল হইল।

ফিরোজা বলিলেন, “কি রমণীয় বিশাল সরোবর! কি নির্মল ইহার জল! কি চিত্তহারিণী শোভা! ইচ্ছা করে এই রমণীয় স্থানে প্রস্ফুটিত কমলকলির ন্যায় আনন্দপূর্ণ কবিভূময় জীবন অতিবাহিত করি।”—এই বলিয়া ফিরোজা কিয়ৎক্ষণ

নীলব রহিবায় পরে মনের আবেগে গাহিলেন :

কে তুমি হে পরম সুন্দর!
সৃজেছ এই সুন্দর বিশ্ব,
সুন্দর তোমার গঠন-কল্পনা
সুন্দর তোমার সকল দৃশ্য!

সুন্দর তোমার অপূর্ণমাণু
সুন্দর তোমার লতাপাতা ফুল,
সুন্দর তোমার গিরি নদী বন
সুন্দর তোমার পথের ধূল!

সুন্দর তোমার গগন পবন
সুন্দর তোমার ভূমি ও জল,
সুন্দর তোমার রবি শশী তারা
সুন্দর তোমার জোনাকীদল।

সুন্দর তোমার পত পক্ষী কীট
সুন্দর তোমার জলদদাম,
সুন্দর তোমার দামিনী-স্করণ
সুন্দর তোমার নিখিলধাম!

সকলি তোমার সুন্দর সুন্দর
তুমি হে অনন্ত সৌন্দর্যময়,
হে প্রিয়তম! হে সুন্দরতম!
তোমার সৌন্দর্য নিখিলময়।

ফিরোজ্জার গান খামিবায় পরে মুরলা তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিল, সে মুখ—সে স্বর্গীয় মুখ সরোবরের কবিচিন্তরঞ্জিনী সুধমাবলোকনে ভাবাবেশে এবং সঙ্গীতরসে আরও নির্মল সুন্দর হইয়াছে। মন্দ সমীরণ কপোলের দুই পার্শ্বস্থ অলকাবলী দোলাইয়া দোলাইয়া উড়াইয়া উড়াইয়া প্রবাহিত হওয়ায় কি চমৎকারই দেখাইতেছে! মনে হয় যেন, শারদীয় উষা নারীমূর্তি পরিগ্রহ করিয়া বিশ্বজগতের কোলাহল ভাগ করতঃ এই নিভৃত নির্জন সরোবরের শ্যাম তটে আপন মনে বিচরণ করিতেছে।

মুরলা, বেগমের মুখ দেখিয়া ভক্তিগদগদ স্বরে বলিল, “বেগম! তুমি মানবী মহ—দেবী। ইচ্ছা করে, এই সরোবর-তটে বাস করে, জীবন ভরে সাধ মিটিয়ে তোমার সেবা করি। আর রক্তোৎপল তুলে প্রাতঃসন্ধ্যা তোমার চরণে দেই। তোমার দর্শনে কি আনন্দ! তোমার সেবায় কি সুখ! তোমার পূজায় কি পুণ্য!”

কিরোজা : মুরলা! পরম্পিতা আগ্রাহ-ভাআলার মহিমা কীৰ্তন কর। এই সৌন্দৰ্যেও তাঁরই মহিমা! কবি সতাই বলেছেন :

মেহাদ নোংকারা ছুরতে চুঁ পরী
কে কারদাস্ত বর আবছুরত্ গিরি।*
অর্থাৎ
তুচ্ছ ভ্রমে করেছেন
অলংকার রূপদান,
জলেতে আঁকয়ে ছবি
কে শিল্পী কমতাবান।

মুরলা! আমার এ রক্তমাংসময় তুচ্ছ দেহের সামান্য সৌন্দৰ্য দেখে মুগ্ধ হচ্ছ! একবার তোমার দৃষ্টিকে সম্প্রসারিত এবং দূরদর্শিনী কর। দেখ, অনন্ত নীল নভোমণ্ডল হতে এই চির শ্যামলা, গিরি-কানন-কুস্তলা সমুদ্রমেখলা ধরিজীর প্রতি পদার্থে, প্রতি তরঙ্গতালে, প্রতি ফল-ফুলে, প্রতি অগুরেণুতে তাঁর কি বিচিত্র বিপুল ও সূক্ষ্ম শিল্পকৌশল ও সৌন্দৰ্য বিরাজমান! তিনি অনন্ত জগৎ জুড়ে কত অসংখ্য প্রকারের রূপ-রস-গন্ধ ও ছন্দ ছড়িয়ে রেখেছেন! তাঁর মহিমায় মুগ্ধ হও। তাঁরই সৌন্দৰ্যে বিভোর হও। তাঁরই প্রশংসা কর। তাঁরই পূজা কর এবং তাঁরই গুণ কীৰ্তন কর। তাঁর রসে ডুবে রও। তাতেই জীবনের সফলতা।

মুরলা বলিল, "দিদি! তোমার কথা কত যুক্তিপূর্ণ! কত মধুর। এবং কত সুন্দর! মুসলমানগণ কেন যে পরমেশ্বর ব্যতীত আর কারও পূজা, অর্চনা, স্তব-স্তুতি করেন না, এতদিনে তা স্পষ্ট বুঝতে পারলাম। আমিও আর কারও পূজা করব না। ইসলাম বাস্তবিকই শ্রেষ্ঠ ধর্ম।"

এইরূপ কথোপকথনের পরে উভয়ে সেই স্বচ্ছ শীতল সরসীসলিলে অবগাহনপূর্বক আহারের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন।

নবম পদচ্ছেদ

বেগম এবং মুরলা আহাৰান্তে যখন বিশ্রাম করিবার জন্য উদ্যোগ করিতেছিলেন, সেই সময় কিরোজা দেখিলেন যে, দূরে বনান্তরাল হইতে দুইটি অশ্বারোহী মারাঠী সৈন্য দেখা যাইতেছে। কিরোজা মুরলাকে সাবধান হইতে ইঙ্গিত করিলেন। মুরলা সাবধান হইয়া মাটি হইতে কক্ষ দুইটি, বুলি ও ত্রিশূলাদি লইয়া একটি বৃহৎ ঝোপের আড়ালে বাইয়া দাঁড়াইল। বেগমও সেই ঝোপের আড়ালে বাইয়া সৈন্যদলের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

* মানুস কাঠ পাথর দ্বারা মূৰ্তি পঠন করিয়া থাকে, কিন্তু আগ্রাহতাল্লা জল অর্থাৎ গুরুবিদ্যুৎ দ্বারা মানবের কি চমৎকার মূৰ্তি পঠন করিয়াছেন।

দেখিলেন, দুই জন নহে—সাত জন অস্বাভাবিক সৈনিক এক ব্যক্তিকে বন্দী করিয়া লইয়া আসিতেছে। বন্দীর অঙ্গে গৈরিক বসন পরিহিত। সৈনিক ক্রমশঃ নিকটবর্তী হইলে দেখা গেল যে, একজন তরুণ বয়স্ক যুবক-সন্ন্যাসীর হস্তে কড়া এবং কটিদেশে জিজির লাগাইয়া একটি অস্ত্রের উপরে দৃঢ় বন্ধনপূর্বক সৈন্যগণ “লাঙ্গা ভালোয়ার” হস্তে লইয়া যাইতেছে। সৈনিকেরা খুব প্রকৃষ্ট। বন্দীর মুখে দারুণ ক্রেশ ও হতাশার লক্ষণ সুস্পষ্ট বিরাজমান।

মারাঠী সৈনিকেরা সেই সরোবরের তটে আসিয়া অস্ত্র হইতে অবতরণপূর্বক শ্যাম ভূপতলে বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল। বন্দীটিকে ঘোড়া হইতে নামাইয়া একটি বৃক্ষের সহিত দৃঢ় রজু দ্বারা বন্ধন করিয়া রাখিল। তৎপরে নিজেদের ঘোড়াগুলিকে ছাড়িয়া দিয়া নিজেরা আহারের উদ্যোগ করিতে লাগিল। আহারান্তে সৈনিকগণ বন্দী পুরুষকেও কয়েকখানি কুটি এবং কিছু ছোলাভাজা খাইতে দিয়া পুনরায় হস্ত-পদাদি দৃঢ়রূপে বন্ধনপূর্বক একজনকে গ্রহরায় নিযুক্ত করিয়া আর সকলে বিশ্রাম করিতে লাগিল। গালচা-বিনিন্দিত কোমল ভূপের উপরে কয়ল বিছাইয়া মন্দ সমীরণে শয়ন করায় সৈনিকগণ শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িল।

যে সৈনিকটি গ্রহরায় ছিল, সেও ক্রমশঃ বন্দীর জন্য কোনও আশঙ্কা না থাকায় এবং ক্লান্তিবিনাশী সমীরণ সেবনে ক্রমশঃ প্রগাঢ়রূপে ঘুমাইয়া পড়িল। কিরোজা এবং মুরলা বৃহৎ ঝোপের নিবিড় আড়াল হইতে চুপে চুপে দস্যুদিগের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। বন্দীকে বিশেষরূপে দেখিবার পরে, তাহাকে তাঁহার হৃদয়নিধি, সংসারমক্কভূমির আশ্রয়-উদ্যান সহধর্মী নজীব-উদ্দৌলা বলিয়া ধারণা হইল। কিন্তু চক্কের দৃষ্টিকেই প্রথমে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। ভাবিলেন, আমার প্রাণকাণ্ড নজীব-উদ্দৌলা দস্যুহস্তে বন্দী হইয়া থাকিলে, এখানে তাঁহাকে কোথা হইতে লইয়া আসিবে? তৎপরে তাঁহার গৈরিক বাস পরিধান করিবার কারণ কি? না, আমার শোকে, আমার অনুসন্ধান, আমার তত্ত্বতন্মাসে সন্ন্যাসীবেশে বাহির হইয়াছিলেন? কিছুই যে ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। হায়! মন কেন এমন ব্যাকুল হইতেছে। হায়! সত্যই কি ইনি আমার প্রিয়তম স্বামী?

বেগমের ব্যাকুলতা, ললাটে চিন্তার রেখা এবং মুখে বিষাদ-কালিমা দেখিয়া মুরলা চিন্তিত হইল। মুরলা ভাবিল যে, বেগম বোধহয় দস্যু সিপাহীদের উপস্থিতিতেই আমাদের ধৃত হইবার আশঙ্কায় ব্যাকুল হইতেছেন। এই ভাবিয়া বেগমকে বলিল, “দিদি! ভীত হবার কিছু নাই। সিপাহীরা কিছুতেই আমাদের দেখতে পায় নাই এবং এদিকে আসলেও দেখতে পাবে না। আমরা এমন চমৎকার স্থানে আছি যে, আমরা দস্যুদিগের সমস্তই দেখতে পারি; কিন্তু ওরা কিছুতেই আমাদের দেখতে পাবে না।”

কিরোজা : মুরলা, সিপাহীদিগকে দেখে আমি ভীত হই নাই। কিন্তু বন্দীকে দেখেই আমার প্রাণ ব্যাকুল হচ্ছে। আমার মন বেন বলছে, এই বন্দীই আমার

হায়া। চেহারা দেখেও সেই রকম মনে হচ্ছে। তবে দূরতানিবেদন একেবারে সুশব্দরূপে মালুম হচ্ছে না। যেই হোক এবং যাই হোক, বন্দীকে মুক্ত করতে হবে। আমি ধীরে ধীরে যাচ্ছি; তুমি এখানেই থাক। যদি কোনও বিপদ সংঘটিত হয়, আমার উপর দিয়েই যাবে।

মুরলা : ছি! বেগম! এমন কথা কখনই বলবেন না। আপনার সঙ্গ আমি কখনই ত্যাগ করব না। যদি বিপদ ঘটে, তবে সর্বাত্মে তা আমিই বরণ করে নিব। আপনাকে প্রাণ থাকতে বিপদগ্রস্ত হতে দিব না। বরং আপনি থাকুন, আমি বন্দীকে মুক্ত করে এখানে নিয়ে আসি।

কিরোজা : আমি না গেলে বন্দীকে তো তুমি চিনতে পারবে না। আমাকেই যেতে হবে। বন্দীকে না দেখে আমি কিছুতেই স্থির হতে পারছি না।

মুরলা : তবে চলুন দু'জনেই যাই।

কিরোজা : খুব সাবধান, যেন কোনও শব্দ না হয়। শুধু পত্রের উপরে পা দিও না। তুমি সৈনিকদের তরবারিতুলো সাবধানে সংগ্রহ করে ফেলবে।

এই বলিয়া কিরোজা ঝুলির ভিতর হইতে ভীকুধার ছুরিকাখানি গ্রহণ করিয়া ধীর পদবিক্ষেপে বন্দীর নিকটবর্তী হইলেন। সৈনিকেরা নাক ডাকাইয়া ঘুমাইলেও, বন্দীর চক্ষে নিদ্রা নাই। বন্দীর হস্ত যেরূপ ভাবে বন্ধন করিয়াছে এবং তাহাকে যেদ্রুপ অসুবিধায় রাখিয়াছে, তাহাতে তাহার পক্ষে নিদ্রালাভ সহজ নহে। কিরোজা একেবারে যাইয়া বন্দীর নিকটস্থ হইয়া বিশ্বয়বিষ্কারিত নেত্রে দেখিলেন, বন্দী—সত্য সত্যই নজীব-উদৌলা। তাহার প্রাণের ভিতর গভীর আনন্দের তুমুল কল্লোল তাহাকে অধীর করিয়া তুলিবার উপক্রম করিল। কিন্তু কিরোজা গভীর সংযম এবং মানসিক ধৈর্যের বলে চঞ্চল চিত্তকে স্থির ও গভীর করিয়া ফেলিয়া তরবারি ও প্রস্তরের সাহায্যে হাতকড়ি ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। হাতকড়ি ভাঙ্গিতে যাহাতে শব্দ না হয়, সে জন্য কিরোজা যথেষ্ট সাবধান হইলেও প্রত্যক্ষকালে একটু শব্দ হওয়ার প্রদরী চমকিত হইয়া জাগিয়া উঠিল। জাগিয়া উঠিবার পরে সে যে অদ্ভুত দৃশ্য দেখিল, তাহাতে সে ভীষণ আতঙ্কজনক চীৎকার করিয়া উঠিল।

তাহার চীৎকারে সৈনিকদের মধ্যে সকলেই জাগিয়া উঠিয়া মহাব্যস্ততার সহিত নজীব-উদৌলাকে ধরিবার জন্য ধাবিত হইল। কিন্তু একজন ব্যতীত কাহারও বন্দুক ও তরবারি কিছুই ছিল না। মুরলা সকলেই অপহরণ করিয়া একটি বৃক্ষের আড়ালে লুক্কায়িত করিয়া রাখিয়াছিল। একজন সৈনিক তরবারি মস্তকের নীচে স্থাপনপূর্বক নিদ্রিত হইয়াছিল বলিয়া মুরলা তাহার তরবারিখানি অপহরণ করিতে সাহসী হইয়াছিল না। কেবল সেই সৈনিকটি ধৃত করিবার জন্য ছুটিয়া গেল।

কিরোজা বেগম প্রাণবলুষ্ঠের বিপদ মোচরণা গীতবেশে ত্রিশূল লইয়া সৈনিকটিকে ভীষণ আঘাত করিলেন।

সৈনিকের তরবারির আঘাত ত্রিশূল-অগ্রে বাধা প্রাপ্ত হইয়া ব্যর্থ হইয়া গেল, অথচ ত্রিশূলের আঘাতে মারাঠী সৈনিকপুরুষ চীৎকার করিয়া ভূপতিত হইল।

ইতিমধ্যে অন্যান্য সৈনিকেরা বৃক্ষের শাখা ভগ্ন করিয়া নজীবকে ঘেরাও করিয়া ফেলিল। মুরলা একখানি তরবারি আনিয়া শত্রুগণ দেখিতে-না-দেখিতেই বিদ্যুতের মত বেগে আসিয়া নজীবকে প্রদান করিলেন। নজীব-উদ্দৌলা তরবারি পাইয়া ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় গর্জন এবং আক্ষালন করিয়া উঠিলেন। তাহার প্রতাপ দেখিয়া সকলে স্তম্ভিত হইল। শাখারূপ লণ্ডুধারী সৈনিকগণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। তাহারা একটু সরিয়া দাঁড়াইল। নজীব-উদ্দৌলা মুরলাকে বলিল, “ইহাদিগকে স্বীয় স্বীয় তলোয়ার প্রত্যর্পণ কর। অস্ত্রহীনের সহিত যুদ্ধ করায় কোনও পৌরুষ নাই। কেমন যোদ্ধা তা আমি দেখে নিব। আমাকে নিদ্রিতাবস্থায় বন্দী করিয়াছে; আমি তার সমুচিত শিক্ষা প্রদান করব।”

মুরলা বলিল, “শত্রুকে বলশালী করা ভাল নহে। এতগুলি লোকের সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়লাভ করা সহজ নহে। নিরস্ত্র অবস্থাতেই আঁটিয়া উঠা কঠিন, তাতে এরা সশস্ত্র হলে আপনার জীবন নাশের আশঙ্কা।”

নজীব : তুমি নিশ্চিন্ত থাক। আম্বাহর কৃপায় এরা কখনও যুদ্ধ করে জয়লাভ করতে পারবে না। এরা যোদ্ধা নহে, লুঠেরা মাত্র। দাও, তুমি শীঘ্র এদেরকে তরবারি দাও।

নজীব-উদ্দৌলার পীড়াপীড়িতে মুরলা বর্গীদিগকে তরবারি দান করিল। বর্গীরা তরবারি পাইয়া নজীবকে চতুর্দিক হইতে ঘিরিয়া ফেলিবার উপক্রম করায় ফিরোজা বেগম ত্রিশূল হস্তে সংহারিণী মূর্তিতে পশ্চাত্তানে দণ্ডায়মান হইয়া শত্রুর গতিরোধ করিতে লাগিলেন।

নজীব-উদ্দৌলা পরাক্রান্ত এবং নিপুণ যোদ্ধা ছিলেন। সুতরাং তিনি প্রবল বিক্রমে ও ষোঁশলে অল্পকালের মধ্যেই তিন জন দস্যুকে ছিন্নমুণ্ড করিয়া ভূপতিত করিলেন। ত্রিশূল-আঘাতে ফিরোজা বেগমও এক জনের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। একজন পূর্বেই ফিরোজা কর্তৃক নিহত হইয়াছিল। এক্ষণে অবশিষ্ট দুইজন প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে উদ্যত হওয়ায় একজনকে মুরলা ধরিয়া ফেলিল। কিন্তু আর একজন তড়িৎগতিতে অশ্বারোহণপূর্বক সেই বনপথেই বিদ্যুৎবেগে অশ্ব ছুটাইয়া পলায়ন করিতে লাগিল।

বর্গী সঙ্কীর্ণ বনপথে অগ্রসর হইয়া অবশেষে একটি প্রকাণ্ড বিলের নিকটে অশ্ব হইতে অবতরণপূর্বক একটি বনের আড়ালে পাত্ৰ হইয়া গেল। নজীব-উদ্দৌলা অতি দ্রুত অশ্ব ধাবিত করিয়া সেই ঝোপের নিকটবর্তী হইয়া বর্গীকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু সমস্ত বন ভুল ভুল করিয়াও যাহাটীর আশ কোনও অনুসন্ধান করিতে পারিলেন না। দেখিলেন, শূন্যপৃষ্ঠ ঘোড়াটি মাত্র বিচরণ করিতেছে। নজীব-উদ্দৌলা অত্যন্ত পরিপ্রান্ত হইয়াছিলেন। অন্যদিকে ফিরোজা এবং মুরলা অনেক পিছনে পড়ায়, তাহাদের জন্যও সেই স্থানে অপেক্ষা করিতে

লাগলেন। কিছু পরেই ফিরোজা এবং মুরলা আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ফিরোজা বলিলেন, “বর্গীটা কোথায় গেল? আপনি তাকে ধরতে পারেন নাই?”

নজীব : বর্গী এই খোপের ভিতরে প্রবেশ করেছে; কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, তাকে বুঝে পেলাম না।

ফিরোজা : তবে অন্য কোনও দিক দিয়ে পলায়ন করেছে।

নজীব : নিশ্চয়ই না। আমি বিশেষ লক্ষ্য করেছি। আর বিশেষ কথা হচ্ছে যে, খোপের চতুর্দিকে কোনও রূপ জঙ্গল নাই; সুতরাং তার পক্ষে লুকিয়ে পলায়ন করা অসম্ভব।

“তবে এখানেই আছে।” এই বলিয়া ফিরোজা এবং মুরলা আবার সেই বনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অশ্বপদমণ্ডিত-ওলোর এবং ঘাসের চিহ্ন ধরিয়া বিশেষ সাবধানতার সঙ্গে অনুসরণ করিতে লাগিলেন। অনুসরণ করিতে করিতে একখণ্ড বৃহৎ প্রস্তরের নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। ফিরোজা প্রস্তর দেখিয়া বলিলেন, “বর্গী এই প্রস্তরের নীচে পলায়ন করে নাই তো?”

মুরলা : এত বড় প্রস্তর উত্তোলন করাই অসম্ভব।

ফিরোজা : তা তো বটেই। তবু এস, একবার ধরা যাক্ না কেন? লোকটা গেল কোথায়? এখান হতে হয় আসমানে উঠে গিয়েছে, না হয় জমিনে প্রবেশ করেছে। পাথরখানা গুরুতর নাও হতে পারে।

এই বলিয়া ফিরোজা এবং মুরলা পাথরখানির নীচে হাত দিয়া উঠাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু তাহাদের কি সাধ্য যে, পাথরখানিকে কিছুমাত্র নড়ায়। পাথরখানি একটুও নড়িল না।

মুরলা বলিল, “আপনার যেমন বুদ্ধি, তিনটা হাতী যে পাথর নড়াইতে পারিবে না, আপনি সেই পাথর উত্তোলন করিতে সাহস করেন। ইহা হঠকারিতা ব্যতীত আর কিছুই নহে।”

ফিরোজা মুরলার কথায় কর্ণপাত না করিয়া চতুর্দিকস্থ বৃক্ষাদি শ্যেনদৃষ্টিতে নিপুণভাবে দেখিতে লাগিলেন। একটি বৃক্ষের গোড়ায় সামান্য একটু খোঁড়ল দেখিলেন। খোঁড়লের মধ্যে দৃকপাত করিয়া হাতালীর যতন কি বেন দেখিতে পাইলেন। সেই হাতালী ধরিয়া জোরে আকর্ষণ করা মাত্রই সেই প্রস্তরের এক প্রান্ত ক্রমশঃ উঁচু হইতে হইতে একেবারেই ঝাড়া হইয়া গেল। এই অভাবনীয় কাণ্ড দেখিয়া ফিরোজা এবং মুরলা আশ্চর্যবিত্ত হইয়া নজীব-উদ্দৌলাকে আহ্বান করিলেন।

নজীব-উদ্দৌলা আসিয়া দেখিলেন যে, প্রস্তরের নীচে সুড়ঙ্গ রাস্তা; সুড়ঙ্গ বেশ প্রশস্ত।

তখন সকলেই বুঝিতে পারিলেন যে, এই পাতালপুরী হইতেছে দস্যুদিগের নিহৃত গৃহ। এখানে নিশ্চয়ই তাহাদের তত্ত্ব ভাণ্ডার আছে।

নজীব-উদ্দৌলা বলিলেন, “এই পাতালপুরীতে বিশেষ সাবধানে প্রবেশ করতে হবে। কত দস্যু এখানে আছে, তা’ অবগত হওয়া আবশ্যিক। তৈরবী মূর্তি পরিত্যাগ করি তোমাদিগকে মারাঠী সৈনিকবেশে সজ্জিত হওয়া আবশ্যিক।”

ফিরোজা ও মুরলা উভয়েই তখন নিহত মারাঠী দস্যুদিগের বস্ত্র ও উজ্জীষ সংগ্রহ করিয়া মারাঠী বর্গীর বেশেই সজ্জিত হইলেন। রাত্রিকালেই দস্যুদিগের গমনাগমনের সময় বিবেচনাপূর্বক তিনজনে পরামর্শ আঁটিয়া সেই বিরাট কোণের মধ্যেই লুক্কায়িত হইয়া রহিলেন। রাত্রি দুই প্রহরের সময় দেখিতে পাইলেন যে, একদল মারাঠী দস্যু টাকার তোড়া মস্তকে বহন করিয়া মশাল হস্তে ওহাৰ দিকে অগ্রসর হইতেছে। ষাদশজনের মস্তকে টাকার তোড়া এবং তিনজনের মস্তকে অলঙ্কার-পত্রের পুঁটুলী বলিয়া বোধ হইল। সকলের হস্তেই উলঙ্গ তরবারি। দস্যুগণ বরাবর সরাসর সেই প্রস্তরের নিকটবর্তী হইয়া শিকল টানিয়া ষারোনোচন করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবার পরে প্রস্তরখানি আপনা আপনি আবার সুড়ঙ্গের মুখে চাপিয়া গেল।

নজীব-উদ্দৌলা, ফিরোজা বেগম এবং মুরলা সকলেই বুঝিতে পারিলেন যে, এই গুপ্ত পাতালপুরীতে মারাঠীদিগের বিশাল ধনভাণ্ডার সংস্থাপিত। এই ধনভাণ্ডার লুণ্ঠ করিতে পারিলে বিপুল যুদ্ধের আয়োজন হইতে পারে। কিন্তু কি উপায়ে এই পাতালপুরী অধিকার করিতে পারা যায়, তাহাই হইতেছে বিষম সমস্যা। এই বিপুল অর্থ কিরূপেই বা এখন হইতে দিল্লীতে লইয়া যাইতে পারা যায়, তাহাও এক দুর্ভহ সমস্যা। দিল্লী এখান হইতে বহু দূরে। সমস্ত পথেই বর্গীদিগের আনাগোনা। মুসলমানের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি! প্রকাশ্যে এই অর্থ লইয়া যাইবার সম্ভাবনা অসম্ভব।

গুপ্ত আক্রমণ হঠাৎ লুণ্ঠন করিয়া গুপ্তভাবে লইয়া যাওয়া ব্যতীত আর কোনও উপায় নাই। এখন চূপ করিয়া এখান হইতে পলায়ন করাই শ্রেয়ঃ। তাহারাই এই গুপ্ত ভাণ্ডারের তত্ত্ব জানিতে পারিয়াছে, কোনওরূপে দস্যুদের মনে এতদূর সন্দেহের উদ্বেক হওয়াই ভীষণ ক্ষতিজনক। সুতরাং সকলে মিলিয়া নীরবে সেস্থান ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিবার জন্য উদ্যত হইলেন।

নজীব-উদ্দৌলা এই গুপ্তস্থানের নকশা ও পথঘাটের নির্দেশ বিশেষরূপে লিখিয়া লইলেন এবং পর্যবেক্ষণ করিয়া স্বরণযোগ্য করিয়া রাখিলেন।

নজীব-উদ্দৌলা ফিরোজা বেগমকে বলিলেন, “এই গুপ্ত পাতালপুরীর সমস্ত রহস্য অবগত হওয়া আবশ্যিক। আমার যার-পর-নাই কৌতূহলের উদ্বেক হচ্ছে। তৎপর অর্থের পরিমাণ এবং ওহাবাসী দস্যুদিগের সংখ্যা ভাল করে বিদিত হওয়া একান্ত আবশ্যিক। দেশে ফিরে এই গুপ্ত-গৃহ আক্রমণ করবার বিহিত উপায় অবলম্বন করা আবশ্যিক।” এই বলিয়া সকলেই পান্নোথানপূর্বক সত্তর্পণে অন্য দিকে রওয়ানা হইলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

মারাঠী সৈনিকের বেশ পরিধানপূর্বক তিনজন সেই গভীর অন্ধকারে সেই সরোবরতটে উপস্থিত হইয়া, ক্রান্তি বোধ করায় বিশ্রামলাভ মানসে সেই স্থানেই যত্নে অতিবাহিত করিলেন। পরদিন প্রভাতে দস্যুদিগের ঘোড়াগুলির মধ্য হইতে আরোহণের জন্য তিনটি উৎকৃষ্ট অশ্ব বাছিয়া লইয়া অবশিষ্টগুলিকে তাড়াইয়া দিয়া সকলেই বিছোখরীর মন্দিরের পথে অগ্রসর হইলেন। যাইতে যাইতে নজীব-উছৌলা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, “মারাঠী দস্যুদিগের অত্যাচার হতে অব্যাহতি লাভের আর কোনও উপায় নাই।” এই বলিয়া নজীব-উছৌলা, ফিরোজা বেগমের অপহরণের কথা তুলিয়া গভীর দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ইহা যে সেনাপতি সদাশিব রাও-এর ষড়যন্ত্র ও অভিসন্ধি ব্যতীত আর কিছুই নহে, তাহা উভয়েই বিশ্বাস করিলেন। ফিরোজা বলিলেন, “আমার অপহরণের পরে আর কি ঘটনা ঘটেছিল? আপনি তখন কোথায় ছিলেন এবং কি করছিলেন?”

নজীব : আমি পূর্বেই আহত এবং সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ি। চৈতন্য লাভের পরে বুঝতে পারলাম যে, দস্যুরা তোমাকে হরণ করে নিয়ে গিয়েছে। সদাশিব রাও-এর ধোঁকাবাজী এবং ষড়যন্ত্রে প্রথমতঃ সকলেই এই লুচন ভরতপুরের রাজ্য কর্তৃক সংঘটিত হয়েছে বলে রটনা এবং সিদ্ধান্ত করেন। সুতরাং ভরতপুর রাজ্য আক্রমণ করবার জন্য বাদশাহ্ স্বয়ং মারাঠীদিগের সহায়তার জন্য অভিযানে উদ্যত হন। কিন্তু ভরতপুররাজ ছত্রসিংহ এই ঘটনার কথা অবগত হয়ে স্বকীয় দোষ ঝালনের জন্য বাদশাহকে এক বিনীত পত্র লিখে জানান যে, তিনি এই লুচনের বিষয়ে বিম্বুবিসর্গও অবগত নহেন। তাঁর দ্বারা এইরূপ ঘৃণিত ও কলঙ্কজনক পাপকার্যের অনুষ্ঠান কদাপি সম্ভবপর নহে।

“তথাপি তাঁর কথা বিশ্বাস না করে বহু সুদক্ষ গুণ্ঠের লাগিয়েও ভরতপুরে তোমার কোনও অনুসন্ধান পাওয়া যায় না। কিন্তু সদাশিব রাও তথাপি ভরতপুর আক্রমণের জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি করতে থাকেন। সম্রাট তাঁর অনুরোধ ও উস্তেজনায পড়ে ভরতপুরে অভিযান করেন। কিন্তু আমি ছয়বেশে তোমার অনুসন্ধান দক্ষিণাত্যে আগমন করে সন্ন্যাসীর বেশে মারাঠী সৈনিকদিগের নিকট অনুসন্ধান করতে লাগলাম।

“এক জনের কাছে সন্ধান পেলাম যে, তুমি সেতারার আছ। হিন্দু সন্ন্যাসীর বেশে সেতারার দিকে রওয়ানা হলাম, একদিন একটি মন্দিরে প্রবাসী ছিলাম। স্বপ্নের ঘোরে রাত্রিতে “ইয়া আক্বাহ” বলে ফেলি। এতেই আমাকে মুসলমান সম্বন্ধে প্রেক্ষার করতঃ বিব্রত করে খবনা দেখতে পায়। খবনা দেখে আমাকে

কঠোর নির্বাচন করতে থাকে। আমাকে মেয়ে ফেলনার জন্যই তাদের সংকল্প ছিল। কিন্তু আমার পরিচয় দেওয়ার এবং সেনাপতি সদাশিব রাও আমার বন্ধু বলে দাবী করার তারা সেভারা ভিত্তিমুখেই আমাকে নিয়ে যাচ্ছিলেন। পথে তোমরা আমাকে মুক্ত করেছ।”

কিরোজা : তবে তো আপনি অপারিসীম কষ্ট ও লাঞ্ছনা ভোগ করেছেন। আর মিছামিছি উত্তরপুরের রাজা, বাদশাহ্ ও মারাঠী কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছেন। সে বেচারী সম্পূর্ণ নির্দোষ। এই নির্দোষকে বন্ধা করাই এক্ষণে আমাদের সর্বপ্রধান ধর্ম। আমাদিগকে এখনই দিল্লীর অভিমুখে রওয়ানা হওয়া কর্তব্য।

নজীব-উদ্দৌলাও ইহাতে সম্মত হইলেন। অশ্বারোহণে যাইতে যাইতে কিরোজা বেগমও আপনার সঙ্কীর্ণ আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিলেন।

নজীব-উদ্দৌলা সমস্ত ঘটনা শুনিয়া আত্মহত্যার প্রশংসা কীর্তন করিলেন।

অন্তঃপর নজীব-উদ্দৌলা, বেগম ও মুরলা অপরাহ্নকালে এক রমণীয় নির্ঝরতীরে উপনীত হইলেন। এই স্থানের দৃশ্য যার-পর-নাই রমণীয় ছিল। বৃক্ষাবলীর হরিৎকান্তি, দুর্বাদলের শ্যামলচ্ছটা, পুষ্পভারাবনত ললিত লতিকাকুলের নখর শোভা, কুসুমসৌরভবাহী সমীরণের মৃদুমন্দ সঙ্কারণ, বিহগাবলীর মধুর কূজন, নির্ঝরবাবির কুলু-কুলু নিঃস্বন, মৃগশিতদিগের ধাবন ও কুর্দন, ময়ূর-ময়ূরীর মোহন নর্তন তাঁহাদিগের চিত্ত ভাবাকুল করিয়া তুলিল! নির্ঝরতীরস্থ একটি রমণীয় বিরাট তমালতলে সকলে উপবেশন করিলেন। মুরলা অশ্বগুলি বৃক্ষে বাঁধিয়া ফল আহরণের জন্য বনের ভিত্তর প্রবেশ করিল।

বেগম ও নজীব নির্ঝরতীরে বায়ু সেবন করিতে লাগিলেন। শীতল বাতাসে দুই জনে বড় আরাম বোধ করিলেন। বায়ু প্রবাহে তমাল-অবলম্বিনী মালতী লতা হইতে ফুল ঝরিয়া ঝরঝর করিয়া তাঁহাদের মাথার উপর পড়িতে লাগিল। কোকিল-দম্পতি তাঁহাদেরই সমুখস্থ একটি গাছের ডালে বসিয়া ডাকিতে লাগিল। মাথার উপরে পুষ্পতলে পুষ্প পুষ্প ভ্রমর গুঞ্জন করিতে লাগিল! চতুর্দিকের নানা বর্ণের বিচিত্র সুন্দর প্রজাপতির দল উড়িয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিহার করিতেছিল। পশতলে নির্ঝরজলে মৎস্যগুলি দলে দলে বিচরণ করিতেছিল। অদূরে পাপিয়া পিউ পিউ তানে আকাশের গারে লহর তুলিয়া ভাবুকের প্রাণে ভাব জাগাইয়া, ধোমকের মনে প্রেমস্রোত বহাইয়া ছুটিতেছিল। চতুর্দিকের এই মোহিনী শোভা, কুলরাগের এই কুলবিভা, দম্পতীর মনে প্রেমের আভা জ্বালাইয়া দিল। এমন সময়ে স্রোতের তীরস্থ একটি পাষণ্ডখণ্ডের উপর কপোতমিথুন কোথা হইতে উড়িয়া আসিয়া উপবেশন করিল। তাহার নাচিয়া নাচিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া ডাকিয়া ডাকিয়া প্রেম-সোহাগে নব অনুরাগে দন চুষন ও আশ্বিন করিতে লাগিলেন।

কপোত-কপোতীর এই প্রেমের সোহাগে, নজীব-উদ্দৌলা ও বেগমের মন, প্রেমের উত্তেজনায় জ্বাকুল ও মগ্ন হইয়া উঠিল। নজীব-উদ্দৌলা বাহবেষ্টনে

বেশমকে আলিঙ্গন করিয়া অধরসুখা পানে উদ্যত হইলে, বেশম চমকিত হইয়া দূরে সরিয়া দাঁড়াইলেন। অতঃপর নজীব-উদৌলার পদস্পর্শ করিয়া কৃতান্তিগুণে পদগদগদে বলিলেন, “হামিন! দাসীর অপরাধ মার্জনা হউক, তুমি আমার হৃদয়ের একমাত্র প্রেম-দেবতা। তোমার সেবাই আমার পরম ধর্ম। তোমার বাসনা পূরণই আমার একমাত্র প্রেম-ধর্ম। তোমার প্রেমাসূত পানের আশায় এ হৃদয় সাহসার ন্যায় দৃঢ় হচ্ছে। প্রেম-জোয়ারের প্রবল তরঙ্গে আমার হৃদয়ডট চূর্ণ-বিচূর্ণ হচ্ছে। শরীরের প্রতি অণু-পরমাণু মিলনের জন্য তীব্র আকর্ষণ করছে! ভোগের বাসনা লাগসার কামনায় আমাকে উন্মত্ত করে রাখছে! প্রাণের মর্মে সহস্র ধারায় মিলনতরঙ্গ তুমি ডুয়ুল হয়ে উঠছে। নারী আমি—এই অনিবার্য শরীর ও হৃদয়ধর্মকে কি কঠিন ও কঠোর সাধনায় অবরুদ্ধ করবার চেষ্টা করছি, তা একবার চিন্তা করে দেখ।

“প্রিয়তম! হৃদয়বস্ত্র! আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, যতদিন পর্যন্ত মারাঠীদিগের ক্রান্ত্যাস হতে স্বর্গাদপী পরীয়াসী জননী জন্মভূমি ভারতবর্ষের রাজমুকুট ও সিংহাসন রক্ষা করতে না পারছি—যতদিন আবার ইসলামের গৌরবচ্ছটায় মারাঠী দস্যুর অত্যাচার দূরীভূত করতে না পারছি—যতদিন দিল্লীর বাদশাহী প্রভুত্বকে সার্বভৌম ও একচ্ছত্র না করতে পারছি—যতদিন ভারতীয় প্রজাবৃন্দের ধন-জ্ঞান ও মান-সম্মানকে সংরক্ষিত করতে না পারছি, ততদিন পর্যন্ত যৌবন ও জীবনকে সর্বপ্রকারের ভোগবিলাস এবং দাম্পত্য জীবনের চির-আকাতিকত প্রেমাসূত পান হতে বঞ্চিত রাখব।

“হামিন! যে নারীর লক্ষ লক্ষ ভ্রাতা-ভগ্নী কাকেরের অত্যাচার-অবিচারে ও দাসত্বচক্রের কঠোর নিষেধে নিষেধিত, সে নারী সম্বন্ধে কেমন করে হামী-সেবার আপনাকে উৎসর্গ করবে?

“হামিন! আমি নারী, তুমি আমার সর্বতোভাবে বরণীয় ও পূজনীয়। কিন্তু ষাওন্দ! মারাঠী কাকেরের নৃশংস ও পৈশাচিক অত্যাচারে প্রাণের পর্দায় পর্দায় যে তীব্র তীষণ অনলকুণ্ড প্রজ্বলিত হচ্ছে, তাতে আমি স্বজাতিসেবার আত্মনিয়োগ ও প্রয়োজন হলে আত্মবিরোধের জন্মই উন্মত্ত হয়ে পড়েছি। তাই আমি প্রাণ খুলে আকুল আবেগে তোমার সম্মতি ও উৎসাহ পাবার জন্য পতীর আশা পোষণ করছি। বল প্রাণেশ্বর! তাতে আমার দোষ নিষে না? আমাকে সদভুক্তি প্রদান করে কঠোর ব্রত-চারিণী হবার জন্য প্ররোচিত করবে।”

নজীব : তোমার প্রাণ অতি উদার! তোমার ভেজঃ অপরিমিত। তোমার লোকহিতৈষণা, স্বজাতি ও স্বদেশপ্রেম নিতান্তই প্রশংসনীয়। কিন্তু কথা হচ্ছে এই যে, তুমি সামান্য স্ত্রীলোক হয়ে বিপুল শক্তিশালী পুরুষ মারাঠী দস্যুদিগকে কিরূপে দমন করতে সমর্থ হবে? ভারতীয় মোসলেম নৃপতিবৃন্দ এখনও প্রকলভাবে সম্ববদ্ধ হয়ে মারাঠী দমনে অগ্রসর হলে, মারাঠীদিগকে সম্মুখে নির্মূল করা যায়। কিন্তু হার! তারা নিজ নিজ স্বার্থে অন্ধ হয়ে সেদিকে কেউই মনোপ

করছে না? তারা বরং পরস্পর পরস্পরের অনিষ্ট সাধনে রত হয়ে ক্রমশঃ
আপনাদিগকে দুর্বল ও মারাঠীদিগকে প্রবল করছে। যে জাতির রাজা ও
রাজপুরুষগণের এতাদৃশ দুর্দশা ও অশ্রু, তাদের আর কল্যাণ কোথায়?

“প্রাণেশ্বর! মারাঠা দস্যুগণ যেদিন হতে দিল্লী আক্রমণ করে লুণ্ঠন করেছে,
সে দিন হতেই অন্তঃকরণে যে প্রতিহিংসানল প্রজ্বলিত হয়েছে, তার দুর্বর দহনে
আমি নিরন্তর দহ হচ্ছি। নানান্থানে গুপ্তচর ও বিশেষ ব্যক্তিদিগকে প্রেরণ করেও
মুসলমান নবাবদিগকে উত্তেজিত ও উদ্বুদ্ধ করতে পারলাম না। দিল্লীর বাদশাহের
সহিত এখনও যদি বাংলা, অযোধ্যা, কর্ণাটের নবাব এবং সিন্ধুর আমীর,
হায়দ্রাবাদের নিজাম ও মহীশূরের সোলতান যোগ দেন, তবে মারাঠীদিগকে
আমরা অনায়াসেই উৎসাদিত করে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে শান্তি ও ধর্মের রাজ্য
স্থাপন করতে পারি। কিন্তু হায়! এই সমস্ত স্বার্থপর নবাবগণের অন্তঃকরণে
স্বজাতি ও স্বধর্মের প্রতি প্রেম ও শ্রদ্ধা কিছুই নাই! এই মহা পাপেই এই সমস্ত
হতভাগ্যগণের রাজত্ব অচিরেই বিনষ্ট এবং বংশধরগণ সত্বরই নির্বংশ বা নীচাশয়
নরাধমে পরিণত হবে। এই রাজরাজড়গণকে ধর্মযুদ্ধে উৎসাহিত করতে না
পারলে, আমাদের দ্বারা কোনও কার্যই সাধিত হবে না।

“প্রাণেশ্বর! মারাঠীগণ যে-দিন হতে তোমাকে হরণ করেছে, সেই দিন হতে
তাদের ধ্বংস সাধনের জন্য আমি আরও উন্মত্ত হয়ে উঠেছি। আমিও প্রতিজ্ঞা
করেছি যে, মারাঠী-রক্তে ভারতভূমিকে ধৌত করতে হবে। আমি নিজে আবার
প্রাণপণ চেষ্টা করে দেখব। স্বজাতির প্রভাব প্রতিপত্তি ও প্রভূত্ব প্রাধান্যের হ্রাস
দেখে যার প্রাণে দুঃখের সঞ্চার না হয়, সে মহাপাষণ্ড, মালাউন। কবি সত্যই
বলেছেন :

হউক সে মহাজ্ঞানী মহা ধনবান
অসীম কমতা তার অতুল সন্ধান!
হউক বিভব তার সম সিদ্ধজল
হউক প্রতিভা তার অকুপ্প উজ্জ্বল!
হউক তাহার বাস রম্য হর্মা মাঝে,
ধাক্ক সে মণিঘর মহামূল্য সাজে।
হউক তাহার রূপ চক্রে উপম,
হউক বীরেন্দ্র সেই যেন রে রোস্তম!
শত শত দাস তার সেবুক চরণ,
করুণ প্রাবকগণ তব সঙ্গীর্ভন!
কিন্তু সে সাধেনি কত জনভূমি-হিত
স্বজাতির সেবা যেবা করেনি কিকিৎ;
জানাও সে নরাধমে জানাও সত্বর
অতীব বৃণিত সেই প্যাষণ্ড বর্বর!

বৃথা যে জনম তাম্‌ বৃথা যে জীবন,
 অতি অপদার্থ সেই অভাগা অধম।
 মারিবারে দাও তারে কীটের মতন
 করিও না কোন জন বিলাপ ক্রন্দন।
 ত্রমেও তাহারে কেহ করো না সম্মান,
 অশ্রুতা কুকুর সম কর তারে জ্ঞান।
 শত কর হোক তার জাহান্নামে বাস,
 গুণ্ড হক ধরা হতে নাম বংশ বাস।

বেগম! তোমার সম্বন্ধিনী বাণী ও কঠোর পণ দেখে প্রাণে গভীর আনন্দ ও
 ভীষণ উত্তেজনার সৃষ্টি হচ্ছে। তোমা হেন ভেজবিনী রমণীরত্ন লাভে আজি হৃদয়ে
 যে ভেজঃ ও গর্ব বোধ করছি, তার তুলনা নাই। রহিম রহমান আত্মাহুতীলা
 তোমার মনোবাসনা পূর্ণ করুন। আমি তোমাকে আনন্দের সঙ্গে এই মহান ব্রত
 উদ্‌যাপনের জন্য আদেশ ও অনুরোধ করছি। সিদ্ধিপথে কাঠিন্য ও বাধা দেখে
 ভীত হলে চলবে না। গভীর ও কঠোর সাধনা এবং চেষ্টার বলে সমস্ত
 কঠিনতাকে তরল এবং বাধা-বিঘ্নকে চূর্ণ করতে হবে। প্রাণের আন্তন খুব বেশী
 চাই। তাহলেই সাধনা চরম ও পরম হবে। উপযুক্ত সাধনা হলে সিদ্ধিলাভ
 অনিবার্য।

বেগম : এক্ষণে উপায় নির্ধারণ এবং কার্যপ্রণালী ঠিক করাই হচ্ছে আসল
 কথা। পথ দেখাতে পারলেই লোকও ক্রমশঃ পাওয়া যাবে। আমার মতে
 জনসাধারণকে উত্তেজিত করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করতে হবে। রাজানবাবদিগের
 আশা ত্যাপি করে অভ্যাচারিত যারা—উৎপীড়িত যারা, তাদিগকেই
 প্রতিহিংসাপরায়ণ করতে হবে। তার জন্য শত শত সহস্র সহস্র লোক চাই।
 আমাদের আলেমগণ এ কার্যে লিপ্ত হলে অতি সহজেই সম্পন্ন হতে পারে। প্রধান
 প্রধান ব্যক্তি ও সর্দারগণের প্রবল সহানুভূতি চাই। তৎকালে ছদ্মবেশে গ্রামে গ্রামে
 পদ্বীতে পদ্বীতে গিয়ে মারাঠীদিগের বিরুদ্ধে একযোগে অভ্যুত্থানের জন্য
 প্রাণপণে চেঁচা করতে হবে। তার পর সর্বপ্রধান কথা হচ্ছে—নেতা। এমন নেতা
 চাই, যার নেতৃত্বের নাম তনলেই উৎসাহে প্রাণে নেচে উঠবে। আমার বিশ্বাস,
 ভারতবর্ষের কোনও রাজা নবাবের নেতৃত্বে ভারতীয় রাজ্যাধিপতিগণ বা
 জনসাধারণ কদাপি অভ্যুত্থান করবে না। বিলাসবাসনে ভারতীয় রাজন্যবর্গ
 ইসলামী হিন্দু ও কুণ্ড একেবারে হারিয়ে বসেছেন। আর সবচেয়ে সঙ্কটের কথা
 এই যে, তারা কেউ কাকেও মানতেও চায় না। সকলেই নিজেকে শ্রেষ্ঠ এবং
 মাননীয় বলে মনে করেন। বাদশাহ্‌ নিজে শক্তিশূন্য এবং মারাঠীদিগের হাত-
 ধরা।

নজীব : তবে তুমি কি করতে চাও?

বেগম : ভারতের বাহির হতে কোন স্বাধীন নরপতিকে আহ্বান করে আনতে হবে—নতুবা ভারতীয় মুসলমানগণকে কিছুতেই জেহাদের পবিত্র পতাকা নীচে সমবেত করা সম্ভব হবে না।

নজীব : কাকে আনতে চাও? আদমদ শাহ আব্দালীকে বুঝি?

বেগম : নিশ্চয়ই। তাছাড়া উপযুক্ত আর কাকেও তো দেখি না। তাঁর ব্যায় যুদ্ধশ্রীর বীর নরপতি ব্যতীত, এই মহাসমরের এবং মহা অত্যাচারের নেতৃত্ব আর কেউ নিতে পারবে না।

নজীব : নির্বাচনটি মনের মতই হয়েছে—এখন এই দুঃসাহসিক সমরে তাঁকে টেনে আনতে পারলে হয়।

বেগম : তার ভার আমার হস্তে। আমি তাঁকে যেকোনো হোক সম্বত করাব। সে দৌত্য-কার্যে আমি নিযুক্ত হব।

নজীব : বটে! এমন দূতী না হলে চলবে কেন?

বেগম : দূতীরূপে যাব না, দূতরূপেই যাব। যদি দূতের বেশে না হয়, তবে দূতীরূপে—ভয়ঙ্করীরূপেই প্রকট হব।

নজীব : ধন্য তোমার সাহস! তোমার কবিত্ব, বাগ্মীতা ও তেজস্বিতা ছাড়া আব্দালী শাহকে অভিত্ত করিতে সমর্থ হও, এই প্রার্থনা করি। তোমার প্রাণে বীরবর রোক্তম ও খালেদের ভেজের আবির্ভাব হোক। আমিও তোমার সঙ্গে যাব।

বেগম : না, তার দরকার নাই। আপনি দেশে থেকে দেশীয় রাজন্য এবং সর্দারবৃন্দকে যুদ্ধের জন্য উত্তেজিত ও প্রস্তুত করতে থাকুন। অস্ত্র ও অর্থ সম্বলহেয় জন্য বিশেষ চেষ্টা করতে হবে।

নজীব : আফগানিস্তানে পমন করা সহজ ব্যাপার নহে! অনেক বাধা বিঘ্ন ঘটতে পারে।

বেগম : ঘটুক। ঘটবার জন্যই তো এ ব্রত অবলম্বন করেছি। মস্তকের সাধন কিম্বা শরীর পাতন।

নজীব : ধন্য তোমার সাহস ও সহিষ্ণুতা।

এইরূপ আলোচনা করিতে করিতে তিন জনে সতর্ক ও সত্বর্ণপথে পথে অতিক্রম করিতে লাগিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

আজ ভরতপুরের রাজা ছত্রসিংহ কেদার সমস্ত সৈন্য লইয়া চরম বিক্রমে শেখ বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। মারাঠী এবং দিল্লীপতির মুসলমান সৈন্যের প্রতাপ ও প্রভাবে বহু সংখ্যক জাঠসৈন্য নিহত হইলেও জাঠদিগের

সৈন্যবল বুঝবে শী পারমাণে ক্রাস হইয়াছিল না ।

রাজা হুমায়ুন সিংহ একটি সমুদ্র তেজস্বী অশ্ব আরোহণ করিয়া সেনাপতি হুমায়ুন সিংহ এবং যুবরাজ হুমায়ুন সিংহ সহ বীরের ন্যায় অত্যাশ্রয় প্রতাপে মারাঠী-বাহিনীকে বিশেষরূপে আক্রমণ করিয়া তাদের ব্যূহ বিদীর্ণ ও বিশীর্ণ করিয়া ফেলিলেন । জাঠগণ ভীষণভাবে বীর্য-প্রতাপ প্রকাশপূর্বক শত্রু নিধন করিয়া সমরক্ষেত্রে দেহপাত করিতে লাগিল । বহুসংখ্যক মারাঠী সৈনিক জাঠদিগের অত্যাশ্রয় অকালে কালসাগরে জীবন-তরণী ভাসাইয়া দিল । মারাঠীগণ জাঠের ক্রোধ ও প্রচণ্ড বিক্রমে পর্যুদন্ত-প্রায় হইলে দিল্লীর শাহী সৈন্যদল প্রচণ্ড তেজে জাঠগণের প্রতিরোধ করিতে প্রবৃত্ত হইল । বীরবর সফদরজঙ্গ প্রকাণ্ডকায় ভেজীওয়ান ভাজী অশ্ব সমাক্রম হইয়া জাঠরাজ হুমায়ুন সিংহকে লক্ষ্য করিয়া প্রবল বলে জাঠদিগকে বিমর্দিত করতঃ অগ্রসর হইতে লাগিলেন । হুমায়ুন সিংহ আসিয়া সফদরজঙ্গের পতিরোধ করিতে প্রবৃত্ত হইলে উভয়ের মধ্যে ভীষণ সময়ের সূচনা হইল ।

হুমায়ুন সিংহ সফদরজঙ্গকে লক্ষ্য করিয়া শাণিত ভল্ল প্রক্ষেপ করিলে, বীরকূলর্ষভ সফদরজঙ্গ মুহূর্তমধ্যে তাহা লৌহঢালে উড়াইয়া দিয়া প্রসারিত করে ভীষণ তরবারি প্রহারে বামকক্ষ সাংঘাতিকরূপে বিকৃত করিয়া দিলেন । হুমায়ুন সিংহ উৎকট লৌহবর্মে বিমর্দিত থাকিলেও তরবারি ভীষণ বেগ প্রভাবে লৌহ-বর্ম ভেদ করিয়া চারি অঙ্গুলি পরিমিত স্বন্ধদেশে বসিয়া পড়িল । অবস্থা শোচনীয় বলিয়া হুমায়ুন সিংহ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে সরিয়া পড়িলেন ।

হুমায়ুন সিংহের পশ্চাদাবর্তনে সফদরজঙ্গ সুবিধা পাইয়া একেবারেই বিপুল বিক্রমে হাইয়া হুমায়ুন সিংহকে আক্রমণ করিলেন । প্রথমে তরবারিতে তরবারিতে ভীষণ যুদ্ধ হইল । অতঃপর তরবারি ভগ্ন ও চূর্ণ হইয়া গেলে, প্রচণ্ড তেজে বর্ষা লইয়া উভয়ে উভয়কে আক্রমণ করিলেন । বর্ষাযুদ্ধ করিতে করিতে সফদরজঙ্গ বাম বাহুতে একটু আঘাত পাইয়া একান্ত উন্মত্ত ও নিতান্ত প্রচণ্ড হইয়া পড়িলেন । অমিতবিক্রম সিংহভেজা সফদরজঙ্গ ভীমবেগে হুমায়ুন সিংহের উরস লক্ষ্য করিয়া এমনভাবে বর্ষা প্রহার করিলেন যে, হুমায়ুন সিংহের লৌহ ঢালের উপর লাগিয়া অগ্নিকুলিঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল এবং সেই বেগে হুমায়ুন সিংহ ঘোড়ার একদিকে যেমন হেলিয়া পেলেন, অমনি সেদিকের রেকাব দোয়াল হইতে ছিঁড়িয়া ভূপতিত হওয়ার হুমায়ুন সিংহও সহসা ভূপতিত হইলেন ।

বীরপুরুষ রাজা হুমায়ুন সিংহের আকস্মিকভাবে এইরূপ ভূপতিত হওয়ার মুহূর্তমধ্যে চতুর্দিকস্থ জাঠসৈন্যদলের মধ্যে একটি অক্ষুট আর্তধ্বনি সমুদ্রিত হইল । জাঠেরা সকলেই ভাবিল যে, এইবার মহাবীর সফদরজঙ্গের শাণিত তরবারি আঘাতে মুহূর্ত মধ্যে হুমায়ুন সিংহের শির গ্রীবাচ্যুত হইবে । কিন্তু সকলেই বিশ্বাসের সহিত দেখিল যে, মুসলিম সেনাপতি শত্রুকে তরবারি প্রহারের পরিবর্তে তাহার বাহু ধরিয়া ভূমি হইতে টানিয়া তুলিলেন ! বীর সেনাপতি চীৎকার করিয়া

বলিলেন, “তোমরা নিশ্চিত থাক। রাজা যতক্ষণ পর্যন্ত পুনরায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত না হবেন এবং আমাকে অস্ত্রে আঘাত না করছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমার তরবারি মুক্ত থাকলেও নিষ্ক্রিয় থাকবে। অপ্রস্তুত শত্রুকে আক্রমণ করা আর মৃত ব্যক্তিকে বধ করা সমান কথা। আমি মুসলমান। তোমরা বিশ্বাস কর যে, আমি হতে বিপন্ন ব্যক্তির জন্য কোনও আতঙ্ক নাই। বিপন্নের প্রতি সদয় হওয়া মুসলমানের পরম ধর্ম!”

উজীরের এই মহানুভবতা দর্শনে জাঠগণ ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। রাজা ছত্রসিংহ সত্বর ভূমি হইতে উঠিয়া আর একটি অশ্বে আরোহণ করিয়া অশ্রুপরিপূর্ণনেত্রে বলিলেন, “মহানুভব সেনাপতি! বড় দুঃখ ও ক্ষোভের বিষয় যে, আপনার ন্যায় মহাপ্রাণ ব্যক্তির সঙ্গে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাকে যুদ্ধ করতে হচ্ছে। হায়! যে দিল্লীর বাদশাহের শরণাগত থাকাই গৌরবের বিষয় বলে পুরুষানুক্রমে মনে করে আসছি, আজ সেই “দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা”র সহিত যুদ্ধ করতে হচ্ছে। যে তরবারি দিল্লীর বাদশাহের সম্মানের জন্য দিল্লীর শত্রু বিনাশ করে চিরকাল পবিত্র হয়ে আসছিল, হায়! হায়! আজ সেই তরবারি দিল্লীপতির সৈন্য-রক্তে কলঙ্কিত হচ্ছে। এ অপেক্ষা লজ্জা ও ক্ষোভের বিষয় আর কি হতে পারে? জানি না, কোন্ পাপের ফলে নিদারুণ লজ্জাকর বিড়ম্বনা ভোগ করতে হচ্ছে। বাদশাহ এবং আপনার কি নিদারুণ ভ্রম! মারাঠী দস্যুগণ বাদশাহের চরম অবমাননা করে এখন আবার মিত্ররূপে প্রকটিত হয়ে মহা সর্বনাশ সাধন করছে! নিদারুণ মোহে আপনারা একেবারে আন্ধন্ন হয়ে পড়েছেন।”

সফদরজঙ্গ বলিলেন, “মহারাজ! যুদ্ধক্ষেত্রে আর সে বিলাপ করে ফল কি? নারী-হরণকারীকে মুসলমান কখনও ক্ষমা করতে পারে না।”

ছত্রসিংহ : উজীর সাহেব। মনে রাখবেন, নারী-হরণকারীকে জাঠও প্রাণের সহিত মৃগা করে। ছত্রসিংহ কখনও নারী-হরণকারী নহে। তাঁর বংশে এ-কলঙ্ক নাই। মারাঠীরাই এ কলঙ্কে কলঙ্কিত! তাদের ষড়যন্ত্রেই অকারণে আমাকে ফিরোজা বেগমের অপহারক বলে ধারণ করছেন।

উজীর : নির্দোষ হলে খোদা আপনাকে কোনও-না-কোনও রূপে এই বিপদ হতে মুক্ত করবেনই। এক্ষণ যুদ্ধ আরম্ভ করা যাক!

এই বলিয়া সফদরজঙ্গ বিপুল বিক্রমে পুনরায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। ছত্রসিংহও চরম প্রতাপে উজীরকে তরবারি-যোগে আক্রমণ করিলেন। দুইজন বিখ্যাত বীর রণরঙ্গে উন্মত্ত-প্রায় হইয়া ঘোরতর রূপে যুঝিতে লাগিলেন। উভয়ের প্রচণ্ড ভীষণবীর্য, সামরিক কৌশল ও অস্ত্র-চালনার নৈপুণ্য দেখিয়া উভয় পক্ষীয় যোদ্ধৃন্দ পুনঃ পুনঃ আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল। ভারত-বিখ্যাত উভয় বীর-পুরুষের ঐশ্বর্য যুদ্ধ যখন চরম প্রতাপে ও পরম বিক্রমে উগ্র হইতে উগ্রতর হইতেছিল, ঠিক সেই সময়ে আপাদমস্তক বর্মপরিহিত দুইজন সৈনিক পুরুষ

বিদ্রোহী ৩৩ উত্তরের মধ্যে বাইরা উচ্চ কণ্ঠে যুদ্ধ নিবারণ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। একজন চীৎকার করিয়া মুখস্ত্রাণ খুলিয়া বলিলেন, “আমি নজীব-উদ্দৌলা, আপনারা বৃথা যুদ্ধ করবেন না। মহারাজ হুজুংসিংহ সম্পূর্ণ নিরপরাধ। কিরোজা বেগমকে পাষাণ নরাদম সদাশিব রাণের অনুচরণগণই অপহরণ করেছিলেন। কিরোজা বেগম স্বয়ং উপস্থিত।”

নজীব-উদ্দৌলার কথা শেষ হইতে মা হইতে কিরোজা বেগম মুখস্ত্রাণ খুলিয়া নিজের পবিত্র পদাবুজ চূষন করিলেন। উজীর সফদরজঙ্গ কন্যার মুখাবলোকন করিয়া পরম উল্লাসবোধ করিলেন। আনন্দ ও অনুভূতের অশ্রুসিক্ত প্রেমপূর্ণ চক্ষু ও হৃদয় লইয়া হুজুংসিংহকে আলিঙ্গন করিলেন। মুহূর্ত মধ্যে সমগ্র জাঠ ও মুসলমান বাহিনীর মধ্যে এক মহা আনন্দ-কল্লোল পড়িয়া গেল। মারাঠীরা স্তম্ভিত এবং চিন্তিত হইয়া পড়িল। বাদশাহ শাহ আলম ক্রোধে, কোপে ও দুঃখে মারাঠী সৈন্যদিগকে বধ করিবার জন্য কঠোর আদেশ প্রদান করিলেন। বীরকুলভিত্তিক নজীব-উদ্দৌলা এবং বীরামনা কিরোজা বেগম প্রচণ্ড বিক্রমে মারাঠীদিগকে বিদলিত করিতে লাগিলেন। শাহী ভোপখানা এবং জাঠদিগের ভোপখানার পোলাশাঙ্গদিগের ক্ষিপ্তকারিতা-প্রভাবে মারাঠী-বাহিনী অচিরেই ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। নজীব-উদ্দৌলা ক্ষিপ্ত আক্রমণ করিয়া মারাঠী সেনাপতি তুলাজী দেশপাণ্ডাকে বন্দী করিয়া ফেলিলেন। রোহিলা-সৈনিক ও বীরগণ দীর্ঘকালের সঙ্কিত জিহ্বাংসায় প্রদীপপ্রায় হইয়া তীব্রতেজে মারাঠী সংহারে প্রবৃত্ত হইলেন। মহারাজ হুজুংসিংহ যে কিরোজা বেগমকে হরণ করিয়াছেন, এ-সম্বন্ধে মুসলমানদিগের অনেকের মনেই গভীর সন্দেহ ছিল, সুতরাং একপে সেই সন্দেহ সত্যে পরিণত হওয়ার মোসলেম ও জাঠ যোদ্ধাবৃন্দ যার-পর-নাই ক্রুদ্ধ ও তেজস্বীভাবে ঘোরতর যুদ্ধ করায় মারাঠী-বাহিনী অচিরেই ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া দিগ্বিদিকে পলায়নপর হইল।

নজীব-উদ্দৌলা, উজীর সফদরজঙ্গ এবং তাঁহার বীর্যবতী ভনম্মা কিরোজা বেগমের অসাধারণ রণপাণ্ডিত্য এবং অস্ত্রকোবিদতা দর্শনে সকলেই স্তম্ভিত হইলেন। আক্ষেপ করিয়া সকলেই বলিতে লাগিলেন যে, মুসলমানকূলে এহেন পরাক্রমশালী শূর ও শূরী বিদ্যমান থাকিতেও, আজ শুধু নবাবদিগের উদাস্য ও স্বার্থপরতার জন্যই মারাঠীগণ দিন দিন অদীন-বিক্রম মুসলিম আধিপত্যকে কুণ্ণ, মলিন ও বিগীন করিতে সমর্থ হইতেছে!

বাদল পরিচ্ছেদ

পতীর অন্ধকারে চতুর্দিক সমাচ্ছন্ন। একে অমাবস্যা রাত্রি, তদুপরি আবার ঘোর ঘনঘটা! কৃকানদীর নুই তীরে ঘন জঙ্গল; তবে মধ্যে মধ্যে ফাঁক আছে।

মেঘাচ্ছন্ন আকাশে মধ্যে মধ্যে মেঘের কাঁক দিয়া দুই একটি তারকা জ্বলজ্বল করিয়া কিরণ ছড়াইয়া অচিরেই আবার মেঘের গুহে ঢাকিয়া যাটতেছে। দেখিয়া মনে হয়, ঠিক যেন অধঃপতিত মুসলিম জাতির পুঞ্জীভূত মূৰ্খতা এবং দুৰ্দশার মধ্যে দু'একটি প্রতিভাশালী লোক অনুগ্রহপূৰ্বক কিয়দিন প্রতিভার রশ্মি বিকীর্ণ করতঃ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া বিরাট সমাজকে গভীর আঁধারে নিমজ্জিত করিতেছেন। অন্ধকারে কৃষ্ণা নদীর জল বহিয়া সাতখানি বৃহৎ নৌকা দ্রুতবেগে দক্ষিণ দিকে ছুটিয়াছে। নৌকাগুলি যাইয়া একটি বৃহৎ বনের আড়ালে লস্কর করিল।

নৌকা হইতে সেই অন্ধকারের মধ্যে ক্ষীণ শ্রদীপ জ্বলাইয়া ২০ জন সশস্ত্র রোহিলা পাঠানসহ নজীব-উদ্দৌলা দ্রুতবেগে পশ্চিম দিকে ধাবিত হইলেন। কিছুদূর যাইবার পরেই একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের পাদমূলে উপস্থিত হইলেন। এইখানে পাঁচ জন মুসলমান সিপাহী পঁচিশটি তেজস্বী অশ্ব লইয়া দাঁড়াইয়াছিল। নজীব-উদ্দৌলা এবং তাঁহার সঙ্গী ২০ জন সৈনিক এবং উপস্থিত দণ্ডায়মান ৫ জন বীর পুরুষ বিদ্যুৎবেগে অশ্বারোহণ করিয়া নজীব-উদ্দৌলার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বনপ্রান্তর অতিক্রম করিয়া ছুটিয়া চলিল। নজীব-উদ্দৌলার সঙ্গে একজন রাহাবর অর্থাৎ পথ-প্রদর্শক ছিল। রাত্রি দেড় প্রহরের সময় এই অভিযানকারীর দল সেই গুহ পাতালগৃহের মুখে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। নজীব-উদ্দৌলা পূর্বের ন্যায় বৃক্কের গহ্বরস্থ হাতাল ধরিয়া আকর্ষণ করিলে আমাদের পূর্বপরিচিত সেই বিরাট প্রস্তরখণ্ড ধীরে ধীরে উন্মিত হওয়ার তন্নিম্নে সুড়ঙ্গ-পথ প্রকাশিত হইয়া পড়িল।

অমনি কর্পূরমিশ্রিত ৬টি প্রকাণ্ড মশাল জ্বলাইয়া চতুর্দিক তীব্র আলোকে আলোকিত করা হইল। দুইটি মশালসহ ৫ জন প্রহরীকে সুড়ঙ্গমুখে রাখিয়া অবশিষ্ট ৪টি মশাল ও ২০ জন সৈনিক সহ নজীব-উদ্দৌলা শাগিত তরবারি হস্তে পাতালগৃহে অবতরণ করিলেন। ৪০টি ধাপ অতিক্রম করিবার পরে একটি প্রান্তরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। এই প্রান্তরের তিন পার্শ্বে সারি সারি একতল অট্টালিকা শ্রেণীবদ্ধরূপে নির্মিত। মশালের শৌ শৌ শব্দে তীব্র আলোকশিখা এবং সৈনিকদিগের পদশব্দে দস্যুগণ সহসা চমকিত এবং ভীতিবিহ্বল হইয়া উঠিল। নজীব-উদ্দৌলার ইঙ্গিতে সৈনিকগণ, দস্যুগণ অনুগ্রহণ করিবার পূর্বেই ৭ জনকে বন্দী করিয়া ফেলিল। অবশিষ্ট ৪ জন তরবারি লইয়া আক্রমণোদ্যত হইলে পাঠান বীরগণ তাহাদিগকে সাংঘাতিকরূপে জখম করিয়া কয়েদ করিয়া ফেলিল।

দস্যুদিগকে কয়েদ করিবার পরে তাহাদের একজনের নিকট হইতে চাবির তাড়া লইয়া নজীব-উদ্দৌলা কয়েকটি ঘরের দ্বার খুলিয়া ফেলিলেন। তিনটি গৃহে তোড়াবন্দী স্বর্ণমুদ্রার ৭০০ শত ধলিয়া ছিল। অবশিষ্ট ৭টি ঘরে কেবল রক্তত মুদ্রা এবং স্বর্ণ-রৌপ্যখচিত নানাবিধ মূল্যবান পদার্থ। একটি গৃহ হইতে দশ বাস্তু মনিমুক্তা বাহির হইল। মণির উজ্জ্বল্যে সমস্ত গৃহ অপূর্ব শোভায় শোভমান হইল। অবশিষ্ট পাঁচটি গৃহ মানা প্রকারের এক-দুই পরিপূর্ণ। এই সমস্ত তরবারি, ছুরি,

ধনুক, বহুমেধ হাতাশী মণি-মুক্তাখচিত এবং স্বর্ণমণ্ডিত। কত দেশের কত রাজস্বাভাড়া, নবাব নাজিম এবং সদার, জমিদার ও জায়গীরদারের হস্তের সখের অস্ত্র-শস্ত্রই যে জমা করিয়াছে কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? একখানি বিরাট আকারের দর্পণ, তাহার চতুর্দিকে সোনার কাঠামে বৃহদাকারের মুক্তার লতা কাটা। দর্পণখানির মূল্য তিন লক্ষ টাকার কম নহে। বস্ত্রখচিত একটি অলঙ্কারের মূল্যবান রুম্বীয়া কৌটা। তাহাতে বৃহদাকারের মুক্তার কাক্কাৰ্য। কানাড়ার এক মুসলমান জায়গীরদারের নাম তাহাতে লেখা আছে। একটি হস্তীদন্তের বাস্ত্র, হীরক কাটিয়া তাহার উপরে গোলাপের গুচ্ছ সাজান হইয়াছে। তাহাতে গুচ্ছগাটের বাহাদুর শাহের বেগম আবেদা বানুর নাম লেখা রহিয়াছে। পাতাল-গৃহটির সাজ-সজ্জাও অতি মনোরম। উপাসনার জন্য তাহাতে কৃষ্ণমর্মরের একটি ক্ষুদ্র মসজিদও আছে। সোলতান বোলবন শাহ তখত ত্যাগ করিয়া জীবনের অবশিষ্ট দিন এখানেই ধ্যান-ধারণায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাহার মৃত্যুর পরে ক্রমশঃ এই পাতালপুরীর উপরিস্থ চূতগে বন-জঙ্গল জন্মিয়া এই স্থানকে শাপদসঙ্কুল এবং মানবের দুর্গম করিয়া তুলিয়াছিল। সেই সময় এখানে দস্যুগণ তাহাদের গুপ্ত অশ্রমের প্রতিষ্ঠা করে। তৎপরে তাহারাও কালক্রমে নির্মূল হইয়া যায়। অতঃপর মারাঠীদিগের অভ্যুত্থানের সময় হতে পেশোয়াগণ এই স্থানকে গুপ্ত ধনাগারে পরিণত করে।

পাতালপুরীর সজ্জিত গুপ্ত-ধনরাশি এবং মূল্যবান জিনিসপত্র দেখিয়া নজীব-উদৌলা বিম্বিত এবং চমৎকৃত হইয়া পড়িলেন। তিনি ভক্তিগদগদ চিত্তে অশ্রুসিক্ত আঁধিতে দুই রাকাত নামাজ পড়িলেন। যে অর্ধাতাবের জন্য তিনি মারাঠীদিগের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণার উদ্যোগ আরোহনে কুণ্ঠিত ছিলেন, অথচ কর্তব্যবুদ্ধির তীব্র উত্তেজনার জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হইতেছিলেন, তাহার সুসার হইবে ভাবিয়া আনন্দে উৎফুল্ল এবং সাহসে সৰল হইয়া উঠিলেন।

এই বিপুল মণি রত্ন এবং অর্ধরাশি বহন করিয়া লইবার জন্য সঙ্গীদের মধ্যে ২০ জনকে নিযুক্ত করিলেন। অতঃপর নৌকা হইতে আরও ৩০ জনকে আনয়ন করিয়া টাকা ও মোহরের তোড়া, মণি-মুক্তার খলিয়া এবং আবলুস কাষ্ঠ ও হস্তিদন্তনির্মিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাস্ত্র পেটিকার আবহু বহুমূল্য জড়োয়া গহনা সকল বহন করিতে নিযুক্ত করিলেন। সমস্ত রাত্রিতে অন্ধারোহী ২০ জন প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও কেবল মাত্র তিনবার অর্ধদিবর তোড়া নৌকার লইয়া বাইতে সমর্থ হইল। অল্পপৃষ্ঠে তিনবারে প্রায় ২০০ শত তোড়া স্বর্ণমুদ্রা বহন করিতে সমর্থ হইল। পদাতিক ৩০ জন সমস্ত রাত্রি পরিশ্রম করিয়া কেবল মাত্র ১২০ তোড়া রৌপ্যমুদ্রা লইতে সক্ষম হইল। রাত্রি প্রভাতে ধন লুটন ব্যাপার প্রকাশ হইতে পারে বলিয়া, নজীব-উদৌলা লুটনে নিরুত্ত হইয়া বিশেষ সতর্কতার সহিত চৌকি দিতে লাগিলেন। দস্যুদিগের আগমনের রাস্তার নানা স্থানে বনের আড়ালে প্রহরী বসাইয়া রাখিলেন। সমস্ত দিনের মধ্যে জনপ্রাণীর সাড়া শব্দ কিছু পাওয়া গেল না।

সন্ধ্যার কিছু পরে—তরল অন্ধকার কিছু ঘনীভূত হইলে আবার ধন লুণ্ঠনব্যাপার দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল। সমস্ত রাত্রিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া পাতালপুরীর সমস্ত ধনরত্নই নজীব-উদ্দৌলার লোকেরা কিশ্তীতে লইয়া গেল।

একজন তেজস্বী সৈনিক পুরুষ মারাঠী দস্যুগণকে প্রাণদণ্ডের ভীতি প্রদর্শন করায় তাদের খাজাখী বলিল যে, তাহাদিগের প্রাণদান করিলে সে আরও একটি অর্ধভাগার, দেখাইয়া দিতে প্রস্তুত আছে। অতঃপর তাহাদিগকে প্রাণদানের প্রতিশ্রুতি দিবার পরে তাহারা কঙ্কের মেজের একখানি পাথর তুলিয়া কোলিলে তন্নিম্নে একটি কঙ্ক বাহির হইয়া পড়িল। সেই কঙ্কে স্তূপীকৃত টাকা দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইল। নজীব-উদ্দৌলা সাতখানি নৌকায় সাতজন প্রহরী রাখিয়া সমস্ত মাঝি-মাতা লইয়া সেই অর্ধ নৌকায় বহন করিতে লাগিলেন। সর্বশুদ্ধ ৮৫ জন লোক অর্ধ বহনে কঠোর পরিশ্রম করিতে লাগিল। নজীব-উদ্দৌলা ওহামুখে ৩ জন মাত্র অনুচরসহ চৌকিতে ব্যাপ্ত থাকিলেন।

অদ্য দিবসেও অর্ধলুণ্ঠন এবং বহনকার্য চলিতে লাগিল। বেলা যখন অর্ধপ্রহর তখন দেখা গেল যে, একদল মারাঠী সৈনিক সেই পাতালপুরীর দিকে অগ্রসর হইতেছে। তাহাদের সঙ্গে অনেকগুলি টাকার তোড়াও দেখা গেল। দস্যুগণ সংখ্যায় ১৫ জন। দস্যুদের সংখ্যাধিক্য দেখিয়া নজীব-উদ্দৌলা দ্বার বন্ধ করিয়া বনের অন্তরালে লুকায়িত হইলেন। দস্যুরা হাতল টানিয়া প্রস্তর উঠাইয়া ওহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। এদিকে নজীব-উদ্দৌলা দ্বারের মুখে সজ্জিত লইয়া তরবারি হস্তে দণ্ডায়মান হইলেন। দস্যুগণ ভিতরে প্রবেশ করিয়াই ভিতরের কাণ্ডকারখানা দেখিয়া এবং ওহাস্থ বন্দী বন্ধুগণের মুখে সমস্ত কাহিনী শুনিয়া শীঘ্রই তাহাদের অনুসন্ধান উপরে আসিবে মনে করিয়াই নজীব-উদ্দৌলা সুড়ঙ্গ-মুখে কৃপাণপাণি হইয়া তাহাদিগকে বধ করিবার জন্যই দণ্ডায়মান হইলেন। এদিকে অর্ধবহনকারী সৈনিকগণ ক্রমশঃ আসিয়া ওহামুখে দণ্ডায়মান হইলেন। কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিবার পরে যখন দস্যুদের কেহই আর উপরে আসিল না, তখন অনর্থক অনুচিত বিলম্ব বিবেচনায় পাথর তুলিয়া সুড়ঙ্গে প্রবেশের চেষ্টায় হাতল ধরিয়া টান দিতেই লোহার ছিন্ন শিকল সহ হাতল বৃক্ষের গহ্বর হইতে একেবারেই খসিয়া পড়িল। নজীব-উদ্দৌলা বুঝিলেন যে, দস্যুরা দ্বার উন্মোলন করিবার কল হইতে শিকল কাটিয়া দিয়াছে। এক্ষণে বলপূর্বক এই গুরুভার প্রস্তরকে না সরাইলে ভিতরে প্রবেশ করিবার আর কোনও উপায় নাই।

মুসলমানগণ নিরুপায় হইয়া তখন বলপূর্বক সেই প্রস্তরখণ্ডকে ১৫ জনে ধরিয়া সুড়ঙ্গের মুখ হইতে তুলিয়া একপাশে রাখিয়া দিয়া প্রজ্বলিত মশাল হস্তে সেই পাতালপুরীতে মুক্ত তরবারি-করে অবতরণ করিলেন। সকলেই ভাবিয়া ছিলেন যে, মারাঠীগণ সুড়ঙ্গে অবতরণমুখেই বাধা দিবে, কিন্তু তাহারা সেই গুপ্তপুরীর ভিতরে নামিয়া একটি লোকেদেরও নিদর্শন পাইলেন না। পূর্বে মারাঠীগণকে দৃঢ়রূপে ছাত-পা বাঁধিয়া যে-ঘরে বন্ধ রাখা হইয়াছিল, সে ঘরে

যাইয়া সকলেই বিস্ময়বিহ্বলিত নেত্রে দেখিল যে, বন্ধনবন্ধুতলি কর্তৃত্ব হইয়া ওখার পড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু বন্দীদের কেহই নাই। সমস্ত ঘরতলি বিশেষ করিয়া খুঁজিয়া দেখিল; কিন্তু একটি প্রাণীরও চিহ্ন পাওয়া গেল না। হঠাৎ এততলি লোক কোখার পলায়ন করিল, ইহা ভাবিয়া সকলেই চমকিত এবং বিস্মিত হইলেন! অনেকেই অনুমান করিলেন যে, দস্যুগণ এই পুরীতেই কোনও গুহে লুকায়িত আছে; নতুবা বাহিরে যাইবার অন্য আর একটি পথ আছে।

নজীব-উদৌলা বলিলেন, 'দস্যুগণ নিশ্চয়ই এখানে নাই, তারা অন্য পথ দিয়া অন্যত্র পলায়ন করেছে এবং সুবিধা থাকিলে সৈন্যদল লয়ে আমাদিগকে আক্রমণের চেষ্টায় আছে। আমাদিগের পক্ষে একটি সহটজনক অবস্থা সমুপস্থিত।' এই বলিয়া তন্ন তন্ন করিয়া সেই পাতালপুরীর সর্বত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করা হইল; কিন্তু কোথাও কোনও গুহপথ, ছিদ্র বা সুড়ঙ্গ দেখা গেল না।

সকলেই বিস্মিত ও হতাশ হইয়া পড়িলেন। দস্যুদিগের বোঁড়ে অনর্থক সময় হনষ্ট না করিয়া অবশিষ্ট অর্থ লুণ্ঠন করিয়া নৌকায় প্রত্যাগমন-পূর্বক স্থান পরিত্যাগ করাই ভাল বলিয়া সকলেই ঠিক করিলেন।

এমন সময় একটি জলের হাওজের পারে শৈবালের মধ্যে একটি লৌহবলয় পরিদৃষ্ট হইল। সেটি দেওয়ালের গায়েরই কড়া বলিয়া সকলেই দেখিয়াও না দেখার মত চলিয়া গেলেন। কিন্তু শমশেরজঙ্গ নামক একটি সৈনিক সহসা ঘুরিয়া আসিয়া: এই কড়াটি টানিতে লাগিল। জ্বোরে টান দেওয়া মাত্রেই কড়াটি শিকলসং সরিয়া আসিতে লাগিল এবং সকলেই বিস্ময়বিহ্বলিত নেত্রে দেখিলেন যে, হাওজের নাচের প্রস্তর-খণ্ড দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া মধ্য উঁচু হইয়া উঠায়, সমস্ত পানি দুই পার্শ্বের ছিদ্র দিয়া বাহির হইয়া গেল! অতঃপর আরও জ্বোরে টানিতে টানিতে প্রস্তরখণ্ড অপসারিত হইয়া একটি গহ্বরবৃক্ষ গকাশ হইয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি যশাল জ্বালাইয়া সেই সুড়ঙ্গপথে কয়েকজন সৈনিকগণের নামিয়া গেল।

সৈনিকগণ অনেকদূর অগ্রসর হইয়া একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের সানুদেশে উঠিয়া পড়িল। সেখানে উঠিয়া তাহারা দেখিতে পাইল যে, দস্যুগণ সেই পথে নির্গত হইয়া উত্তর দিকে চলিয়া গিয়াছে। তাহার চিহ্নস্বরূপ ক্ষুদ্র লতা-গুলি সকল দলিত এবং মধিত হইয়া গিয়াছে। নজীব-উদৌলা দেখিলেন যে, এই সুড়ঙ্গপথে নৌকায় অর্থ বহন করিয়া লইয়া গেলে পথ বুঝ সর্বোৎকৃষ্ট হয়, সুতরাং এই পথেই তাড়াতাড়ি সমস্ত অর্থ বহন করিতে লাগিলেন।

কিছু রাত্রিতে জনৈক প্রহরী আসিয়া নজীব-উদৌলাকে খবর দিল যে, বহুসংখ্যক বন্দী দস্যু অশ্রমে সম্বৃত হইয়া নীরবে ধীরে ধীরে ওহার দিকে আগমন করিতেছে। তাহাদের সংখ্যার বিপুলতার কথা শুনিয়াই নজীব-উদৌলা বুদ্ধিতে পারিলেন যে, দস্যুগণ তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্যই সমাগত

হইতেছে। সুতরাং নজীব-উদ্দৌলা প্রতি তুরা পাতালপুরীর পথ খোলা রাখিয়া অবশিষ্ট অর্থাৎ লইয়া সুড়ঙ্গের নব প্রকাশিত পথ অবলম্বনে অতি সহুর সেই গভীর অন্ধকারের মধ্যে নৌকা ছাড়িয়া দিলেন।

সাতদিন পরে সেই বিরাট সমুদ্রস্রোতে আসিয়া সমুদ্রকূলে যাইয়া উপনীত হইল। নজীব-উদ্দৌলা সমস্ত নৌকার টাকার উপরে রেশম বোঝাই করিয়া বন্দরে বন্দরে রেশম-নৌকা বলিয়াই পার হইয়া গেলেন। সমুদ্রের কূলে কূলে ধীরে সন্তর্পণে নৌকা চালাইয়া অনুকূল বায়ুতরে ১৫ দিবসেই গঙ্গার মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অতঃপর গঙ্গা বাহিয়া বাঙ্গলার ভিতর দিয়া ২৯ দিনে নৌকা গঙ্গা এবং তৎপরে যমুনা বাহিয়া দিল্লীতে উপনীত হইল। নৌকা হইতে আটার বস্তার মধ্যে এক একটি করিয়া টাকার তোড়া লইয়া দিল্লীর বিশেষ একটি স্থানে অত্যন্ত সাবধানতার সহিত ভূ-গর্ভে সঞ্চিত রাখা হইল। বিপুল অর্থ পাইয়া নজীব-উদ্দৌলা এবং সফদরজঙ্গ প্রাণপণে ভিতরে ভিতরে সৈন্য ও অস্ত্র সংগ্রহে মনোযোগী হইলেন।

মারাঠীদিগকে সমূলে উচ্ছেদ করিবার জন্য দেশের প্রত্যেক পরগণা এবং থানায় একটি করিয়া গুপ্ত সমিতি স্থাপিত হইল। লোক সংগ্রহ এবং সংগৃহীত ব্যক্তিদিগকে যুদ্ধের কার্যদা-কানুন শিক্ষা দেওয়াই হইল ইহাদের প্রধানতম উদ্দেশ্য।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

প্রভাত-সূর্যের কনক কিরণরাগে কাবুলের চতুর্দিকস্থ গিরিশিখরসমূহ ঝক-ঝক করিতেছে। কাবুলের রাজপথে নানাবিধ বিচিত্র পরিচ্ছদধারী অগণ্য লোকের যাতায়াত শুরু হইয়াছে। বিরাট দরবারগৃহের সম্মুখে নহবতে রওশন চৌকি বাজিতেছে। সম্মুখস্থ ময়দানে আহমদ শাহ দোরবানীর জগদ্বিখ্যাত অপরাজের এবং অতুল কষ্টসহিষ্ণু নিমকোট সৈন্যদলের কুচকাওয়াজ চলিতেছে।

সহসা গুড় ম করিয়া ভীষণ ভোপধ্বনি হইল। অমনি জরীজড়োয়া উর্দী পরিহিত পঞ্চাশত অতি সুন্দর সূত্রী এক বয়সী সৈনিক পুরুষ একই বর্ণের পোশাক পরিহিত, এক বর্ণের একই আকৃতি বিশিষ্ট অশ্বে সমারূঢ় হইয়া, ঋটিকাবেগে সমস্ত রাজপথ প্রতিধ্বনিত করিয়া দরবার পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া, আবার দ্রুত-গতিতে ফিরিয়া যাইয়া বাদশাহকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া আসিল। বাদশাহ চৌঘোড়ার গাড়ীতে প্রধানমন্ত্রী এবং সেনাপতি সহ উপবিষ্ট। অশ্ব চতুর্দয় শ্বেতবর্ণ এবং একই আকৃতিবিশিষ্ট। অশ্বের সাজ-সজ্জা এবং বস্ত্র সমস্তই সুবর্ণ-নির্মিত। বাদশাহ কুম্বারগুজ পোশাকে সজ্জিত। মস্তকে শ্বেত উকীষে একখণ্ড শ্বেতহীরক সত্যাতারার ন্যায় জ্বল জ্বল করিয়া দীর্ঘ প্রকাশ করিতেছে।

পাৰ্বদেশে ডব্বাৰি সুবৰ্ণপাৰ্শ্বানে সংবন্ধ । অশ্বখান যাইয়া দব্বাৰ-গৃহের সম্মুখে
দণ্ডায়মান হইল ।

বাদশাহ্ দব্বাৰ-গৃহে প্রবেশ করিতেই সকলে দণ্ডায়মান হইয়া নীরবে সালাম
করিলেন । বেদিকায় উপরিস্থ সিংহাসনে যাইয়া বাদশাহ্ উপবেশন করিলেন ।
পত্র-খিত্র সকলই আপন আপন আসন পরিগ্রহ করিলেন । অতঃপর গায়কগণ
আসিয়া বাদশাহের ওণ-বশঃ ও জয়সূচক সঙ্গীত কীর্তন করিয়া বিদায় গ্রহণ
করিলেন ।

সঙ্গীতশেষে সত্য নীরব ও নিস্তব্ধ । অতঃপর দিল্লীর রাজদূতকে দব্বাৰে
হাজির হইবার জন্য প্রধান মীর মুনসী ইঙ্গিত করিলেন । ইঙ্গিত মাঝে একটি
উজ্জ্বলকান্তি মনোহরমূর্তি ভেজস্বী যুবক বাদশাহের সিংহাসন-সম্মুখে আসিয়া
ভিনবার কুর্শি করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া লিপির পেটিকাটি পেশ্কারের হস্তে অর্পণ
করিলেন । পেশ্কার হস্তিদন্তনির্মিত মণিমুক্তাখচিত ক্ষুদ্র বাক্সটি খুলিয়া বাদশাহের
হস্তে সুবর্ণপাণ্ডে লিখিত লিপিখানি প্রদান করিলেন । বাদশাহ্ উহা স্পর্শ এবং
চুম্বন করিয়া প্রধান পাঠকের হস্তে প্রদান করিলেন । পাঠক-বড় উচ্চৈঃস্বরে পাঠ
করিলেন ।

। পত্র ।

সর্বশক্তিমান আলাহুতালার নাম ও মহিমা জয়যুক্ত হটক । তাঁহার প্রেরিত
মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদ (দঃ) আশীর্বাদ গ্রাণ্ড হউন । আলাহুতালার আদিষ্ট
ইসলামধর্মাবলম্বী ভ্রাতৃবৃন্দের ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক কল্যাণ হটক ।

এই পত্র দিল্লীর বাদশাহ্ ভারতীয় মুসলমান নেতৃবৃন্দ এবং ধর্মের রক্ষক
আলেমদিগের নিকট হইতে ভারতীয় মুসলমানদিগের উদ্ধার-সংকল্পে প্রতাপাবিত
মহামান্য বাদশাহ্ (আফগান ও ইরানের অধিপতি) আহম্মদ শাহ আবদালী
দোকরানী সাহেবের সমীপে সম্মান ও শ্রীতি সহ প্রেরিত হইল ।

হে মহানুভব ধর্মপ্রাণ বাদশাহ্! আমাদের সালাম এবং আন্তরিক শ্রীতি ও
সাদর সম্বন্ধন গ্রহণ করিবেন । আপনি মুসলমান, সেই জন্য আজ মুসলমানের
বিপদ ও দুঃখে আপনাকে তীব্রভাবে দ্বন্দ্ব করিতেছি এবং আপনার সাহায্য
বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতেছি ।

ভারতীয় মুসলমানগণ, অসত্য ও দস্যুপ্রকৃতি মারাঠীদিগের ভীষণ অত্যাচার,
লুণ্ঠন ও নির্বাতনে যার-পর-নাই প্রণীড়িত হইতেছেন । প্রতাপশালী দিল্লীপতির
প্রতাপ ধ্বংস এবং ইসলামের ভেজঃপ্রভাব ও সম্মান মলিন হইয়া পড়িয়াছে ।
বহুসংখ্যক মসজিদ ধ্বংসীকৃত ও শূন্য-রক্তে অর্পিত হইয়াছে । বহু মুসলমান
রাজ্য মারাঠীদিগের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে । দিল্লী পর্বত লুণ্ঠিত হইয়াছে ।
ভারতীয় সর্বধর্মাবলম্বী সর্ব জাতীয় প্রজার ঘরে ঘরে মারাঠীর অত্যাচারে
হাহাকার ধ্বনি উচ্চিত হইয়াছে ।

নারী ও শিশুদিগের করুণ ক্রন্দনে ভারতের আকাশ মুখরিত হইতেছে! মারাঠীদিগকে দমন করিতে না পারিলে ভারতবর্ষে এমন কোনও নেতা ও বীরপুরুষ নাই যে, এই বিজাতীয় ও বিধর্মীর করাল কবল হইতে মুসলমানগণকে উদ্ধার করিতে পারেন। আমাদের রাজশক্তিসমূহ ৮০ ৮০ ও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। আপনার বিজয়িনী পতাকার আকর্ষণ এবং শোণিতপিপাসু তরবারির ভীকৃত্য ব্যতীত, তাহাদিগকে আর কেহ একত্র করিতে সমর্থ নহে হে মহাবাহু তেজস্বী বীর! আপনার তেজস্বী রণতুরঙ্গমের পাদস্পর্শে ভারতের ভূমি চিহ্নিত না হইলে মারাঠী জবুকগণ কদাপি তাহাদের গর্ভে প্রত্যাবর্তন করিবে না। হে গাজী! আপনার তরবারির ঠোঁড়ের দামিনীদ্যুতি ব্যতীত মারাঠী পেন্টকদিগের চক্ষু কলসিত হইবে না। হে মহাপ্রাণ! আপনার সিংহ-হৃদয় ব্যতীত কদাপি মারাঠী-শৃগালের কোলাহল নিবারিত হইবে না। আপনার মহতী সেনা ব্যতীত ইসলামের মর্যাদা কিছুতেই প্রতিষ্ঠিত হইবে না। হে শাহানশাহ! আমরা কায়মনোচিত্তে আপনার উভাগমনের প্রতীক্ষা করিতেছি।

আপনি সিদ্ধনন্দ অতিক্রম করিবা যাত্রাই আমরা ভবদীয় বিজয়-বৈজয়ন্তী মূলে একত্র হইব। আপনার বাহুবলে ইসলামের সম্মান এবং মুসলমানের গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে, এই দৃঢ় বিশ্বাসেই এই পত্র প্রেরিত হইল। ইতি।

বিনয়াবনত—

শাহ আলম (বাদশাহ)
 সফদরজঙ্গ (প্রধানমন্ত্রী)
 নজীব-উদ্দৌলা (রোহিলা সর্দার)
 আমিনর রহমান (শেখুল ইসলাম)
 মোহাম্মদ আলী হাসান (মক্কা-এর প্রধান মওলানা)
 শামসোজ্জমান (পান্ডাবের প্রধান মুফতী)
 সর্দার মোহাম্মদ আলী খান (আগ্রার একজন বড় জমিদার)

এই পত্রে এতদ্ব্যতীত আরও অনেক প্রধান প্রধান বিখ্যাত ব্যক্তির স্বাক্ষর ছিল। পত্রপাঠান্তে সকলেই নীরব এবং নিস্তব্ধ। সভাস্থল নির্বাক নিষ্কম্প। সকলের নিঃশ্বাস যেন রুদ্ধ!

আহমদ শাহ দোররানী দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, “কি আশ্চর্য! ভারতবর্ষের ন্যায় বিরাট দেশের বিপুল সংখ্যক মুসলমান বিদ্যমান থাকতে আজ মারাঠীগণের অভ্যাচার, হত্যা ও লুণ্ঠন নির্বিরোধে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। মুসলমানেরা স্বদেশে থেকেই তার প্রতিকার করতে সমর্থ নহে। এ-অবস্থায় বিদেশ হতে যেয়ে আমি কি সাহায্য করতে সমর্থ হব? ভারতের একটি প্রদেশে যত লোকের বাস, আমার সমস্ত আকণানিস্তান এবং ইরানেও তত লোক নাই। আমি যুদ্ধে যুদ্ধে ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছি; তদুপরি নিজ রাজ্যে নানা গোলযোগ। এ অবস্থায়

পেশোয়ার বিপুল বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করা কিরূপে সম্ভবপর?"

প্রধানমন্ত্রী : পেশোয়ার সঙ্গে হয় তো দীর্ঘকাল যুদ্ধ করতে হবে। তা হলে বিপুল কামান-বন্দুক ও সৈন্য চাই। এখন যা আছে তাতে কুলাবে না।

সেনাপতি : মারাঠীদিগের ৪ লক্ষ সৈন্যের বিরুদ্ধে অন্ততঃপক্ষে আমাদের ২ লক্ষ সৈন্য প্রেরণ করা আবশ্যিক। কিন্তু এক্ষণে যে সৈন্যবল আছে, তদুপায়ে হতে খুব বেশী হলেও আমরা ৪০ হাজারের বেশী ভারতবর্ষে পাঠাতে পারব না। এ অবস্থায় ভারত উদ্ধারে অভিযান করা কদাপি সম্ভব নহে।

যুবরাজ : ভারতবর্ষের জন্য আমরা কেন মাথা দিতে যাব? ভারতের মুসলমানেরা কি করে? যাদের ঘরে ডাকাত পড়েছে তারা নাকে তেল দিয়ে ঘুমাবে, আর পাড়াপ্রতিবেশীকে ডাকাত তাড়াবার জন্য ডাকাডাকি! ব্যাপার তো যক্ষ মত! যারা নিজেদের স্বাধীনতা ও রাজত্ব রক্ষা করতে পারে না, তারা আবার কিরূপ মুসলমান?

বাদশাহ : মুসলমানের এমন অধঃপতন আর কখনও এবং কোথায়ও হয় নাই। এমন হতভাগ্য এবং হীনবীর্যদিগকে সাহায্য করতেও ঘৃণা হয়!

শেখুল ইসলাম : কি আশ্চর্য ব্যাপার! একেশ্বরবাদী মোমেনদিগের প্রতি ভৃত-প্রভেদের উপাসক চিরদাস ও চিরকাপুরুষ হিন্দুরা কেমন করে আধিপত্য লাভ করছে এ তো বড় আশ্চর্য ব্যাপার! কাকের যাদের উপর অত্যাচার করতে পারে, তারা কেমন মুসলমান?

দূত : হজরত মওলানা! আপনি যা ফরমালেন, তা যথার্থ। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, যারা অত্যাচারিত মুসলমানদের সাহায্যকল্পে অগ্রসর না হয়, তারাই বা কেমন মুসলমান?

শেখুল ইসলাম : ভারতীয় মুসলমানেরা যদি সংখ্যায় কম হত, তা হলে সাহায্য করা আবশ্যিক হতো।

দূত : সংখ্যায় প্রেষ্ঠতাই তো প্রেষ্ঠতা নহে, কমতার প্রেষ্ঠতাই হচ্ছে যথার্থ প্রেষ্ঠতা। দুর্বলকে রক্ষা করাই হচ্ছে প্রেষ্ঠত্বের লক্ষণ।

শেখুল ইসলাম : মারহাবা! মারহাবা! আপনি ঠিক কথাই বলেছেন।

বাদশাহ : (শেখুল ইসলামের প্রতি) তা হলে আপনি ভারতীয় মুসলমানদের উদ্ধার কল্পে অভিযান করাই সম্ভব মনে করেন?

শেখ : শক্তিতে কুলালে সিক্তই।

উজির : তা হলে এক্ষণে নিজের শক্তির পরীক্ষা করে দেখাই কর্তব্য।

সেনাপতি : যুদ্ধক্ষেত্রে নাকি?

উজির : (সহাস্যে) না, না, নিজেরাই পরীক্ষা করে দেখুন।

সেনাপতি : ভারত অভিযানে গেলে কেবল মাত্র আমার সেনাপতিত্বে চলবে না। আপনাকেও উজীরী ছেড়ে সেনাপতীপদে অধিষ্ঠিত করতে হবে।

উজির : তাতে আপনি ছিল না, তবে বরসটা আর বাৰ্ধক্য ছেড়ে বৌকমে

ফিরবে না, এই যা দুঃখ!

সেনাপতি : অন্ততঃ পরামর্শ সত্যই থাকলেও চলবে।

বাদশাহ : হে দূতবর! আপনার আনীত পত্র পাঠ করে ভারতীয় মুসলমানদিগের দুর্দশা ও দুর্গতির বিবরণ জানতে পেরে নিতান্ত দুর্গ্ৰস্ত এবং মর্মান্বিত হলাম। আমার বৈদেশিক সংবাদ-বিভাগ হতেও এ সমস্ত কষ্টকর সংবাদ আমি পূর্বেই অবগত হয়েছি। পেশোয়ার শক্তি যখন অল্প ছিল, তখন তাকে দমন করা সহজ ছিল। এক্ষণে উপচিতিবলসম্পন্ন মারাঠীশক্তিকে সনূলে উৎসাদিত করা নিতান্ত কঠিন ব্যাপার। বিশেষতঃ খোরাসানের বিপ্লব লয়ে আমি যেতপ বিব্রত আছি, এ সময়ে আমার পক্ষে ভারতে অভিযান করা কিছুতেই সম্ভবপর বলে বোধ করি না।

দূত : শাহানুশাহ! আপনার জয় ও মঙ্গল কামনা করি। আপনার কথা শুনে মনে বড় দুঃখ ও ক্রেশের সঞ্চার হচ্ছে। বিপুলকে উদ্ধার করবার জন্য, স্বজাতির দুর্দশা ও দুর্গতি দূর করবার জন্য যদি আপনার সাহস ও শক্তি উদ্দীপিত এবং কর্তব্যবুদ্ধি উদ্বোধিত না হয়, তা হলে আপনি রাজসিংহাসন ত্যাগ করে ব্যবসায়ীর গদিতে যেয়ে উপবেশন করুন। অগ্নি যেমন কাষ্ঠ পেলেই দগ্ন করে থাকে, ব্যাঘ্র যেমন শিকার পেলেই আক্রমণ করে থাকে, জল যেমন নিম্নস্থান পেলেই চলতে থাকে, বীরপুরুষও তেমনি শত্রু পেলেই আক্রমণ করবেন।

“জাহাঁপনা! যথার্থ মোসলেম কখনও স্বজাতি স্বধর্মীয় ঘোরতর বিপদার্থী শ্রবণ করে স্থির থাকতে পারেন না। যথার্থ মুসলমান কখনও নিজেদের জন্য প্রাণ ধারণ করেন না। ইসলাম যেমন কোনও দেশ-কাল-পাত্রের আবদ্ধ নহে; মুসলমানের প্রেম ও উদারতা তেমনি কোনও দেশ বা জাতি বিশেষে সীমাবদ্ধ নহে। ইসলামে কোনও পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গল বা নদী-প্রান্তরের সীমা-সরহদের বাধা-বিঘ্ন ব. গণী নাই। ভারতের মুসলমানগণ শত্রু কর্তৃক উৎপীড়িত হয়ে আর্তনাদে গগন-পবন মুখরিত করবেন, আর আপনি এখানে নিষ্কণ্টকে নিরুপদ্রবে রাজ্যসুখ ভোগ করবেন, এ কখনও ঐসলামিক বিধিসঙ্গত নহে।

“ভারতে কোটি কোটি মুসলমান আপনার মুখ চেয়ে রয়েছে, আর আপনি কিনা ভারত গমনে অবলা রমণীর ন্যায় ভীতি ও সঙ্কুচিত হচ্ছেন! আপনার হৃদয় এত সাহসহীন ও শক্তিশূন্য আমি কখনও এ ধারণা করি নাই। আমরা জানতাম, আফগানগণ বিজাতি বিধর্মীর সংশ্রব ও সংসর্গহীনতা বশতঃ যথার্থ ইসলাম-ভেঙ্গে সন্দীপ্ত রয়েছে। কিন্তু এক্ষণে দেখছি এরূপ ধারণা পোষণ করা অন্যায় হয়েছে।

“জাহাঁপনা! ভারতীয় মুসলমানগণ ভীক বা কাপুরুষ নহে। তাঁরা ঐক্যবদ্ধ হলে সমস্ত পৃথিবী জয় করতেও সমর্থ। কিন্তু তাঁদিগকে এক পতাকার নীচে সমবেত ও সম্মবদ্ধ করবার জন্য একজন ক্ষমতাশালী নেতার প্রয়োজন মাত্র।”

বাদশাহ : দূতবর! আপনার কথা অত্যন্ত তীব্র ও তীক্ষ্ণ। দূতের কথা এরূপ

হওয়া উচিত নহে।

দূত : শাহানশাহ! সত্য কথা সর্বদাই তীব্র ও তীক্ষ্ণ হয়ে থাকে। আমি শুধু হৃদয়ে পরের কথা নিবেদনের জন্যই দৌড়া-কার্বে নিযুক্ত হই নাই। আমি নিজেও আপনাকে ভারত-অভিযানের জন্য পরামর্শ দিতে ও আহ্বান করতে আগমন করেছি। আপনাকে বীরপুরুষ জানেই আপনার নিকটে বহু কষ্ট স্বীকার করে এসেছি। আপনাকে ভারতীয় মুসলমানদিগের রক্ষাকল্পে অগ্রসর হতেই হবে। আপনার কোনও অসুবিধা ও অভাব হবে না। আপনি নিশ্চয়ই জয়যুক্ত হবেন। শিখদিগের সঙ্গে যুদ্ধে শিখদিগকে যেমন তেজস্বী বলে বোধ করেছেন, মারাঠিগণ সেরূপ নহে। শিখেরা যোদ্ধা, আর মারাঠিগণ দস্যু। সম্মুখ-সমরে তারা চিরদিনই ভীত ও অনভিজ্ঞ। কিন্তু এবারে তাদিগকে সম্মুখযুদ্ধই করতে হবে। বেকায়দা লড়াই এবং লুট-তরাজে তারা কবলিত রাজ্য কখনও রক্ষা করতে পারবে না। আপনার তরবারি-ফলক বিজয়ের গৌরবে নিশ্চয়ই ঝলসিত হবে। আত্মাহু কাকেরদিগের উপরে নিশ্চয়ই আমরাই জয়যুক্ত করবেন। আত্মাহু জালামে জাতকে কখনও উন্নত করেন না।* মুসলমান চিরকালই কাকেরদিগের উপর জয়লাভ করেছেন। জাহাপনা! মুহালিব, মোহাম্মদ বিন কাসেম, সোলতান মাহমুদ গজনবী, শাহাবউদ্দীন মোহাম্মদ গোরী, বাবর, নাদিরশাহ সকলেই ভারতবর্ষ জয় করতে সমর্থ হয়েছিলেন। আর আপনি ভারতীয় মুসলমানের সাহায্য ও সহানুভূতি পেয়েও ভারতীয় পৌত্তলিকদিগকে পরাস্ত করতে সমর্থ হবেন না? ভারতীয় রমণীগণও যে কার্য সম্ভবপর বলে মনে করেন, আপনি সেই কার্যকেই কঠিন বলে মনে করেন? রমণী অপেক্ষাও কি আপনার সাহস ও আশা দুর্বল?

বাদশাহ : দূতবর! আপনি বাক্যকুশল, এ-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু স্বরূপ রাখবেন, সত্যের অপলাপ করা কদাপি কর্তব্য নহে। বেদেশে পুরুষগণ রাষ্ট্রনেতৃত্ব হতে বীরত্বের অভাবে দিন দিন ঋণিত হচ্ছে, তাদের রমণীবৃন্দের যুদ্ধশূন্য ও ভেজবিতার কথা আকাশ-কুসুম ব্যতীত আর কিছুই নহে।

দূত : জাহাপনা! আপনি যা বললেন, তা আপনার অনুমান মাত্র; কদাপি তা সত্য নহে। শাহানশাহ! আপনি জেনে রাখুন যে, ভারত-অভিযানে সম্মত না হলে আপনাকে ভারতীয় রমণীর সহিত যুদ্ধ করে অব্যাহতি লাভ করতে হবে।

দূতপ্রবরের কথা শুনিয়া সভাস্থলে সকলেই বিদ্রূপসূচক উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। হাস্যাবেগ প্রশমিত হইলে বাদশাহ বলিলেন, "দূতপ্রবর! যদি কখনও ভারত-রমণী আমাকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করেন, তা হলে আমি আমাকে পরম সৌভাগ্যবান বলে মনে করব। এমন বীরসৈন্যের সমস্ত আদেশ মতক পেতে নেব। ভারতে যদি এমন তেজস্বিনী শূরী থাকেন, তবে ভারতের জন্য আকর্ণানিত্যমের সমস্ত রক্ত ব্যয় করতেও কুণ্ঠিত হব না।"

* ইব্রাহীম না ইফ্দিয়াল কওয়া জাদিমীন— (যহা কোরআন)।

দূত : জাহাঁপনা! এ উপহাসের কথা, কিম্বা সত্যাকার কথা?

বাদশাহ্ : আমি কখনও মিথ্যা বলি না।

দূত : জাহাঁপনা! আমিও কখনও মিথ্যা বলি না।

বাদশাহ্ : তবে ভারতবর্ষ হতে তেমন বীরসুন্দরী নিয়ে আসুন।

দূত : নিয়ে আসবার আবশ্যিক কি?

বাদশাহ্ : না নিয়ে আসলে ছাড়ব না, আনতেই হবে। আহমদ শাহ্ আবদালীর কাছে বৃথা দাঙ্কিততা দও না পেয়ে যায় না।

দূত : আপনার দাঙ্কিততা চূর্ণ করে ছাড়ব না। প্রকৃত হউন। আমি সেই ভারতবর্ষীয়, আমি পুরুষ নহি। প্রতিজ্ঞা করে এসেছি যে, যদি আপনাকে ভারত-অভিযানে সম্মত করাতে না পারি, তা হলে ঘনুযুদ্ধ করে হয় নিজে নিহত হব, না হয় আপনাকে মৃত্যুমুখে পতিত করব। আমি উজীর সফদরজানের কন্যা ফিরোজা বেগম।—এই বলিয়া বেগম শান্তিত তরবারি কোষ হইতে মুক্ত করিয়া উর্ধ্বে উত্তোলন করিলেন।

সহসা সভাস্থলে বজ্রাঘাত হইলে অথবা সহসা দরবারগৃহে সূর্যোদয় হইলে লোকে যেমন বিস্মিত এবং স্তম্ভিত হইত, ফিরোজা বেগমের সাহসিকতাপূর্ণ উক্তি এবং তেজঃপূর্ণ কমনীয় অথচ তেজস্বিনী মূর্তি, চেহারায় দৃঢ়তা ও কঠোরতার স্পষ্ট প্রকাশ এবং তরবারি নিষ্কাশনে সকলেই বিস্মিত এবং স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন।

বাদশাহ্ লজ্জিত এবং সঙ্কুচিতভাবে বলিলেন, “মা! তুমি ধন্য! তোমার জন্যে ভারতবর্ষ পবিত্র এবং তোমার পুণ্যপদরজে আফগানভূমি ধন্য হইল! যে দেশে এমন আদর্শ বীরসুন্দরী জন্ম গ্রহণ করে, সেদেশের ললাটে দুর্ভাগ্য ও অধঃপতনের জলদজাল বেশীদিন তিষ্ঠিতে পারে না। মা! আমি তোমার সম্মানের জন্যই ভারতে অচিরেই অভিযান করব।”

বাদশাহ্ এই বলিয়াই উজীর ও সেনাপতির দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “আপনারা অচিরেই ভারত-অভিযানের জন্য বিপুল আয়োজন করুন।”

অতঃপর বীরকুলকেশরী শাহানশাহ্ আহমদ শাহ্ প্রধান খাজে-সারাকে ডাকিয়া ফিরোজা বেগমকে বিশেষ জাঁকজমকের সহিত অন্তঃপুরে অভ্যর্থনা করিবার জন্য আদেশ জ্ঞাপন করিলেন।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

সুবনের অমরাবতী প্রাসাদমালিনী লক্ষ্মী নগরী। অসংখ্য আলোকমালায় শারদীয় নক্ষত্রখচিত নৈশাকাশের ন্যায় রাজধানী একান্ত রমণীয় শোভা ধারণ করিয়াছে। উচ্চ উচ্চ বিরাট বণু সৌধ ও প্রাসাদান্তরে হইতে নানা প্রকার সুমধুর স্বাগ

রাগিনী-ধ্বনি উৎখত হইতেছে। কক্ষপক্ষের পক্ষমীর চন্দ্রোদয় হইতেছে। পূর্ব-গগনের নীলকান্ত মণির ন্যায় নির্মলভাবে চন্দ্রকলা নববধু-সীমান্তে সুবর্ণ তিলকের ন্যায় শোভা পাইতেছে। কি বিচিত্র এবং মনোহর দৃশ্য! নিতরু রজনীতে নির্মল আকাশে চন্দ্রকৌমুদীর বিকাশে দিঘলয় ঘেন শ্রিত হাস্য করিতেছে। লক্ষ্মী-এর নূরবাণ নামক বিরাট শাহী-বাগানে কত যে বিচিত্র জাতীয় পুষ্পরাজি প্রস্কৃটিত হইয়া কবি-চিত্তসম্বোধিনী অপূর্ব শোভার বাজার খুলিয়াছে, কে তাহার বর্ণনা করিবে?

এই বিরাট উদ্যানের মধ্যে ভাঙ্কর কলার আদর্শরূপ রমণীয় ও বিখ্যাত 'নূর মঞ্জিল' নামক প্রাসাদে নিভৃত দরবার বসিয়াছে। একপার্শ্বে নবাব সূজা-উদৌলা, মন্ত্রী এবং সেনাপতি, অন্যপার্শ্বে নজীব-উদৌলা এবং দোররানী সেনাপতি তাহের খান সমাসীন। অন্যদিকে চিকের আড়ালে বেগম এবং নবাব-মাতা আজাদীবানু বেগম সমাসীনা।

বিরাট কক্ষ নীরব ও নিতরু। কেবল পুষ্পগছবাহী সমীরণ প্রাসাদের মুক্ত কক্ষের ভিতর দিয়া ফুর ফুর করিয়া সূক্ষ তল্পেবের পর্দা উড়াইয়া প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে।

উজ্জ্বল আলোকরশ্মিপাতে প্রাসাদ-প্রাচীরের মণিমুক্তার কারুকার্যগুলি দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতেছে। প্রাসাদের বিশাল কক্ষ নানা আকারের ঘটিকাযন্ত্র, স্বর্ণ ও রৌপ্যের মণিমুক্তাষচিত্ত পুষ্পবৃক্ষে ও ফলবৃক্ষে যাব-পর-নাই রমণীয়ভাবে সুকৌশলে সজ্জিত। পুষ্পে পুষ্পে হীরকষচিত্ত কত চিত্র-বিচিত্র প্রজাপতি, যৌমাছি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পক্ষী। মরি! মরি! কিবা মনোহর গঠনপ্রণালী! কি মনোহর ছাঁদ ও ভঙ্গিমা। সৌন্দর্যের সহিত কলাকৌশলের অপূর্ব সম্মিলন! দেখিলে সহসা স্বভাবসৃষ্টি বলিয়াই মনে হয়।

কক্ষের সেই রমণীয় কৃত্রিম পুষ্পকুঞ্জের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলাপের উৎস উৎসারিত হওয়ার দৃশ্য আরও চিত্তাকর্ষক এবং কৌতূহলোদ্দীপক হইয়াছে। চতুর্দিকে এইরূপ পুষ্পকুঞ্জের মঞ্জুল কুঞ্জ; মধ্যস্থলে বসিবার জন্য বিচিত্র কারুকার্যময় কুর্সি, সোফা ও তখত! আলোকজটায় সমস্তই জ্বল্ জ্বল্ করিয়া জ্বলিতেছে। প্রথম দর্শনেই লক্ষ্মীর দেবদুর্গত ঐশ্বর্য ও ত্রিলোকমোহন বিলাসের জাঁকের প্রভাব স্পষ্টভাবেই উপলব্ধি হয়।

এ হেন দরবারগৃহে সকলেই মৌনী। সকলেই কি ঘেন পতীর ও গুরুতর বিষয়ের ভাবনায় গুরুপঞ্জির ও ধীর।

সহসা নিঃশব্দতা ভঙ্গ করিয়া নবাব সূজা-উদৌলা নজীব-উদৌলার দিকে চাহিয়া বলিলেন : মোহেরবান ভ্রাতঃ! ব্যাপার বড়ই গুরুতর। আমি মারাঠীদের সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ আছি। এক্ষণে কেমন করে আহমদ শাহ আবদালীধ পক্ষাবলম্বন করি। মারাঠীগণ মুসলমানের শত্রু, তা আমি স্বীকার করি; কিন্তু মারাঠীগণ আজ পর্যন্ত আমার রাজ্যে কোনও উৎপাত ও লুটন করে নাই। তাদের

সহিত সন্ধি ভঙ্গ করলে তারা অতঃপর জাতক্রোধ হয়ে অগ্নিযুখে আমার রাজ্য হারবার করবে। হায়! তখন কে আমাকে রক্ষা করবে?

নজীব : যাতে আর হারবার করতে না পারে, বরং তা'রাই হারেবারে যায়, সেই জন্যই তো এই ভীষণ জেহাদের বন্দোবস্ত। সেই জন্যই তো এত সাধনা, সেধে দোররানী শাহকে হিন্দুতানে আনয়ন।

সুজা : তিনি যে বিপুল সৈন্যবল, অস্ত্র ও অর্ধবলসম্পন্ন মারাঠীদিগকে পরাস্ত করতে সমর্থ হবেন, তার নিশ্চয়তা কি? জয়ী হলে মারাঠী'রা আরও বেপরওয়াভাবে মুসলমানদিগের প্রতি দস্তদারাজী শুরু করবে। তখন সে জুলুম ও অত্যাচারে একান্তই অসহনীয় এবং মারাত্মক হয়ে পড়বে। তখন কে রক্ষা করবে?

তাহের : নবাব বাহাদুর! আফগানের বলদৃশ সশস্ত্র বাহু হতে মারাঠী দস্যু আর বাঁচতে পারে না। তাদের মত জালেম জাতি আর টিকতে পারে না। আহমদ শাহ তাদিগকে ধ্বংস না করে দেশে ফিরবেন না। আমরা ভারতীয় মুসলমান-শক্তির ভরসা অতি সামান্যই রাখি। তবে আপনি মুসলমান, এই জন্য আপনার পুণ্য সাধনোদ্দেশ্যেই এবং আপনার ভাবী মঙ্গলের জন্যই ইসলামের এবং মুসলমানের হায়দার্দ হবার জন্য মাত্র আপনাকে আহ্বান করছি। আপনার যদি মুসলমানের প্রাণ থাকে, আপনি আমাদের সঙ্গে যোগ দিন। নতুবা ইচ্ছা করলে আপনি মারাঠীদিগের সঙ্গেও যোগদান করতে পারেন। তাতে আমাদের কোনও ভয় বা দুঃখ নাই। তবে, যে ব্যক্তি কাফেরের সঙ্গে যোগদান করবে, তাকে কাফেরের মতই অপমানিত এবং লাঞ্চিত হতে হবে!

সুজার স্ত্রী : সেনাপতে! আপনার কথা নিতান্তই কর্কশ! কর্কশ বাক্য দৌত্যগিরীর অনুকূল নহে।

নজীব : তা নিশ্চয়! কিন্তু পূর্বে অনেকবারই মধুবর্ষিণী রসনারও অনেক ব্যবহার হয়েছে। ইসলামের প্রতি আপনাদের কোনও হায়দার্দির পরিচয় পাওয়া যায় নাই। নবাব বাহাদুর মারাঠীর গুণে নিত্য কম্পিত! এবার সেই কম্পন-ভীতি হতে রক্ষা করবার জন্যই সিংহবিক্রান্ত মহাবীর আহমদ শাহ দোররানীকে আহ্বান করা হয়েছে। তিনিও সম্মত। কিন্তু কি আশ্চর্য! এ অবস্থাতেও নবাব বাহাদুর ভীত এবং সঙ্কচিত হচ্ছেন! এই কি বীরত্ব এবং পুরুষকার! অযোধ্যার এমন পতন স্বরণ করতেও হৃদয় বিদীর্ণ হয়।

নবাব : ভুল! ভুল! মহাভুল! আমি যুদ্ধের নামে কম্পিত নহি। সকল কার্যেই অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করে যোগদান করা কর্তব্য। বিশেষতঃ এহেন দারুণ সময়ে। এ সময়ে অগ্ন্যবিপর্যয় ঘটা তো বিচিত্র নয়। আহমদ শাহ বিজয়ী হলে ভারতবর্ষ ত্যাগ করে যে স্বদেশে ফিরে যাবেন, এমন তো মনে হয় না। ভারতবর্ষ একান্তই করবার জন্য তখন তিনি নিশ্চয়ই চেষ্টা করবেন। সে চেষ্টার ভীষণ প্রতিফল আমাদের স্বাধীনতার তরু কি সমূলে উৎপাটিত হবে না?

ভাহের : নিশ্চয়ই না। আহমদ শাহ ভারত জয় করলেও, বকুর রাজ্য কখনও অপরহণ করবেন না। কিন্তু আপনি যদি শত্রু হয়ে দাঁড়ান, তা হলে আপনাকে তিনি সমূলে ধ্বংস না করে ছাড়বেন না। বীরপুরুষ বকুর প্রতি যেমন দয়ানীল, শত্রুর প্রতি তেমন কঠোর-হস্ত।

নবাব : আহমদ শাহ মাত্র ৬০ হাজার সৈন্য নিয়ে কিরূপে মারাঠীদিগের ৪/৫ লক্ষ বল বিনাশে সমর্থ হবেন, তা বুঝতে পারছি না।

নজীব : আমরা যখন ভারত জয় করেছিলাম, তখন কত সৈন্য নিয়ে এসেছিলাম? কাফেরদিগের অপেক্ষা কোন্ যুদ্ধে মুসলমানদের সংখ্যা বেশী ছিল? কিন্তু জয়লাভ করেছে কারা? সুতরাং, চিরাচরিত প্রথার অনুবর্তনে কিসে ভয়? ব্যক্তিগত স্বার্থ জাতিগত স্বার্থের মূলে বলিদান না দিলে কোন্ দিন কোন্ জাতি ত্রাণ পেয়েছে? ভারতের অন্যান্য নবাবগণ তো এ যুদ্ধে যোগ দিতে আপনার ন্যায় এক্ষণ দ্বিধাবোধ করেন নাই। তবে আপনারই বা এত দ্বিধা কেন?

নবাব-মাতা : বৎস সুজা-উদৌলা! আর ইতস্ততঃ করা উচিত নহে। স্বজাতির মঙ্গলের জন্য—সমগ্র ভারতের কল্যাণের জন্য সমর-সাগরে যথার্থ বীরপুরুষের ন্যায় নির্ভীক চিত্তে ঝাঁপিয়ে পড়াই কর্তব্য। অধর্মাচারী নৃশংস প্রকৃতি মারাঠী দস্যুগণকে নির্ধাতন এবং নির্মূল করাই এখন একমাত্র কর্তব্য। তুমি অবিলম্বে রণসজ্জা করে দোবরানী শাহের পতাকামূলে সমবেত হও। আমার ঐকান্তিক ইচ্ছা যে, এই যুদ্ধে যোগদান করে স্বকীয় বাহুর দোর্দণ্ড প্রতাপের পরিচয় দিয়ে কালের পটে অক্ষয় কীর্তি স্থাপন কর। বৎস! যুদ্ধই বীরপুরুষের একমাত্র কাম্য। সমর-স্ফূহার তোমার ধান নেচে উঠুক! শোণিত-ভরঙ্গের বিশাল প্রবাহে তোমাদের নামদর্শীসূচক বিলাসব্যসন ভেসে যাক। বৎস! যে-বাহু শত্রুদলনে অক্ষম, সে বাহু রাজ্যদণ্ড ধারণে উপযুক্ত এবং শোভন নহে।

বেগম : জাহাঁপনা! ষাওক! আমারও বলবতী ইচ্ছা যে, আপনি এই ভীষণ আহবে নেতৃত্ব গ্রহণ করুন। আপনার তরবারি কাফের রক্তপাতে উষ্ণ ধরণীর তৃষ্ণাজ্বালা নিবারণ করুক। আপনার চূড়বিক্রমে মারাঠী দস্যুগণ বিপর্যস্ত এবং বিদলিত হোক। মারাঠী দস্যু দমনের গৌরব-আলোকে আপনার নাম উজ্জ্বল হোক। হামিন্! আমার ইচ্ছা যে, আমিও সমরক্ষেত্রে আপনার সঙ্গিনী হয়ে তৃপ্তি ও পৌরব অনুভব করি। কীর্তি ও আশ্রয়সাদ লাভের এমন সুবর্ণ-সুযোগ আর কখনও ঘটবে না। জাহাঁপনা! আপনি এই যুদ্ধেই সমরের বিপুল আয়োজন লিঙ হোন। এ দাসী সর্বতোভাবে সাহায্য করতে প্রস্তুত।

সভাসীন সকলেই নবাব-মাতা এবং নবাব-বেগমের কথার উচ্চৈঃস্বরে আনন্দ-পুত কণ্ঠে 'মারহাবা!' 'মারহাবা!' বলিয়া উঠিলেন। নজীব-উদৌলা বলিলেন, 'আর আমার ভাবনা নাই। যে জাতির পূর্বে এমন বীর্যবতী ভেজাবিনী রমণী এখনও বিরাজমানা, নিশ্চয়ই সে জাতির মৃত্যু নাই। অচিরে তারা জড়তার

আবরণ ভেদ করে ভারত-বক্ষে নবজীবনের সূচনা করবে। সমস্ত বাধাবিঘ্ন তাদের চরণতলে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে।”

সুজা : বেশ কথা। এর অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি হতে পারে। আমি এখনই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে আদেশ প্রদান করছি। রাজকোষের জওয়াহেরাত বিক্রয় করবার আবশ্যিক হলেও তা বিক্রয় করে যুদ্ধের ইত্তিজাম করতে হবে।

নবাব-মাতা : বৎস! আমার নিজেই যে ১১ লক্ষ টাকা রাজকোষে জমা আছে, তা আমি যুদ্ধের জন্য অর্পণ করলাম। জওয়াহেরাত বিক্রয় করবার কোনো আবশ্যিক নাই।

বেগম : আমার সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা এবং সমস্ত জওয়াহেরাত সামরিক তহবিলে প্রদান করছি। অবিলম্বে যুদ্ধের আয়োজন করা হোক।

আবার সভাসীন বীর পুরুষদিগের মধ্যে ‘ধন্য’ ‘ধন্য’ এবং ‘সাবাস’ ‘সাবাস’ রব পড়িয়া গেল।

সেই নিস্তরু রাত্রিতেই অবিরাম তোপ গর্জন এবং বাদ্য-ধ্বনিসহ সমরোদ্‌যোগের আদেশ গভীর রবে ঘোষিত হইল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

নবোদিত সূর্যের হৈমকিরণচ্ছটা শাহ-ডেরাহিত তাবুর চূড়ায় পতিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই আহমদ শাহ, দোররানীর বিশাল তাবুতে দরবার বসিয়াছে। দোর্দণ্ড প্রতাপ আহমদ শাহ, তেজস্বী শাহ আলম, উজীর সফদরজঙ্গ, নবাব সুজা-উদৌলা, মুলতানের সুলতান আসফজাহ, রোহিলা সরদার নেওয়ামতউল্লাহ, সিদ্ধ প্রদেশের প্রসিদ্ধ বীরপুরুষ মির্জা নাসরজঙ্গ, ডাওয়ালপুরের নবাব রোকন উদৌলা, আফগান সেনাপতি তাহের খান, আক্বাস মির্জা, মাহমুদ খান প্রভৃতি প্রধান প্রধান বীরপুরুষ ও নেতৃগণ এবং আরও বহু সংখ্যক আলেম ও পণ্ডিতগণ দরবারে সমাসীন। দরবার নীরব ও নিস্তরু। এমন সময় আফগান-রাজকবি আহমদুল্লাহ খান দরবারে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার আগমনে সকলেই আনন্দোৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। সকলেই তাঁহাকে বিপুল সম্মান ও সংবর্ধনার সহিত অভ্যর্থনা করিলেন। অতঃপর সকলেই স্ব-স্ব আসন পরিগ্রহণ করিবার পরে দোররানী শাহ তাঁহাকে ৩৫-রচিত সামরিক কবিতাটি পাঠ করিতে অনুরোধ করিলেন।

কবির আহমদুল্লাহ খান সভামূলে দণ্ডায়মান হইয়া পারস্য ভাষায় রচিত উদ্দীপনাপূর্ণ এক অপূর্ব কবিতা পাঠ করিতে লাগিলেন।

আমরা বাঙ্গালা ভাষায় তাহার ভাবানুবাদ নিম্নে প্রদান করিলাম :

ভুলি' স্বাধীনতা	বর্ণ-সিংহাসন
ভুলি' বীর-ধর্ম	অপার্বিষ ধন
ভুলি' শাহীতাজ	চিরকুচি ধন

কেমনে জীবন যাপিছ তাই!

(৫)

যে সকল জাতি	বসি পদতলে,
আহরিল জ্ঞান	মনোকুত্ৰহলে
সেবিল চরণ	ভক্তি-পুষ্পদলে,
তোমাদের কাছে	সত্যতা শিখিয়া
উঠেছে যাহারা	গৌরবে মাতিয়া

দেখ তারা আজি মস্তক 'পরে।

হের তা'রা আজি	কিবা সমুন্নত!
শাসিছে তোদেরে	হরষে নিয়ত
বীর্য শৌর্য জ্ঞানে	কিবা বিমণ্ডিত

কাঁপিছে অবনী বিক্রমভরে!

(৬)

কিন্তু হায়! তোরা	আঁধারে পড়িয়া
বিপথে কুপথে	চলেছ ছুটিয়া
জাতীয় উদ্যান	বিস্তৃত হইয়া
হীন স্বার্থ পড়ে	মরিছ ডুবিয়া

মরণের ঝাত কাটি' স্ব-করে।

প্রভুত্ব স্বামীত্ব	সব হারাইয়া
অকূল পাথারে	মরিছ ডুবিয়া!
মূর্খতা-কুহকে	হয়ে জড়ীভূত!
নিজ দেশে আজি	পর-বশীভূত!

দুরবস্থা হেরি শ্রাণ বিদরে!

(৭)

যে জাতি অগতে	আলো ছড়াইল,
বীর-দাপে যার	ভুবন কাঁপিল,
অগৎ যাদের	চরণে লুটিল

তারা হিন্দুতানে আজি হতমান!

যাও দিকে দিকে	কর দরশন
আছে কত কীৰ্তি	ধরণী-শোভন।
মীনার মসজিদ	প্রাসাদ ভবন
দুর্গ গড়খাই	সেতু উপবন
কত বিদ্যালয়	কত শিল্পশালা
দীঘি সরোবর	কত খাল নালা

হইয়াছে এবে উগ্ৰ জীর্ণ মান!

(৮)

জগতের তাজ	সে তাজমহল
এখনো ছড়ায়	কিরণ উজ্জ্বল
এখনো প্রকাশে	মহিমা বিমল
এখনো কুতুব	মস্তক তুলিয়া
নীলাকাশ-অঙ্গ	আছে পরশিয়া

নীরবে গাহিয়া গৌরব গান।

কোথা গেল সেই	আশ্র-অভিমান
কোথা গেল সেই	বিপুল সম্মান
কোথা গেল সেই	চরিত্র মহান

কোথা গেল সেই স্বজাতির টান।

(৯)

কোথায় তোদের	বিজয়ী বাহিনী
কোথায় তোদের	গৌরব-কাহিনী
সমাগত এবে	আঁধার যামিনী

দেখি না গৌরব-আলোক-রেখা!

তরলাগ্নি-সম	পাঠান-বীরত্ব
সহসা কি হয়।	হইল বিপুলত্ব
কোথা মোগলের	প্রতাপ প্রচণ্ড
কোথায় তাহার	সত্যতা-মার্তণ্ড

কিছুই যে আর যায় না দেখা!

(১০)

কোথা দর্শনের	ভঙ্গ-আলোচনা?
কোথা বিজ্ঞানের	সূত্র গবেষণা?
চিকিৎসা-বিদ্যার	কোথা সে সাধনা?

সকলি কি সেই অতীত গরভে?

কোথা হয়! সেই শিল্প-নিপুণতা
কোথা হয়! সেই সময়-দক্ষতা!
কোথা শত্রুপাতে ঘোর প্রমত্ততা।
বাণিজ্য-গৌরব কোথায় এবে!

(১১)

ঐশ্বর্য সাম্রাজ্য বীরভের গর্ভ
সকলি কি হয় হয়ে গেল খর্ব!
বিলুপ্ত কি হয়! ইসলামের দর্প!
কোন সাধে তবে ধরিস জীবন!

তোদের গৌরব প্রশংসা-কাহিনী
হেয়েছিল এই বিশাল অবনী,
তোরাই ছিলি রে জগতের মণি,
ছিল রে তোদের শিখি-সিংহাসন।

(১২)

সবাই তোদের পূজিত চরণ
সবাই করিত মহিমা কীর্তন!
ছিল আজ্ঞাবহ ভারত ভূবন
ব্যস্ত ছিল সবে তোদের কাজে।

কিন্তু এবে হয়! তোদের অখ্যাতি
কীর্তন করিছে সবে দিবা রাত্রি,
বিশাল জগতে ঘৃণা টিটকারী
উখলি উঠিছে দিগন্ত ঠিকরি!
ফাটে এ হৃদয় বিষম লাজে!

(১৩)

যে সকল জাতি ছিল রে গোলাম
তাদের কাছেও আজি হতমান,
ভূ-নত জানুতে অবনত শিরে
ধাকিত যাহারা তোদের হজুরে
তোরাই আজি রে তাহাদের ঘারে
দাঁড়াইয়া দীন ভিখারী সাজে!

সহস্র লাঞ্ছনা অযুত গঞ্জনা
কত যে অবজ্ঞা কত যে পীড়না
দিতেছে এ প্রাণে বিষম বেদনা!
হৃদয় ফাটিছে বিষম লাজে!

(১৪)

কোন সাথে তবে
নাহি কি ভোদের
নাহি কি ভোদের
নাহি কি ভোদের
নাহি কি নিরায়
নাহি কি রে ঘৃণা
যদি থাকে তবে

খরিস জীবন!
সরম সঙ্কম?
বিন্দু উদ্বোধন?
বিক্রম চেতন?
শোণিতের ধার?
ক্রোধ অহঙ্কার?
জাগ একবার

জাগ সিংহ-সম নয়ন মেলে ।

সহে না সহে না
এহেন ঘৃণিত
সহে না রে আর

সহে না রে আর
পরাজয়-ভার,
হেন টিটকার!

ভণ্ড ঘৃত যেন দেয় রে ঢেলে'!

(১৫)

সিংহের ঔরসে
হয়েছিস্ হায়!
মারাঠীর কাছে

লডিয়া জনম
শুগল অধম!
বিনত বদন

ভাসে সদা আঁখি নয়ন-জলে ।

কোথা রে ভোদের
কোথা রে ভোদের
কোথা রে ভোদের

সে যশঃ-সৌরভ?
সে ধন-বৈভব?
ধর্মের গৌরব?

সকলি কি হয় গেল রসাতল!

(১৬)

কোথা হায়! সেই
কোথা হায়! সেই
কোথা হায়! সেই

বিজ্ঞানের শ্রভা?
বিজয়ের আভা?
মহিমার বিভা?

সকলি কি হয়? নিভিয়া গেল?

কোথা রে ভোদের
কোথা চর্ম বর্ম?
কোথা সিংহাসন?

সে বাণিজ্য-তরী?
কোথা তরবারি?
কোথা সৌধ-সারি?

সকলি কি হয় মিটিয়া গেল?

(১৭)

কোথা রে তোদের দৃশ্বেদ্য একতা?
কোথা রে তোদের সাহস-শীলতা?
কোথা রে তোদের মহা জাতীয়তা,
কোথা রে তোদের অদম্য উৎসাহ?

কোথা রে তোদের রূপ-উত্তেজনা?
কোথা রে তোদের উন্নত কামনা?
কোথা শত্রুজয়ে অদম্য বাসনা?
কোথা রে প্রখর তেজের প্রবাহ?

(১৮)

এ বিশ্বসংসারে বল কিসে, হায়!
তোদের মতন আপনা হারায়?
তোদের তুলনা বিশাল ধরায়
কিছুই তো নাহি করি দরশন!

হারায় কি অগ্নি দহন-শক্তি?
হারায় বিক্রম কবে পত্তপতি?
হারায় কি বিষ কতু বক্রগতি?
হারায় কি বহু গভীর গর্জনা?

(১৯)

জাগ তবে সবে জাগ একবার
গভীর নিনাদে ছাড়িয়া হুকার।
আলস্য জড়তা করি' পরিহার
বীরবেশে সবে সাজ আরবার,
ধর পাণ্ডিতলে অসি খরধার,
কর্তব্য সাধনে ধাও রে সবে।

দেখুক জগৎ বিশ্বয়ে চাহিয়া,
সুসুও মোসলেম শয়ন ত্যজিয়া,
উঠিল যুগল নয়ন মেলিয়া,
রাখিল প্রাধান্য আবার ভবে।

(২০)

আখার ভারতে মুসলিম পতাকা
উড়িবে পৌরবে অর্ধচন্দ্র আঁকা!

হাজার, রোহিলা সর্দার ৫ হাজার, এবং অন্যান্য সর্দার ও নবাবগণ দুই এক হাজার করিয়া টাকা উপহার প্রদান করিলেন। আহমদশাহ্ বান সর্বশুদ্ধ দুই লক্ষ পাঁচ হাজার টাকা প্রাপ্ত হইলেন। আহমদশাহ্ এই দুই লক্ষ পাঁচ হাজার টাকার সহিত নিজ হইতে আরো ৫ হাজার টাকা সম্মিলিত করিয়া একুশে দুই লক্ষ দশ হাজার টাকা সামরিক তহবিলে দান করিলেন। কবিপ্রবর আহমদশাহ্ বানের এই অসাধারণ স্বার্থত্যাগ এবং মহানুভবতায় চতুর্দিকে 'ধন্য' 'ধন্য' ধ্বনি সম্মিলিত হইল।

মহাবীর আহমদ শাহ্ এই জাতীয় কবিতার ৫ লক্ষ কাপি নকল করিয়া ভারতময় সর্বত্র বিতরণ করিবার আদেশ দিলেন। ৭ শত কাতেব (কেরানী) এক সপ্তাহ পরিশ্রম করিয়া কাপি প্রস্তুত করিয়া মফস্বলের সর্বত্র পাঠাইয়া দিলেন।

বোড়শ পরিচ্ছেদ

হৈমাবুদ-কিরীটিনী পুষ্পকুম্বলা উষার মৃদু হাসি-রেখা পূর্বাকাশ-প্রান্তে সমুদিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই পাণিপথ-প্রান্তরে ভীষণ শব্দে কামান গর্জন করিয়া উঠিল। মুসলিম ও মারাঠা সৈনিকশ্রেণী অস্ত্রশব্দে সজ্জিত হইয়া বাহবিন্যাসপূর্বক বিশাল প্রান্তর ব্যাপিয়া যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান হইল। মুসলিম সৈনিকগণ শ্রেণীবদ্ধ ভাবে সেই মহাপ্রান্তরেই ফজরের নামাজ সম্পন্ন করিয়া এক্যকণ্ঠে 'আল্লাহ্ আকবর' নিনাদে জল, স্থল, ব্যোম প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিলেন। তক্তবীর ধ্বনিতে মুসলিম-ধমনীতে রক্তস্রোত তরতর করিয়া প্রবাহিত হইল। সামরিক উন্মাদনায় সকলেই অধীর হইয়া পড়িলেন।

আহমদ শাহ্ আবদালী, নজীব-উদৌলা, উজীর সফদরজঙ্গ, মীর্জা নসিরজঙ্গ প্রভৃতি মুসলিম পক্ষের যাবতীয় প্রধান প্রধান বীরপুরুষ বিশেষ কৌশল ও দৃঢ়তা সহকারে সৈন্য পরিচালনায় বহুপরিকর হইলেন। তিন লক্ষাধিক সৈন্য এবং তিন শতের অধিক কামানের বিপক্ষে আহমদ শাহ্ মাত্র ৬০ হাজার সৈন্য এবং ৬০টি কামান লইয়া দুর্জয়-বিক্রমে এবং অতুল-সাহসে সময়-তরঙ্গে ভাসমান হইলেন।

বিশ্বলোচন সবিভাদেব পূর্বাকাশে সমুদিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই উভয়পক্ষ হইতে প্রলয়কালীন বজ্রের ন্যায় শীষণ শেল সকল বর্ষিত হইতে লাগিল। অসংখ্য বশুকের সাঁই সাঁই শব্দে ঝটিকাকুরু সমুদ্রের উচ্ছ্বাস-তর্জন পরিব্যাণ্ড হইতে লাগিল! অস্ত্র-গজ-সেনা-পদভারে ধরণী কম্পিত এবং ধূলিরাশি চঞ্চল হইয়া দিগঞ্চল আবৃত করিল।

প্রবিকরজাল সম্পাতে সৈনিকদিগের অস্ত্র-শস্ত্র সকল দায়িনীবিকাশের ন্যায় দীপ্তিমান হইতে লাগিল। অস্বারোহী মুসলিম সোনার সংখ্যা অল্প থাকায় মারাঠী অস্বারোহিণী সর্দারিণী রাণের নেতৃত্বে উত্তাল সাগরের প্রচণ্ড তরঙ্গের ন্যায়

তাহাদিগের গতি অবক্ষয়প্রায় করিয়া ফেলিল। কিন্তু এমন সময় মুসলিম গোলন্দাজদিগের অবাধ নিশানায় সদাশিব রাওয়ের পরিচালিত অশ্বারোহী সৈনিকবৃন্দ তরল পারদের ন্যায় চঞ্চল ও উচ্ছল হইয়া পড়িল! এ সময় একদল রোহিলা গাজী মুক্ত কৃপাণকরে সদাশিব রাওয়ের বিক্রান্ত সাদীগণের উপরে সহসা আনতিত হইয়া তাহাদের ধ্বংস সাধন করিতে লাগিল। ৫০ জন গাজী প্রায় ৮ শত মারাঠী সাদীকে নিপাত করিয়া নিজেরা মাত্র ১৫ জন শহীদ হন। ইহারা দীর্ঘ দু'ধারবিশিষ্ট তরবারি এমন বিদ্রোহে ঘুরাইতে অভ্যস্ত ছিলেন যে, বন্দুকের গুলী এবং তীর ইহাদের তরবারিতে প্রতিহত হইয়া ছিটকিয়া পড়িত। সদাশিব রাও হিংস্র ব্যাঘ্রের ন্যায় ভীষণতেজা গাজীদিগের দুর্বিসহ পরাক্রম দেখিয়া বিস্মিত এবং স্তম্ভিত হইলেন।

নজীব-উদ্দৌলা একদল বর্শাধারী সৈন্য লইয়া মারাঠী পদাতিকদিগকে আক্রমণ করিলেন। উভয়পক্ষে ভীষণভাবে যুদ্ধদান করায় যেন প্রলয়কাণ্ড বাধিয়া গেল। বর্শাধারী মুসলিম বীরগণ মারাঠী পদাতিকদিগকে বহুলভাবে হত্যা করিয়াও সংখ্যার অল্পতানিবন্ধন জয়লাভে সমর্থ হইলেন না। নজীব-উদ্দৌলা এবং মহাদেব পাণ্ডের মধ্যে ভয়ানক দৈরধ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বর্শাযুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের বর্শাই ভাঙ্গিয়া গেল। অতঃপর তরবারি লইয়া মারাঠী ও মুসলিম বীরদ্বয় শৌৰ্যবীর্যের বিপুল পরিচয় প্রদান করিলেন।

ভীষণ তরবারি অনবরত লৌহ-ঢালে পুনঃ পুনঃ প্রতিহত হওয়ায় অগ্নিস্কুলিঙ্গ বিকীর্ণ হইতে লাগিল। মহাদেব পাণ্ডে ক্রুদ্ধ মহিষের ন্যায় নিতান্ত উত্তেজিত এবং অধীর হইয়া নজীব-উদ্দৌলার স্বক্ক-লক্ষ্যে অসি প্রহার করিলেন। কিন্তু বীরকুলোসম নজীব-উদ্দৌলা সুকৌশলে বিপুল শক্তিতে সে আঘাত ঢালে উড়াইয়া দিলেন। মহাদেব পাণ্ডের তরবারি প্রচণ্ডভাবে প্রতিহত হইয়া ভগ্ন হইয়া গেল।

মারাঠী সেনাপতি তরবারিহীন হইয়া নিতান্ত পেরেশান হইয়া পড়িলেন, কারণ পাণ্ডের কাছে আর দ্বিতীয় তরবারি ছিল না। প্রতিহতীকে পেরেশান দেখিয়া নজীব-উদ্দৌলা স্বকীয় অশ্বজিন-বন্ধ আর একখানি তরবারি লইয়া পাণ্ডেকে অর্পণ করিয়া বলিলেন, “মারাঠী-বীর, ব্যস্ত হবেন না! অস্ত্রহীন শত্রুকে মুসলমান কখনও আক্রমণ করে না। আপনার যুদ্ধসাধ থাকলে আপনি এই তরবারি নিয়ে যুদ্ধ করতে পারেন।”

শত্রুর মহানুভবতা দেখিয়া মহাদেব পাণ্ডে মুগ্ধ এবং বিস্মিত হইলেন। কৃতজ্ঞতাজড়িত বাষ্পাবরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, “আপনি ধন্য, আপনার ন্যায় বীর ও মহানুভব পুরুষ-প্রবরের সাথে যুদ্ধ করে জ্ঞান ও জীবন সার্থক হল। আর দৈরধ যুদ্ধের প্রয়োজন নাই। নিজ নিজ সৈন্যবল নিয়ে যুদ্ধ করাই সমস্ত। আপনি আমাকে মেহেরবানী করে আপনার অযোগ্য দোসত বলেই মনে রাখবেন। সুযোগ পেলে এ উদারতার কৃতজ্ঞতা দানে কুণ্ঠিত হব না।”

অতঃপর উভয়ে ঘেরণ সংগ্রাম হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া কর্তব্যানুরোধে নিজ নিজ বাহিনীকে সংগ্রামে লিপ্ত করিয়া রাখিলেন। অপরাহ্নকালে উজীর সফদরজঙ্গ দিল্লীর বাহিনী লইয়া একদল মারাঠী-বাহিনী আক্রমণ করিলেন। দিল্লীর বাদশাহী বাহিনীর সৈন্যদল বিলক্ষণ প্রতাপ ও ভুক্তবীর্য প্রদর্শন করিলেও শত্রুদিগের বিশাল চমুর বিশেষ কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না। মাত্র দশ হাজার রোহিলা সৈন্য লইয়া সতর হাজার মারাঠী সৈন্যের প্রচণ্ড আক্রমণে মহাবীর সফদরজঙ্গ নিতান্ত বিপন্ন ও হয়রান হইয়া পড়িলেন। তিনি স্বকীয় অসাধারণ পরাক্রম ও নৈপুণ্যবলে পঞ্চ সহস্র শত্রুকে শমনসদনে প্রেরণ করিয়াও তাহাদিগের উন্মত্ত ও উদ্ভ্রাম আক্রমণ ক্ষুণ্ণ করিতে সমর্থ হইতেছিলেন না। সহসা একদল মারাঠী অশ্বারোহী তাঁহাকে ঘিরিয়া লইয়া মুঘলধারায় বাণ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। বীরপুঙ্গব সফদরজঙ্গ দুই হাতে দুইখানি প্রচণ্ড তরবারি ঘুরাইয়া একা প্রায় আড়াই শত দুশ্মনকে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। তিনি নানাস্থানে আহত হইয়াও সিংহবিক্রমে লড়াই করিতে লাগিলেন। তাঁহার সৈন্যগণ প্রাচীন আরব যোদ্ধাগণের ন্যায় কোষ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া মুক্ত তলোয়ার লইয়াই মাতোয়ারাভাবে যুদ্ধ করিয়া বীরত্ব প্রদর্শনপূর্বক শহীদ হইলেন।

জাঠকুল-গৌরব রাজা ছত্রসিংহ উজীরকে বিপন্ন দেখিয়া সত্বর পাঁচ হাজার বিক্রান্ত জাঠ সৈন্যসহ আসিয়া শত্রুদলে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রচণ্ড আক্রমণে বিপুল মারাঠী-বল ক্ষণকালের জন্য প্রতিহত হইলেও, আবার বিপুল তেজে বহু সংখ্যক আসিয়া প্রতি-আক্রমণে দিল্লী এবং ভরতপুর বাহিনীকে পর্যুদস্ত-প্রায় করিয়া তুলিল। স্বয়ং মারাঠী সেনাপতি মহাপরাক্রান্ত সদাশিব রাও, রঘুজী ভোসলাকে লইয়া উজীরকে বেটন করিবার জন্য বিষম প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। ছত্রসিংহ বিষম যুদ্ধ করিয়া যার-পর-নাই আহত এবং ক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। সফদরজঙ্গ ভীষণ ঘূর্ণিবাত্যার ন্যায় প্রচণ্ড তেজে শেষ বিক্রমে যুদ্ধ করিতে করিতে নিজের দুইখানি তরবারি এবং একটি বর্শা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। অতঃপর তোফাঙ্গ (পিস্তল) চালাইয়া দুই জনকে বধ করিলেন। সেকালের গাদা পিস্তল আজকালের মত সুবিধাজনক ছিল না। দু'নালা তোফাঙ্গে মাত্র দুইটি গুলীই ছিল। গুলী দুইটি নিঃশেষ হইবার পরে একজন মারাঠী সৈন্যের তরবারি কাড়িয়া লইবার উপক্রম করায় সদাশিব রাও শ্যেন পক্ষীর ন্যায় বেগে আসিয়া উজীরকে তরবারির আঘাত করিতে উদ্যত হইলে, উজীর চরম শক্তিতে নির্ভর করিয়া সদাশিবের পেশানি (কপাল) লক্ষ্য করিয়া পিস্তল ছুঁড়িয়া মারিলেন। ভীমবলে নিক্ষিপ্ত পিস্তলের বিষম আঘাতে সদাশিবের কপাল কাটিয়া তাঁহাকে ভূপাতিত করিল।

সদাশিব ভূপাতিত হইবামাত্রই রঘুজী ভোসলা এক লক্ষে আসিয়া উজীরের উপর পতিত হইয়া তাঁহাকে বন্দী করিবার জন্য প্রয়াস পাইলেন। সহস্রাধিক বলবান মারাঠী যোদ্ধা উজীরের উপর সমুদ্রতরঙ্গের ন্যায় ভীমবলে পতিত হইয়া

তাঁহাকে কাঁধে ফেলিবার উপক্রম করিল। উজীর এবং তাঁহার মুষ্টিমেয় দেহরক্ষী সিপাহী গ্রাণপণ কাপটা-কাপটি এবং ধস্তাধতি করিয়াও সাংঘাতিকরূপে আহত এবং বন্দী হইয়া পড়িলেন।

মারাঠীদলে তুমুল আনন্দধ্বনি উদ্ভিত হইল। কিন্তু এমম সময়ে শ্রীকুলশিবোমণি ভেজাধিনী বামা ফিরোজা বেগম প্রকাণ্ড আয়ব্য তাঞ্জীপৃষ্ঠে তীব্রবেগে শত সংখ্যক শত্রুসংহারিণী রোহিলা-ভামিনী সহ তীক্ষ্ণ শুষ্ক হস্তে রঘুজী ভোঁসলায় সৈন্যদলের উপর শত বজ্রের ন্যায় আপতিত হইলেন। জুফা সিংহিনীর ন্যায় ভূবিষহ পরাক্রমে কামাদল শত্রুকুলকে আকুল ও সম্ভ্রান্ত করিয়া তুলিলেন। প্রচণ্ডভেজা মহাবাহু ফিরোজা বেগম ক্ষিপ্রবেগে বর্শা প্রহারে রঘুজী ভোঁসলাকে বন্য স্বাহের ন্যায় বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। রঘুজী ভোঁসলাকে বিদ্ধ করিয়াই মুহূর্ত মধ্যে তাঁহার শিরশ্ছেদন-পূর্বক বর্শায়ে গাঁধিয়া উঁচু করিয়া সকলকে প্রদর্শন করায়, মারাঠী সৈন্যগণ ভয়ে ছত্রস্ত হইয়া পড়িল। উজীর সফদরজঙ্গ শত্রু-হস্ত হইতে মুক্তিকাত করিলেন। মারাঠী সৈন্যগণ বিচলিত হইবামাত্র অরিনিসূদনী মহিলাবৃন্দ তাহাদিগের পশ্চাত্তাবিত হইয়া বহু সংখ্যক কাকেরকে 'মালেকুল মওতে'র হস্তে হাঙলা করিলেন। বর্মচর্মমণ্ডিত এই কামিনীবাহিনীর উগ্র পরাক্রম ও শত্রুকোবিদতা সন্দর্শনে আহত সদাশিব দুঃখ ও কোঙে ক্ষুব্ধ সিংহের ন্যায় গর্জন করিয়া উঠিলেন। উন্নত ও রুদ্ধকণ্ঠে সৈন্যগণকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওরে নরধম কাপুকষণগণ! আজ অল্প সংখ্যক রমণীদিগের সঙ্গে যুদ্ধেও তোরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলি। দিক! দিক! তোদের জন্ম ও জীবনে! রে ভীকগণ! আজ বিজ্ঞাতীয় শ্রীলোকদিগের অপেক্ষাও তোরা হীনবীর্য এবং সাহসশূন্য! এই বর্মমণ্ডিত যোদ্ধগণের সকলেই মহিলা! সাহসপূর্বক তোরা কিরে দাঁড়িয়ে এদের বন্দী করার চেষ্টা কর! এরা পরমাসুন্দরী! যে যাকে বন্দী করবে, সেই তাকে পাবে। রমণীর সঙ্গেও যুদ্ধে আঁটতে না পারলে হস্তাগাগণ সিঁছু-সলিলে ডুবে মর।"

সদাশিবের ভীষণ তর্জন-গর্জন এবং রোষে সকলেই কিরিয়া দাঁড়াইল। এতক্ষণ পর্যন্ত মারাঠীগণ বুঝিয়াছিল না যে, এই আগলুক বাহিনী রমণী। তাহারা ভাবিয়াছিল, ইহারা বিশেষ নির্বাচিত পুরুষ সৈনিক। তাই তাহারা বীরত্ব এবং কৌশল দেখিয়া ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু সদাশিবের কথায় যখন তাহারা স্মরণভাবে নিপুণ দৃষ্টিতে দেখিয়া সত্যই বুঝিল যে, তাহারা রমণী, তখন তাহারা "হর হর মহাদেও" রবে বিকট চীৎকারে আকাশ কম্পিত করিয়া ভীষণভাবে মহিলাদিগের প্রতি কথিয়া দাঁড়াইল। ফিরোজা বেগম আরও উত্তেজিত হইয়া রমণীবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ভগ্নীগণ! সকলে আত্মার নামে দ্বিগুণ তেজে যুদ্ধ কর। এই সমস্ত অশূন্য কাকেরদিগকে নিতান্ত হিংস্র এবং দূশমন জানে প্রচণ্ড প্রহারে হত্যা কর। তোমাদের বাহুতে বাহুতে শক্তি,

মানসে মানসে সাহস, শিরায় শিরায় বীর্য প্রবাহিত হোক। কারিকরের সংখ্যাধিক্য দেখে কিছুমাত্র ভীত বা চঞ্চল হইও না। তোমরা পূর্বকালের আরাব ও তুর্কী মহিলাদিগের ন্যায় শত্রুর প্রতি একান্ত প্রচণ্ড ও পরিতপন হয়ে আক্রমণ কর। শত্রুদলন করে তোমরা বিজয়পতাকা উড়িয়ে দাও। ভগ্নীগণ! মনে রেখো, আব্দুল্লাহ তাল্লা নিশ্চয়ই তোমাদের সহায় আছেন। তিনি ধৈর্যশীল এবং কষ্টসহিষ্ণুদিগকেই প্রেম করেন।”

ফিরোজা বেগমের সন্দীপনী বানী শ্রবণে বামাবৃন্দ সকলেই শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দীর্ঘ বস্ত্রম প্রহারে শত্রু নিপাত করিতে লাগিলেন। পাষণ-প্রাচীরের ন্যায় রমণীবৃন্দ একান্ত দৃঢ়তা-সহকারে শত্রুদিগকে সংহত করিয়া প্রচণ্ড আক্রমণ করিলেন। মহিলাদের ভীমতেজে শত্রুবৃহৎ আবার বিদীর্ণ, বিশীর্ণ এবং বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। মুসলমানগণ ‘আব্দুল্লাহ আকবর’ নামে গগন-পবন মুখরিত করিয়া গর্জন করিয়া উঠিলেন। রমণীদিগের ভাঙ্গর বস্ত্রম এবং সৈনিকদিগের দীর্ঘ তরবারি শত্রুসৈন্যরূপ জলদশ্রেণীতে বিদ্যুৎ বিভাসিত হইতে লাগিল।

মারাঠীদিগের বহুসংখ্যক ভোপ থাকায় তাহারা এক্ষণে অজস্রভাবে ভীষণ শেলপুঞ্জ বর্ষণ করিতে লাগিল।

অবিশ্রাম গোলা বর্ষণে বহুসংখ্যক মুসলমান সৈন্য ধরাশায়ী হইল। অবস্থা শোচনীয় দেখিয়া গোলন্দাজ সেনাপতি শম্শের জঙ্গ ‘জাহাঁকোষা’ ‘আকগান,’ ‘জবরদস্ত,’ ‘আলফাতেহ’ প্রভৃতি নামধেয় নবনির্মিত বিরাট আয়তনবিশিষ্ট সাতটি ভোপে আশ্রয় দিলেন। এই কয়েকটি ভোপ আহমদ শাহ ভারতবর্ষে আসিয়া প্রস্তুত করিয়াছিলেন। প্রত্যেক ভোপ টানিতে একশত অশ্ব যোজিত হইত। জবরদস্তে ২০ মণ এবং আলফাতেহে ২৫ মণ বারুদ ঠাসা হইত। অন্যান্যগুলিতে ১৫ মণ করিয়া বারুদ লাগিত। ৫ হইতে ১০ মণ ওজনের গোলা ব্যবহৃত হইত। শম্শেরজঙ্গ এই সমস্ত নবনির্মিত ভোপে আশ্রয় দিলে, তাহার প্রলয়ঙ্কর শ্রবণবিদারী আওয়াজে যুদ্ধস্থল কম্পিত এবং যুদ্ধগণ চমকিত হইয়া উঠিল। মারাঠী ভোপখানার উপর এই সমস্ত ভোপের প্রকাণ্ডকার ভয়াবহ শেল পড়ায় তাহাদের অনেক কামান ভগ্ন এবং কতকগুলির নল চেন্টা হইয়া গেল।

পাঠান গোলন্দাজদিগের অব্যর্থ লক্ষ্যে মারাঠীদিগের বহু গোলন্দাজ সৈন্য ভোপের মুখে উড়িয়া গেল। দ্বিপ্রহরের মধ্যে মারাঠীদিগের ভোপখানা অকর্মণ্য এবং নগণ্য হইয়া পড়িল। কিন্তু মারাঠী গোলন্দাজগণ নূতন নূতন ভোপ আনিয়া অভাব পূরণের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিল।

এইরূপে পানিপথ-পান্তরে সত্তাহকালব্যাপী ভীষণভাবে সমর-তরঙ্গ উদ্ভিত হইল। মুসলিম বিক্রমে মারাঠী-চমু ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইল। বীরকেশরী আহমদ শাহ আবদালী আপনার নিমকোটী নামক অপরাজেয় বিক্রমশালী সেনাদিগকে সঙ্গে লইয়া ভীষণভাবে যুদ্ধ করিয়া অসংখ্য বর্গী সেনাকে শমনসদনে প্রেরণ

করিলেন।

আহমদ শাহের কালান্তক কালসদৃশ পরাক্রম এবং সৈন্য চালনার অদ্ভুত কৃটকৌশলে সকলেই বিস্ময় গণিলেন। সপ্তম দিবসে আহমদ শাহ যখন ভীম বিক্রমে কাকের দলন করিতেছিলেন, তখন সহসা একটি গোলা আসিয়া আহমদ শাহের সম্মুখে পতিত হইল। শেল এই মুহূর্তেই কাটিয়া প্রলয়কাণ্ড উপস্থিত করিবে। হায়! মুহূর্তের মধ্যেই মুসলমানের সমস্ত জয়াশাই বিলীন হইবে। শেল কাটিয়া এখনই আহমদ শাহকে চূর্ণ করিয়া ফেলিবে। হায়! হায়! কি সর্বনাশ! শেলের মুখের আগুন জ্বলিতেছে! এখনই ফাটিবে! আর রক্ষা নাই!

বীরকুমসিংহ আহমদ শাহের অন্তঃকরণেও কাঁপিয়া উঠিল। এই কঠিন মুহূর্তে সকলেই বিস্মিতভাবে দেখিল যে, বিদ্যুদ্গতিতেও লজ্জা দিয়া বীর্যবতী ফিরোজা বেগম অস্থ হইতে অবতরণপূর্বক চক্ষুর পলক ফেলিতে-না-ফেলিতে শেলটিকে দক্ষিণ হস্তে লইয়া বেগে শত্রুপক্ষে নিক্ষেপ করিলেন! কিন্তু হায়! শেল নিক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গেই তাহা বিদীর্ণ হইল। আর তৎক্ষণাৎ ফিরোজা বেগমের দক্ষিণ হস্তখানির কনুই পর্বন্ত উড়িয়া গেল! মুহূর্তের জন্য সকলের মুখে ককণ চীৎকার উদ্ভিত হইল। ফিরোজা গর্জন করিয়া ভীতকণ্ঠে বলিলেন, “আমার জন্য ভয় নাই। আমার কিছুই হয় নাই। শত্রুদলকে পরাস্ত কর।”

এই বলিয়া বাম হস্তে তরবারি ধারণ করিয়া সদাশিব রাওয়ের দিকে ব্যাতীর ন্যায় তীব্র গতিতে অভিদ্রুত হইলেন। সদাশিব ফিরোজাকে দেখিয়া মনের ভিতরে প্রথমে চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। কিন্তু মুহূর্ত পরে ফিরোজার কুধিরাত্ত বাহু এবং অন্য দিকে তীষণ সংহারিণী মূর্তি দেখিয়া সদাশিব আতঙ্কিত হইয়া পড়িলেন। সদাশিব ভাবিলেন, এই দারুণ শোচনীয় অবস্থা এবং হস্ত ধ্বংস হইবার অসহনীয় যাতনায় ফিরোজা আকুল ও অধীর হইয়া পড়িয়াছেন। এই মনে করিয়া বলিলেন, “সুন্দরী বেগম! এ কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার! এস, এস, হস্ত বাঁধিয়া দি! আহা! কিসে এমন হইল? তোমার ঐ সুবসুন্দরীপঙ্কন, ত্রিলোকললামদেহে এ সমরসজ্জা কর-পর-নাই বিশ্রী ও বেখায়া সেখাইতেছে! এস হৃদয়হারিণি! এস, তোমার চরণ-সেবা করিয়া ধন্য হই।”

ফিরোজা সদাশিবের বাক্যে অগ্নিশিখার ন্যায় একেবারে প্রজ্বলিত হইয়া রোষকষায়িত লোচনে দস্তে দস্ত সংঘর্ষন করিয়া বলিলেন, ‘ওরে পাপাশ্চা নারী-চোর! কথা রাখ। অস্ত্র ধারণ কর। আমি তোমার মাতা কটবার জন্যই এসেছি। পাপাশ্চা, মৃত্যুর জন্য প্রতুত হ!”

এই বলিয়াই তরবারি আক্ষলন করিলেন। সদাশিব তাহা চালে উড়াইয়া লইয়া বেগমকে বন্দী করিবার জন্য বাম হস্তে চাপিয়া ধরিবার কৌশল করায় বেগম সম্প্রসারিত তরবারির ওয়ারে ঘোড়ার দুই পা সহসা কাটিয়া ফেলিলেন। ঘোড়ার সম্মুখের দুইখানি পা কর্তন করায় ঘোড়ার সহসা টবু হইয়া পড়ায় সদাশিব

আসনচ্যুত হইয়া ভূপতিস্ত হইলেন । মুহূর্তের অবসর না দিয়া ফিরোজা বেগম চকিত আঘাতে সদাশিবের মস্তক কাটিয়া তরবারি অগ্রে বিদ্ধ করতঃ উর্ধ্ব উস্তোলন করিলেন । মুসলিম-বাহিনী “আল্লাহ্ আকবার” নামে প্রমত্ত ভেঙ্গে গর্জন করিয়া কাফের সংহারে মাতোয়ারা হইলেন । সদাশিবের শিরশ্ছেদনে বর্গী-সৈন্য জলস্রোতঃ-প্রহৃত বেতস-লতিকার ন্যায় কম্পিত কলেবরে ঘূর্ণিব্যত্যা-ভাঙিত তুলারাশির ন্যায় দিগ্বিদিকে পলায়নপর হইল । আফগান বাহিনী পচাৎ পচাৎ গিয়া তাহাদিগকে সমূলে নির্মূল করিয়া ফেলিল ।

এই পানিপথের ভীষণ যুদ্ধেই মারাঠীদিগের উপচীযমান বিরাট শক্তি একেবারেই চুরমার হইয়া যায় । সমগ্র ভারতবর্ষ আবার মুসলিম বীর্য-পরাক্রমের বিজয়-লাভে আনন্দোৎফুল্ল হইয়া ওঠে । মারাঠীদিগের ঘরে ঘরে ক্রন্দন-ধ্বনি উদ্ভিত হয় । পেশোয়া মনোদুঃখে ভগ্ন অন্তঃকরণে প্রাণত্যাগ করেন । ভারতের গৃহে গৃহে নগরে নগরে পত্নীতে পত্নীতে আবার আনন্দ-কোলাহল উদ্ভিত হয় ।

উপসংহার

পানিপথের ঐশ্বৰ্য্য যুদ্ধে মারাঠী-শক্তি পরাজিত ও বিধ্বস্ত হইবার পরে বীরকুল-
হৰ্ষক আহমদ শাহ্ দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়া ভারতের শাসনে সুবন্দোবস্তে প্রবৃত্ত
হইলেন : ফিরোজা বেগমকে রাজকীয় সম্মান, বেলাত এবং ১৫ লক্ষ টাকা
আয়ের বিস্তৃত জায়গীর প্রদত্ত হইল। বিশেষ দরবার আহ্বান করিয়া তাঁহাকে
“কবুল হেব” অর্থাৎ ‘হিন্দুস্তানের পৌরব’ এই উপাধি প্রদত্ত হইল। তাঁহার
কর্তৃত্ব হস্তবানি দেশভক্তি এবং স্বজাতি-প্রেমের সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রূপে আরকে
ছুবাইয়া কাচপাত্রে বিশেষ যত্নে একটি রমণীয় মন্দিরে স্বর্ণ-বেদিকার উপরে
সর্বসাধারণের দর্শনার্থ সংস্থাপিত হইল। মিসরের গাত্রে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইল :

“বদেশ-প্রেমের অত্যাঙ্কুল আশ্চর্য্যসর্গ।”

নজীব-উদ্দৌলা এবং ফিরোজা বেগম দীর্ঘকাল পরে প্রেমরসে অভিষিক্ত হইয়া
পরম সুখে দাম্পত্য-জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। মুরলাকে একজন
সম্ভ্রান্ত সেনাপতির সহিত বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করা হইল। দিল্লীর প্রভুত্বকে অঞ্চল
এবং মজবুত করিয়া ভারতব্যাপী বিশাল ইসলামী সাম্রাজ্য সংগঠনের জন্য
আহমদ শাহ্ যখন কঠোর পরিশ্রম করিতেছিলেন, ঠিক এমন সময়
আফগানিস্তানে রাজপরিবারে ঘোরতর বিপ্লব ঘটায় আহমদ শাহ্ অনিচ্ছা সত্ত্বেও
দিল্লী ত্যাগ করিয়া কাবুলে প্রত্যাবর্তন করেন। কাবুলে প্রত্যাবর্তন করিয়া
অল্পকাল পরেই মহাবীর আহমদ শাহ্ হঠাৎ পরলোকগমন করেন। তাঁহার
মৃত্যুতে ভারতের মুসলমান শক্তি-সকল আবার বিচ্ছিন্ন এবং দ্বীন হইয়া পড়ে।

আন্তবিরোধ আবার মন্তকোত্তোলন করে। বাদশাহ্ এবং উজীরগণ আবার
মারাঠীদিগের হস্তে ক্রীড়াপুতলি হইয়া পড়েন। সুতরাং মুসলমান কর্তৃক ভারতবর্ষ
দ্বিতীয় বার বিজিত হইয়াও মুসলমান-ভাগ্যে তাহার ফলভোগ ঘটিল না।
বিধাতার ইচ্ছায় উদ্যমশীল ইংরেজ জাতি ফল-ভোগের অধিকারী হইলেন।

নূরউদ্দীন

নূরউদ্দিন

' উদ্বোধন, ' ' উচ্ছ্বাস, ' ' নব উদ্দীপনা, ' ' স্ত্রীশিক্ষা, ' ' স্পেনীয়
মুসলমান সভ্যতা, ' ' সুচিন্তা, ' ' আদব কাযদা শিক্ষা, '
' তুরস্ক ভ্রমণ, ' ' তুর্কী নারীজীবন, ' ' সঙ্গীত-
সঞ্জীবনী, ' ' স্পেনবিজয় কাব্য,
' প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা—

গাজী

সৈয়দ আবু মোহাম্মদ ইস্‌মাইল হোসেন সিরাজী

(কবি সোলতান ও ওয়ায়েজল এস্‌লাম)

প্রণীত।

গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত।

১৯২৩

মূল্য ১/০ আনা

PRINTER—K. C. DASS.

METCALFE PRINTING WORKS.

34, Mechuabazar Street, Calcutta.

এখন পরিচ্ছেদ

ফজর হইয়াছে। তরুণ রবির অরুণ কিরণ আঁধার ভুবন আলোকিত করিয়াছে। পাখী ডাকিতেছে। ফুল ফুটিতেছে। বায়ু বহিতেছে। আকাশ-সাগরে দর্শিত মেঘ ধীরে ধীরে যেন হাওয়া পাইয়া বেড়াইতেছে। নবীন জীবন, নবীন আনন্দ সারা ভুবন ব্যাপিয়া জাগিয়া উঠিতেছে। ভুবনে ভুবনে, গগনে গগনে, পবনে পবনে শান্তি, শ্রীতি এবং আলোকের ধারা ফুটিয়া উঠিতেছে।

এহেন মধুর ও সুন্দর প্রাতঃকালে চিতোরের রাজ-উদ্যানে দুইটি সুন্দর বালক-বালিকা মনোহর জলকুসুমদাম-শোভিন সরোবর-তীরে একটি হরিণশিত লইয়া খেলা করিতেছে। বালক এবং বালিকার কালো কালো গুচ্ছ গুচ্ছ কেশকলাপ লইয়া ক্রীড়া করিতে করিতে প্রভাত-পবন নাচিয়া নাচিয়া প্রবাহিত হইতেছে। বালারুণের হৈমচ্ছটা দুইজনের মুখের উপর পড়িয়া এক অনির্বচনীয় শোভার সৃষ্টি করিয়াছে।

সুবর্ণশৃঙ্খলাবহু হরিণশিতটিকে লইয়া দুইজনে সরোবর-তীরে গালিচার ন্যায় শ্যামল ঘাসের উপরে ভ্রমণ এবং ধাবন করিয়া বেড়াইতে লাগিল। বাগানে নানা জাতীয় মনোহর ফুল ফুটিয়া অপূর্ব শোভার বাজার খুলিয়া বসিয়াছে। বালক-বালিকা এ-গাছের ফুল ভুলিয়া, ও-গাছের ফুল গুঁকিয়া, সে-গাছের ফুল ছিড়িয়া, হরিণ নাচাইয়া সুন্দর প্রাতঃকালে এই সুন্দর বাগানের সুন্দর দৃশ্যকে আরও সুন্দর ও মনোহর করিয়া তুলিল।

এই শিত দুইটি পশ্চিম তীর হইতে পূর্ব তীরে যাইয়া উপস্থিত হইবার ক্ষণপরেই, উদ্যান-তোরণ উদ্ঘাটিত হইল। চিতোরের রানী লক্ষ্মীবাসী এবং মালবের বেগম আর্জুমন্দ বানু কতিপয় সখী ও রক্ষিণী সঙ্গে প্রাতঃভ্রমণ উপলক্ষে উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। রানী ও বেগম উভয়েই সমবয়সী। উভয়েই সুন্দরী, আমোদপ্রিয় এবং রসরসিনী। কেবল পরিচ্ছদের পার্থক্যে উভয়কে ভিন্নজাতীয় বলিয়া বোধ হইতেছে, নতুবা সহোদররা ভগ্নীযুগল বলিয়া নিশ্চয়ই প্রতীয়মান হইত।

বেগম ও রানী উভয়েই ধীরে ধীরে পায়চারি করিতে লাগিলেন। সখীগণ নানা জাতীয় ফুল ভুলিয়া তোড়া বাঁধিতে লাগিল। বেগম ও রানী দুইজনে কত ফুল, কত পাখীর গল্প করিতে লাগিলেন। উভয়েই পূর্ণ যুবতী, রসবতী এবং লীলাবতী, উভয়েই মধুরহাসিনী, মধুরভাষিনী এবং খঞ্জনগামিনী। উভয়ের দ্বিত মধুরহাসো,

ওজনবৎ বাকো এবং রূপের ছটায় বাগানের কুসুমাবলী যেন আরও হাস্যময় ও সৌন্দর্যশালী হইয়া উঠিল।

বেগম বলিলেন : রানী! আপনার বাগানটি দেখে খুশী হলেম। চলুন এক্ষণে একবার সরোবরে নৌ-বিহার করা যাক।

রানী বলিলেন : চলুন, নৌকা প্রস্তুতই আছে।

দুইজনে নৌকায় আরোহণ করিলেন। সখীরা বাহিতে লাগিল। পুরু গালিচার উপরে দুইখানি রত্নখচিত কুর্সী সংরক্ষিত হইয়াছিল। রানী ও বেগম তদুপরি বসিয়া কুটির টুকরা জলে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। আর অমনি শত শত নানা জাতীয় বৃহৎ ও ক্ষুদ্র মৎস্য ধাবন, কুর্দন, সস্তরণ ও উল্লফন করিয়া সেই সমস্ত কুটি খাইবার জন্য এক অপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা করিল।

সরোবরের নীলাভ স্বচ্ছ জলে মৃদু তরঙ্গ উঠিতেছিল। মাছের কুর্দনে সে তরঙ্গে আরও কত রঙ্গবিভঙ্গ হইল। মাছের খেলা দেখিয়া কুমার-কুমারী ছুটিয়া আসিয়া বলিল : আশ্চর্য, আমরা নৌকায় উঠব।

বেগমের ইঙ্গিতে পরিচারিকারা বালক-বালিকাভয়কে নৌকায় উঠাইয়া লইল। ইত্যবসরে সখীরা নানা ফুলের মাথা গাঁথিয়া বেগম ও রানী এবং কুমার ও কুমারীর গলে পরাইয়া দিল।

নারীমণি এবং ফুলমণিদিগের একত্র সম্মিলনে রূপের খনি যেন উধলিয়া উঠিল। কুমারের একগাছি মালা বড় সুন্দর ও লম্বা ছিল। কুমার তাহা গলা হইতে খুলিয়া কুমারীর গলায় পরাইয়া দিল। কুমারী তৎপরিবর্তে আর এক গাছি বেলা ও গোলাপ-গ্রথিত মালা হাসিতে হাসিতে কুমারের গলায় পরাইয়া দিল।

রানী হাসিয়া বলিলেন : বেগম দেখুন, আপনার কুমারের কাণ্ড দেখুন।

বেগম : আপনার কুমারী অদলের বদল করেছে।

রানী : কুমারই তো আগে বদল করেছে। সুতরাং কুমার আমার কন্যার সৌন্দর্যের কাঁদে পড়েছে।

বেগম : তা তো বটেই, অমন সুন্দরী মেয়েকে দেখে ভুলবার কথাই তো বটে।

বেগম ও রানীর কথা শুনিয়া তরলমতি বালক-বালিকাভয় মৃদু মৃদু হাসিয়া উভয়েই নিস্ত নিস্ত মায়ের মুখের দিকে চাহিল; সে চাহনিতে কেবলই পবিত্রতা ও নির্মলতা।

পাঠক-পাঠিকার অবগতির জন্য জানাইয়া রাখিতেছি যে, আমাদের এই কুমার ও কুমারীর নাম যথাক্রমে নূরউদ্দীন ও কাম্বলীবাহী। হালকের সুলতান রোকনউদ্দীন এবং চিতোরের রাণা উদয়সিংহের মধ্যে মিত্রতাবন্ধন দৃঢ় করিবার উদ্দেশ্যে বেগমকে নিমন্ত্রণ করিয়া চিতোরে আনা হইয়াছে। বিশ্ববিজয়ী মুসলমান

এবং ভারতের একুশতাব্দী বীর-জাতি রাজপুত্রের মধ্যে এক যুগে যেমন ভীষণ সমর-তরঙ্গ উখিত হইয়াছিল, পরবর্তী যুগে মিলনের মলয়-মাকড়সও তেমনি প্রবাহিত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গুজরাটে বিপুল প্রতাপে সুলতান আহমদ শাহ্ দরবারে বসিয়া রাজকার্যের পর্যালোচনা করিতেছেন। বিশাল ত্রিগুণ্ড-বিশিষ্ট প্রকাণ্ড দরবারগৃহ। শুভ্র মর্মরপ্রস্তরের নয়ন-মোহন কারুকার্যময় অতীব রমণীয় হর্ম্য। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ধামগুলির গায়ে সুবর্ণের লতাপাতার চারু অঙ্কন অপূর্ব সুম্মা প্রকাশ করিতেছে। সুবর্ণনির্মিত বিবিধ জাতীয় মণিখচিত একটি আশ্চর্য শিল্পকৌশলজড়িত অনতি-বৃহৎ চন্দ্রাতপ নিম্নে শাহী তখত সংস্থাপিত। ছাদ হইতে দোলায়মান বহুসংখ্যক সুবর্ণশৃঙ্খলের প্রত্যেকটিতে ফুলের গুচ্ছ ঝুলিতেছে।

সিংহাসনখানি একখানি রৌপ্যনির্মিত চৌকির উপরে সংস্থাপিত। চারিটি সুবর্ণনির্মিত সিংহের মস্তকোপরি তখতখানি সংস্থাপিত। তখতের পৃষ্ঠদেশে একটি বৃহৎ প্রজাপতির গঠন। এই প্রজাপতিটি তেইশ রকমের মণি-মুক্তায় গঠিত। জমরুদ, ইয়াকুত, লাল, বদখশান, ফিরোজা, পোস্তরাজ, চুণী, পান্না, মোতি, হীরক প্রভৃতি নানাজাতীয় পাথরের কৌশলজনক সংস্থাপনে প্রজাপতিটি যার-পর-নাই মনোহর ছিল বলিয়া, এই সিংহাসন “প্রজাপতি সিংহাসন” নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল।

দক্ষিণ-পার্শ্বে যুবরাজ এবং বাম পার্শ্বে উজীর সমাসীন। তাঁহাদের দুই পার্শ্বে আর্মীর-ওমরার আসন। পেশকার সিংহাসনের নীচে রৌপ্য-কুর্সীতে সমাসীন। দরজার দুই পার্শ্বে মুক্ত-করবালকরে দুইজন প্রহরী দণ্ডায়মান। সিংহাসনের পশ্চাৎভাগে আরও দুইজন প্রহরী উলঙ্গ করবালকরে দণ্ডায়মান। সিংহাসন-বেদিকার নিম্ন-ভাগে দক্ষিণ পার্শ্বে ফরিয়াদী এবং বাম পার্শ্বে আসামীগণ দণ্ডায়মান। তৎপর সম্রাট দর্শকবৃন্দের স্থান। তৎপর সাধারণ দর্শকদিগের জায়গা।

সভাস্থল নীরব নিম্পন্দ। কাহার নিঃশ্বাসও পতিত হইতেছে না। দরবারগৃহের বারান্দায় আটটি গোলাপের উৎস উৎসারিত হওয়ায় সমস্ত গৃহ সুগন্ধে ভুরভুর করিতেছে। জাঁকজমক, গাভীর্য এবং সৌন্দর্য দিল্লীর দরবারের সমন্বিত।

একটি বিষয়ের মীমাংসা শেষ হওয়া মাত্রই প্রহরী আসিয়া নিবেদন করিল :

চিতোরের একজন মুসলমান হুজুরের খেদমতে হাতির হতে চার। তার বিশেষ কিছু নিবেদন আছে।

সুলতান সখাতি জ্ঞাপন করিলে, একজন শ্রৌতব্রাহ্ম খোশ-চেহারা ঠাণ্ডা মেজাজ হুমুবেশধারী ব্যক্তি আসিয়া বখারীতি কুর্নিশ করিয়া সুলতানের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। সুলতান স্বিতমুখে তাঁহাকে তাঁহার বক্তব্য নিবেদন করিতে বলিলেন।

আগতুক বলিতে লাগিলেন : আমি চিতোর রাজ্যের একজন বণিক। আমার মাম আহমদ রেজা খান। আজ পনেরো বছর হতে চিতোরে বাস করে আসছি। বিপত্ত ইসলাম-আজহা উপলক্ষে আমি একটি গো-কোরবানী করি। অবশ্য রাজ-দণ্ডেরে আমি নিতৃত্তেই কোরবানী করেছিলাম। কিন্তু কোতোয়াল, বিশেষ ওয়ানুসন্ধানে তা অবগত হয়ে রাজার কর্ণগোচর করে। রাজা এই অপরাধে আমার একমাত্র পুত্রকে কালীর মন্দিরে বলিদান করেন। আমার সহধর্মিনী পুত্রশোকে উনুদিনী হয়ে তিন দিন পর্যন্ত অনবরত ভীষণ বিলাপ করতে করতে প্রাণত্যাগ করেছেন!

সুলতান : কি লোমহর্ষক ব্যাপার! এ কি কখনও মানুষের পক্ষে সম্ভবপর? কি আশ্চর্য! উদহুসিংহ! এ এতই নিষ্ঠুর এবং পাষণ্ড!

উজীর : হিন্দুরা পরধর্মে ঘোরতর বিশ্বাসী। গো-হত্যার নামে তারা কিও হয়ে ওঠে।

সুলতান : কি আশ্চর্য! তারা গরুর ভূল্য উপকারী সহস্র সহস্র মহিষ বলি দিতে কিছুমাত্র কুষ্ঠাবোধ করে না, বিশেষতঃ গো-হত্যা তাদের ধর্মে সিদ্ধ, তবে বর্তমানে দেশীয় সংস্কারবিরুদ্ধ। মুসলমান গো-হত্যা করলেই তারা অস্থির হয়ে ওঠে। এমন বিচারহীন বিশ্বাসী রাজার হস্তে রাজদণ্ড কদাপি শোভা পায় না।

উজীর : বিধাতা সেজন্য তাদের হস্ত হস্তে রাজদণ্ড বহু সহস্র বছর পূর্বে কেড়ে নিয়েছেন। সহস্র সহস্র বছর হতেই তারা তিনুদেশীয়দিগের দ্বারা শাসিত হচ্ছে। পারসিক, চীন, শক, হন, নৈসরী, এরাকী, গ্রীক প্রভৃতি নানা জাতি কর্তৃক হিন্দুরা শাসিত হয়ে আসছে।

সুলতান আহমদ শাহ আগতুকের দিকে চাহিয়া বলিল : তুমি যা' যা' বলছ সবই বর্ণে বর্ণে সত্য?

অশ্রুসিক্ত নয়নে শোকারকণ্ঠ কণ্ঠে আগতুক বলিল : জাহাঁপনা! আমি যা বলেছি, সবই সত্য; একবর্ণও অতিরঞ্জিত বা মিথ্যা নয়।

সুলতান কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন : আমাকে কি করতে বল?

আগতুক : হুজুর, বাদশাহ নামদারকে গোলাক কি করতে বলবে! আমি

বিচার-প্রার্থী।

সুলতান : চিতোর স্বাধীন রাজ্য, তার রাণাও শ্রবণ প্রতাপশালী। আমি কেমন করে তার বিচার করব?

আগস্তুক : কেমন করে বিচার করবেন, আমি কেমন করে বলব! আমার দুখে ও শোক নিবেদন করেছি; এক্ষণে আপনাত কর্তব্য আপনি স্থির করুন।

উজীর : এমন পাষাণ দমন না করলে আত্মাহের কাছে নিশ্চয়ই দারী হতে হবে। এমন পাষাণকে সমূলে উৎসাদিত না করতে পারলে আমাদের রাজশক্তির গৌরব একেবারে বৃথা!

সুলতান : নিশ্চিত কথা! গুপ্তচর পাঠিয়ে সকল অবগত হওয়া আবশ্যিক।

এই বলিয়া বাদশাহ আগস্তুক লোকটিকে মোসাফেরখানায় থাকিবার জন্য হুকুম দিলেন। জেব খরচের জন্য আগস্তুককে এক শত টাকা দান করিলেন।

আহমদ রেজা খান দরবার হইতে যাইতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময়ে পররাষ্ট্র বিভাগের মন্ত্রী আসিয়া একখানি পত্র পেশ করিলেন। পত্রখানি সুলতান আহমদ শাহের চিতোরস্থ দূতের লিখিত। পত্র খুলিয়া পাঠ করা হইল। পত্রখানিতে লিখিত হইয়াছিল :

মহামান্য বাদশাহ নামদার,

সালাম ও তসলিম বাদ আরজ এই যে, এখানে বিগত বকর-ইদ পর্ব উপলক্ষে আহমদ রেজা খান নামক একজন মুসলমানের উপর ভীষণতম নিষ্ঠুর ও নৃশংস অত্যাচার হইয়াছে। সে একটি গরু কোরবানী করিয়াছিল বলিয়া রাণা উদয়সিংহ তাঁহার কুলগুরু আদেশ ও উপদেশে বেচারী মুসলমানের একমাত্র শিশু পুত্রকে কালী-মূর্তির সম্মুখে বলিদান করিয়াছে। শিশুটির মাতা উন্নাদিনী হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। পিতাও উন্মত্ত হইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। হজুরের বিদিতার্থে এই সংবাদ পেশ করিলাম।

একান্ত বিনীত ভৃত্য—

আবু ইউসুফ সাইফউদ্দীন

পত্র পাঠ করিবার পর দরবারের সকলেই বলিয়া উঠিলেন : ঘটনা সঘর্ষে আর কোনও সম্ভেদ নাই। এই নৃশংসতম দানবীয় ব্যাপারের প্রতিকার করণ হয়ে পড়েছে।

সুলতান ক্షিপিতকণ্ঠে বলিলেন : যতদিন পর্যন্ত এর উপযুক্ত প্রতিফল না দিতে পারব, ততদিন সর্বপ্রকার মাংস ভক্ষণ আমার জন্য হারাম!

সুলতানের প্রতিজ্ঞা শুনিয়া এবং মুখমণ্ডলে ক্রোধের আরক্তিম বিকাশ দেখিয়া

সকলেই ভীত হইয়া উঠিলেন ।

সুলতান আহমদ শাহ যখন যে প্রতিজ্ঞা করিতেন, তখন তাহা প্রতিপালন করিবার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিতেন । প্রধান সেনাপতিকে ডাকিয়া তখনই যুদ্ধের জন্য বিপুল আয়োজন করিতে আদেশ করিলেন ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সুলতান আহমদ শাহ অচিরে লক্ষাধিক পদাতিক এবং বিশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য সহ চিতোর আক্রমণ অভিযান করিলেন ।

রাণা উদয়সিংহ পরাক্রান্ত যোদ্ধা এবং উপযুক্ত বল-সম্পন্ন ছিলেন । চিতোর গড় সমগ্র হিন্দুস্থানে দুর্ভেদ্য এবং অত্যাচ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল । আজও প্রবাদ আছে :

তালাবত ভূপালকা আর সব তালিয়,
গড় তো চিতোরকা আর সব গাড়িয়া ।

অর্থাৎ ভূপালের সরোবরই সরোবর, আর সমস্ত ডোবা, আর চিতোরের গড়ই গড়, আর সব স্থূপ ।

চিতোরের দুর্গ-প্রাচীর চল্লিশ গজ উচ্চ ছিল । এই প্রাচীরের বাহিরে সুবিন্দুত এবং গভীর পরিষ্কার কৃষ্ণ-জলরাশি বায়ু-হিল্লোলে খেঁ খেঁ করিয়া নাচিত ।

পঞ্চাশ হাজার রাজপুত সৈন্য চিতোর-কেন্দ্রায় সর্বদা বীরদর্পে বিচরণ করিত । চিতোর-রাজ উদয়সিংহ কুম্বী খান নামক একজন তুর্কী বীর-পুরুষের নেতৃত্বে একদল পরাক্রান্ত অশ্বারোহী সৈন্য গঠন করিয়াছিলেন । উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট নূতন ধরনের বৃহদায়তনের তোপ নির্মাণ করিয়া প্রাচীরের উপরে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন । চিতোর দুর্ভেদ্য ও দুপ্রবেশ বলিয়া সমগ্র ভারতে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল । কুম্বী খানের তত্ত্বাবধানে চিতোর সামরিক শক্তিতে নূতন বল ও ভেজঃ লাভ করিয়াছিল ।

সুলতান আহমদ শাহ স্বকীয় সৈন্যদলকে অতীব গোপনে পরিচালনা করিয়া চিতোরের নিকটবর্তী হইয়া দূত প্রেরণ করিলেন । দূতের হস্তে প্রেরিত পত্রে লিখিত হইল যে, নির্দোষ মোসলেম শিতর খুনের পরিবর্তে সমস্ত চিতোর রাজ্যে অবাধ গো-কোরবানীর প্রচলনের প্রথা জারি করিতে এবং আহমদ রেজা খানকে লক্ষ টাকা আয়ের জায়গায় দিতে হইবে । চিতোর রাজধানীতে তাঁহার নিজের ডব্বক হইতে একটি জামে মসজিদ স্থাপন করিবার জন্য জায়গা ও জায়গায় দিতে হইবে ।

আগামী পঞ্চাশ বৎসরের জন্য গুজরাটের কুড়ি হাজার সৈন্যকে চিতোরের স্বতন্ত্র দুর্গে থাকিতে দিতে হইবে। মুসলমানদিগের বিচারের জন্য মুসলমান কাজী ও মুফতি নিযুক্ত হইবে। মুসলমানের মোকদ্দমা কাজী এবং মুফতি সাহেবের নিকট সম্পন্ন হইবে, প্রভৃতি শর্ত সাত দিবসের মধ্যে কবুল না করিলে গুজরাট সরকার সমর ঘোষণা করিবেন; ইহা স্পষ্ট করিয়া জানাইলেন।

গুজরাট-অধীশ্বর সুলতান আহমদ শাহের পত্র পাইয়া উদয়সিংহ একেবারে ভেলে-বেগনে জ্বলিয়া উঠিলেন। ক্রুদ্ধ হইয়া পত্রখানি ঝঙ ঝঙ করিয়া ছিড়িয়া ফেলিলেন। দূতকে অবমানিত করিয়া বিনা উত্তরে রাজসভা হইতে তাড়াইয়া দিলেন। প্রধানমন্ত্রী প্রতিবাদ করায় রাণা উদয়সিংহ তাহাকেও কটুক্তি করিলেন। গুজরাটের দূত মোস্তফা খলিল অপমানিত হইয়া বিনা উত্তরে সুলতান আহমদ শাহ সমীপে ফিরিয়া আসিলে সমস্ত ঘটনা শুনিয়া মহাবীর সুলতান লাহুলাহত সিংহের ন্যায় গর্জন করিয়া উঠিলেন। সেনাপতি তাহার বেগকে ডাকিয়া চিতোর আক্রমণের আদেশ প্রদান করিলেন।

যথাসময়ে পরদিবস গুজরাট-বাহিনী বিপুল বিক্রমে চিতোর-সীমান্ত আক্রমণ করিয়া কতিপয় গ্রাম দখল করিয়া ফেলিল। মোসলেম সৈন্যবাহিনী অজয়গড় নামক সীমান্তের একটি ক্ষুদ্র কেল্লা দখল করিয়া লইবার পরে চিতোরের চমু আসিয়া গুজরাটের সৈন্যদলের গতিরোধ করিল। তাহের বেগের অশ্বারোহী সৈন্যের বিপুল পরাক্রমে চিতোরের সৈন্যদল বিষমরূপে রাস্ত হইয়া দিগ্বিদিকে পলায়ন করিল।

আহমদ শাহ যাইয়া একেবারে চিতোর অবরোধ করিলেন। চিতোরের প্রাচীরের উপরে চতুর্দিকে পঞ্চাশতাত্তিক বৃহৎ বৃহৎ কামান সুবিন্যস্ত ছিল। এই সমস্ত কামানের শেল প্রহারে গুজরাটের সৈন্যদল বিশেষ ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে লাগিল।

দশদিনের যুদ্ধে গুজরাটের অন্ততঃ পঞ্চদশ সহস্র সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিল। রাণা উদয়সিংহ এবং সেনাপতি রুমী খান ভীষণ পরাক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সুলতান আহমদ শাহ গুজরাট হইতে আরও নূতন নূতন তোপ আনিয়া চিতোর দুর্গের একাংশ ধ্বংস করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এইরূপে আরও কয়েকদিন ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইল। উভয় দলেই সহস্র সহস্র বীরপুরুষ অকালে সমর-সাগরে প্রাণ বিসর্জন করিতে লাগিল।

একদা রজনীকালে সুলতান আহমদ শাহ বহুসংখ্যক ফানুসে দাহ্যমান পদার্থ ঝুলাইয়া উড়াইয়া দিলেন। ফানুসগুলি প্রবল পবনবেগে বিদ্যাংগতিতে কেল্লার উপরে যাইয়া দাহ্যমান পদার্থের গুরুভারনিবন্ধন এবং অন্যদিকে গ্যাসের তৈল নির্বাণিত হওয়ায়, দুম্ দুম্ শব্দে নানাস্থানে পতিত হইয়া চারিদিকে আগুন

লাগাইয়া দিল। ভীষণ আগুকাণ্ডে সৈন্য ও গ্রহরিগণ জাগ্রত হইয়া অগ্নি নির্বাণে ব্যাপ্ত হইল। কিন্তু এইসময় আরও বহু সংখ্যক বোমা-বিশিষ্ট দাহ্যমান ফানুস শেলখানার উপরে ঘাইয়া বায়ু বেগে পতিত হওয়ায় অসংখ্য বোমা একসঙ্গে কাটিয়া শেলখানার ছাদ চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া উড়াইয়া দিল।

ছাদ চূর্ণ হইবার পরে কতিপয় ফানুসের বোমা শেলখানায় পতিত হওয়ায় বারুদের তুপে আতন লাগিয়া যায়। ত্রিশ হাজার মণ বারুদের বস্তা সহসা ভীষণ শব্দে আকাশস্পর্শী শিখা বিস্তার করিয়া প্রজ্বলিত হইয়া ওঠে। ভীষণ শব্দে সমস্ত চিতোরবাসী কম্পিত এবং চমকিত হইয়া ওঠে। কেদ্বায় অধিকাংশ অট্টালিকা ভীষণ কম্পনে চূর্ণ হইয়া যায়। বহু সংখ্যক নরনারী মৃত্যুমুখে পতিত এবং সাংঘাতিক রূপে আহত হয়। কুম্বী খান ছাদ পড়িয়া বিশেষরূপে আহত হন। একখানি হস্ত ভাঙ্গিয়া যায় এবং মস্তকে গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হন।

এই আকস্মিক বিপদপাতে চিতোরের ঘরে ঘরে হাহাকার-ধ্বনি উদ্ভিত হয়। রাণী লক্ষ্মীবাই, কুম্বারী কুম্বিনীবাই, রাণার বিধবা ভগ্নী হীরাবাই, জ্যেষ্ঠা কন্যা স্বর্ণবাই, রাণা এবং রাণার পার্শ্বচর ও দেহরক্ষী সৈন্যগণ কেহই সৌভাগ্যক্রমে আঘাত প্রাপ্ত হন নাই। কেদ্বা উড়িয়া যাওয়ায়, বারুদের বিশাল ভাণ্ডার একেবারে নষ্ট হওয়ায় এবং সেনাপতি আহত হওয়ায় রাণা উদয়সিংহ শশব্যস্তে সন্ধির প্রস্তাবের জন্য দশদিন সময় প্রার্থনা করিলেন।

রাণার ঘোরতর বিপদে আপনার বিজয়লাভ দর্শনেও সুলতান মনে মনে নিতান্তই দুঃখিত হইলেন। মানবের, বিশেষতঃ রাজা-বাদশাহদিগের ভাগ্যচক্রের দ্রুত পরিবর্তনশীলতার বিষয় চিন্তা করিয়া সুলতান বিনা-বাক্যব্যয়ে দশদিন যুদ্ধ বন্ধ রাখিবার আদেশ প্রদান করিলেন।

কুম্বী খানের ন্যায় বিখ্যাত প্রভুভক্ত বীর-সেনাপতি আহত হওয়ায় সুলতান আহমদ শাহ গভীর দুঃখ প্রকাশ করিলেন। আহত ব্যক্তিদিগের অস্ত্র-চিকিৎসার জন্য পঞ্চান্ন জন হাকিমকে ঔষধপত্র এবং দুই শত সেবক-সহ রাণার সাহায্যে প্রেরণ করিলেন। সুলতানের মহত্ব এবং পরদুঃখকাতরতার পরিচয় পাইয়া চিতোরবাসী সকলেই ধন্য ধন্য করিতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অস্তঃপুরের একটি রমণীয় প্রশস্ত কক্ষে কুম্বী বা একখানি আবলুস কাঠনির্মিত ঝিনুকের রমণীয় কারুকার্যকরা পালঙ্কে শায়িত। কুম্বী খানের তক্ষির ও সেবা-গুণ্ণ্যার সুবিধার জন্যই রাজপুরীতে স্থান দান করা হইয়াছে। কেদ্বা এবং কুম্বী

খানের বাটী বিনষ্ট হওয়ায় রাজপুরী ব্যতীত তাঁহাকে আর স্থান দান করিবারই বা স্থান কোথায়?

ক্রমী খাঁর প্রকৃত নাম ছিল ফররোখ আফেন্দী। তিনি তুরকের রাজবংশের পুরুষ। রাজনৈতিক কুটিল চক্রান্তে পতিত হইয়া আশ্রয়কার জন্য বদেশ হইতে ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি সমরবিদ্যাশিখারদ তেজস্বী ও দেবকাণ্ডবিশিষ্ট পুরুষ ছিলেন। মালবের সুলতান রোকনউদ্দীন তাঁহার পরিচয় লাভ করিয়া তাঁহার বন্ধু চিতোরের রাণা উদয়সিংহের নিকট তাঁহার তোপখানার তত্ত্বাবধানের কার্যে পাঠাইয়া দেন। রাণা ক্রমশঃ তাঁহার গুণগ্রামে মুগ্ধ হইয়া প্রধান সেনাপতির পদ পর্যন্ত অর্পণ করেন। তিনি ক্রমশঃ হইতে আসিয়াছিলেন বলিয়া সাধারণ্যে ক্রমী খান নামে অভিহিত হন।

ক্রমী খাঁ যেমন সুশ্রী সুঠাম কাশ্মিরান ছিলেন, অন্যদিকে তেমনি অদ্রাস্ত পরিশ্রমী অধ্যবসায়ী তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। তাঁহাকে দেখিলেই কঠিন, বুদ্ধিমান এবং দৃঢ়চেতা ব্যক্তি বলিয়া বোধ হইত। ক্রমী খাঁ চিতোর সৈন্যদলে প্রবেশ করিবার পর হইতে চিতোরের সামরিক বিভাগের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধিত হয়। পার্শ্ববর্তী রাজ্যসমূহ বাহুবলে জয় করিয়া চিতোরের বিস্তৃতি সাধন করিয়াছিলেন। দুর্গ, পরিখা, তোপখানা, শেলখানা—সকলই নূতনভাবে সংস্কৃত, বর্ধিত এবং সমুন্নত হইয়াছিল। ক্রমী খাঁ আহত না হইলে সুলতান আহমদ শাহের পক্ষে জয়লাভ করা সম্ভব হইত কিনা, সন্দেহের বিষয়।

রাণা উদয়সিংহ ক্রমী খাঁকে প্রিয়তম হিতৈষী বন্ধুর ন্যায় ভালোবাসিতেন। ক্রমী খাঁর সাংঘাতিক জখমে রাণা নিতান্তই দুঃখিত এবং বিষণ্ণ হইয়া পড়িয়াছিলেন। রাজ-চিকিৎসক ভিষক-প্রবর সনৎকুমার সেন চিকিৎসা-বিষয়ে বিলক্ষণ পটু ছিলেন। রাণা তাঁহাকেই ক্রমী খাঁর চিকিৎসায় নিযুক্ত করিলেন। সনৎকুমার ইউনানী এবং আয়ুর্বেদ উভয় শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। জয়পুরের বিখ্যাত বৈদ্য হরকুমার সেনের নিকট আয়ুর্বেদের সমস্ত শাখায় জ্ঞানলাভ করিয়া, দিল্লীর ফিরোজ শাহের স্থাপিত তিব্বিয়া মদ্রাসায় ভর্তি হইয়া শেষ পরীক্ষায় সৌরভের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া সনদ লাভ করিয়াছিলেন।

সনৎকুমার একখানি কুর্সীতে বসিয়া ক্রমী খাঁর হাতের পটি খুলিতেছেন। কুমারী স্বর্ণবাঈ এবং হীরা ঔষধ-পত্র ও গরম পানি লইয়া হস্তের ঘা ধৌত করিবার জন্য দাঁড়াইয়া আছে। হীরাবাঈ বাল-বিধবা। পরিধানে শুভ্র পটবস্ত্র। হস্তে দুইগাছি মাএ স্বর্ণকঙ্কণ। বিধবা বলিয়া অন্য কোনও অলঙ্কার নাই। তবে রাজদুহিতা বলিয়া হস্তে স্বর্ণবলয় ধারণ দোষাবহ ছিল না। হীরাবাঈ-এর গঠন দোহারী এবং কমনীয়। কাণ্ড উজ্জ্বল এবং মধুর। বর্ণ দুগ্ধমিশ্রিত আলতার ন্যায়।

হীরাবাই-এর চোখ-মুখ হইতে যৌবনের প্রভাব ও বিলাসভাব প্রকাশিত হইতেছে। যুবতী বহু সাধনায় যৌবনের জোয়ারতরঙ্গ রোধ করিতেছে। বর্ষার উৎফুল্লিত খরধার পঙ্খার ন্যায় যুবতীর সর্বান্তে যৌবনের খরপ্রভা প্রবাহিত হইতেছে। শ্রাবৃষ্টির নদীর ন্যায় তাঁহার চালচলন, ভাব-ভঙ্গী, আচার-ব্যবহার কিছু অনিয়মিত বা উদ্ভ্রমল। যুবতী সুপক্ক আঙ্গুরের ন্যায় একান্ত রসবতী।

বর্ণবাই রাগার জ্যেষ্ঠা পুত্রী। বয়সক্রমে চতুর্দশ বর্ষ অতিক্রম করিয়াছে। রূপ উছলিয়া পড়িতেছে! কাণ্ডি ছুটিয়া বাহির হইতেছে। চক্ষুর এক প্রান্তে লালসা বিদ্যুৎ দীপিতা উঠিতেছে, অন্য প্রান্তে লজ্জা অবগঠন টানিতেছে। অঙ্কিত জ্র-সমবিত ললাটের দুই পার্শ্বে চূর্ণ-কুস্তল কৃষ্ণ-ভূজঙ্গের ন্যায় দুলিতেছে। চক্ষু পঙ্খদলের ন্যায় প্রশস্ত দীর্ঘ এবং ভাসমান। চক্ষুর দৃষ্টি মেঘনির্মুক্ত শারদীয় আকাশের প্রশান্ত নীলিমার ন্যায় মনোহর। কুসুমের মৌন-ভৃষ্টির ন্যায় চক্ষুর দৃষ্টি মৌন; কিন্তু মধ্যে মধ্যে বর্ষণমুক্ত মেঘান্তে দামিনী-বিকাশের ন্যায় মৃদু কটাক্ষ পূর্ণ। তাহাতে লালসার অগ্নি নাই, কিন্তু প্রেমের জ্যোতিঃ আছে। উভয়ে সুন্দরী। আমি কাহাকে সরস এবং কাহাকে নীরস বলিব, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।

পাঠক-পাঠিকা বলুন দেখি, গোলাপ এবং পঙ্কের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? আঙ্গুর এবং আম্রের মধ্যে কোনটি সরস? সাঁঝের শোভা অধিক রমণীয়, কিংবা শরতের শোভা অধিক কমণীয়? পাপিরার 'পিউ'-তান এবং কোকিলের 'কুহু' গান, কোনটি অধিক মিষ্ট? বকুলের স্রাব ভালো, কি কামিনীর স্রাব ভালো? ডালিমের বর্ণ বেশী মনোহর, কিংবা সিদুরে আমের বর্ণ বেশী সুন্দর? প্রভাতের ঠাণ্ডা হাওয়াই বেশী পছন্দ, কিংবা সন্ধ্যার শীতল সমীরণ বেশী পছন্দ? বেলফুলের মালা চাই, কিংবা যুইফুলের মালা চাই? নলিনী অধিক সুন্দর, কিংবা কুমুদ অধিক সুন্দর? রাগিণীর ভিতরে ঠুংরি সুন্দর, কিংবা খেমটা সুন্দর? বেহাগ ভালো, না ভৈরবী ভালো? আর কত দৃষ্টান্ত দিব! যাহা দিলাম, অগ্রে তাহার মীমাংসা করুন। কই, কিছু মীমাংসা হইল কি? একেলা মীমাংসা করিলে চলিবে না। পাঁচ-সাত জনে মিলিয়া মীমাংসা করুন। দেখি, কেমন করিয়া একমত হইতে পারেন?

আর পাঠক-পাঠিকা উভয় যদি দম্পতি হন, তাহা হইলে দুইজনে মিলিয়া মীমাংসা করুন তো! আপনারা দুইজনে বলুন তো, নারী বেশী সুন্দরী, কি পুরুষ বেশী সুন্দর? আপনাদের দুইজনের মধ্যে কে অধিক সুন্দর, তাহা আমি জিজ্ঞাসা করিয়া আপনাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং তাহার ফলে বিরহের সৃষ্টি করিতে চাই না। আপনাদের মধ্যে কে অধিক রসিক এবং রসিকা, কে অধিক প্রেমিক এবং প্রেমিকা, তাহাও জিজ্ঞাসা করিব না। কিন্তু আমার উপরের প্রশ্নগুলির উত্তর এক হইয়া মীমাংসা করুন। সুতরাং হীরাবাই এবং বর্ণবাই, কে অধিক সুন্দরী,

আপনারা কাহাকে পছন্দ করেন, সে ভার আপনাদের উপরেই মীমাংসার জন্য ন্যস্ত রহিল।

কুম্বী ঝাঁর দক্ষিণ হস্ত পাথর-চাপা পড়িয়া যেখানে জাগিয়া গিয়াছিল, সেখানের হাড় ক্রমশঃ জোড়া লাগিতেছিল। সনৎকুমার ঘা ধুইয়া, ঔষধ লাগাইয়া পটি বাঁধিয়া চলিয়া যাইবার পরে হীরাবাসী এবং স্বর্ণ দুইজনে মিলিয়া কুম্বী ঝাঁকে ভোজনের বন্দোবস্ত করিয়া দিল। এইরূপ প্রত্যাহই হইত। কুম্বী ঝাঁর কন্দর্পনিন্দিত অথবা ইউসুফ-নিন্দিত রূপরাসি, শারীরিক গঠনের মোহিনী ভাস্মা, বীর্যপুষ্টকান্তি, ঈষৎ দীর্ঘ নখর দেহ, মিষ্ট স্পষ্ট এবং সরস বাক্যাবলী ক্রমশঃ হীরাবাসী এবং স্বর্ণবাসী-এর প্রাণ আকর্ষণ করিতে লাগিল।

হীরা প্রাণ ভরিয়া সেবা করিয়াও ভাবিত যে, ঝাঁ সাহেবের সেবা বুঝি কিছুই হইল না; পাছে বা অসন্তুষ্ট বা বিরক্ত হন। আর স্বর্ণবাসীও প্রাণ ভরিয়া সেবা করে,, কিন্তু সর্বদা আশঙ্কা, ঝাঁ সাহেবের কটের বুঝি লাঘব হইল না। দুইজনের ভাবে এইটুকু পার্থক্য। প্রথম প্রথম হীরাবাসী স্বর্ণকে দেখিয়া সঙ্কোচ বোধ করিত; কিন্তু নদীতে যখন বান ডাকে, তখন পাড়ের উচ্চতা দেখিলে চলে কি? বাঁধ বা পাড় যতই উঁচু হোক না কেন, দুই-চার আঙ্গুল করিয়া তাহাকে ডুবাইতে ডুবাইতে অবশেষে একেবারেই ডুবাইয়া দুইকূল ভাসাইয়া ছুটিয়া চলে। প্রেমেও তাই, ধীরে ধীরে প্রাণের এক কোণে জাগিয়া ওঠে। সেখানে জাগিতে জাগিতে চোখের কোণে ফুটিয়া ওঠে। কিন্তু তখনও অবগুষ্ঠিত এবং সঙ্কুচিত থাকে। শেষে অবগুষ্ঠন ছাড়িয়া ফাঁকে ফাঁকে এদিক ওদিক দেখিয়া প্রাণকান্ত বা কান্তার দিকে দুই একবার করিয়া তাহার অসাক্ষাতে নজরে নজরে প্রেমকে ছুটাইয়া দেওয়া হয়। এইরূপ করিতে করিতে তাক ঠিক হইলে একদম তাহার চোখের উপরেই প্রেমের বাণ ছাড়িয়া দেওয়া হয়। চোখের উপর ছোড়ার পরেই শিকার লাভ ঘটে। যতক্ষণ চোখের উপরে প্রেমের বাণ না ছোড়া যায়, ততক্ষণ হৃদয়ে প্রবেশ করে না।

হৃদয়ে প্রবেশ না করিবার কারণ এই যে, শরীরের সর্বদই অল্পাধিক কঠিন; চক্ষুই হইতেছে একমাত্র কোমল পদার্থ। অন্য দিকে প্রেমও কোমল পদার্থ। প্রেমের এই কোমল বাণ, তাই চক্ষু ব্যতীত অন্য কোনও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা ইন্দ্রিয় দ্বারা মানুষের মনের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। তাই চক্ষুই হইতেছে প্রেম-পাখী ধরিবার চমৎকার ফাঁদ! চক্ষুর ফাঁদ না থাকিলে দুনিয়াতে প্রেম-পাখী ধরা যাইত কি-না, এবং প্রেমের ব্যবসা চলিত কি-না, পতীর সন্দেহ।

চোখ আছে বলিয়া যেমন আকাশ পাতালের সবকিছু—অন্ততঃ অনেক কিছু দেখিতে পাই, তেমনি চোখ আছে বলিয়াই প্রেম, ভালোবাসা, প্রীতি, স্নেহ, মমতা, বাৎসল্য, ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহস্র নির্ঝর প্রবাহিত হইয়া মরুভূমি তুল্য অনন্ত

দুঃখ-ক্লেশ এবং ভাণময় সংসার-ক্ষেত্রে কতক পরিমাণে সরস এবং স্নিগ্ধ
 কাব্যরূপে। তবে নদী থাকিলেই তাহাতে যেমন দুই একজন ডুবিয়া মরে, তেমনই
 শ্রেয়ের নদীতেও দুই একজন উদ্ভাস্ত হইয়া ডুবিয়া মরে। নদী থাকিলেই তাহাতে
 লোক ডুবিবে। তা' শ্রেয়ের নদীই হউক, আর জলের নদীই হউক। তবে জলের
 নদীতে ডুবিয়া মরিলে পচিয়া গলিয়া যায়, আর শ্রেয়ের নদীতে ডুবিয়া মরিলে সে
 পবিত্র, মহান, সুন্দর, অমৃত এবং অক্ষয় হয়। জলের নদীতে ডুবিয়া মরিলে
 দুর্গন্ধের ভয়ে অনেকে তাহার কাছে যাইতে চায় না; কিন্তু শ্রেয়ের নদীতে ডুবিয়া
 মরিলে, কবির বীণায়, শ্রেমিকের হৃদয়ে, ইতিহাসের বর্ণনায় চিরকাল ঝংকৃত,
 পূজিত এবং কীর্তিত হয়।

পৃথিবীতে শায়লী এবং মজনুঁ, শিরি এবং ফরহাদ, রোমিও এবং জুলিয়েট, নল
 এবং নমরুত্তী, সাকিন্দী এবং সত্যবান, রাম এবং সীতা, ইউসুফ এবং জুলেখার
 ন্যায় কত লক্ষ নবনারী ছাই-ভস্ম হইয়া উড়িয়া গিয়াছে বা মাটিতে মিশিয়াছে;
 কিন্তু উপরোক্ত শ্রেমিক-শ্রেমিকাগণ আজও স্মরণীয় এবং বরণীয় হইয়া
 রহিয়াছেন। তাহাদের নামে নিত্য নিত্য শ্রেয়ের বাঁশরী এবং স্মৃতি বীণা
 শ্রান্তঃসন্ধ্যা বাজিতেছে।

একই দ্রব্যের একাধিক প্রার্থী হইলেই প্রথমতঃ তাহাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা
 চলিবে। কিন্তু প্রতিযোগিতা পরের দিনই প্রতিঘন্ডিতায় পরিণত হইবে। ইহাই
 স্বাভাবিক ধর্ম। মানুষ এই ধর্ম কখনই ত্যাগ করিতে পারে না। বাকুদ আর অগ্নি
 একত্র হইলেই আগুন জ্বলিবে। ইহা স্বাভাবিক, সুতরাং অনিবার্য। এই
 প্রতিঘন্ডিতা কেবল নারী বা নর লইয়া, আশেক বা মা'তক লইয়া নহে। ব্যবসায়
 বল, বাণিজ্য বল, তালুক বল, মুসুক বল, প্রতিপত্তি বল, পশার বল, খেলা বল,
 ধূলা বল, যাহা কিছু বল—কিবা বৃহৎ কিবা ক্ষুদ্র, প্রত্যেক পদার্থ লইয়া বিবাদ-
 বিসম্বাদ, ঝগড়া-কলহ, যুদ্ধ-কিয়াহ, মামলা-মোকদ্দমা এবং হত্যা-খুন। মানবের
 মধ্যে যিনি এই প্রতিঘন্ডিতা, এই বিবাদ ত্যাগের জন্যে নিজের স্বার্থ তুলিয়া পরের
 স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখেন তিনিই মহাপুরুষ। তিনি আমাদের আদর্শ। আর এই
 জন্য পরার্থপর হওয়া এবং নিজের স্বার্থে বলি দেওয়াই হইতেছে মানবের পরম
 ধর্ম এবং চরম কর্ম। ইহার উপরে কোনও ধর্ম নাই, কোনও কর্ম নাই। হীরাবাকী
 এবং স্বর্ণবাকী-এর মধ্যে যেসব প্রতিযোগিতা ক্রমশঃ প্রতিঘন্ডিতায় পরিণত
 হইল। হীরাবাকী এবং স্বর্ণ বিবয় হিসেবের প্রকৃতি হইতে লাগিল। লক্ষীবাকী পরে
 এই সমস্ত জানিতে পারিয়া নন্দা এবং কন্যা উভয়কেই স্বর্গে টিঁসিয়া এবং
 শাসন করিলেন। কুম্বী বীর সেবা-ওজ্জ্বা এবং ভদ্রাবধান হইতে উভয়কেই
 বঞ্চিত করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যার পরেই মালবের (মালওয়ার) সুলতান বোকনউর্দীন মসজিদ হইতে অস্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। বেগম আর্জমন্দ বানু অস্তঃপুরের দিলখোশ বাগে উপাসনাস্তে সখীগণ-সঙ্গে হাওয়া খাইতেছিলেন। বাদশাহকে অস্তঃপুরের দিকে আসিতে দেখিয়া একটু দ্রুত আসিয়া মুচকি হাসিয়া বলিলেন : আজ যে বড় সকাল সকাল ওতাগমন! রাজকার্য কিছু কম পড়েছে নাকি?

বাদশাহ : রাজকার্য কম পড়া দূরে থাক, দিন দিন আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে। আজ আবার এক নূতন ব্যাপার উপস্থিত। তাতে তোমার পরামর্শের আবশ্যক আছে বলেই সকাল সকাল এসেছি। পরামর্শের পরে আবার রাতেই দরবার বসবে।

বেগম : তাই তো। গরজ বড় বলাই!—এই বলিয়া প্রসাদাভাস্তরে প্রবেশ করিয়া দুইজনে আসন পরিগ্রহ করিলেন। আসন পরিগ্রহ করিবার পরে বেগম বলিলেন : আজকার বিশেষ ঘটনাটা কি?

বাদশাহ : চিতোরের রানী লক্ষ্মীবাই আমাকে রাবী* পাঠিয়েছিল। আহমদ শাহের আক্রমণে চিতোর-বাহিনীর অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়েছে।

বেগম : বিষম সমস্যা। একদিকে ধর্ম, অন্যদিকে বন্ধুতা। রাণা উদয়সিংহ বেচারী আহমদ রেজা খাঁর প্রতি যে ভীষণ ও লোমহর্ষণ অত্যাচার করেছে, তা স্বরণ করলেও প্রতি লোমকূপ হতে অগ্নিস্কুলিঙ্গ বহির্গত হয়। আহা! বেচারার শিশুপুত্রটিকে বলি দিয়েছে। বেঈমান কাফেরের দেশ একেবারে দয়া-মায়ামূলা! এমন “হুজুদেস্ত” পাষাণ যে খোদার দুনিয়াতে আছে, তা চিন্তারও অগোচর ছিল। আহমদ শাহ উপযুক্ত কর্মই করেছেন।

শাহ : আহমদ শাহ উপযুক্ত কর্ম করেছেন নিশ্চয়ই। কিন্তু রানী আমাকে রাবী পাঠিয়েছেন। রাবীর সম্মান না রাখলে সমগ্র রাজপুতের শ্রদ্ধা হারাতে হবে। রানী আমাকে পরম আত্মীয় জানে একান্ত বিশ্বাস করে এই স্বর্ণখচিত রাবী পাঠিয়েছেন।

* রাবী—চর্প বা সূত্র-নির্মিত বস্ত্রী বিশেষ। দক্ষিণ হস্তের কজায় পরিতে হয়। যাহাকে রাবী পাঠান হয়, তাহার সহিত ধর্ম-ভ্রাতা-ভগ্নী সম্পর্ক হয়। রাবীর সম্মান রক্ষা না করা রাজপুতদিগের মধ্যে নিত্য কলঙ্কজনক বলিয়া বোধ হইত। রাবী পাঠাইলে, ভ্রাতাকে ভগ্নীর রক্ষার জন্য গ্রাণপনে বুদ্ধ করিতে হইত। রাজপুতদিগের ন্যায় মুসলমানেরাও রাবীর সম্মান রক্ষা করিতেন।

বেগম : তবে কি আপনি আহমদ শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবেন? তার পরিণাম কি ভালো হবে? আর আহমদ শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা কি ধর্মসম্মত হবে?

শাহ : কখনই নয়। অসম্ভব ব্যাপার! একদিকে ধর্ম, অন্য দিকে বন্ধুতা! আমি মহা-সঙ্কটে পতিত।

বেগম : আমি গুণ্ডচর শূঁষে সন্ধান পেলাম যে, চিতোরের বারুদখানা উড়ে গেছে এবং কেব্বা ভেঙ্গে পড়েছে। সেনাপতি এবং বহু লোকজন আহত ও নিহত হয়েছে। এমতাবস্থায় রাণা আর যুদ্ধ করতে সমর্থ হবেন না।

শাহ : কি আশ্চর্য, এ সংবাদ আমি এখনও প্রাপ্ত হই নাই।

বেগম : আমার গুণ্ডচর আপনার গুণ্ডচর অপেক্ষা কার্যপটু এবং ক্ষিপ্রগতি। সুতরাং আপনি অগ্নে কিরূপে জ্ঞানবেন? পররাষ্ট্র ব্যাপারে কোন দিনও আপনি আমার অপেক্ষা অগ্নে সংবাদ রাখতে পারেন না।

শাহ : বটে! তবে তো সিংহাসনে তোমারই বসা উচিত।

বেগম : সিংহাসনে বসলেই ক্ষমতা বেশী প্রকাশ পায় নাকি?

শাহ : তা' পায়ই তো বটে!

বেগম : তবে সিংহাসনে যে বস, তা'র উপরে যে প্রভুত্ব করে, তা'র আসন কোথায়?

শাহ : তা'র আসন সিংহাসনেরও উপরের সিংহাসনে।

বেগম : সিংহাসনের উপরের সিংহাসন কোথায়?

শাহ : কেন পিয়ারি? তা' কি অবগত নও?—বাদশাহ এই বলিয়া বেগমকে গাড় আলিঙ্গন করতঃ বন্ধে ধারণ করিয়া বলিলেন : সে সিংহাসন, এই হৃদয়-সিংহাসন।

বেগম তার প্রতিদান দিয়া বলিলেন : এখন আর সিংহাসনে বসবার সময় নাই। সামান্য-সংখ্যক সৈন্য নিয়ে চিতোরে গিয়ে সন্ধি করে দিয়ে আসুন। রাণার যাতে উপযুক্ত শিক্ষা হয়, অথচ রাজ্যটিও একেবারে না যায়, এমন ব্যবস্থা করবেন। আহমদ শাহের সহিতও কোন শত্রুতার না হয়। তাঁর সাথে মিত্রতা করবার জন্যই চেষ্টা করবেন। চিতোরে কাজী ও মুক্তি নিযুক্ত করে মুসলমানদের বিচারের সুবিধা করবেন। রাজধানীতে মালব (মালওয়ার) সুলতানের পক্ষ হতে একটি মসজিদ স্থাপন করবেন। হতভাগ্য আহমদ রেজা খাঁর জন্য বিদ্যুত জ্বালানীর বন্দোবস্ত করবেন।

শাহ : বেশ, উত্তম যুক্তি। কিন্তু আমার যতে এমন ধর্মাত্ম রাণাকে সিংহাসনচ্যুত করাই কর্তব্য।

বেগম : সেখানে গিয়ে সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে যা বিহিত হয় তাই করুন।

শাহ : যা হুকুম! আদেশ বিরোধার্থ করলাম।

বেগম : রাণী লক্ষ্মীবাই এবং শ্রীমতী কৃষ্ণিনীর জন্য আমার তরফ হতে আমার প্রেরিত ফর্দ-দৃষ্টে ভেট্-ঘাট নিতে যেন ক্রটি না হয়।

শাহ : নিশ্চয়ই না।

শাহ রোকনউদ্দীন অতঃপর চিতোর যাইবার বন্দোবস্তের জন্য প্রধানমন্ত্রীকে আদেশ দিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দেখিতে দেখিতে ধাঁ ধাঁ করিয়া অবসরের দশদিন অতিবাহিত হইয়া গেল। একাদশ দিবস প্রাতঃকালে সন্ধির কথাবার্তার জন্য দরবার বসিল। আহমদ শাহ অর্ধ চিতোর রাজ্য এবং যুদ্ধের ক্ষতিপূরণস্বরূপ ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা দাবী করিয়া বসিলেন।

রাণা সম্পূর্ণ টাকা দিতে স্বীকৃতি জ্ঞাপন করিলেন, কিন্তু রাজ্য দিতে অস্বীকৃত হইলেন। অনেক পীড়াপীড়ি, অনেক কথা-কাটাকাটি হইল। কিন্তু পরস্পরের শর্ত কেহই স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন না। মালবের (মালওয়ার) সুলতান রোকনউদ্দীন বহু চেষ্টা এবং যত্ন করিয়া রাণাকে আহমদ বেজা খাঁর জায়গীরের জন্য দুইটি পরগণা এবং গুজরাটের পক্ষ হইতে চিতোরে মসজিদ নির্মাণের জন্য স্থান এবং জায়গীর দানের বিষয়ে রাণাকে স্বীকৃত করাইতে সমর্থ হইলেন।

কিন্তু রাজ্যাংশ ত্যাগ করিতে মহারাণা একেবারেই অস্বীকৃত হইলেন। এ দিকে আহমদ শাহ অর্ধরাজ্য না পাইলে সন্ধি করিবেন না বলিয়া জেদ্ করিয়া বসিলেন। সুতরাং যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া উঠিল। মহারানী লক্ষ্মীবাই প্রমাদ গণিলেন। ক্রমী খাঁ রাণাকে অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু রাণা রাজ্য ত্যাগ করা অপেক্ষা যুদ্ধ করাই মঙ্গল মনে করিলেন।

আহমদ শাহ চিতোর পুনরাক্রমণ করিলেন। রাজতক্ত ৭০ হাজার রাজপুত যোদ্ধা তরবারি হস্তে ভীষণ আহবে প্রমত্ত হইল। রণক্ষেত্র শোণিত-তরঙ্গে ভাসমান হইয়া গেল। মোসলেম ও রাজপুতের পদতরে পৃথিবী কম্পিতা এবং রণ-হুন্ডারে দিগ্‌মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইল।

গুজরাট পক্ষে ২০ হাজার এবং চিতোর পক্ষে ৫০ হাজার সৈন্য নিপাতেরী

পরে রাণা সম্পূর্ণ পরাজয় স্বীকার করিলেন। চিতোর নগরী সম্পূর্ণ সেনাপতি ডাহের বেগ কর্তৃক অধিকৃত হইল। মালবের সুলতানের অনুরোধে রাজপুরী লুণ্ঠিত হইল না। রাণা সাংঘাতিক রূপে আহত এবং শত্রুহস্তে বন্দী হইলেন। রাণার সমস্ত দত্ত এবং গর্ভ সূর্ণ হইয়া গেল।

আহমদ শাহ সমস্ত চিতোর রাজ্য দখল এবং রাণার প্রাণদণ্ড করিবার আদেশ প্রদান করিলেন, রাজপুরীতে আতর্জনাদ উদ্ভিত হইল। রানী লক্ষ্মীবাই শিবিকা-আহোহণে সুলতান-সমীপে করিয়া কৃষ্ণীবাইকে সুলতানের চরণে নিক্ষেপ করিয়া দয়াপ্রার্থী হইলেন।

পরমা-সুন্দরী রমণীয় কান্তি কমণীয় দেহ অল্পবয়স্কা কৃষ্ণীবাই-এর নেত্রকুবলয়ে অশ্রু ঝরিতে দেখিয়া মহানুভব সুলতান মমতা এবং কল্পণায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। রাণার প্রাণদণ্ড মৌকুফ এবং অর্ধরাজ্য মহারানীকে প্রদান করিলেন। মহারানী লক্ষ্মীবাই গুজরাট-পতিকে নিমন্ত্রণ করিয়া এক সপ্তাহ কাল পরম সমাদরে ভোজ্য দান করিলেন। গুজরাটেশ্বরীর জন্য এক ছড়া বহুমূল্য মুক্তার মালা এবং এক জোড়া হীরক-কঙ্কণ উপহার প্রদান করিলেন।

অন্তঃপর রানী রাবী দান করিয়া আহমদ শাহকে ডাভুতের বন্ধনে আবদ্ধ করিলেন। সুলতান আহমদ শাহের মহানুভবতা দর্শনে সকলেই ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। একপভাবে শত্রুরাজ্য জয় করিয়া অর্ধাংশ দান করা সাধারণ উদারতার দৃষ্টান্ত নহে।

গুজরাট সরকারের পক্ষ হইতে চিতোরে একটি রমণীয় জামে মসজিদের প্রতিষ্ঠা করা হইল। লক্ষ টাকা আয়ের একটি পরগণা আহমদ রেজা খাঁকে প্রদত্ত হইল। চিতোরের সর্বত্র অবাধে গো-কোরবানীর আদেশ প্রচারিত হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ফায়ুনী পূর্ণিমা। পূর্ণচন্দ্রের অমল ধবল জ্যোৎস্নাজালে ধরাতল, ঋ-মণ্ডল ও দিগঙ্কল আলোকিত হইয়াছে। মেদুর সমীরণ ঝিরঝির করিয়া বৃক্ষের পল্লবাবলী এবং রমণীদিগের চেলাঙ্কল আন্দোলিত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। গুজরাটের উপকূলবর্তী নির্মলনীলিম সাগর-সলিলে চন্দ্রকিরণ প্রতিফলিত হইয়া অপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা করিয়াছে। মনে হয়, কে যেন দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্রবক্ষে তরল কাঞ্চনধারা ঢালিয়া দিতেছে। নীল আকাশের ভালে নির্মল চন্দ্রের শোভা আর সাগর-সলিলে তার কনক-আভা দিগঙ্কলে তার বিমল-বিস্তা যুদু পবনে নীরধির

জলরাশিতে মৃদু মৃদু তরঙ্গ উঠিয়াছে ।

এই মুক্ত জ্যোৎস্নাক্ষর নীল গগনের নীচে মুক্ত বারিধির স্বর্ণোজ্বল বক্ষে একখানি স্বর্ণভূষাভূষিত রাজকীয় বিহার-তরনী সাসিতেছে । এই বিহার-তরনীতে বেগম আর্জুমন্দ বানু এবং রানী লক্ষ্মীবাঈ সখীগণ-সহ আনন্দরসে মাতোয়ারা । বেগম ও রানী উভয়েই কবি-প্রকৃতিসম্পন্ন বলিয়া প্রকৃতির রমণীয় দৃশ্যে বিহ্বল আনন্দরস ভোগে সমর্থা ছিলেন ।

নীল সাগরের মুক্ত দৃশ্য, মৃদু সমীরের মুক্ত-প্রবাহ, চন্দ্রমার মুক্ত শোভা, আকাশের মুক্ত আভা সকলের মানসদ্বারকে মুক্ত করিয়া দিয়াছিল । সাগরবক্ষে পূর্ণচন্দ্রোদয়ের জ্যোৎস্না-লহরীর মন-মাতানো প্রাণ-জুড়ানো দৃশ্য যে দেখে নাই, সে এই রমণীয় শোভার চারুতা উপলব্ধি করিতে পারিবে না । লহরে লহরে বায়ু বহিতেছে—লহরে লহরে ঢেউ উঠিতেছে, আর তার সঙ্গে সিঁদুরবক্ষে সহস্র চন্দ্রভঙ্গ হইতেছে । সেই সঙ্গে সঙ্গে তরনী দুলিতেছে—হেলিতেছে এবং নাচিতেছে । সেই দোলনে রমণীদিগের কর্ণের ও নাসার হীরককুণ্ডলী দুলিতেছে । ছাদের উপরে বহু মূল্যবান গালিচার উপর বেগম, রানী, স্বর্ণবাঈ, কুম্বিনী এবং নূরউদ্দীন পায়চারি করিতেছেন । পূর্ণিমার মধুময় শোভা সন্দর্শন করিয়া বেগম আর্জুমন্দ বানু সখীগণকে নাচ-গানের অনুমতি দিলেন ।

সুপ্রসিদ্ধ বাদিকা জোহরা সেতার বাজাইতে আরম্ভ করিল । মরি! মরি! কি চমৎকার সেতার বাদন! সেতারের তারগুলি কাঁপিয়া কাঁপিয়া নাচিয়া নাচিয়া ককরণ-মধুরে গমকে গমকে মুর্ছনার সুখা বর্ষণ করিতে লাগিল । সেতার বখন মাতিয়া উঠিল, তখন সুপ্রসিদ্ধ গায়িকা জাহান-আন তাহার অলরাশিকিত কণ্ঠে বাক্য দিয়া গাহিয়া উঠিল :

সখি রে!

এ নব বসন্তে আজি

পরান আকুলি ধায়,

কুসুম-সুরতি মাখি

মলয়া বহিয়া যায়।

ফুলগুলি দুলে দুলে

গায়ে গায়ে পড়ে হেলে,

সে পীরিত্তি-নীলা হেরি

মানস অধীর, হার!

কাহার মুরতি বাঁকা

মানস-আকাশে ফুটে,

মনোলোভা কার শোভা
আজি রে রাঙিয়া উঠে।

আঁধার কালিয়া টুটে
ললিত লাবণি কুটে
পরান খায় রে ছুটে
কাহার সে রাঙা পায়।

গান শুনিয়া সকলেই পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া আবার আর একটি গাহিতে
বলিলেন। জাহান-জান আবার মধুর কণ্ঠে গাহিল :

সুখদ পূর্ণিয়া তিথি
মধুর মধুর নিশি!
কনক জোছনাঝালে
হাসিতেছে দশদিশি!
নীলিম গগন-কোলে
চাঁদ হাসে ঢলে ঢলে;
উছলে সাগরজলে
মরি কি রূপের হাসি!
শীতলতা মাখি' গায়
সমীর বহিয়া যায়,
জুড়াইয়া নীল কায়
নাচাইয়া ঢেউরাশি!

কার হাসি লয়ে আজি
হাসিতেছে শশধর!
কাহার সৌন্দর্য মাখি
চাঁদ এত মনোহর।

সে যে এই বিশ্ব-বঁধু
সে যে পরাপের মধু
সে যে গো বিধুর বিধু—
স্বর তারে দিবানিশি।

গায়িকা জাহান-জানু আবার কিছুক্ষণ ধামিয়া গাহিলেন,—

মাখাইয়া দাও প্রেমের পরাগ
বুলাইয়া দাও রেহের সোহাগ
বাজাও প্রাণের রাগিনী বেহাগ

ওহে আমার স্বামি!

দিয়াছ হে ভাষা, দাও তবে তান
দিয়াছ হৃদ, দাও লয়-মান
পরান-বীণায় তোমারই গান
বাজুক দিবস-যামি ।

শশী তপন হউক মগ্ন
তোমার চরণ-তলে,

দাঁড়াও তুমি হইয়া নগ্ন
হৃদয়-পদ্ম-দলে!

টানিয়া লও হে বৃকের মাঝে
টুটিয়া সকল শরম লাজে,
লাগাও তোমার সেবার কাজে
যদিও অধম আমি ।

জাহান-জানের মধুর কণ্ঠের সুধারাগিনীর সঙ্গীত শ্রবণে সকলেই মুগ্ধ এবং
খীত হইলেন । অভঃপর সর্বাঙ্গ নানা শ্রেণীর সঙ্গীত ও নৃত্য বেগম ও রানীর
মনোরমের চেটা করিতে লাগিল । সেই নিস্তরু চন্দ্রকর-ফুল্লরজনীতে সঙ্গীতের
রাগিনী যেন উর্মিমালার সঙ্গে সারা সিঁহুবন্ধে এবং পবন-প্রবাহে গগন-কক্ষে
ধীরে ধীরে বাজিতে লাগিল ।

কল্পিনী এবং নূরউদ্দীন পায়চারি করিতে করিতে নীচের তলায় নাখিয়া গেল ।
জাহানের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সমুদ্র-তরঙ্গ জোছনা মাখিয়া কেমন নৃত্য করিতেছে,
তাহাই দেখিতে লাগিল । দুইজনেই এখন যৌবনসীমায় পদার্পণ করিয়াছে । উভয়
হৃদয়ই এখন প্রথম প্রভাত-সমীর-চুম্বিত পঙ্খের ন্যায় স্ফুটনোন্মুখ । প্রেম-সৌরভে
উভয় হৃদয় ক্রমশঃ মাতিয়া উঠিতেছে । তরঙ্গের গায়ে তরঙ্গগুলি কেমন করিয়া
টলিয়া পড়িতেছে, মৎস্যগুলি চাঁদের আলোকে পরম পুলকে কেমন করিয়া খেলা
করিতেছে; দেখিয়া দেখিয়া মাতিয়া উঠিল ।

কল্পিনী চাঁদের শোভা দেখিতেছে আর চাঁদের কনক আভা তাহার গোলাপী-
চাঁপা বর্ণবিশিষ্ট কোমল মুখের উপরে ছড়াইয়া পড়িতেছে । চঞ্চল সমীর সোনালী

অঞ্চলযুক্ত ওড়না উড়াইয়া কেশ দোলাইয়া ফুরফুর করিয়া বহিয়া যাইতেছে। কুমারী চন্দ্রমণ্ডলে দৃষ্টি সংবদ্ধ করিয়া অপূর্ব ভঙ্গিমা সহকারে দাঁড়াইয়া আছে। সহসা কুমারের দৃষ্টি সেই চন্দ্রকিরণ-প্রাণিত মুখের উপরে পতিত হইল। কুমার দেখিল কল্পিলীকীর মুখখানি কি অতুলনীয় মনোহর। চাঁদ বা কমল কাহারও সহিত তাহার তুলনা হইতে পারে না।

আরও লোচনযুগলের দৃষ্টিতে কি প্রশান্ত প্রেম পরিপূর্ণ! সে-দৃষ্টিতে কেবল অমিয়-স্নিগ্ধ-কোমল-দীপ্তি এবং মৌন পরিতৃপ্তি বর্ষিত হইতেছে। সে দৃষ্টিতে উজ্জ্বলতা আছে, কিন্তু প্রখরতা নাই; মদিরা আছে, কিন্তু মাদকতা নাই; ভাবুকতা আছে, কিন্তু কামুকতা নাই, তাহা যেন অপার্থিব—তাহার সহিত এ মর-জগতের কোন কুদ্রতা ও কুটিলতার সংস্রব নাই।

নূরউদ্দীন দেখিয়া দেখিয়া ভাবে মজিল এবং প্রণয়-রসে ডুবিয়া গেল। সে দেখিল—তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের দিকে চাহিয়া দেখিল—এই দৃষ্টির মধ্যেই যেন তাহার নিজের দৃষ্টি সংবদ্ধ রহিয়াছে। মনে হইল, জগতে আসিবার পূর্বে তাহারা যেন স্বর্গের নন্দনকাননে একবৃন্তে যুগ্ম পারিজাত রূপে ফুটিয়াছিল।

নূরউদ্দীন যখন এইরূপ বিভোরভাবে কল্পিলীকে দেখিতেছিল, সহসা সেই সময় বাতাসে কল্পিলীকীর বন্ধের অঞ্চল উড়িয়া যাওয়ায় চকিত হইয়া উঠিল। সহসা সেই চকিত-দৃষ্টি নূরউদ্দীনের চোখে পড়ায় নূরউদ্দীন সলজ্জভাবে শিশিরভারাবনত-মস্তক-পুল্পকলিকার ন্যায় অবনত-মুখ হইয়া পড়িল। কুমারীও নূরউদ্দীনের সলজ্জভাবে ঈষৎ লজ্জিতা হইয়া পড়িল। এই লজ্জাশীলতার সঙ্গে সঙ্গে উভয়ের হৃদয়ের পরতে পরতে প্রেমের স্রোত অস্তঃসলিলা ফরুনদীর ন্যায় বহিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে কুমার কুমারীর কাঁধের উপর হাত রাখিয়া বলিল : খোদা তোমাকে কত সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন!

কল্পিলী : কেন, আপনিও তো পরম সুন্দর। আপনার ন্যায় এমন সুশ্রী সুঠাম সুন্দর পুরুষ আর একটিও তো দেখা যায় না।

নূরউদ্দীন : হতে পারে, আমি তোমার চেয়ে পরম সুন্দর; কিন্তু বলুতঃ সে তোমার চোখের গুণ।

কল্পিলী : তা হলে আপনি যে আমাকে পরমা সুন্দরী দেখে থাকেন, সেও আপনার চোখের গুণ।

নূরউদ্দীন : যে যাকে ভালোবাসে সে তাকে সুন্দর দেখে; তার প্রত্যেক কার্যই মনোরম বলে বোধ হয়। তার চলনটি সুন্দর, কথাটি মিষ্ট, তার মূর্তি মনোহারিণী, ভঙ্গিমা প্রাণতোমিণী, সে হাসলে জ্যোৎস্না বর্ষে, কাঁদলে মুক্তা ঝরে।

সুতরাং আমি তোমাকে ভালোবাসি বলে সুন্দর দেখি ।

কুশ্বিনী : নিশ্চয়ই ।

নূরউদ্দীন : তবে তুমি আদতে সুন্দরী নও!

কুশ্বিনী : তা আপনি নিজেই বলতে পারেন । আমি সুন্দরী কি অসুন্দরী, আমি নিজে তা কেমন করে বলব ।

নূরউদ্দীন : আমাকে যে পরম সুন্দর বলে বোধ কর, তাও তবে নিশ্চয়ই ভালোবাসার জন্য?

কুশ্বিনী এবার লজ্জায় অবনতমুখী হইল । তাহার মনোহর গণ্ডয় বসরাই আনারের মত রক্তবর্ণ ধারণ করিল । নূরউদ্দীন তদর্শনে বলিলেন : কি ব্যাপার! এবার যে চূপ করে রইলে? তবে বৃষ্টি আমাকে ভালোবাস না?

কুমারী কুশ্বিনী তথাপি কোন কথা না বলিয়া মুবের উপর অঙ্কল ঈষৎ টানিয়া মুখ আবৃত করিতে চেষ্টা করিল । কিন্তু অন্তরের হাসি মুবে ফুটিয়া পড়িল, মুখখানি সহসা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল । সেই ঔজ্জ্বল্যেই কুমারের হৃদয়ে প্রণয়ের সৌন্দামিনী সহসা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল । কুমার দুই বাহুপাশে দৃঢ় আলিঙ্গন করিয়া কুমারীর অধরে অধর স্থাপন করিলেন । উভয়ের হৃদয়ের স্তরে স্তরে মধুরে মধুরে সুধা-স্রোত প্রবাহিত হইয়া গেল । উভয়ের হৃদয় এক হইল । কুমারীও প্রতিদান দিয়া কুমারকে প্রেমরসে অভিষিক্ত করিয়া দিলেন । অতঃপর এই প্রেম যাহাতে চিরস্থায়ী হয়, সে জন্য প্রত্যেকেই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, পরস্পর পরস্পরকে ছাড়া আর কাহাকেও পাণিদান করিবেন না ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

রানী লক্ষ্মীবাই এবং রাণা উদয়সিংহ নিভৃত কক্ষে বসিয়া কথোপকথনে ব্রত । একটি মধুমলমণ্ডিত সোফায় উভয়ে পাশাপাশি উপবেশন করিয়াছেন ।

রানী বলিলেন : বড় বিষম প্রমাদ । একই সময়ে জয়পুর এবং মালওয়া হতে কুশ্বিনীর জন্য দূত এসেছে । এক্ষণ কি উপায় অবলম্বন করা যায়? আমি তো নূরউদ্দীনকেই কন্যা দিব বলে বেগম আর্জুমন্দ বানুকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি । নূরউদ্দীনকে আমার নিজের পুত্র-তুলা বরাবর স্নেহ করে আসছি । এক্ষণে জয়পুরের রাজকুমার অক্ষয়সিংহকে কিরূপে কন্যা দান করা যেতে পারে?

রাণা : জয়পুরের রাজকুমার অক্ষয়সিংহের সাথে স্বর্ণবাঈ-এর বিবাহ দিবার জন্য প্রস্তাব করে কৃতকার্য হই নাই । জয়পুরেশ্বর কুশ্বিনীবাই-এর সাথেই পুত্রের

বিবাহ দিতে ইচ্ছুক। এদিকে মালবপতিও মুরউদ্দীনের জন্য কল্পিণীর প্রার্থী। আমি তাঁকেও বুঝিয়ে পত্র লিখেছি। কিন্তু তিনি তো আমার অনুরোধ রক্ষা করবেন বলে বোধ হয় না।

রানী : কল্পিণীকে নিয়ে বিষম বিপদ দেখছি। এ সূত্রে আবার যুদ্ধ-বিগ্রহ না ঘটে। এদিকে স্বর্ণময়ীকে আর গৃহে রাখা যায় না। সেনাপতি কুম্বী থাকেই আর কতদিন স্তোক-বাক্যে ভুলিয়ে রাখা যায়।

রানী : সেনাপতিকে কন্যাদান করলে, রাজপুত্র রাজাদিগের নিকট শিশোদীয় কুলের উন্নত মস্তক অবনত হবে না কি?

রানী : আমার মতে মস্তক অবনত না হয়ে উন্নতই হবে। রাজপুত্রানার কোন রাজা আছেন, যিনি মুসলমানকে কন্যা দান করেন নাই? মালবের সুলতান-বংশে কন্যাদান করলে যদি কলঙ্ক না হয়, তবে পরাক্রান্ত ও বিপুল প্রতিষ্ঠাশালী তুর্কী রাজবংশোদ্ভব বীরকুলর্ষভ কুম্বী থাকে কন্যাদান করলে অগৌরব হবে কেন?

রাণা : অগৌরব না হতে পারে, কিন্তু অন্য আশঙ্কার কারণও আছে।

রানী : কি আশঙ্কা?

রাণা : অবশ্য তা শুধু আমার মনের সন্দেহ। কুম্বী খাঁ যেহেতু সুদক্ষ ও তেজস্বী পুরুষ, তাতে পরিশেষে এ রাজ্যখ্যাসে উদ্যত হওয়া তার পক্ষে বিচিত্র নহে।

রানী : পুত্রাদি না জন্মিলে কন্যাই তো রাজ্যাধিকারিণী হবে, তাতে দুঃখ করবার কি আছে?

রাণা : কন্যার হস্তে রাজ্য গেলে, কার্ণভঃ তা কুম্বী খাঁর হস্তেই পতিত হবে। কুম্বী খাঁ মুসলমান; তার প্রভাবে এ রাজ্যপুরীতে হিন্দুরানীর কোনও প্রভাব থাকবে কি?

রানী : নাই বা থাকল, আমাদের জীবদ্দশায় তো আর ঘটবে না। আর যে অবস্থা দেখছি, তাতে সমস্ত দেশের লোকই যে ক্রমশঃ ইসলামের আশ্রয় গ্রহণ করবে, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

রানী : তা ভবিষ্যতের বিষয়। উপস্থিত বর্তমান দেখেই সমস্ত কার্য করতে হবে।

রানী : এটা ঠিক নয়। ভবিষ্যৎ ভেবেই সমস্ত কার্য করা উচিত। আর কুম্বী খাঁকে কন্যাদান করলে, বর্তমানেও শত্রুদের মনে আভঙ্কের সৃষ্টি হবে। কুম্বী খাঁ রাজ্যের সামরিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য আরও গ্রাণপণে চেষ্টা করবে।

রাণা : তবে কল্পিণী ও স্বর্ণবাঈ-এর বিবাহ এক সঙ্গেই সমাধা করা কর্তব্য। কিন্তু কল্পিণীকে মুসলমান-গৃহে দান করতে আমার আদৌ কচি নাই। কল্পিণীকে

অরুণসিংহের করেই সমর্পণ করব। আশা করি; অরুণসিংহ বিরোধী হবে না। আমি যখন তোমার অনুরোধে স্বর্ণবাসীকে কুম্বী খাঁর হস্তে দান করতে স্বীকৃত হচ্ছি, তুমিও তখন আমার অনুরোধে কুম্বীগীকে জয়পুরের যুবরাজ-করে অর্পণ করতে সম্মত হও।

রানী : সোলতান রোকনউদ্দীন যদি এতে অসন্তুষ্ট বা বিরক্ত হন, তবে বড়ই প্রমাদ। জয়পুর অপেক্ষা মালবপতির সহিত মিত্রতা রক্ষা করাই অধিকতর মঙ্গলজনক।

রাণা : সে যা হোক, তর্ক-বিতর্ক করে তোমার সাথে জিতবার শক্তি নাই। তবে আমার অনুরোধ যে, তুমি এ বিষয়ে আমার মতেই মত দাও।

রানী : আচ্ছা, তোমার মতেই মত দিচ্ছি। কিন্তু ভবিষ্যতে এই ব্যাপার নিয়েই আবার একটা যুদ্ধ-বিগ্রহ না ঘটে, এই ভাবনায় আমি অস্থির হচ্ছি।

নবম পরিচ্ছেদ

যথাসময়ে রাজকীয় আড়ম্বর ও ধুমধামের সহিত স্বর্ণবাসী-এর সঙ্গে কুম্বী খাঁর এবং কুম্বীগীবাসী-এর সঙ্গে জয়পুরের যুবরাজ অরুণসিংহের উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল। কুম্বীগীবাসী অরুণসিংহকে বিবাহ করিতে একেবারেই নারাজ ছিলেন। অনেক সাধ্য-সাধনা করিয়া, কলা-কৌশল খাটাইয়া কুম্বীগীবাসীকে কোনও রূপে জোর-জবরদস্তিপূর্বক জয়পুরের রাজকীয় বাহনে তুলিয়া দেওয়া হইল। কুম্বীগীর মনোবিকার দেখিয়া রাণা ও রানী উভয়ে নিতান্ত বিচলিত হইলেন। আতসবাজী পোড়াইতে পোড়াইতে, তোপ ও বন্দুক ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে অরুণসিংহ কুম্বীগীবাসীকে লইয়া জয়পুরাভিমুখে রওয়ানা হইলেন।

বিবাহের সমস্ত উৎসবই কুম্বীগীবাসী-এর চক্ষে একান্ত বিষময় ও পীড়াদায়ক বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। সখীগণ এবং ধাত্রীমাতা কুম্বীগীকে নানারূপ প্রবোধবচনে বুঝাইতে লাগিল; কিন্তু তাঁহাদের সেই সমস্ত উপদেশের এক বাক্যও কুম্বীগীর কর্ণে প্রবেশ করিল বলিয়া বোধ হইল না। জয়পুরের রাজ-অস্তঃপুরে কুম্বীগীর মনোরঞ্জনের জন্য নানা প্রকারের রত্নরস ও আমোদ-প্রমোদের বন্দোবস্ত হইল। সখীরা প্রাণপথ যত্ন এবং চেষ্টায় কুম্বীগীবাসী-এর মনের গতি কিরাইবার জন্য প্রয়াস পাইতে লাগিল।

গান-বাদ্য আমোদ-আহ্লাদ এবং নানা প্রকারের তামাসার আয়োজন হইতে লাগিল। উদ্যান-বিহার, নৌ-বিহার এবং বন-বিহারের নূতন নূতন ধরনের আয়োজন হইতে লাগিল। অরুণসিংহ কুম্বীগীবাসী-এর মনোরঞ্জনের জন্য

অহরহঃ চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। যুবতীকে যৌবনের সরস-বিলাস সম্বোগে মাতোয়ারা করিবার জন্য অনেক কাণ্ড-কারখানা করা হইল।

কিন্তু হয়! সমস্তই পণ্ড্রমে পরিণত হইল। কৃষ্ণিণীবাসী দিন দিন আরও গভীর এবং নিঃসঙ্গ প্রকৃতিবিশিষ্ট হইতে লাগিলেন। বুদ্ধিমতী ধাত্রীমাতা মঞ্জুলিকা বিশেষ চেষ্টা ও যত্ন করিয়া দিবারাত্র কৃষ্ণিণীকে নূরউদ্দীনকে ভুলিবার জন্য নানা উপদেশ দিতে এবং অনুরোধ করিতে লাগিল। কিন্তু হয়! ফল ক্রমশঃই বিপরিত ফলিত লাগিল। নূরউদ্দীন ব্যতীত কৃষ্ণিণীর আর কোনও ধ্যান-জ্ঞান রহিল না। ধাত্রী মঞ্জুলিকা ব্যাপার গুরুতর দেখিয়া উদয় সিংহ এবং রানী লক্ষ্মীবাসীকে বলিয়া কন্যা-জামাতাকে চিত্তোরে আনয়ন করিলেন। চিত্তোরে আসিবার পরে লক্ষ্মীবাসী কন্যাকে অনেক প্রকারে প্রবোধিত করিলেন। কিন্তু কৃষ্ণিণীর একই কথা, “একটি প্রাণ কয় জনকে দিব? নূরউদ্দীনকে যে হৃদয় ধর্ম সাক্ষী করে দান করেছি, সে-হৃদয় অন্যকে কেমন করে সমর্পণ করব?”

কন্যার উত্তর শুনিয়া রাণা ও রানী উভয়েই হতবুদ্ধি এবং স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন। তথাপি কৃষ্ণিণীর মন পরিবর্তনের জন্য অনেক পূজা এবং হোম করা হইল। কত রকম মন্ত্র-তন্ত্র ছিটে-ফোটোর যে শ্রাদ্ধ হইল, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? কিন্তু কৃষ্ণিণীর মতি-গতির কিছুমাত্রও পরিবর্তন ঘটিল না। কৃষ্ণিণী সূর্যমুখীর ন্যায় একনিষ্ঠ এবং নলিনীর ন্যায় একৈকচিত্তই রহিল। যৌবনের ধর চাকলা, ভোগের কামনা, বিলাস-বাসনা, ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা, গুরুজনদিগের গুরু গঞ্জনা, পরিচালিকাদিগের নিন্দা-ঘৃণা কিছুতেই তাহাকে নূরউদ্দীনের প্রেম হইতে একবিন্দুও টলাইতে পারিল না।

কৃষ্ণিণী দেবপূজার ধ্যানে এবং পুস্তকপাঠে তাহার জীবনের ব্যাকুল ও উষ্ণ দিনগুলিকে ক্রমশঃ ধীর ও সংযতভাবে কাটাইতে লাগিল। বাহিরের চাকলা ক্রমশঃ হৃদয়ের কোণে জমাট বাঁধিতে লাগিল। তরুণী তারুণ্যকে গাভীর্য দিয়া কতকটা ঢাকিয়া ফেলিলেন। সকলেই বুঝিল, ধর্ম-চর্চা এবং ব্রহ্মচর্য করিয়া কৃষ্ণিণী জীবন-বেলা কাটাইয়া দিবার জন্য বিশেষরূপে প্রয়াস পাইতেছেন। কৃষ্ণিণীর এই ধর্ম-চর্চা এবং গভীর ভাব দেখিয়া রাণা এবং রানী উভয়েই দারুণ অন্তর্দাহকর দুঃখের অন্ত মধ্যেও একটা সান্ত্বনা লাভ করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যা প্রায় সমাগত। সূর্যমণ্ডল রক্তরাগ ধারণ করিয়াছে। সোনালী কিরণে আকাশের গায় মেঘের অঙ্গে কত রং-বেরঙ্গের চিত্র সৃষ্টি হইতেছে। সারাদিন উষ্ণ

বায়ু-প্রবাহের পরে সন্ধ্যার ঈষৎ শীতল বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। সুলতান রোকনউদ্দীন এই প্রকার মধুর সন্ধ্যায় সারাদিনের রাজ্যকার্যের গুরু পরিশ্রমের পরে দেহ-মনের শ্রান্তিদূর-মানসে আরামবাণ নামক প্রাসাদ-সংলগ্ন রমণীর উদ্যানে বায়ু সেবনে বেগম-সহ নির্গত হইয়াছেন।

উদ্যানে নানা জাতীয় ফুল ফুটিয়া পবন-প্রবাহে গন্ধ ঢালিতেছিল। সরোবরের নির্মল টলটল জলে মৎস্যগুলি দলে দলে উল্লঙ্ঘনপূর্বক বিচরণ করিতেছিল। সুলতান ও বেগম দু'জনে সরোবরের বাঁধা ঘাটে বসিয়া শীতল বায়ু সেবন এবং মৎস্যরাজির ক্রীড়া দর্শন করিতে লাগিলেন। একটু ঠাণ্ড হইবার পরে সুলতান বলিলেন : বেগম! নূরউদ্দীনের বিবাহের আয়োজন সমস্তই পণ্ড হতে চলল। বিবাহের জন্য আর কি উপায় অবলম্বন করা যায়?

বেগম : কি যে করা যাবে, এই-ই তো সমস্যা! কাম্ববস্ত কাকের কথা দিয়ে শেষে কথা রক্ষা করল না।

সুলতান : ছেলেটি কৃষ্ণিণীর রূপের নেশায় একেবারে মেতে গিয়েছে।

বেগম : মাতবার তো কথাই। এত মেশামেশি এবং ভালোবাসাবাসি, তার উপর রানী লক্ষ্মীবাই-এর আপনা হতে কন্যাদানের কামনা। এতে যুবক ছেলের পক্ষে আর বিশেষ দোষ কি? তখন এতটা ঘনিষ্ঠতা না করলেই দোষ ঘটত না।

সুলতান : সে কথা তো ঠিক। কিন্তু মানুষ তো অন্তর্যামী নয়। বাণা যে এরূপ বেইমানী করবে তা তো স্বপ্নেও ভাবিনি। কাকেরকে কখনও বিশ্বাস করতে নাই। কথায় বলে—'উঝড়ী নয় গোশত আর হিন্দু নয় দোস্ত।'

বেগম : মেয়েটি কিন্তু ঠিক।

সুলতান : সে নাকি আর জয়পুরে যায় নাই। এখন নাকি ব্রহ্মচারিণীর বেশে সর্বদাই তপ-জপে দিন কাটায়। কি বিষম ব্যাপার।

বেগম : নূরউদ্দীন এবং কৃষ্ণিণী উভয়ের সংকল্প এবং প্রতিজ্ঞা একই রূপের।

সুলতান : কারণারে দিয়ে তো অনেক পীড়ন করা হল; এবার তাকে বুঝিয়ে পড়িয়ে অনুরোধ-উপরোধ করে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করবার চেষ্টা দেখ।

বেগম : তা কি আর কম করছি! কিন্তু তার দুর্জয় সংকল্প যে কিছুতেই টলে না!

সুলতান : যে-রূপেই হোক টলাতে হবে। নতুবা রাজ্য-সিংহাসন সমস্তই বৃথা। আর বিবাহ না করলে বংশই বা থাকবে কিরূপে?

বেগম : আমার জীবনে আর কোনও আরাম নেই। নূরউদ্দীনের ভাবনাই আমাকে কবরে নিয়ে যাবে।

সুলতান : তুমি পূর্বে ভাবলে এখন আর ভাবতে হতো না।

বেগম : কৈ? আপনিতো তো ভাবেন নাই। একেবার সাবধান করে দিলেও তো আজ তার শোকরানা আদায় করতাম।

সুলতান : সেটাই তো মন্ত ভুল। সে যা হোক, সুলতান আহমদ শাহের কন্যা নূরুল্লাহাবের কাছে কন্সিলী দাঁড়াইতেই পারে না। নূরকে যদি একবার দেখান যেত, তা হলে বোধহয় কন্সিলীর নেশা ছুটে যেত।

বেগম : ওগো! এ তো নেশা নয়, এ যে প্রতিজ্ঞা পালন। উত্তরে উত্তরকে নাকি ধর্মসাক্ষী করে মনোনয়ন করেছিল।

সুলতান : ও সব রেখে দাও। চোখে ভালো এবং মনে মিঠা লাগাই সমস্ত প্রতিজ্ঞার মূল প্রতিজ্ঞা। যৌবনে রূপজ মোহের প্রভাব বড় বেশী।

বেগম : আমার কিন্তু মনে হয়, রূপজ মোহ অপেক্ষা এখানে প্রতিজ্ঞার মোহই বেশী প্রভাব বিস্তার করেছে। নর্তকী বিলাসিনী এবং কত রূপবতী ছুকরীদের দ্বারা নূরকে তো আর কম পরীক্ষা করিনি। পয়গাম্বর হজরত ইউছুফ (আঃ)-ও একরূপ কঠিন পরীক্ষায় পতিত হয়েছিলেন না। তাঁকে শুধু এক জ্বালাখার হাতে পড়তে হয়েছিল; আর নূরকে কত জ্বালাখা, কত মোহিনী এবং কত রতি দ্বারাই ফাঁদে ফেলবার চেষ্টা করেছেন, তা একবার স্থিরচিত্তে ভেবে দেখুন। কিন্তু বাছা আমার সকল পরীক্ষায়ই উত্তীর্ণ হয়েছে! কেউই তার চরিত্র নষ্ট করা দূরে থাক, মলিন পর্ষস্ত করতে পারেনি।

সুলতান : তবে কি নূর এ দুর্ভয় সংকল্প টপবে না? কন্সিলী ন্যাতিত সমস্ত নারীই তার পক্ষে হারাম বলে জ্বলন্ত বিশ্বাস। তবে উপায় কি?

বেগম : বোদা কি বিষম সঙ্কটেই ঠেকিয়েছেন!

এই পর্ষস্ত কথোপকথনের পরেই বেলা ডুবিল। মসজিদের উচ্চ মিনার হইতে আজান-ধ্বনি উদ্ভিত হইয়া পার্শ্ব-মোহমগ্ন মানবকে চিরজীবনের পথে ডাকিতে লাগিল। সুতরাং সুলতান ও বেগম মগরেবের নামাজের জন্য অঙ্কু করিতে গেলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই চিত্তোরে আজ হুলস্থূল ব্যাপার উপস্থিত। কুমার অরুণসিংহ বিপুল লোক-সঙ্কর সহ কন্সিলীকে নিজ বাটিতে লইবার জন্য উপস্থিত হইয়াছে। রাজবাটিতে বাহিরে বাহিরে জামাতার আদর অভ্যর্থনার ধূম পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু হায়! ভিতরে ভিতরে রাজা ও রানী এবং রাজ-পরিবারের

আমীর-ছজন-পনের মুখ বিষাদে মালিন হইয়া দিয়াছে। রানী লক্ষ্মীবাই কপালে হাত দিয়া পৃথকোণে ভাবিতেছেন, জামাই আসিয়াছেন, পরম সুখের বিষয়। কিন্তু হায়! কন্যা যে জামাইয়ের নাম ওনিয়াই যার-পর-নাই ম্লান ও ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িয়াছে!

কৃষ্ণিণী প্রাণান্তেও জয়পুরে যাইতে রাজী নয়। সখীরা এবং রানী অনেক বুঝাইলেন; কিন্তু কৃষ্ণিণীর সেই একই কথা! সে ধর্ম ও সতীত্ব নাশ করিতে পারিবে না। নূরউদ্দীনই তাহার একমাত্র স্বামী। প্রাণান্তেও সে অপর পুরুষের মুখ দর্শন করিবে না। একান্ত বাড়াবাড়ি করিলে সে আত্মহত্যা করিবে। কি বিষম ব্যাপার! কি ভয়ানক অবস্থা!

তিন দিন পর্বস্ত অরুণসিংহ চিতোরে অবস্থান করিলেন। রাণা উদয়সিংহ জামাতাকে আদর-অভ্যর্থনায়, যত্ন ও সমাদরে প্রাণপণে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিলেন। কৃষ্ণিণীকে ত্যাগ করিয়া যাইবার জন্য অনেক অনুরোধ-উপরোধ করিলেন। কিন্তু অরুণসিংহের সংকল্প টলিল না। তিনি কৃষ্ণিণীকে না লইয়া বাটি কিরিবেন না। স্বেচ্ছায় কৃষ্ণিণীকে দান না করিলে, যুদ্ধ করিয়া জবরদস্তিপূর্বক তাহাকে লইয়া যাইবেন। জামাতার সংকল্প উদয়সিংহ নিতান্ত বিচলিত হইলেন। জামাতার সহিত যুদ্ধ হইলে কলঙ্কে দুনিয়া ভরিবে। রাণা উদয়সিংহ দুঃখে স্কাতে যার-পর-নাই মর্মান্বিত এবং ব্যাকুল হইলেন। পিতা আত্মহত্যায় প্রস্তুত দেখিয়া অবশেষে জয়পুরে যাইতে স্বীকৃতা হইলেন।

জয়পুর-রাজকুমার, যথাসময়ে কৃষ্ণিণীবাইকে লইয়া স্বরাজ্যে গমন করিলেন। কৃষ্ণিণীর সঙ্গে তাহার সখী অপর্ণা পাঁচজন দাসী সঙ্গে লইয়া গমন করিল। কুম্বী খাঁর জয়পুর রাজধানী দেখিবার জন্য নিজের আশ্রয় ছিল। এক্ষণে জয়পুরপতি, জয়পুরের কেয়া ও সৈন্য পরিদর্শনের জন্য তাঁহাকে সাদর আহ্বান করায়, এই সঙ্গে তিনিও গমন করিলেন।

ষাদশ পরিচ্ছেদ

মালবের সুলতান রোকনউদ্দীন ওজরাটপতি সুলতান আহমদ শাহের কন্যার সঙ্গে নূরউদ্দীনের বিবাহ স্থির করিয়াছিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, নূরউদ্দীন তাঁহার কার্ণে কিছুতেই অসম্মত হইবে না। বিশেষঃ, ওজরাটের শাহজাদী যেসকল বে-মেছাল খুবসুরত এবং আকেলমন্দ, তাহাতে তাহাকে বিবাহ করিতে কুমার কখনই ওজর করিবেন না। কিন্তু কুমার নূরউদ্দীন যখন একেবারেই কঠোরভাবে

অষ্টকৃষ্ণ ও জাপন করিলেন, তখন সুলতান রোকনউদ্দীন যার-পর-নাই বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া পড়িলেন।

মন্ত্রীবৃন্দ, কুমারের শিক্ষকগণ এবং বয়সী সকলে নানারূপে কুমারকে বিবাহে সম্মত করিবার জন্য বৃথাইতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই শাহাজাদার মতের পরিবর্তন হইল না। রাগান্বিত হইয়া কুমারকে কারাগারে কয়েদ করিয়া সাধারণ কয়েদীদের ন্যায় কঠোর শারীরিক পরিশ্রমের কার্যে নিযুক্ত করিলেন। প্রহরিগণ যাহাতে কোনও রূপে শাহাজাদার প্রতি গোপনে বা প্রকাশ্যে অনুগ্রহ প্রদর্শন না করে, সেজন্য প্রহরীদেরকে বিশেষরূপে শাসন করিয়া দেওয়া হইল।

হায়! যে শাহাজাদার সেবার জন্য শত শত দাসদাসী নিযুক্ত এবং ব্যস্ত থাকিত, আজ তিনি চোর-দস্যুর ন্যায় অতি কঠিন ও ক্লেশময় জীবন নিতান্ত হীনভাবে কাপন করিতে লাগিলেন। সুকোমল ও মূল্যবান রেশমী জামার পরিবর্তে নিতান্ত স্থূল কবলের জামা পরিতে দেওয়া হইল! সে জামা কুমারের অঙ্গে স্থলের ন্যায় কুটিতে লাগিল। যাহার মাথায় মণিমুক্তা খচিত মূল্যবান টুপি শোভা পাইত, তাহার মস্তকে স্থূল বস্ত্রের অতি সামান্য টুপি পরাইয়া দেওয়া হইল। নানা প্রকার লজ্জিত ও নক্ষিত খানা যাহার বর্তনে গড়াগড়ি যাইত, তাহার জন্য কেবলমাত্র যৎসামান্য গোশূত দিবার ব্যবস্থা হইল।

যে রাজকুমার কখনও নীচ কর্মে হস্তার্পণ করেন নাই এক্ষণে, রোজ সকালে এবং বিকালে চোর-ডাকাতদের সঙ্গে তাহাকে দস্তুরমত মাটি কাটিতে প্রবৃত্ত করা হইল। কুমারের দারুণ দুর্দশায় এবং কঠোর শাস্তিতে রাজপুরী, এমন কি রাজধানীর অধিবাসীদের মধ্যে দারুণ শোকের হাহাকার পড়িয়া গেল। কয়েক দিনের মধ্যেই কুমারের মূর্তি যার-পর-নাই মলিন এবং শীর্ণ হইয়া পড়িল। কোমল কুসুম বৈশাখের খর রৌদ্রে মলিন না হইয়া কতক্ষণ থাকে? বাঁটাছেঁড়া পর কতক্ষণ অম্লান থাকে? কুমারের ক্লেশ ও দুঃখে মন্ত্রী ও আমীরগণ অশ্রুসিক্তনেত্রে সুলতানের নিকট কুমারের জন্য করুণ প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু সুলতান রোকনউদ্দীনের চিত্ত কিছুতেই দ্রবীভূত হইল না। সুলতান স্পষ্ট ঘোষণা করিলেন যে, নূরউদ্দীন যতদিন বিবাহে সম্মত না হইবে, ততদিন কিছুতেই তাহার কারামুক্তি ঘটিবে না। যে ব্যক্তি এই অবাধ্য এবং দুর্মতিগ্রস্ত শাহাজাদার কারামুক্তির প্রার্থনা করিবে, তাহাকেও কুমারের সহপাঠী হইতে হইবে।

সুলতানের কঠোরতা এবং দৃঢ়তা দেখিয়া সকলেই ভীত হইল। কিন্তু কুমারের নিদারুণ ক্লেশ রাজপুরীর গোলাম, বাঁদী, চাকর-নওকর, খোজা ও আত্মীয়-বন্ধন সকলেই বিকল্প এবং ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িল। রাজাী আর্জমন্দ বানুর চক্ষে শ্রাবণের ধারা যখন তখন বহিতে লাগিল। যে রাজপুরী অষ্টপ্রহর আনন্দ-কোলাহলে এবং

বদরসে উজ্জ্বল নাট্যালাসম প্রতীয়মান হইত, এখন তাহা নীরস ও নিরানন্দ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। গোলাম-বান্দীদিগেরও কাজকর্মে উৎসাহ ও স্কৃতি নাই। প্রাতঃসন্ধ্যা নহবতে এখনও বাজনা বাজে; কিন্তু তাহা কেবল কল্পন বসই প্রকাশ করে। পূর্বে যে শাহানার সুরে প্রাণের পর্দায় পর্দায় অমিয়ধারা বহিত, এখন সে-সুর কেবল শোকের বিষ ঢালিয়া দেয়! ফুলের বাগানে এখনও ফুল ফুটে—গন্ধ ছুটে, ভ্রমর লুটে—কিন্তু সে-ফোটনে যেন শোভা নাই, সে-গন্ধে যেন মাদকতা নাই, সে-লোটে যেন সৌন্দর্য নাই! ফলতঃ, দিবানিশ কেবল হারেমের রাজপুত্রের কারাক্রেশের কথা আলোচনা, তাহারই প্রাণপনা এবং তাহারই আন্দোলন!

কেহ যদি বলে, রাজপুত্র মলিন হইয়া গিয়াছেন, অমনি আর একজন বলে, শুধু মলিন কেন, হায়! তাহার চক্ষু দুটিও কোটরপ্রবিষ্ট হইয়াছে! কেহ বা বলে—আহা! বাহার দুইটি গণ্ড বসিয়া গিয়াছে! এইরূপ সমালোচনায় শোকের তরঙ্গ ক্রমাগত বাড়িতেই থাকে। সরোবর-জলে লোষ্ট্রের পরে লোষ্ট্র নিক্ষেপ হইলে যেমন ঢেউ-এর উপর ঢেউ খেলিতে থাকে, তেমনি দাসী-বান্দী এবং সখা-সখীদের মুখে কুমারের ক্রেশের ক্রম-আলোচনায় বেগেমের মনে কেবল গমীর ভূফান বহিতে থাকে! পরে সে গমীর ভূফানে সকলের হৃদয়-তরঙ্গী তোলপাড় হইতে থাকে।

ক্রমাগত ছয় মাস কাটিয়া গেল। কুমারের কাঁচা সোনার মত বর্ণে কালিমার ছাপ পড়িতে লাগিল। প্রভাতের নির্মল পঙ্কজের মত বদনখানি কীটদষ্ট হিম-পীড়িত পঙ্কজের মত মলিন ও বিশ্রী হইয়া পড়িল। গণ্ডের লালিমা, চোখের ঔজ্জ্বল্য, কণ্ঠস্বরের মাধুর্য, দেহের লাবণ্য অনেক পরিমাণে ক্ষয়প্রাপ্ত হইল! একদিন রাজধানীর বহু সম্ভ্রান্ত নর-নারী ব্যথিত চিন্তে সুলতানের চরণ ধারণ করিয়া মুক্তি-প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু সুলতান কঠোরভাবে সে প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলেন। অগত্যা সকলে মিলিয়া কারাগারে যাইয়া কুমারকে বিবাহের জন্য নানারূপে বুঝাইলেন। সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর রমণীবৃন্দ বুকভরা মায়ের মমতা লইয়া কুমারকে নানারূপ বুঝাইলেন। কাকুতি-মিনতি, শ্বেহ-ভালোবাসা, উপদেশ-অনুরোধ সমস্তই যে শেষ হইয়া গেল। কিন্তু হায়! কুমারের সমস্ত টলিল না। সকলেই চমৎকৃত এবং বিস্মিত হইয়া পড়িল! অনেকেই বিরক্ত হইয়া বেওকুফ এবং বে-আড়া বলিয়া মনের দুঃখে সমালোচনা করিতে লাগিল! কেহ কেহ বলিল, চিত্তোত্তরের কুমারী কি যাদু-ই করিয়াছে! কদাচিত্ দুই একজন—যাঁহারা প্রেমরাজ্যের বিচিত্র ব্যাপার অবগত ছিলেন, তাঁহারা কেবল এই একনিষ্ঠ এবং বিতর্ক প্রেমের জন্য মুক্তকণ্ঠে কুমারের তারিফ করিলেন। হিন্দুদিগের মধ্যে কেহ

কেহ বাল্যেন, বোধ হয় মজ্জনা বা করহাস পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। কেহ তাহার উত্তরে গাছিল, তবে কল্পিণীবাঈ বোধহয় পূর্বজন্মে লায়ালা কিবা শিরি ছিলেন। রাজকুমারের দুঃখ-দুর্দশার জন্য সকলে মর্মান্তিক কষ্টবোধ করিলেও কুমার কখনও একটি দীর্ঘ-নিশ্বাসও ত্যাগ করেন নাই। নীরবে কারাক্লেশ বহন করিয়া ঘৌবনের দিন যাপন করিতে লাগিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

জয়পুররাজ অক্ষয় সিংহ কল্পিণীকে সঙ্গে লইয়া চলিয়াছেন। ত্রয়োদশ দিন ঘাইবার পরে শিখা নদীর তটে ঘাইয়া উপস্থিত হইলেন। শিখার তটে বিশাল কানন। সে-কাননে শত শত মৃগ বিচরণ করে। নানাজাতীয় ময়ূর, কুকুট, রিশাল এবং ধনেশপক্ষীও ঘেষ্ট। শিখাতে মৎস্য-শিকারেরও বিশেষ সুবিধা। সুতরাং অক্ষয় সিংহ এই বনে শিকারের জন্য ক্রমী ঝাঁর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া শিখা-তটে এক মনোহর ভূমিতে তাহু ফেলিলেন।

এই বনবিহার এবং মৃগয়ার পরমানন্দে দুইদিন কাটিয়া গেল। রাজপুত্র, ক্রমী ঝাঁ এবং সঙ্গের অন্যান্য শিকারী এবং সৈনিকগণ পরম উৎসাহে এবং আনন্দে দুই দিন কাটাইলেন। কত জাতীয় মৃগ, পক্ষী এবং মৎস্য শিকার করিয়া বীরপুরুষগণ চিত্তের আনন্দ বিধান করিলেন।

তৃতীয় দিবস সন্ধ্যা-সমাগমে সহসা মেঘের সজ্জার হইল। দেখিতে দেখিতে নির্মল নীলাকাশ, নীলাভ মেঘপুঞ্জ ছাইয়া গেল। সকলেই বুঝিল খুব বৃষ্টি হইবে। কেহ কেহ ভাবিল ঝড়-তুফান হওয়াও বিচিত্র নহে। সুতরাং তাহুরক্ষিণ খুঁটি ও দড়ি দিয়া তাহুগুলি মজ্জবৃত্ত করিয়া বসাইতে লাগিল।

সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইলে চটপট বৃষ্টির ফোঁটা পড়িতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে চতুর্দিক অন্ধকার করিয়া নুশলধারার বারিপাত আরম্ভ হইল। অল্প সময়ের মধ্যেই উচ্চভূমি হইতে জলস্রোত নিম্নে কল কল করিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল। তারপর ধীরে ধীরে বাতাস বহিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে বাতাস ভীষণ আকার ধারণ করিয়া গাছের ডালপালা ভাঙিতে লাগিল। সেই দুর্যোগময়ী অন্ধকার যামিনীতে মনে হইতে লাগিল—যেন শত শত হস্তী বনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বৃক্ষাদি উৎপাটন এবং শাখা-প্রশাখা ভগ্ন করিতেছে। পবনের হুঙ্কারে এবং ধ্বস্তাধ্বস্তিতে এক প্রলয়কাণ্ডের সূচনা হইল। তাহুগুলির অধিকাংশ প্রদীপই নিভিয়া গেল। সাঁ করিয়া খুঁটি উপড়াইয়া দড়ি ছিড়িয়া নদীতীরবর্তী তাহুগুলিকে

খও খও করিয়া খড়ে উড়াইয়া কোথায় লইয়া গেল। লোকজনের মধ্যে মহা-শোরগোল এবং মহামারী কাণ্ড পড়িয়া গেল। এদিকে ক্ষুদ্রকায়া শিখা নদী প্রবল বারিধারায় পূর্ণগর্ভা হইয়া তটদেশ বিপ্রাভিত করিয়া কেলিল। রাজকুমারের তাম্বু সহসা জলপ্রাবনে উৎপাটিত হইয়া কোথায় ভাসিয়া গেল। রাজকুমার জলে ভাসিয়া যাইতেছিলেন। আর্চ চীৎকার তনিয়া কুম্বী বা কঙ্কটো তাঁহাকে উদ্ধার করিলেন।

রাজকুমারী কুম্বিনীর তাম্বুতেও ভীষণ বেগে জলস্রোত প্রবেশ করিল! জিনিসপত্রসহ তাম্বুটি মুহূর্তমধ্যে জলসং হইয়া ভাসিয়া গেল। ভৃত্য ও নওকরগণ তাম্বু রক্ষার জন্য যাহারা প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিল, তাহারাও ভীত স্রোতে ভাসিয়া গেল। কুমার এবং কুম্বী বা সেই ভীষণ দুর্যোগের মধ্যে কুম্বিনীর তত্ত্ব লইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কুম্বিনীর কোন তত্ত্ব পাওয়া গেল না। বিষম আশঙ্কা-উৎসে এবং দুর্যোগের মধ্যে ক্রমশ রজনী প্রভাত হইল। অশান্ত প্রকৃতির উদ্যম আক্ষালনের পরে-তাহার প্রশান্ত নীল গগন-ভালো উষার ত্ত্র আলোকরেখা ফুটিয়া উঠিল। গাছে গাছে পাখীরা গাড় ঝাড়া দিয়া ডাকিয়া উঠিল।

উষালোক প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে কুম্বিনীবাঈয়ের জন্য মহা বোজ পড়িয়া গেল। নদীর তীর ধরিয়া অনেক দূর অনুসন্ধান করা হইল। কত লোকের লাশ পাওয়া গেল, কত অর্ধমৃত জীবনুত লোককে টানিয়া তুলিয়া উদ্ধার করা হইল; কিন্তু হায়! হতভাগিনী কুম্বিনীকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।

অরুণ সিংহ এবং কুম্বী বা যার-পর-নাই মর্মান্বিত হইয়া পড়িলেন। কোন মুখে কি বলিয়া তাঁহারা মুখ দেখাইবেন? স্বামী বাঁচিয়া থাকিতে পত্নীকে জলস্রোত ভাসাইয়া লইয়া গেল! বীর সেনাপতি জীবিত থাকিতে, প্রভু-কন্যা জলে নিমজ্জিত হইয়া ভাসিয়া গেল! এ লজ্জা, এ কাণ্ডকষতা, এ কলঙ্কের যে কিছু ইয়ত্তা নাই! যে যুনিবে সেই বলিবে, “কাণ্ডকষেরা নিজের জীবন লইয়াই ব্যস্ত ছিল! নারী-পত্নী-রাজকন্যা—প্রভু-কন্যাকে রক্ষা করিতে পারে নাই, করিবার কোনও চেষ্টা করে নাই!” পুরুষের পক্ষে, বিশেষতঃ বীরের পক্ষে ইহার অধিক কলঙ্ক আর কি আছে? এ কলঙ্ক অপেক্ষা মৃত্যু যে শতগুণে শ্রেয়ঃ। নিজের জীবনপাত করিয়াও রাজকুমারীকে বাঁচাইতে পারিলেও জীবন ধন্য হইত। হায়! কি ভীষণ অনর্থই সংঘটিত হইল!

ইত্যাকার চিন্তায় কুমার ও সেনাপতি এবং সহকারিগণ অত্যন্ত বিষণ্ণ এবং মলিন হইলেন।

কিঞ্চিৎ আহার ও বিশ্রামান্তে কুম্বী বা এবং অরুণ সিংহ আবার ব্যাকুল চিত্তে

নদীর দুই তীর ধরিয়া কহদুর অগ্রসর হইলেন। কিন্তু কোথাও কুন্সিণীর কোনও খোজ পাওয়া গেল না। তথাপি তাঁহারা অনুসন্ধানে কাত না হইয়া পাতি পাতি করিয়া নদীতট এবং নদীতীরস্থ বনভূমি তাল্লাশ করিতে লাগিলেন। সন্দের অনুচরণগণও প্রাণপণ যত্নে অনুসন্ধান করিতে লাগিল।

এইরূপে সমস্ত দিন অতিবাহিত হইল। নিশায় এক স্থানে কোনও রূপে তাহু পাতিয়া উষ্ণের মধ্যে রাত্রি যাপন করিলেন। ভোর হইতে আবার সকলে মিলিয়া কুন্সিণীর অনুসন্ধানে নির্গত হইলেন। কিন্তু হায়! বৃথা পরিশ্রম! বৃথা আশা!

অক্ষয় সিংহ হতাশ হৃদয়ে দেশে ফিরিবার সংকল্প করিলেন। কিন্তু কুম্বী খাঁর ঐকান্তিক অনুরোধে তৃতীয় দিবসও বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিলেন। চতুর্থ দিবস প্রাতে অক্ষয় সিংহ লোকজন-সহ স্বদেশাভিমুখে রওয়ানা হইলেন। কুম্বী খাঁ সন্দের তিনজন ভৃত্য, পাঁচজন অনুচর এবং সাতজন দেহরক্ষী সহ কুন্সিণীর অনুসন্ধানে সেই শিখা-তটে রহিয়া গেলেন। জয়পুর-যুবরাজ তাঁহাকে তৎসঙ্গে জয়পুরে যাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলেন। 'কুন্সিণী নদীগর্ভে ডুবিয়া মরিয়াছে, সুতরাং তাহাকে তাল্লাশ করা বৃথা।'—সকলে দৃঢ়তার সহিত এইরূপ নৈরাশ্যজনক বাক্য পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিলেও কুম্বী খাঁর কুন্সিণীর প্রাপ্তি-আশা কিছুতেই লুপ্ত হইল না। তিনি পঙ্কীরভাবে বলিলেন, "কুন্সিণী নিশ্চয়ই ডুবে মরে নাই। আমার মন সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, কুন্সিণীকে জীবনুত অবস্থায় কেউ পেয়ে বাড়ী নিয়ে গিয়েছে। আরও কিছুদিন অনুসন্ধান না করে আমি চিত্তোরে ফিরব না।"

কুম্বী খাঁকে অনুসন্ধানে বিরত করিত না পারিয়া অক্ষয় সিংহ অবশেষে তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া স্বদেশে প্রস্থান করিলেন। কুম্বী খাঁ অনুচরণগণসহ বনে বনে নদীতটে আরও কয়েক দিন অনুসন্ধানে ব্যাপ্ত রহিলেন।

চতুর্থ পর্বচ্ছেদ

শিখাতটে সেই তীষণ ঝটিকাসঙ্কুল রাত্রিতে প্রবল প্রাৰনে কুন্সিণী ভাসিয়া গিয়াছিল। ভাসিবার উপক্রমেই সৌভাগ্যবশতঃ কুন্সিণী একখণ্ড কাঠ অবলম্বন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। বাতাসের জোরে, ঢেউয়ের তোড়ে এবং স্রোতের ধারে কুন্সিণী তীরের মত বেগে ভাসিয়া চলিল। কুন্সিণী আতর্কণ্ডে চীৎকার করিলেও ঝটিকার উন্মত্ত তাণ্ডব এবং ছন্দারের মধ্যে কেহ তাহা শুনিতে পাইল না। যখন কুন্সিণীর অনুসন্ধান হইল, তখন সে পাঁচ মাইল দূরে ভাসিয়া গিয়াছিল।

সমস্ত রাত্রি এইরূপে ভাসিতে হইবে ভাবিয়া কুন্সিণী কাঠের সহিত নিজের

শরীরটি বহু দ্বারা ভালোরূপে বাঁধিয়া হস্তাশ হৃদয়ে শ্রোতে ভাসিয়া চলিল। কিছুক্ষণ পরে শীতে ধর ধর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। সেই নিবিড় অন্ধকারে মৃত্যু-বিভীষিকাপূর্ণ নদী-শ্রোতের ভীষণ গর্জনে, তরঙ্গের ভীম শাউনে, শ্রোতের প্রবল ঘূর্ণনে ও ঝটিকার স্তর্জনে যে কিরূপ চমকিত, বিস্মিত এবং কম্পিত হইয়াছিল, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে?

দারুণ শীতে এবং আতঙ্কে কল্পিণী ক্রমশঃ সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িল। নদীর প্রবল শ্রোত এক রাত্রির ভিতরেই তাহাকে প্রায় ৩০ মাইল দূরে লইয়া গেল। প্রত্যবে একটি নিমজ্জমান বৃহৎ বৃক্ষের শাখায় অবলম্বনের কাঠখণ্ড আটকাইয়া গেল।

একজন সন্ন্যাসী প্রাতঃস্নান করিতে আসিয়া সেই কাঠখণ্ডের উপরে বালারূপে কিরণরঞ্জিত এক অপরূপ সুন্দরী দেহ দর্শন করিয়া চমকিত হইয়া উঠিলেন। সন্ন্যাসী সাঁতার কাটিয়া কাঠখণ্ড তটে তুলিয়া আনিয়া দেখিলেন, সুন্দরী মৃতকং অচেতন। তাড়াতাড়ি কাঠাদি সংগ্রহ করিয়া কল্পিণীকে সেক দিতে থাকেন। অর্ধঘণ্টা সেক দিবার পরেই কল্পিণী চৈতন্য লাভ করে। সন্ন্যাসী অতঃপর তাহাকে বহু কষ্টে নিজের আশ্রয়ে লইয়া যাইয়া দুগ্ধ এবং ফলাদি সেবন ও আহার করাইয়া বিছানায় শায়িত করিয়া রাখেন। সমস্ত দিবারজনী নিদ্রার পর, কল্পিণী অনেকটা সুস্থ এবং প্রকৃত হইয়া ওঠে।

সন্ন্যাসী কল্পিণীকে সুস্থ হইতে দেখিয়া পরমানন্দ লাভ করেন। কল্পিণীর সর্বপ্রকার সুখ-সুবিধার জন্য সন্ন্যাসী বিশেষভাবে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসীর স্নেহ এবং যত্নে কল্পিণী বেশ প্রশান্তভাবে সুস্থ দেহে দিন কাটাইতে লাগিল।

সন্ন্যাসীর আশ্রমটি একটি সুন্দর হ্রদের তীরে অবস্থিত ছিল। বিশাল বিজ্ঞ অরণ্য। সেই অরণ্যের মধ্যে স্বচ্ছসলিলপূর্ণ সরোবর; সেই সরোবরতটে বহুদিনের একটি কালী-মন্দির। মন্দিরটি পুরাতন হইলেও তখন প্রায় অক্ষত এবং মজবুত ছিল।

এ বিজ্ঞ-বনে কে কবে কি উদ্দেশ্যে এই মন্দির নির্মাণ করিয়াছিল, তাহা কেহই ঠিক জানিত না। অনেকে বলিত যে, ব্রহ্মনন্দন বলিয়া একজন ডাকাতেব সর্দারই মন্দির স্থাপন করিয়াছিল। সে নাকি তাহার লোক-লঙ্কর লইয়া এই বনেই বাস করিত। তাহার ভয়ে তখন এ অঞ্চল দিয়া মানুষ দূরে থাকুক, পক্ষীও আকাশ-পথে উড়তী হইত না। স্থানটি যেমন নির্জন, তেমনি রমণীয়। নানা জাতীয় বৃক্ষ-লতার শ্যামল শোভায় এবং ফুল ফুলকুলের বিমল আভায় আশ্রমটি মুনিজনমনোহর সৌন্দর্যশালী ছিল। সরোবরের জল অতীব স্বচ্ছ বলিয়া কৃষ্ণাভ বোধ হয়। নানা জাতীয় বেত, বট, নীল কমল, কুমুদ, কল্যাণ, কুটিরা হ্রদের

শোভা মনোহারিণী করিয়া রাখিয়াছে। চারি পাশে সবুজ ঘাস—তাহার কোমলতা মধুমলকেও নিশা করে।

সন্ন্যাসীর থাকিবার জন্য একখানি কুটীর। কুটীরখানি নিতান্ত পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন এবং গোময় ও মৃত্তিকার অমুলিও হইত বলিয়া বেশ ষট্খটে এবং ধূলিশূন্য। সন্ন্যাসীর পাঁচ জন শিষ্য ছিল। তাহারাষ্ট সন্ন্যাসীর আহাৰ্য্য প্রস্তুত করিত। প্রতি অমাবস্যায় এই মন্দিরে সমারোহের সহিত পূজা হইত। দূস্ববর্তী রাজা, জমিদার এবং সর্দারগণও এই সময় বলির জন্য এখানে মহিষ এবং পাঁটা পাঠাইতেন। সাধারণ লোকেও অনেক বলি পাঠাইত। সন্ন্যাসীর জন্য অৰ্ঘ, ফল-মূল, ঘৃত এবং ময়দাও প্রচুর আসিত। সুতরাং সন্ন্যাসী হইলেও, অনেক অবস্থায় শালী গৃহী অপেক্ষা সম্পন্ন ছিলেন। মন্দিরের ভিত্তিতে বহু টাকা সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

কাপালিক সন্ন্যাসীরা বাস্তবিকপক্ষে সন্ন্যাসের নামগন্ধেরও ধার ধারে না। তাহারা আহাৰ্য্য-বিহারে যথেষ্টচারী। ইন্দ্রিয় এবং উদর সেবাই বামাচারীদিগের পরম ধর্ম। কুমারী পূজা, ভসবতী পূজার ছলে অনেকেই ব্যভিচারেরই উপাসনা করিয়া থাকে। বাৎসায়ন-প্রণীত কামশাস্ত্রের সূত্র এবং দুর্নীতিগুলি অনেকেরই জীবনের কাম্য। সুখের বিষয়, আমাদের সন্ন্যাসী সর্বানন্দ স্বামী সেক্ষপ ধরনের সন্ন্যাসী ছিলেন না। আহাৰ্য্য-বিহারে তিনি সংযত এবং মিতাচারীই ছিলেন। তিনি তেজস্বী এবং ধর্মান্বিত ছিলেন। কালিকা দেবী 'বলি'তে নিতান্ত প্রীত এবং সন্তুষ্ট হন, এ-বিশ্বাস তাহারা খুব প্রবল ছিল। পত-বলি অপেক্ষা নর-বলিতে যে কালিকা দেবী অধিক প্রীতা, ইহাও তাহারা ধারণা ছিল।

পত-বলি অপেক্ষা মানব-বলিতে যে কালিকার অধিক লালসা ও আনন্দ হয়, এ বিশ্বাস আজ কালীমূর্তি-উপাসক শাস্ত্রদিগের মধ্যে অনেক ছলেই প্রবল রহিয়াছে।

প্রাচীন হিন্দু রাজারা নৃতন প্রাসাদ প্রতিষ্ঠা, পুত্রের রোগারোগ্য কামনা, দীঘিকা বা সরোবর খননে সর্বদাই নরবলি দেওয়া অপরিহার্য্য কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। এজন্য সূহ এবং নিখুঁত নরনারী নির্বাচিত হইত। বলির পাত্র অবিবাহিত সূন্দর এবং নিখুঁত (সর্বাত্ম অক্ষত) হইলেই সর্বোত্তম বলি হইত। এই সব বলির পাত্র কখনও কলপূর্বক, কখনও চুরি করিয়া, কখনও ছলনা করিয়া, কখনও অৰ্ঘ দ্বারা ক্রয় করিয়া আনা হইত। মহাশয় বুদ্ধদেবের আবির্ভাবে এই ব্রহ্মের প্রথা ভারতবর্ষ হইতে একবার দূর উঠিয়া গিয়াছিল। অধিকাংশ হিন্দুই বৌদ্ধ ধর্ম অবলম্বন করিয়াছিল। যাহারা বৌদ্ধ ধর্ম অবলম্বন করিয়াছিল না, তাহারাও 'অহিংসা পরম ধর্ম' এই সর্বলোকমান্য মত গ্রহণ করার এই নৃশংসে ও জঘন্য জীবহত্যা-প্রথা, বিশেষতঃ নরবলি প্রথা ভারতবর্ষ হইতে অনেকটা কিলুও হইয়াছিল। কিন্তু শঙ্করাচার্য ও কুমারিল ভট্টের অধ্যয়নে হিন্দু ধর্মের পুনঃ

প্রতিষ্ঠায় আবার নরবলি-প্রথা ধীরে ধীরে প্রবল হইতে থাকে। অবশেষে বৌদ্ধদিগের বিনাশে এবং বৌদ্ধদিগের বিলুপ্তিতে* তাত্ত্বিক ধর্ম যখন মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল, তখন নরবলি, পশুবলি এবং ব্যক্তিচার-ধর্মের এক নিগূঢ় রহস্যজনক অনুষ্ঠান হইয়া পড়িল। মুসলমানগণের ভারত-বিজয় এবং ভারত-শাসনে নরবলি-প্রথা উৎপাটিত হয়। মুসলমান শাসনকর্তাগণকে এজন্য দীর্ঘকাল যাবৎ কঠোর শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতে হইয়াছিল। তথাপি নরবলির প্রচলিতাব অদ্যপি একশ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে বিদ্যমান আছে। উড়িষ্যার ষান্দ জাতির মধ্যে সে দিন পর্যন্তও নরবলি প্রথা বিরাজমান ছিল। ভারতের অনেক স্থানে নরবলি-প্রথা নিবারণের জন্য বৃটিশ গবর্নমেন্টকে কিঞ্চিৎ বেগ পাইতে হইয়াছে।

এক্ষণে উপাখ্যানের কথা এই যে, আমাদের সর্বানন্দ স্বামী দীর্ঘকাল হইতে নরবলি দিবার জন্য উৎসুক ছিলেন। কল্পনীকে মুমূর্ষু অবস্থায় পাইয়া প্রথমতঃ সন্ন্যাসীর মনে স্নেহ ও সেবার ভাব জাগিয়া উঠে। তৎপর কল্পিনী যতই সুস্থ এবং প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, সন্ন্যাসী ক্রমশঃ ততই কল্পিনীর অসাধারণ সৌন্দর্য এবং কোমল ও সরল ব্যবহারে তাহার দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। নির্মল ও পবিত্র ভালোবাসায় সন্ন্যাসী কল্পিনীকে কন্যার ন্যায় শ্রীতির চক্ষে দেখিতেন। তাহার মতলব ছিল যে, কোনও সুযোগে কল্পিনীকে চিত্তোরে পাঠাইয়া দিবেন। কিন্তু কল্পিনী এই আশ্রমের রমণীয় দৃশ্যে এবং শান্তিময় নির্জন-নিবাসে থাকিয়া ধর্মালোচনা এবং দেবী-পূজার জীবনের দিন কাটাইতে সংকল্পাক্রম হইয়া আশ্রম ত্যাগ করিতে একেবারেই অসম্মতি জ্ঞাপন করায়, সন্ন্যাসী আর তাহাকে বাটী যাইবার জন্য পীড়ন করিলেন না। কল্পিনী পবিত্র ভাবে শুদ্ধাচারে জীবনের দিনগুলি কাটাইতে লাগিল।

সূর্যরশ্মি এবং বায়ু যেমন অতি সূক্ষ্ম ছিদ্র অবলম্বন করিয়াও গৃহে প্রবেশ করে, পাপ তদপেক্ষাও অতি সূক্ষ্ম সূত্র অবলম্বন করিয়া মনোমন্দিরে প্রবেশ করিয়া থাকে। এই জন্য মানুষ কেবল পাপকার্য হইতে বিরত থাকিলেই পাপ হইতে বাঁচিতে পারে না। পাপকার্য করিবার সর্বপ্রকার সুযোগ ও সুবিধাগুলিও নষ্ট করিয়া ফেলা সর্বতোভাবে কর্তব্য। যাহাতে পাপ-চিন্তা মনে আসিতে পারে, এমন দৃশ্য, এমন কল্পনা, এমন জিনিসের ধারণাও যাইতে নাই।

* কুমারিল বৌদ্ধদিগের বিরুদ্ধে মহাসংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছিলেন। যে হিন্দু, বৌদ্ধদিগকে হত্যা করিবে না, তাহাকেও তিনি বধ করিবার জন্য হুকুম জারি করিয়াছিলেন। ফলে, বৌদ্ধদিগের বিরুদ্ধে মহাসংগ্রাম ঘোষিত হয়। সাত কোটি বৌদ্ধ নরনারী নিহত এবং অবশিষ্ট হিন্দুধর্মে দীক্ষিত হয়। বৌদ্ধদিগের যাবতীয় ধর্মমন্দির, সন্ন্যাসালয় এবং তীর্থস্থান দূর্ভাগ্য, ভীষণত্ব বা হিন্দুত্বের পরিণত হয়। পৃথিবীর ইতিহাসে এইরূপ জিঘাক্ষের দৃষ্টান্ত অতীত বিরল। অতীতকালে নেবুকাডনেজার কর্তৃক ইহুদীদের প্রতি এবং উক্তকালে স্পেনের রাজা কার্ডিনাও কর্তৃক মুসলমানদিগের প্রতি এই শ্রেণীর অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

একদা বৈশাখ-প্রভাতে কুন্স্বিনীবাসী যখন উলঙ্গ হইয়া স্নান করিতেছিল, সেই সময় সন্ন্যাসী ঠাকুর হঠাৎ তাহাকে সে-অবস্থায় দেখিয়া কামজ-মোহে মুগ্ধ হন। পৃথিবীতে পুরুষের পক্ষে যুবতী যৌবনের ন্যায় মারাত্মক জিনিস আর কিছুই নাই। যুবতী-যৌবনের মোহচক্রে পড়িয়া কত মহাজ্ঞানী যে নরাধম সাজিয়াছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? সর্বানন্দ স্বামী প্রথমতঃ স্বকীয় অন্তরের দুর্বলতা দেখিয়া ভয়ে শিহরিয়া উঠিলেন। অনেক চেষ্টা করিয়াও পাপ মোহের কালিমা হইতে অন্তঃকরণকে নির্মল ও পূর্বকং পরিচ্ছন্ন করিতে পারিলেন না। লালসা-বিবেক ক্রমশঃ বলবতী হইয়া উঠিল। স্বামীজি জ্বিতেন্দ্রিয় এবং বিবেকবান লোক ছিলেন। তিনি দেখিলেন, কুন্স্বিনীর যৌবনই তাহার জীবনব্যাপী তপস্যা মাটি করিবার উপক্রম করিতেছে।

তাঁহার মত কাশ্মিনী-কাঙ্ক্ষনত্যাগী সন্ন্যাসীর সনেই যখন এই নারীর যৌবন চাক্ষু্য অনুভব করা দিয়াছে, তখন তাঁহার শিষ্যদিগের সর্বনাশ সাধন অনিবার্য। সন্ন্যাসী ঠাকুর আরও লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, ইতিমধ্যেই শিষ্যদিগের কাহারও কাহারও মনে উষ্মেগ ও চাক্ষু্যের সঞ্চার হইয়াছে। সুতরাং তিনি নিজের শিষ্যদিগের এবং শিষ্যা কুন্স্বিনীর কল্যাণের জন্য এবং কালীর বর লাভার্থ কুন্স্বিনীকে বলি দিবার জন্য সমুদ্যত হইলেন। সমুখের কালবৈশাখী-অমাবস্যায় বিরাট ঘটায় দেবীর পূজা হইবে। আর সেই ব্রাহ্মিই মহাকালীর মহাপূজায় মহাজীবের মহাবলি দ্বারা মহাপুণ্য সঞ্চার এবং ডাকিনী-যোগিনীদিগকে বশ করিবার জন্য সন্ন্যাসী ঠাকুর অতুল শক্তি লাভ করিবেন। অন্ধ ধর্ম-বিশ্বাস এবং কুসংস্কার চিরকালই মানুষকে যার-পর-নাই মূঢ় করিয়া তোলে। বিচারশক্তি একেবারেই নির্মূল করিয়া দেয়। এই জন্য বড় বড় ধর্মপ্রাপ পুরুষদিগের মধ্যেও নানাবিধ কুসংস্কার দেখিতে পাওয়া যায়।

ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে বিতর্ক জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চা এবং মহানুভবতা সম্মিলিত না হইলে, ধর্মবিশ্বাস মানুষকে অনেক সময়ই অধর্মের পতীর অন্ধকারেই টানিয়া লইয়া যায়। এই জন্যই জগতের সার্বভৌমিক এবং সার্বজনীন মহাপয়গাম্বর হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ধর্ম লাভের সঙ্গে শিক্ষা লাভের জন্য কঠোর আদেশ করিয়াছেন। সুশিক্ষার 'হলে' হৃদয়ভূমি কর্ণিত না হইলে, ধর্মের বীজ কখনও অঙ্কুরিত এবং যথাযথভাবে পুষ্টিত ও কলিত হয় না। ধর্ম লাভের জন্য সংসার ত্যাগ করিয়া সর্বানন্দ ঠাকুর সন্ন্যাসী হইলেও, বিশ্বাসপত্ত কুসংস্কারের বশীভূত হইয়া ভক্তিপূর্ণ প্রাণে নারীহত্যারূপ মহাপাতকের জন্য সম্যক প্রস্তুত হইলেন।

হায়! কল্পনাময় মঙ্গল-কারণ বিশ্ববিধাতা যে, কোনও জীব-হত্যার সমুদ্র হওয়া দূরে থাকুক, বরং কোনও জীব-জন্তুকে পীড়ন করিলে, সে পীড়ন যে

তাঁহাকেই পীড়ন করে, এই ধারণা মানব-সমাজে কবে প্রবলতা লাভ করিবে? যেদিন এই বিশ্বাস ও ধারণা মানব-প্রাণে জাগিয়া উঠিবে, সেই দিনই পৃথিবীতে বেহেশতের হাওয়া প্রবাহিত হইবে।

পৃথিবীতে যদি কোনও ধর্ম থাকে, তাহা জীবনের সেবা করা, জীবের দুঃখ দূর করা। আর পাপ যদি কিছু থাকে, তাহা জীবকে কষ্ট দেওয়া। ফলতঃ, দয়ার উপরে ধর্ম নাই, আর হিংসার বড় পাপ নাই। ইসলামের কথায় কথায় এই মহাশিক্ষা ছড়ানে রহিয়াছে। কোরআনের পাতায় পাতায় এই মহাশিক্ষার পুণ্য আলোক বিকীর্ণ হইতেছে। এই জন্য কোরআনের ধর্মের নামই হইতেছে—“ইসলাম” অর্থাৎ কল্যাণ; আর তাহার প্রচারক মহামানব মোহাম্মদ (দঃ)-র উপাধি রহমতুল-লিল্-আলামীন্ অর্থাৎ ‘বিশ্বজনীন দয়া’।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সারা রাত্রি বিশ্রাম ও নীরবতার পরে পাখীরা যখন মধুর স্বরে প্রভাতী গাহিয়া উঠিল, তখন ফুলবালারা সে-ডাক শুনিয়া ধীরে ধীরে চোখ মেলিয়া চাহিতে লাগিল। উষা তাহার স্মিতহাস্যে অন্ধকাররাশিকে চঞ্চল ও তরল করিয়া মধুর কটাক্ষে শিশিরসিক্ত ফুলদল লইয়া প্রাণপতি তরুণ অরুণকে অভ্যর্থনা করিতে সজ্জিত হইল। প্রভাতের সুখ-স্পর্শ-সমীকরণ-শ্রান্তি-স্তান্তি হরণ করিয়া জীবমণ্ডলীকে নূতন শক্তি ও নূতন স্মৃতি দান করিবার জন্য প্রবাহিত হইল। ধীরে ধীরে সুগু ও লুগু চেতন ধরণী-বক্ষে নবীন জীবনের সঞ্চার হইল।

উষা-সমাগমে কুম্বী খাঁও তৃণ-শয্যা হইতে উদ্ভিত হইয়া শিখা-সলিলে যাইয়া অজু করিয়া তৃণের উপর জায়নামাজ বিছাইয়া ফজরের নামাজ সম্পন্ন করতঃ মোনাজাত করিতে লাগিলেন। তিনি মোনাজাত করিলেন, “হে আল্লাহ্! হে দাতা ও দয়ালু পিতা! তুমি সকলকে আশীর্বাদ কর। হে প্রভু! তোমার করুণার শীতল ধারায় সকল প্রাণীকে অভিষিক্ত কর। হে প্রভু! তোমার করুণার শীতল ধারায় সকল পাণীকে অভিষিক্ত কর। হে প্রভু! তোমার ইচ্ছায় সকলই সম্ভবপর। তুমি পাহাড়কে দরিয়া এবং দরিয়াকে পাহাড় করিতে সমর্থ! হে করুণাময় স্বামী! তুমি কুম্বীকে মিলাইয়া দাও। হে প্রভু! আমাকে লজ্জা ও অপমান হইতে রক্ষা কর। তোমার দয়া এবং অনুগ্রহে সকলই সম্ভবপর।”—এইরূপে গভীরভাবে দীর্ঘকাল প্রার্থনা করিয়া কুম্বী খাঁ লোকজন-সহ গভীর বনের একটি ছুদ্র পখালকন করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হইতে কিগ্রহর সম্মুখে

একটি ঝিলের তীরে যাইয়া আনাহার সম্পন্ন করিলেন। আহারাণ্ডে যখন কুম্বী বা একটি বটবৃক্ষের শীতল ছায়ায় উপবেশন করিয়া আশ্রয় করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে একটি শৈথিল্যবাস পরিহিত নবীন বয়স্ক ফকিরও সেই সরোবর-তটে উপস্থিত হইয়া পানি পান করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

কুম্বী বা দেখিলেন, ফকির যেমনি তরুণবয়স্ক তেমনি সূত্রী ও খোশ্‌নমা চেহারা। তাঁহার নয়নের দৃষ্টি কোমল অথচ দৃঢ়তাব্যঞ্জক। সর্বাস্ত সুপাঠিত! তাঁহার চেহারা হইতে শটই বোকা যাইতেছে যে, তিনি নিতান্ত সজ্জাতবংশীয়। কৌতূহল এবং ব্লেহের বশবর্তী হইয়া কুম্বী বা লোক পাঠাইয়া সম্বানের সহিত যুবককে আহ্বান করিলেন। ফকীর ধীরপদবিক্ষেপে কুম্বী বা'র নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ফকীরের সালামের উত্তর দিয়া কুম্বী বা সবিনয়ে ফকিরকে নিজের গালিচার পার্শ্বে বসিতে দিলেন। কুম্বী বা বুঝিতে পারিলেন, যুবক নিতান্ত কৃধার্ত, সুতরাং নিজ হস্তে কুটী, হালুয়া এবং কল-মূল যাহা সঙ্গে ছিল, আহারের জন্য ফকিরের সম্মুখে প্রদান সহিত উপস্থিত করিলেন।

নবীন ফকির কুম্বী বা'কে ধন্যবাদ দান করতঃ সে-সমস্ত খাইয়া জঠরজ্বালা নিবারণপূর্বক পরিতৃপ্ত হইলেন। আহারাণ্ডে ফকির কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিবার পরে কুম্বী বা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা! আপনার নাম-ধাম জানতে ইচ্ছা হচ্ছে। আপনি এই তরুণ বয়সে বৈরাগ্যের বেকা পরিধান করেছেন কেন? আপনাকে দেখে বোধ হচ্ছে যে, আপনি সুপাঠিত এবং সজ্জাত যুবক। আপনার অঙ্গে এ বেশ কিছুতেই শোভা পাচ্ছে না।"

ফকির : আমি সংসার ছেড়ে ফকির হয়েছি। ফকিরের আর কি পরিচয় থাকবে? কোনও কামেল দরবেশের নিকটে শিষ্যত্ব গ্রহণের জন্য নানা স্থানে ঘুরে বেড়াচ্ছি। তবে দূরদৃষ্টক্রমে তেমন কোনও উপযুক্ত পীর জুটছে না।

কুম্বী বা : মুসলমানের পক্ষে সংসারাপ্রম ত্যাগ করা তো বিধেয় নহে। ইসলাম সন্ন্যাস বা বৈরাগ্যের ধর্ম নহে। ইসলামে সংসার আঁকড়িয়ে থেকেই ধর্ম লাভ করতে হয়। বরং বৈরাগ্য ও সন্ন্যাসমূলক ধর্মমতগুলি বিনাশ করবার জন্যই কর্মমূলক ইসলাম ধর্ম প্রচারিত হয়েছিল। মানুষ সংসারের জীব, সমাজের জীব, সুতরাং তাহাকে সংসারে ও সমাজে থেকেই ধর্মজীবন লাভ করতে হবে। দুঃখ, বিপদ ও প্রলোভনের মধ্যে তাকে অটল ও উন্নত থাকতে হবে। ষোদাকে মঙ্গলময় করুণাময় বলে বিশ্বাস করে ধর্মানুষ্ঠানে চরিত্রকে নির্মল, কঠিকে মার্জিত, বিবেককে পরিতৃপ্ত এবং হৃদয়কে উদার করতে হবে।

ফকির : আপনি যথার্থ বলেছেন। মহামানব হজরত মোহাম্মদ (দঃ) শটই সন্ন্যাস আশ্রমকে অগ্রাহ্য করেছেন। তিনি মুক্তকণ্ঠে বলেছেন, "লা বহ্বানিয়াতা

কিন্তু ইসলাম” —অর্থাৎ “ইসলামে সন্ধ্যাস নাই।” ভবে আমি যে ককির হয়েছি, তা কেবল কোনও কামেল দরবেশকে লাভ করবার জন্য এবং কিছুদিন দেশ-বিদেশ পরিভ্রমণপূর্বক পাহাড়-পর্বত বন-জঙ্গল নদী-নালা শহর-বাজার দেখে আত্মহতালার কুদ্রত উপলব্ধি ও নয়ন-মনের তৃপ্তি সাধনার্থ।

ক্রমী বা : আপনার উদ্দেশ্য সাধু ও মহৎ। ভূতভাবন করুণানিদান আত্মাহ আপনায় সহায় হউন।

ফকির : এক্ষণে আপনার পরিচয় লাভ করলে সুখী হব।

ক্রমী বা : আমি একজন শিকারী। বনে আমাদের একটি লোক হারিয়ে গেছে; তাই তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।

ফকির : আমি পরিচয় দেই নাই বলেই, আপনিও কি পরিচয় দিবেন না? আপনাকে দেখে তো একজন সজ্জাত সর্দার বলেই বোধ হচ্ছে।

ক্রমী বা : বাবা! আপনার অনুমান মিথ্যা নহে। আমি একজন সর্দারই বটে! আমার নিবাস চিতোরে।

ফকির : ঠিক কথা! আপনাকে মহানুভব সেনাপতি ক্রমী বা বলেই বোধ হচ্ছে!

ক্রমী বা হঠাৎ ফকিরের মুখে নিজের পরিচয়-প্রাণ হইয়া চমকিত হইয়া উঠিলেন। কণকালের জন্য তিনি স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন। অতঃপর বলিলেন : আপনার অনুমান যথার্থ।

ফকির : আপনি এত দূরে গজরাটের এলাকায় এই বনে ঘুরছেন কিসের জন্য?

ক্রমী বা আর কিছু গোপন করা সম্ভব নহে মনে করিয়া বলিলেন : বাবা! আমি বড় পেরেশান আছি। চিতোর-রাজকুমারী কুম্বিনীবাই তাঁর স্বামী জয়পুর-রাজকুমার অরুণ সিংহের সাথে জয়পুরে যাচ্ছিলেন। পথে শিপ্রা নদীর তটে শিকারের জন্য তাহু খাটান হয়। হঠাৎ এক রাত্রিতে ভূমূল ঝড়-বৃষ্টি হয়ে নদী উচ্ছলিত হয়। আমাদের অনেক লোকজন এবং জিনিসপত্র ডাসিয়ে নিয়ে যায়। সেই সঙ্গে কুম্বিনীবাইও ভেসে যায়। পরে বহু অনুসন্ধানেও কোনও খোঁজ-খবর পাওয়া যায় না। রাজকুমার হতাশ হয়ে দেশে ফিরেছেন। কিন্তু আমি এখনও তাঁর অনুসন্ধানে শিপ্রার তটে তটে বনে বনে পরিভ্রমণ করছি।”

এতটুকু শুনিতে শুনিতেই ফকির, “আহ!” শব্দ উচ্চারণপূর্বক মূর্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। ক্রমী বা এবং তাঁহার অনুচরগণ শীতল জল সিঁকান এবং বাহু-ব্যঞ্জন করিয়া ফকিরের মূর্ছা ভঙ্গ করিলেন।

ক্রমী বা বলিলেন : আপনি আশ্বস্ত হউন। রাজকুমারী জলমগ্ন হয়ে মরেন

নাই। তা হলে তাঁর লাশ পাওয়া যেত।

ফকির অতি কষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া কৃত্রিম বিশ্বয়ের সহিত বলিলেন, “তা’ হোক, আমার সহিত রাজকুমারীর কি সম্পর্ক? আমার মৃগী রোগ আছে। মধ্যে মধ্যে হঠাৎ মূর্ছা ঘাই।”

কুমী খাঁ বলিলেন : কুমার। আর আত্মগোপন নিশ্চয়োজন। আপনি শাহজাদা নূরউদ্দীন! আমার অপরাধ মার্জনা করুন। আমি শৈশবে আপনাকে দেখেছিলাম, কাজেই এত দীর্ঘকাল পরে এইরূপ ফকিরের বেশে দেখে সহসা চিনতে না পারলেও মনে মনে সন্দেহ ছিল।

এই বলিয়া কুমী খাঁ ফকিরবেশী শাহজাদা নূরউদ্দীনকে বুকের ভিতরে টানিয়া লইলেন। কুমারও, কুমী খাঁর বন্ধসংলগ্ন হইয়া অজস্র অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। এই করুণ দৃশ্যে সকলের চিত্ত অত্যন্ত ব্যথিত এবং সন্তোষ হইয়া উঠিল। কুমী খাঁ নানাবিধ প্রবোধবাক্যে কুমারকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। রাজকুমারীর বিতর্ক প্রেমের একনিষ্ঠ সাধনার কথা ভুলিয়া বলিলেন : “সেই দুর্ভোগময়ী রজনীতে অকর্ণ সিংহের কবল হতে আত্মরক্ষার জন্য কুমারীর পক্ষে পলায়ন করাও অসম্ভব নহে। সুতরাং কল্পিনীর সম্বন্ধে মৃত্যুর ধারণা করা কদাপি সম্ভব নহে। আমার প্রবল বিশ্বাস, কুমারী জীবিতা আছেন—নিশ্চয়ই জীবিতা আছেন।”

নূরউদ্দীন বলিলেন : “হায় সেনাপতি! কল্পিনীর জন্য আমার উপর দিয়ে যে কি বিপদের ঝঞ্ঝাই প্রবাহিত হচ্ছে, তা’ ভাষায় প্রকাশ করবার ক্ষমতা নাই। পিতা আমাকে কঠোর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন। সুলতান আহমদ শাহের কন্যাকে বিবাহ করতে অস্বীকৃত হওয়ার কঠোর নির্ধাতন করেছেন। আমার শরীর-মন ভেঙ্গে পড়েছে। মাতা দয়াপরবশ হয়ে নিজের মস্তকে রাজদণ্ড ও রাজরোধের দায়িত্ব নিয়ে আমাকে কারামুক্ত করে দিয়েছেন। আমি কল্পিনীর শোকে দিগন্তানা বনে গিয়েছি। হৃদয়ের কণায় কণায় কি তীব্র দাহন। অন্তরের অন্তরে কি তীব্র আকর্ষণ! মৃত্যুর পরপারেও বোধহয় এর উপশম নাই।

সেনাপতি বলিলেন : রাজকুমারীর অবস্থাও তথৈবচ। তিনিও আপনার প্রেমে উন্মাদিনী কাঙ্গালিনী। জয়পুরে এবং চিত্তোরে তাঁর প্রতি বহু অত্যাচার ও উৎপীড়ন হয়েছে। অকর্ণসিংহের প্রতি অনুরক্ত করবার জন্য কত হোম, কত পূজা, কত গীতবাদ্য, কাম-উত্তেজক ঔষধ, কত মদ্য-তদ্ব, কত কাণ্ডকারখানা, কত কারসাজি যে করা হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু ধন্য রাজকুমারীর একনিষ্ঠ প্রেমের সাধনা! কিছুতেই আপনার প্রতি প্রেমের তপস্বী হতে বিন্দু পরিমাণেও কেউ তাঁকে বিচলিত করতে পারে নাই। তাঁর একনিষ্ঠ প্রেমের কথা

চিত্তের এবং জয়পুরের ঘরে ঘরে কীর্তিত হচ্ছে। তিনি পুণ্যশীলা তপস্বিনী। তাঁর একনিষ্ঠ ধৈর্য এবং ত্যাগ সর্বতোভাবে কীর্তনীয়। খোদা তাঁকে ব্রহ্ম করুন!

কুমার : আমরা না-জেনে-ওনে যে-প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, এক্ষণে তারই কঠোর ফলভোগ করছি। রাজকুমারী যদি অরুণসিংহকে স্বামিভূত্ব বরণ করে নিয়ে দাম্পত্য-ধর্মে মন দিচ্ছেন, তা হলে হতভাগাকে আর দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হত না। তাঁর একনিষ্ঠতা এবং ব্রতপরায়ণতা দেখে আমিও তাঁকেই একমাত্র কাম্য করে তুলেছি। কিন্তু হায়! আমাদের কামনা, আমাদের ব্রত সমস্তই বিফল হল। হায়! আর একবার যদি রুক্মিণীকে দেখেও মরতে পারতাম, তা হলেও শান্তিলাভ হতো। এ দৃষ্টি-হৃদয় শীতল হতো! তাঁর পুণ্য-দৃষ্টিতে এ দৃষ্টি জীবন-কমলও প্রস্ফুটিত হতো।

অতঃপর সেনাপতি রুমী খাঁ কুমারকে নানা আশায় আশ্বস্ত এবং মধুর কথায় প্রশান্ত করিয়া কুমারী রুক্মিণীর অনুসন্ধানের জন্য শিখাতটে বনে বনে গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

পুণ্যাবতার শ্রীরামচন্দ্র, পঞ্চবটি বনে আদর্শ সতী নারীকুলসন্তমা সীতা দেবীকে হারাইয়া যেরূপ আকুল অন্তরে তন্ন তন্ন করিয়া তাঁহার অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, শাহজাদা এবং রুমী খাঁ, উভয়ে মিলিয়া সেইরূপে শ্রীমতী রুক্মিণীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

বোড়শ পরিচ্ছেদ

ঠাকুর সর্বানন্দ স্বামী রূপসীকুলরানী রুক্মিণীকে মহামায়ার নিকট বলি দিবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া পঞ্চ শিষ্যকে ডাকিয়া তাহাদিগের নিকট স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন।

সর্বানন্দ স্বামী অত্যন্ত উগ্র ও কোপনস্বভাব ছিলেন। শিষ্যেরা তাঁহাকে ব্যাঘ্রের ন্যায় ভয় করিত। মুকুন্দ ও অক্ষয় অযোধ্যাবাসী এবং পরম্পর আত্মীয় ছিল বলিয়া তাহাদের বিশেষ বন্ধুতা ছিল। গণপৎ ও মুখলকর উভয়েই মারাঠী; এজন্য তাহারাও পরম্পর বন্ধু ছিল। পঞ্চ শিষ্য দেবকীনন্দন বাহালী ছিল। সকলের সহিতই তাহার সম্বন্ধ ছিল। তবে সে কোনও দলভুক্ত ছিল না। সন্ন্যাসীর প্রস্তাব শুনিয়া দেবকীনন্দন ব্যতীত আর সকলেই শিহরিয়া উঠিল। হরকুমার বলিল, “পরে যদি এ ঘটনা প্রকাশ পায়, তা হলে বিলাসপুরের ফৌজদার প্রাণদণ্ড করবেন।”

সন্ন্যাসী : তোমরা না বললে কোনও জনপ্রাণীই এ বলির সম্বন্ধে বিন্দু-বিসর্গও জানতে পারবে না। এই নিবিড় বনে কিম্বদন্তি রাস্তায় কি ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, অন্যে তা কেমন করে জানবে?

শিষ্যপন : তা তো ঠিক! এক্ষণে আপনার ইচ্ছা তবে পূর্ণ হোক।

মুকুন্দ বলিল : তাঁকে শিষ্যা করে ডামর বা ভৈরবী মস্ত্রে দীক্ষা দিলেই তো ভালো হতো।

সন্ন্যাসী : তোর ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি কি আমার চেয়ে বেশী? এই অসাধারণ সুন্দরীর রূপের ফাঁদে মানুষ তো তুমি কখনো, দেবতাদিগকেও পতিত হয়ে হাবুড়বু খেতে হবে। একে বলি না দিলে, প্রায়শ্চিত্তের জন্য শেষে সকলকেই বলি হতে হবে। মহামায়াকে এই সুন্দর মহাজীবনের বলি হতে বঞ্চিত করলে তাঁর ক্রোধ হতে বাঁচবার কোনও উপায় থাকবে না। মহামায়া তার রক্ত পানাকাজ্জকায় অধীর হয়েছেন। আজ কয়েক রাত্রি হতে গভীর নিশীথে আমি গুনতে পাচ্ছি যে, “মায় ভূবা হোঁ”, “মায় ভূবা হোঁ।” সুতরাং কৃষ্ণিনীকে বলিদান ব্যতীত আর অন্য উপায় নাই।

গুরুর দৃঢ়তা এবং ক্রোধ দেখিয়া আর কেহ কোনও আপত্তি না করিয়া সকলেই একবাক্যে সম্মতি জ্ঞাপন করিল। সর্বানন্দ স্বামী শিষ্যদিগকে বিশেষ সাবধান করিয়া দিলেন যে, কৃষ্ণিনী যেন ঘুণাকরেও কিছু টের না পায়।

বলির এখনও তিনদিন বাকী আছে। দেবকীনন্দন গুরুর প্রস্তাবে একেবারে অধীর হইয়া উঠিল। সে ভাবিল, ‘রমণীকে বলিদান কিছুতেই বৈধ নহে, কিন্তু কি আশ্চর্য! সর্বানন্দ স্বামী এই নির্দোষ পরমা সুন্দরী যুবতীকে কোন প্রাণে বলি দিতে উদ্যত হইলেন! এমন অপূর্ব সুন্দরী, এমন রমণীয় এবং কমণীয় নারীদেহে মহাপাষণ্ডও অগ্নাঘাত করিতে সমর্থ হইবে না। এইরূপ নারী বলিদানে যদি ধর্ম হয়, তাহা হইলে অধর্ম আর কি আছে? যাহা হউক, এই নারীকে বাঁচাইতে হইবে। তাহাতে যদি অধর্ম হয়, হউক। গুরুর কোপানলে পড়িতে হয়, পড়িব। দেহে প্রাণ থাকিতে রমণীকে বাঁচাইতেই হইবে।’ মনে মনে এইরূপ সংকল্প করিয়া আকাশ-পাতাল অনেক চিন্তা করিল। একাকী কিরূপে সকলের হাত হইতে রমণীকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে, তাহার কোনও পন্থা নির্ণয় করিতে সমর্থ হইল না। অনেক চিন্তা করিয়া দেখিল যে, আর দুই একটি সতীর্থকে মতে আনিতে না পারিলে, রমণীকে উদ্ধার করা অসম্ভব। সুতরাং দেবকীনন্দন অনেক ভাবিনা-চিন্তিনা মুকুন্দলালকে নিভৃতে ডাকিয়া অনেক বুঝাইল।

মুকুন্দলাল দেবকীনন্দনের কথা শুনিয়া বলিল যে, কাজটি যে নিতান্ত নিষ্ঠুর ও পৈশাচিক সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু গুরুদেবের বিক্রমচরণ করিতে

তাহার সাহস হয় না। গুরুদেবের অজ্ঞাতসারে যদি কল্পিনীকে কোনওরূপে কৌশলক্রমে সরান যায়; তাহা হইলে তাহাতে তাহার মত আছে।

দেবকীনন্দন অত্যন্ত সতর্কভাবে কল্পিনীর সহিত দেখা করিয়া সন্ন্যাসীর ভীষণ সংকল্পের কথা অভিব্যক্ত করিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, কল্পিনী কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিল না। যে সন্ন্যাসী তাহাকে এত ভালোবাসেন এবং যত্ন করেন, তিনি যে তাহাকে দেবীর কাছে বলি দিবেন, তাহা কিছুতেই সে প্রত্যয় করিল না। কিন্তু দেবকীনন্দন যখন পুনঃ পুনঃ প্রতিজ্ঞা করিয়া দৃঢ়তার সহিত বলির কথা বলিতে লাগিল, তখনও বিন্দুমাত্র উদ্বেগ প্রকাশ না করিয়া বলিল : দেবকী! ভাই, যদি সন্ন্যাসী ঠাকুর আমাকে সত্য সত্যই মহামায়ার সম্মুখে বলিদান করেন, তা' আমার সম্ভোগ ও জ্বালাময় জীবনের পক্ষে এক পরম শাস্তির কারণ হবে। আহা! এ হৃদয়ে যে ভীষণ অগ্নি প্রজ্বলিত হচ্ছে, তা' যদি তুমি বুঝতে, তা হলে আমার বলির সম্বন্ধে বিচলিত না হয়ে সুখী ও সন্তুষ্টই হতে। আমরা অক্ষুরন্ত দুঃখের কথা বলবার নয়। আমার দঙ্ক-জীবন জুড়াবার স্থান বসুধায় নাই। সুতরাং, প্রিয় ভ্রাতঃ! এমন হতভাগিনীর মৃত্যুর পথে কষ্টক না হয়ে তার সহায় হলেই পুণ্যলাভ হবে।

দেবকীনন্দন কল্পিনীর কথা শুনিয়া বিস্মিত এবং স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। বুঝিতে পারিল যে, কল্পিনী অত্যন্ত দুঃখিনী—একান্ত বিরহিণী এবং শোকানলে বিদম্বা! কল্পিনীর জীবন গভীর রহস্যে পরিপূর্ণ; কল্পিনী নিজের যে পরিচয় দিয়াছে তাহা যথার্থ নহে। এই রমণী নিশ্চয়ই অভিজাতবংশীয়া। সামান্য-কুলোদ্ভব নারীতে এত সৌন্দর্য, এত সাহস, এত ধীরতা, এত গাভীর কিছুতেই সম্ভব নহে। কিন্তু হায়! সন্ন্যাসীর খ হইতে ইহাকে বাঁচান অসম্ভব। নিজের জীবনের প্রতি যে এত নির্ভর, তাহাকে রক্ষা করা কঠিন। এই রূপ চিন্তা করিয়া দেবকীনন্দন নিতান্ত হতাশ হইয়া পড়িল।

সকলপ পরিচ্ছেদ

গভীর অন্ধকার রাত্রি। তারাদল স্বকম্বু করিয়া জ্বলিতেছিল। কিন্তু সহসা মেঘসন্ধারে তাহাও ছুবিয়া গেল। দুইদিকে গভীর বন। মধ্য দিয়া একটি পথ সীমান্তের ন্যায় সরলভাবে চলিয়া গিয়াছে। অদ্য প্রত্যুষে একটি ভীল-সর্দারের কাছে শুনিতে পাইয়াছিলেন যে, মহামায়ার মন্দিরে একটি পরমা সুন্দরী যুবতী সন্ন্যাসিনীর আপমন হইয়াছে; তাই সেনাপতি কুম্বী খাঁ এবং কুমার নূরউদ্দীন

সঙ্গের লোকজন লইয়া দ্রুতপদে অগ্রসর হইতেছেন। একটি ভীল যুবক তাঁহাদের পথপ্রদর্শক-রূপে সেই অন্ধকারের মধ্যে মশাল জ্বালাইয়া অগ্নে অগ্নে চলিয়াছে। পদব্রজে পরিভ্রমণ করার সকলেই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। বিশ্রাম করা নিতান্ত প্রয়োজন হইলেও আজ কুমার নূরউদ্দীন এবং কুম্মী খাঁর মন যেন মহামায়ার মন্দির পানে সবলে আকৃষ্ট হইতেছে। সেখানে গেলেই যেন কুম্মীগীকে পাওয়া যাইবে, মনের ভিতরে এই আশা ধুকধুক করিতেছে। বীরপুত্রব কুম্মী খাঁ এবং কুমার-নূরউদ্দীন এত দ্রুত চলিয়াছেন যে, সঙ্গের লোক বহু কষ্টেও তাঁহাদের সঙ্গ রক্ষা করিতে পারিতেছে না। রাত্রি যতই বেশী হইতে লাগিল, ততই যেন কি এক অজ্ঞাত বিপদের আশঙ্কায় নূরউদ্দীনের হৃদয় আকুল হইতে লাগিল। উদ্বেগে এবং আশঙ্কায় নূরউদ্দীন ক্রমাগতই বলিতে লাগিল, “আর কত দূরে? আর কত দূরে?”

পথপ্রদর্শক ভীল বলিতে লাগিল, “আর বেশী দূর নয়।”

রাত্রি প্রায় ত্রিপ্রহর, এমন সময় দূরে হতাশের আশার ন্যায় প্রদীপরাশি দেখা গেল। ভীল-যুবক আনন্দে এবং সোৎসাহে বলিয়া উঠিল, “ঐ যে মন্দির দেখা যাচ্ছে।”

আলোক দর্শন করিয়া নূরউদ্দীন এবং কুম্মী খাঁর নৈরাশ্যের অন্ধমতসাজন হৃদয়ে পুলকের সঞ্চার হইল! বন্ধের স্পন্দন দ্রুত হইতে দ্রুততর হইল। পা যেন উড়িয়া চলিল। দেখিতে দেখিতে তাঁহারা নক্ষত্রবেগে মন্দির-প্রাঙ্গণের নিকটবর্তী হইলেন। নিকটবর্তী হইয়া তাঁহারা যাহা দেখিলেন, তাহাতে প্রথমতঃ চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। সুতরাং ভাল করিয়া দুই হাতে দুই চক্ষু মুছিয়া আবার নিপুণভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু হায়! হায় খোদা। একি ভীষণ নৃশংস কাণ্ড! রক্তবস্ত্রপরিহিতা রক্তভিলকভূষিতা একটি রমণীকে মহামায়ার সম্মুখে বলি দিবার জন্য বৃপকাঠের মধ্যে গলা আটটকাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কাপালিক সন্ন্যাসী মালকোঁচা মারিয়া ভীষণ ঋ উর্ধ্বে উত্তোলন করতঃ শ্রীবাচ্ছদনে উদ্যত। হায়! এক মুহূর্তের মধ্যেই সমস্ত শেষ হইবে। সর্বনাশ! মহাসর্বনাশ! হায়! কুম্মীগীকে পাইয়াও বুঝি পাওয়া গেল না।

কুম্মী খাঁ ভীষণ চীৎকার করিয়া উন্মত্ত শার্দূলের ন্যায় অসিহস্তে সন্ন্যাসীর উপর সহসা লাকাইয়া পড়িলেন। সন্ন্যাসী বিকট চীৎকার করিয়া ভয়ে মূর্ছিত হইয়া ভূপতিত হইল। হাতের খখানি খন্ খন্ করিয়া একখণ্ড প্রস্তরের উপর পতিত হইল। শিষ্যগণও ভয়ে কে কোথায় পলায়ন করিল! একজন সৈনিক দেবকীনন্দন এবং মুকুম্বকে ধরিয়া ফেলিল।

নূরউদ্দীন কুম্মীগীকে বৃপকাঠ হইতে মুক্ত করিয়া প্রাঙ্গণের উচ্চাসে বৃকে চাপিয়া

ধরিলেন। তাঁহার নয়নদয় হইতে অশ্রুর বান ডাকিল। কৃষ্ণিণীও প্রাণকাতকে মৃত্যুর মধ্যে অচিন্তের রূপে জীবনরূপে প্রাপ্ত হইয়া অবিরাম কান্দিতে লাগিল। সে ক্রন্দনে উত্তরের চোখে যেন গঙ্গা-বমুনীর ধারা বহিতে লাগিল। লঙ্কার পতিত আদি পিতা আদম বহু অনুসন্ধানে জেদায় হাওয়া মাতাকে পাইয়া বোধহয় এইরূপ করিয়াই ক্রন্দন করিয়াছিলেন। সে ক্রন্দনের সুরে কত যুগ-যুগান্তের, কত অতীত স্মৃতির, কত পুরাতন গাছের, উদাস ককণ সুরের রাগিণী বাজিতে লাগিল! সে রাগিণী—ঝঙ্কারে কত সুখ, কত আনন্দ, কত সখিলন, কত আশা ও কত ভাষার মূর্ছনা জাগিয়া উঠিল। সেই নিস্তরু আমারজনীতে ক্রন্দনের সুরে বিশ্বের বৃকে বৃকে, আকাশের কক্ষে কক্ষে, তারকামালার বন্ধে বন্ধে, ফুটন্ত ফুলের সুরভি নিঃশ্বাসে, পত্রের মর্মগাথায়, নদ-নদীর কলতানে, কি যেন এক অব্যক্ত প্রেমের সঞ্জীবনী মাদকতা ছড়াইয়া দিল।

সে মাদকতায় চৌদিকে কেবল প্রাণের তন্ত্রীগুলিই ঝঙ্কত হইয়া উঠিল। সে ক্রন্দনের অশ্রুধারায় শাস্তির শীথল ধারাই যেন বর্ষিত হইতেছিল। নূরউদ্দীন এবং কৃষ্ণিণীর সে-ক্রন্দনে কুম্বী খাঁ এবং তৎসঙ্গীয় লোকজন সকলেরই চোব হলহল করিতে লাগিল। কুম্বী খাঁ বন্দী সন্ন্যাসীর শিরশ্ছেদনে উদ্যত হইলে, কৃষ্ণিণী তাঁহাকে মার্জনা করিবার জন্য অনুরোধ করিল। প্রাণঘাতক নৃশংস-স্বভাব দস্যুর প্রাণভিন্কার প্রার্থনা শুনিয়া সকলেই বিস্মিত ও বিরক্ত হইল।

কুম্বী খাঁ বলিলেন : রাজকুমারী, মাফ করুন। এমন পাষণ্ড দস্যুকে কমা করলে মহাপাতকে পতিত হতে হবে।

কৃষ্ণিণী : ইনি দস্যু নহেন, সন্ন্যাসী। অধিকন্তু আমার প্রাণদাতা। জীবনুত, লুণ্ঠচৈতন্য অবস্থায় আমাকে নদী হতে উত্তোলন করে বহু কষ্টে সেবা করে রক্ষা করেছেন। আমাকে কন্যার ন্যায় ভালোবেসেছেন। আমার সুখ-স্বাস্থ্যের জন্য যতদূর সম্ভব যত্ন করেছেন। আমাকে বাটী পহুঁছিয়ে দিবার জন্য পীড়াপীড়ি করছিলেন; কিন্তু আমি কিছুতেই সম্মত হই নাই। অবশ্য সন্ন্যাসীকে আমার যথার্থ পরিচয় দিয়েছিলাম না। আমার সমস্ত অভিশপ্ত জীবনের দীর্ঘ দিনগুলি এই আশ্রমের শান্ত-শীতল ছায়ায় কাটাতে ইচ্ছুক ছিলাম। মহামায়ার পূজার কুল তুলে, দেবমন্দির ধৌত করে এবং অবশিষ্ট সময় শাস্ত্রালোচনা করে দিন যাপন করছিলাম। সন্ন্যাসীর যত্নে এখানে আমার কোনও ক্রেশ ও দুঃখ ছিল না। সন্ন্যাসী যে পরে আমাকে মহামায়ার সম্মুখে বলি দিতে উদ্যত হয়েছিলেন, তা শক্রতা বা অসদুদ্দেশ্যে নয়। সন্ন্যাসী ঘোর কাপালিক। নরবলি দেওয়া মহাপুণ্য কার্য বলে এঁদের বিশ্বাস। সেই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়েই মহাপুণ্য লাভের আকাঙ্ক্ষায় অধীর হয়ে আমাকে বলি দিতে উদ্যত হয়েছিলেন। বলির পরে

আমার মেহে আসীন হয়ে শব-সাধনা করবার সংকল্প ছিল। বামাচারী তান্ত্রিক সন্ন্যাসীদের পক্ষে এই শব-সাধনাই হচ্ছে চরম সাধনা। এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলে ডাকিনী, নাগিনী এবং প্রেতিনীর উপর অধিকার লাভ হয়। সন্ন্যাসী ঠাকুর এই ধর্মবিশ্বাসের বশীভূত হয়েই বলিদানে উদ্যত হয়েছিলেন। আমি এটা পূর্বে জানতে পেরেও আত্মবিকার কোনও চেষ্টা করি নাই। বলির সময়ও আমি আকার-ইচ্ছিতে কোনও অনিচ্ছা প্রকাশ করি নাই।

কুমী বা : এত কঠিন প্রাণ হবার কারণ কি? কুমার নূরউদ্দীনের কথা তখন কি ভুলে গিয়েছিলেন?

কুমারী : সেনাপতে! নূরউদ্দীনের কারাদণ্ড হতে মুক্তিলাভের জন্যই আত্মবিকারে সম্মত ছিলাম। আমার মৃত্যুসংবাদ ঘোষিত হলে কুমার মুক্তিলাভ করতেন!

কুমী বা : খোদা যা' করেন, তা ভালোর জন্যই। আজ আমাদের মনও অভ্যস্ত চঞ্চল এবং উদ্বিগ্ন ছিল। ভীল-সর্দারের কাছে 'একটি যুবতী রমণীকে মহামায়ার মন্দিরে দেখেছি'—এই কথা মাত্র শুনেই আমরা বেন উন্মত্ত ও অধীর হয়ে পড়লাম। যতই নিকটবর্তী হচ্ছিলাম, ততই বেন চৌকক আকর্ষণে আমরা আকৃষ্ট হচ্ছিলাম। এখন বুঝেছি, আত্মার তীব্র আকর্ষণই আপনাদের উভয়কে এবং তৎসঙ্গে এ অধমকেও বন্ধা করেছে। আপনার বলি হলে কুমারও প্রাণ ত্যাগ করতেন। আর আপনাদের উভয়ের এই ভীষণ পরিণামে আমিও শোক-বাণবিক্ত হয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে পড়তাম। খোদা জানেন, আপনার অনুসন্ধানের জন্য আমি কি ভীষণ কষ্টই স্বীকার করেছি। আজ প্রায় দুই মাস কাল আমি অনিদ্রায় অনাহারে, অন্ধকারে বনে বনে, পাহাড়ে পাহাড়ে, শিখার কূলে কূলে, গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করেছি। খোদাতালাকে হাজার ধন্যবাদ যে, আজ আমার শ্রম সার্থক হয়েছে। আজ আপনাদের সুখ-সন্মিলন দেখে নিজেকে ধন্য মনে করছি।

কুমারী : আমি যে ডুবে মরি নাই, তা কিরূপে জানতে পেরেছিলেন?

কুমী বা : সে শুধু আমার ধারণা। আপনি ডুবে মরেছেন এটা কখনও মন বিশ্বাস করত না। শুধু মনের ধারণার উপর নির্ভর করেই খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম।

অতঃপর দস্তরমত পাহারার বন্দোবস্ত করিয়া, সকলে সেই মন্দির-সংলগ্ন গৃহেই রাত্রিযাপন করিতে উদ্যত হইলেন।

কুমী বা, কুমারীর অনুরোধে সন্ন্যাসীর প্রাণদণ্ড রহিত করিলেন। কিন্তু মন্দিরস্থ মহামায়ার মূর্তিটি দগাঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া উদ্দেশ্যে ঘোষণা করিলেন, "ওয়াজা আলহাকো ওয়া জাহকাল বাতিলু ইন্না লু বাতিলু কানা জাহকা"— অর্থাৎ সত্যের প্রতিষ্ঠা হইল এবং মিথ্যা লোপ পাইল। (মহা কোরআন)

মূর্তি চূর্ণ করার সেনাপতির কোনও বিপদ ঘটিল না দেখিয়া সন্ন্যাসী সর্বানন্দ স্বামীর জীবনব্যাপী ভ্রম দূর হইল। তাহার ধর্ম সম্বন্ধে মানা সম্বন্ধে উপস্থিত হইল। সমস্ত রাত্রি সে ধর্ম সম্বন্ধে নানা চিন্তা করিয়া কাটাইল। পরদিন প্রত্যুষে সন্ন্যাসী অনুভব চিন্তে “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহম্মদুর রসূলুল্লাহ” পাঠ করিয়া সেনাপতি সাহেবের হস্তে ইসলামে দীক্ষিত হইলেন।

সন্ন্যাসীর ইসলাম গ্রহণে শিষ্যগণও মুসলমান ধর্ম অবলম্বন করিল। মহামায়ার মূর্তি চূর্ণ হওয়ায় কত শত মানব-প্রাণ যে পৈশাচিক হত্যা হইতে বাঁচিয়া গেল, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

সুদীর্ঘ বিরহের পরে মিলনের সুখে কুমার-কুমারীর হৃদয় উদ্ভাসিত! দুই হৃদয়ের প্রেমের জোয়ার তরঙ্গে উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে। দীর্ঘকালব্যাপী বিরহশীতের অবসানে বসন্ত সমুপস্থিত হইয়াছে। উভয়েই রাজ-সন্তান! কিন্তু উভয়েই আজি পথের ফকির। শত শত দাসদাসী যাহাদের সেবার জন্য ব্যস্ত থাকিত, আজ তাহাদের সেবার জন্য একটি লোকও বিদ্যমান নাই। মণিমুক্তাবিজড়িত কারুকার্যখচিত পোষাক-পরিচ্ছদ যাহাদের শরীরের শোভা বর্ষণ করিত, আজ সামান্য গৈরিক বাস কোনওরূপে তাহাদের দেহের নগ্নতা নিবারণ করিতেছে। কালের কি কুটিল ও বিচিত্র গতি! কালচক্রে মানুষ কোন মুহূর্তে কোন্ অবস্থায় পতিত হয়, তাহা চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়।

কুমার এবং কুমারীকে লোকালয়ে ফিরিবার জন্য কুম্বী ঝাঁ অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু উভয়েই অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। কুমার নূরউদ্দীন বলিলেন : “সেনাপতে! এ অবস্থায় দেশে ফিরলে পিতা হয় তো প্রাণদণ্ড করবেন। মাতা আমাকে নিজের দায়িত্বে গোপনে ষড়যন্ত্র করে কারাগারে হতে মুক্তি দিয়েছেন। জানি না, কারারক্ষক এবং মাতা কিরূপ রাজরোষেই বা পতিত হয়েছেন। সুলতান নিতান্তই দৃঢ়চেতা পুরুষ। রাজধানীর যাবতীয় নর-নারীর অনুরোধেও আমাকে কারামুক্ত করেন নাই। সুতরাং এক্ষণে আমি কুম্বীকে নিয়ে কোন্ সাহসে এবং কোন্ মুখে মালবে ফিরব! দেশের লোক আমাকে ‘প্রেম-পাগলা’ বলে ভাঙ্খিলোর ভাবে নিরীক্ষণ করে। সুতরাং দেশে ফেরা দূরের কথা, অন্য কোথাও লোকালয়ে বা জনসমাজে যাবারও প্রবৃত্তি নাই! মানুষ হৃদয়ের ব্যথা দেখে না! প্রেমের ধর্ম বোঝে না! মানুষ স্বার্থের দাস! জনসমাজের অশান্তিপূর্ণ কোলাহল অপেক্ষাবনের নিবিড় শান্তিই ভালো বোধ হয়। বনের পত-পক্ষী দেখলে আমার প্রাণে যে

আনন্দের সঞ্চার হয়, মানুষ দেখলে তা হয় না। কল্পিণীকে প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছিলাম। প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, তাকে ব্যতীত কাকেও বিবাহ করব না। সেও সেইরূপ প্রতিজ্ঞা করেছিল। ঘটনাচক্রে কল্পিণীর পিতা জ্বরদন্তী করে কল্পিণীকে অক্ষয়সিংহের সহিত বিবাহ দিলেন। কল্পিণী দুর্বলা নারী হয়ে অসহনীয় গল্পনা ও লাঞ্ছনা সহ্য করেও ধর্মের সম্মান রক্ষা করলেন। কল্পিণীর ব্রত পালনে অসাধারণ তাপসীদৃঢ়তা দেখে আমিও আর বিয়ে করব না বলে মত প্রকাশ করলাম। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার! তাতে আমি প্রশংসিত না হয়ে কেবল নিন্দিতই হলাম! আমি যে প্রতিশ্রুতি ভঙা না করে মনুষ্যত্ব ও ধর্মের সম্মান বজায় রাখলাম, একটি লোকও তা দেখল না। সেনাপতে! আগে বুঝি নাই যে, সংসারের লোক এত অন্ধ! এত মূর্খ! ধর্ম যে শুধু লৌকিকতায়, পূর্বে তা' বুঝি নাই। ধর্ম যে হৃদয়ের জিনিস, সত্যের জিনিস, দুনিয়ার লোক এখনও এ পরম ভঙ্গু বুঝতে পারে নাই! ত্যাগ স্বীকারে, স্বার্থ ত্যাগে, পরের বেদনা অনুভূতিতে, পরের চোখের জল মুছাতে, নিজেকে বিপদগ্রস্ত করে, এমন কি হাসি মুখে নিজের জীবনকে বলি দিয়ে অন্যকে রক্ষা করাতেই যে ধর্ম, এ ভঙ্গু এখনও জগতে কুহেলিকাঙ্কন হয়ে রয়েছে। সংসারে যত লোক ধর্ম ধর্ম করে ছুটাছুটি করছে; তাদের অধিকাংশই দেখছি স্বার্থলাভের জন্যই ধর্ম ধর্ম করে ধর্মের আড়ালে অধর্মের জাল পেতেছে। পান হতে চুন খসলেই এদের ধর্মবিশ্বাস উড়ে যায়। আমি এই জঘন্য ধর্ম চাই না। আমি সত্যিকার ধর্ম চাই—হৃদয়ের ধর্ম চাই। তাতে যদি সুখ না হয়ে কেবল দুঃখই হয়, তা-ই আমার কাম্য। সেই দুঃখেই আমার শান্তি। সেনাপতে! আমার ঐকান্তিক বাসনা যে, বনে-পর্বতে মুক্ত-বাতাসে মুক্ত-গগনের নীচে মুক্ত-হৃদয় লয়ে বাস করি। মুক্ত হৃদয়ের মুক্ত ভাবে জীবনের দিনগুলি কাটিয়ে দেই। ভগ্নমি এবং ছলনার বিবাক্ত বায়ু যেন জীবন-তরুকে স্পর্শও করতে না পারে!

নূরউদ্দীনের হৃদয়ের আকাজকা ও উদ্বেগজড়িত মহতী বাণী শ্রবণে কুমারী কল্পিণী বলিলেন : “সেনাপতে! শাহজাদার এবং আমার প্রাণের সুর ও স্বাক্ষর অবিকল একই ধরনের। লোকালয়ে লোকের বুদ্ধি-বিবেচনা এবং ধর্মচিন্তায় যে বিকৃত সঙ্কীর্ণ ও দূষিত পরিচয় পেয়েছি, তাতে বোধহয় বিজ্ঞান-বিপিনে-বিরলে বাসই বিলক্ষণ যুক্তিযুক্ত। মানুষের মনে মনে কেবল কুটিলতা এবং জটিলতা; কিন্তু বনের ফুলে ফুলে কেবল সরলতা এবং সরসতা। সমাজের লোকের কথায় কথায় কেবল স্বার্থের ছলনা, আর বনের পাখীর পাখায় পাখায় কেবল প্রেমের মূর্ছনা! বনের বৃক্ষছায়া কেমন শান্তিপ্রদ ও শীতল, আর সমসাজে লোকের আশ্রয় কত বিপদের অনল। বিশেষতঃ, লোক-বিচারে কলঙ্কিত ও আহমক আমাদের মত কোনও স্থানই নাই! আমার ইচ্ছা সন্ন্যাসীর বেশে নূরউদ্দীনের চরণ-সেবা

করতে করতে নিবিড়-বনের স্নিগ্ধ ও মৌন শ্যাম শোভা, সমুদ্রের চঞ্চল উদ্‌গম তরঙ্গলীলা, গিরিমালার মেঘ-কিরীটী তৃপ্ত-শূন্য, উপত্যকার শ্যামল-শাখলের কোমল দৃশ্য অবলোকন ও নিরীক্ষণ করে বিশ্বাপিতার বিশ্বধামের বিনোদ-বিপুল বিচিত্র সৌন্দর্য ও বৈভবের বিশদ ব্যক্তনায় নিমগ্ন হয়ে যাই! তাঁর প্রেম-সাগরের অমৃত পানে বিহ্বল হয়ে থাকি! সেনাপতি! আপনি জানেন, আপনি রাজকন্যা হলেও দাসকন্যা অপেক্ষাও হতভাগিনী! আমার প্রাণের প্রতি, হৃদয়ের প্রতি, আমার ধর্মের প্রতি যে অত্যাচার ও অবিচার অনুষ্ঠিত হয়েছে, আপনি তাও অবগত আছেন। যে কুমারের জন্য আমি উদাসিনী এবং বিরহিনী সেজেছি, আজ তাঁকে পেয়ে আর সংসারী সাজবার ইচ্ছা নাই। যাকে বনে পেয়েছি, তাঁকে নিয়ে বনে থাকতেই বাসনা। কিন্তু আশঙ্কা হচ্ছে যে, বোধহয় লোকে তাও থাকতে দিবে না!

সেনাপতি : শাহজাদা এবং রাজকুমারি! আপনারা যা বললেন, তা আপনাদের প্রেমপ্রবণ ভাবপূর্ণ হৃদয়ের পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু বনে বাস করতে হলে সংসার পেতে বাস করা কি অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং কষ্টকর হবে না? এখানে খাদ্যাদি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিই বা জুটেবে কোথা হতে?

কুমার : যে খোদা পাথরের মধ্যস্থ কীটকেও আহার দেন, তিনিই আমাদের আহার দিবেন। খোদা কি আমাদের জন্য বন্য ফল-মূলেরও ব্যবস্থা করবেন না?

কুমারী : অতঃপর আরও অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু রাজকুমার ও রাজকুমারী আপনাদের মত হইতে কিছুতেই বিচলিত হইলেন না। কুমারী অবশেষে বিলাসপুরের বিশাল কাননাভ্যন্তরে ক্ষুদ্র পাহাড়ের পাদমূলে একটি স্বচ্ছতোয়া সরোবর-কূলে রমণীয় এবং স্বাস্থ্যকর স্থানে একখানি মৃৎ-কুটির নির্মাণ, একটি সবজী ক্ষেত্রের আবাদ, একটি ফলের বাগানের পত্তন করাইয়া দিলেন। দুইটি ভীল যুবক ও একটি যুবতীকে ভৃত্যস্বরূপ রাখিয়া যথাসময়ে কুমার এবং কুমারীর নিকট হইতে অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

কুমারী : যাইবার সময় নিজের সঙ্গে যে টাকা ছিল, তাহা হইতে পাথের রাখিয়া অবশিষ্ট তিন শত মুদ্রা কুমার নূরউদ্দীনকে উপহার-স্বরূপ দান করিলেন।

সেনাপতি : তাহাদের অবস্থান-স্থান গোপন রাখিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। তিনি আপন হইতে অঙ্গীকার করিলেন যে, মধ্যো মধ্যো তিনি তাহাদের খবর লইবেন। কুমারী : পুত্রহারা জনকের হৃদয়, প্রতুলশূন্য ভৃত্যের মন, বন্ধুহারা বন্ধুর উদ্দেশ এবং স্মিতজ্ঞানবিসর্জন-বিরহের বিধুর চিন্তা লইয়া চিত্তোরে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

উপবিংশ পরিচ্ছেদ

বিলাসপুরের মনোহর কাননে নূরউদ্দীন ও কল্পিনী নির্জনে দাম্পত্য জীবন অভিবাহিত করিতে লাগিলেন। কুম্বী বা বিদায় লইবার পূর্বে কল্পিনীকে বিশ্বাসের পবিত্র কলেমা পড়াইয়া ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করতঃ যথারীতি 'ইজ্জাব-কবুল' লইয়া সঙ্গীয় অনুচরগণ সাফাতে উত্তরকে উছাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন। দীক্ষার সময় কল্পিনীর নাম পরিবর্তন করিয়া সখিনা রাখা হইয়াছিল। বিজ্ঞান বনে বিলাসিতার কোনও উপকরণ ছিল না এবং প্রয়োজনও ছিল না। সুত্তরাং পবিত্রচেতা দরবেশের ন্যায় দম্পতি যুগল ওদ্র-শান্ত, সহজ সরল জীবন-যাপন করিতে লাগিলেন।

কজরের নমাজের পরে নূরউদ্দীন ও কল্পিনী সরোবর-তটের ক্ষেত্রে যাইয়া বৃক্ষলতা গুল্মগুলির যত্ন লইতেন। কোনটির মূল খুঁড়িয়া দিতেন, কোনটির গোড়ায় পানি ঢালিতেন, কোনটির শাখা ছাঁটিয়া দিতেন। অল্পদিন মধ্যেই বাগানটি ফল-ফুলে সম্বিভ হইয়া রমণীয় শোভা ধারণ করিল। স্বহস্ত রোপিত বাগানের ফল-ফুল এবং শাক-সজীতে যে আনন্দ ও মিষ্টতা বোধ হইতে লাগিল, চিতোর এবং মালবের শাহী-বাগানের ফলমূলেও সে স্বাদ মিষ্টতা ছিল না। পূর্বে দাস-দাসীরাই তাঁহাদের সেবা করিত। এক গ্লাস পানিও তাঁহাদিগকে ঢালিয়া খাইতে হইত না। তাহাতেই সুখ বলিয়া তখন ধারণা ছিল। এক্ষণে বুদ্ধিতে পারিলেন যে, নিজের কাজ নিজের ইচ্ছায় নিজের হাতে করার কত সুখ, কত স্কৃতি! দুইটি ভীলকে কিছু জমি আবাদের কাজে প্রথম হইতেই নিযুক্ত করা হইয়াছিল। ক্রমশঃ তাহা হইতে যে শস্য উৎপন্ন হইতে লাগিল, তাহাই তাঁহাদের পক্ষে যথেষ্ট হইল।

সরোবরের নির্মল জলে নূরউদ্দীন ও কল্পিনী অবগাহন করিয়া স্নান করিতেন, সাঁতার কাটিতেন, কমল ফুল ছুলিলেন। কখনও কখনও জাল লইয়া মৎস্য ধরিতেন। তাহাতে কত আনন্দ! কত স্কৃতি! কত সুখ! রাজপুরীতে তাহা স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। প্রত্যহ বিকালে মাছের জন্য কিছু খাদ্য সরোবরের নির্দিষ্ট স্থানে নিক্ষেপ করিতেন। যথাসময়ে দলে দলে মৎস্য সেই স্থানে সমবেত হইয়া ধাবন-কূর্দন এবং উল্লঙ্ঘনে এক আনন্দবাজার বসাইতো। মাছের ক্রীড়া দেখিয়া নবীন-দম্পতি যে নবীন ও সরস আনন্দ লাভ করিতেন, রাজবাড়ীর বিশাল সরোবরে মাছের খেলা দেখিয়া সে আনন্দ লাভ কখনও অদৃষ্টে ঘটিয়া ওঠে নাই। ময়ূর

এবং ময়ূরীগুলি প্রতিদিন সকালে আশ্রমে আহ্বানের জন্য আগমন করিত, শস্যের দানা খাইয়া তাহারা আনন্দ প্রকাশ করিত। তাহাদিগকে ভালোবাসিতে বাসিতে তাহারা এমনই অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে, তৃষ্ণি দিলেই তাহারা বিচিত্র পুষ্প মেলিয়া নৃত্য করিত। সে নৃত্যের শোভা কত মনোলোভা! সরোবরতটের মখমলনিবন্ধিত উজ্জ্বল কোমল শ্যামল ঘাসের উপরে দলে দলে মধুর-ময়ূরী মোরগ-মুরগী ও কপোত-কপোতী বিচরণ করিয়া, ডাকিয়া ডাকিয়া আনন্দের হাট—শোভার বাজার খুলিয়া দিত, সরোবরের ঈষৎ কৃষ্ণাভ জলরাশি পবন-হিল্লোলে যখন ধৈ ধৈ করিয়া নাচিত, সে-নাচার সঙ্গে সঙ্গে নানা বস্তুর জলজ পুষ্পরাশি শোভা ছড়াইত, গন্ধ লুটাইত এবং নাচিয়া নাচিয়া গায়ে গায়ে ঢলাঢলি করিত। সে-শোভা দেখিয়া দম্পতি-হৃদয় মুগ্ধ হইত, চক্ষু ভ্ৰঙ হইত, আত্মা আনন্দ পাইত।

প্রভাতে মধুর কণ্ঠে পাখীর সুধামাধা ভানে, দম্পতিযুগল জাগিয়া উঠিয়া সরোবরপ্রান্ত ত্রিঙ্ক-সমীর সেবনে স্কৃতি লাভ করিতেন। অঞ্জু করিয়া জামাজ শেবে মধুর কণ্ঠে কোরআন পাঠ করিতেন। কোরআনের সেই মধুরস্বরে বনভূমি যেন পবিত্রতায় এবং সরসতায় ছাইয়া যাইত। ভীল যুবক-যুবতীরা অর্ধ না বুঝিলেও দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাহা শ্রবণ করিত! প্রভাত-রবির প্রথম রশ্মিজ্বাল যখন আশ্রমের উদ্যান, সরোবর এবং প্রান্তর লোহিত-বর্ণে রঞ্জিত করিয়া দিত, তখন পত্রাবলী এবং দুর্বাদলের শিশিরবিন্দুগুলি লক্ষ লক্ষ মুক্তাফলের ন্যায় দীপ্যমান হইয়া রমণীয় শোভা ধারণ করিত। বনজ ফুলের কোমল মধুর গন্ধ বহিয়া প্রভাত-পবন যখন সখিনার অঞ্চল উড়াইয়া বহিয়া যাইত, যখন তরুণ অরশিমা পাতে তাহার মুখখানি আরও রমণীয় হইয়া উঠিত, তখন নূরউদ্দীনের বুক গর্বে ফুলিয়া উঠিত। কল্পিত যখন বহুস্তরোপিত পুষ্প-বৃক্ষ হইতে ফুল চয়ন করিয়া মালা গাঁথিয়া নূরউদ্দীনের গলায় পরাইয়া দিত, তখন নূরউদ্দীনের চেহারায় নূর আরও জ্বলিয়া উঠিত। সে নূরের দীপনায় সখিনার হৃদয় আরও দীপ্ত হইয়া উঠিত। এইরূপ সুখ ও আনন্দের মধ্যে তৃষ্ণি ও প্রীতির সহিত উভয়ের মুক্ত-জীবনের ধারা অবাধ নির্ঝর ধারার ন্যায় প্রবাহিত হইতে লাগিল। লতা যেমন লতার গায়ে মিশিয়া জড়াইয়া জড়াইয়া আঁকড়াইয়া এক হইয়া বাড়িতে থাকে, নূরউদ্দীন ও সখিনার হৃদয় দুইটি তেমনি ভাবের কল্পনায়, রসের আচ্ছন্নায়, প্রেমের বন্ধনে, অন্তরের আকর্ষণে এক হইয়া গেল। দুই প্রাণের তারে একই ঝঙ্কার দুই হৃদয়ে ঝঙ্কত হইতে লাগিল। দুই হৃদয়-বাগে একই ভাবপুষ্প পুষ্পিত হইতে লাগিল। দুই হৃদয়-নদীতে একই চিন্তার ধারা প্রবাহিত হইল। দুইটি হৃদয় প্রভাতপঙ্কের ম্যায় নিতান্ত নির্মল। উভয় হৃদয়ে কেবল আনন্দ—কেবল রস—

কেবল পুখা ও শ্রীতির ধারা উছলিয়া বহিতে লাগিল । ক্রমশঃ আশ্রম বাসে যতই অভ্যস্ত হইতে লাগিলেন, ততই শাহজাদা ও রাজকুমারী রাজপুত্রীর কথা ভুলিতে লাগিলেন । রাজপুত্রীর জীবনযাত্রা ততই কুটিল আড়ম্বরপূর্ণ ও কৃত্রিম বলিয়া বোধ করিতে লাগিল । ক্রমশঃ আড়ম্বরপূর্ণ রাজপ্রাসাদ-বাসের প্রতি বিরক্ত এবং বনের নির্জন ও শান্ত-শীতল জীবনযাত্রার প্রতি শ্রদ্ধার ভাব জন্মাট বাঁধিয়া গেল ।

বিংশ পরিচ্ছেদ

জয়টপতি সুলতান আহমদ শাহ নিতান্ত শিকারপ্রিয় ছিলেন । প্রতি বৎসর বসন্তকালে বিপুল ঘটায় শিকারে বাহির হইতেন । আমরা যে বৎসরের ঘটনার কথা লিপিবদ্ধ করিতেছি, সে বৎসর তিনি বিলাসপুরের নিবিড় জঙ্গলে ব্যাঘ্র, গজর ও ভল্লুক শিকারে আগমন করিয়াছিলেন । তাঁহার ভেজবিনী কায়সরজাহাঁ বেগমও মৃগয়াপটু ছিলেন । তিনিও প্রতি বৎসর স্বামীর সঙ্গে মৃগয়ার্থে বহির্গত হইতেন । তীরন্দাজীতে তাঁহার বেশ হাতশশও ছিল । তাঁহার শানিত শায়কসন্ধানে শত শত স্বাপদ সদ্য সদ্য শমনসদনে প্রেরিত হইত ।

সুলতান শিকার করিতে করিতে নিবিড় বনে প্রবেশ করিলেন । বহু পরিশ্রমে তিনটি ভল্লুক ও দুইটি বৃহৎ ব্যাঘ্র বধ করিয়া তিনি নিতান্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন । শিবিরে প্রত্যাভর্তন করিবেন, এমন সময় একটি প্রকাণ্ড হরিণ দেখিয়া তাহার পশ্চাতে অশ্ব ধাবিত করিলেন । হরিণটি ক্রমশঃ অক্রমক্রম গতিতে অনেক দূরে যাইয়া নিবিড় বনের মধ্যভাগে প্রবেশ করিলে, সুলতানও সেই গভীর বনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন । সুলতান শায়ক সন্ধান করিয়াছেন, এমন সময় পার্শ্বদেশের কোপ হইতে একটি বিরাট ব্যাঘ্র সুলতানের অশ্বের মস্তকের উপর লাফাইয়া পড়িয়া কামড়াইয়া ধরিল । ঘোড়াটি ভীষণরূপে আক্রান্ত হইয়া উল্লঙ্ঘন করায় সুলতান সহসা ভূপতিত হইলেন । ঘোড়াটি ব্যাঘ্রের আক্রমণে মাটিতে পড়িয়া গেল । সুলতান মাটিতে পতিত হইয়া তরবারির ভীষণ আঘাতে ব্যাঘ্রটিকে নিহত করিবার উপক্রমে, বাঘিনীটাও সুলতানকে আক্রমণ করিল । বগলং ব্যাঘ্র-দম্পতি কর্তৃক আহমদ শাহ আক্রান্ত হওয়ার ওকলন্তরূপে জন্ম হইয়া পড়িলেন । ব্যাঘ্রটিকে নিহত করিবার জন্য চেষ্টা করিলেও মাত্র সে আহত হইল । আহমদ শাহের ঘোড়াটি আরব-জাত ছিল । সে জন্ম হইয়াও পলায়ন না করিয়া প্রসূর বিপদে উচ্চকণ্ঠে হিন্ হিন্ করিয়া ডাকিতে এবং ব্যাঘ্রটিকে পদাঘাত করিতে লাগিল । যেখানে এই ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল, সেই স্থান নূরউদ্দীনের আশ্রম

হইতে বেশী দূরে ছিল না। নূরউদ্দীন ঘটনা-স্থানের অদূরেই কাষ্ঠ সংগ্রহের জন্য একটি ভীল ভৃত্যকে লইয়া শুষ্ক বৃক্ষ ছেদন করিতেছিলেন। সহসা অচিন্তিত এবং অশ্রুতপূর্ব ভাবে ঘোড়ার আর্ত-কণ্ঠস্থর গুনিয়া কুঠার-হস্তে দ্রুতবেগে আওয়াজ লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইলেন। উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তিনি আতঙ্কিত হইয়া পড়িলেন। ব্যাঘ্রটি শিকারীর দক্ষিণ বাহু জীষণভাবে কামড়াইয়া ধরিয়াছে। শিকারী বাম হস্তে কেবল ধনুকের দ্বারা ব্যাঘ্রটিকে বৃথা নিবারণের চেষ্টা করিতেছেন। নূরউদ্দীন কুঠার উত্তোলন মাত্র বাঘিনীটি তাহার উপর লাফাইয়া পড়িল। বাঘিনীটি লাফাইয়া পড়া মাত্র নূরউদ্দীন তাহার মস্তকে কুঠারের এমন নিদারুণ আঘাত করিলেন যে, বাঘিনীর মস্তক দ্বিখণ্ড হইয়া গেল। অতঃপর বাঘটাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হওয়ায় সে উর্ধ্বশ্বাসে বনের ভিতরে পলায়ন করিল। ভীল যুবক গাছ কাটিবার গুরুভার দা লইয়া তাহার পশ্চাদনুসরণ করিল, কিন্তু কোনও সন্ধান না পাইয়া ফিরিয়া আসিল।

সুলতান গুরুতররূপে আহত হইয়া অচেতন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। নূরউদ্দীন ঝঞ্জে করিয়া তাহাকে বহন করতঃ আশ্রমে লইয়া আসিলেন। ভীল যুবক তাড়াতাড়ি অশ্বটির মস্তকে পটি বাঁধিয়া তাহাকেও আশ্রমে টানিয়া আনিল।

নূরউদ্দীন এবং কল্পিণী প্রাণপণে সুলতানের সেবা করিতে লাগিলেন। পটি বাঁধিয়া এক জাতীয় বন্যলতা ছোঁচয়া তাহার রসে পটি ভিজাইয়া দিলেন। দীর্ঘকাল জল সিঞ্চন এবং বায়ু ব্যঞ্জন করিবার পরে সুলতান ঐষৎ চৈতন্য প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু দারুণ যন্ত্রণায় আবার মৃতবৎ অচেতন হইয়া পড়িলেন। সখিনা গোশ্বতের গুরুয়া রক্ষন করিয়া পুনঃ পুনঃ একটু একটু করিয়া খাওয়াইতে লাগিলেন।

এক দিন পরে রোকদ্দামানা বেগম কয়সরজাহাঁ লোকজন লইয়া অনুসন্ধান করিতে করিতে নূরউদ্দীনের আশ্রমে আসিয়া সুলতানের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া কঁাদিতে লাগিলেন। নূরউদ্দীন ও কল্পিণী পূর্বে কেহই বুঝিতে পারেন নাই যে, তাহারা যাহার সেবা করিতেছেন, তিনি স্বয়ং সুলতান আহমদ শাহ। সুতরাং এক্ষণে তাহারা একটু কুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। বেগমকে তাহারা নিতান্ত বিনয় ও সম্মানপূর্বক অভ্যর্থনা করিয়া কুটীরতলে মৃগচর্ম পাতিয়া আসন দান করিলেন। লোকজন বাহিরে বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিল। তৃতীয় দিনে সুলতান চৈতন্য-প্রাপ্ত হইয়া দুগ্ধপানের অভিপ্রায় জানাইলেন। নূরউদ্দীন পূর্বেই সুলতানের জন্য দুগ্ধ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। সুলতান দুগ্ধ পান করিয়া উঠিয়া বসিলেন। নূরউদ্দীন বেরূপ সহসা উপস্থিত হইয়া জীষণ বিক্রমে ব্যাঘ্র নিধন করিয়া তাহার জীবন বাঁচাইয়াছিলেন, তাহা বেগম ও অনুচরদিগের নিকট আগ্রহের সহিত বর্ণনা

করিলেন। বেগম নিজের অঙ্গের যাবতীয় মণিমুক্তাখচিত অঙ্গভরণ উন্মোচন করিয়া আশ্রয়ভরে উপহাররূপ দান করতঃ হহতে কল্পিণীর সঙ্গে পরাইয়া দিতে চাহিলেন।

রাজ্ঞীর মহানুভবতার জন্য কল্পিণী পুনঃ পুনঃ ধন্যবাদ দিয়া উপহার প্রত্যাহার করলেন। কিন্তু বেগম নাছোড়বান্দা। কল্পিণীকে গহনা না পরাইয়া ছাড়িবেন না। অনেক পীড়াপীড়ির পরে কল্পিণী বলিলেন : “মা! আমরা বনবাসী ফকির। গহনা নিয়ে কি করব! আমাদের নিকট ঐ সমস্ত হীরা-মণিমুক্তার কোনও আদর নেই। উহা আমরা অবজ্ঞার চোখে দেখে থাকি। লোকালয়ে উহার আবশ্যিকতা থাকতে পারে, কিন্তু এই কাননপ্রমে উহার কোনও কদর নেই!”

রাজ্ঞী : অন্ততঃ আমার চক্ষু বিনোদন এবং প্রাণের শান্তির জন্য তোমাকে পরতেই হবে। আমরা চলে যাবার পরে না হয়, ফেলে রেখো।

কল্পিণী : আমি পরতে রাজি আছি, কিন্তু যাবার সময় নিয়ে যেতে হবে।

রাজ্ঞী : মা! যা' তোমার সঙ্গে পরাব, তা আবার কেমন করে গা হতে কেড়ে—গাত্র হতে উন্মোচন করে নিয়ে যাব! তা কখনই হবে না।

কল্পিণী : তবে আমি পরতে পারব না।

অগত্যা রানী কল্পিণীর শর্তেই স্বীকৃত হইয়া সমস্ত অঙ্গভরণ কল্পিণীকে পরাইয়া দিলেন। কল্পিণী সেই সমস্ত ঘর-আলো-করা গহনা পরিয়া রমণীয় মূর্তি ধারণ করিলেন। রাজ্ঞী হাস্য-বিস্কৃষিত অধরে বলিলেন : “মা! এইবার তোমাকে মহীয়সী রাজ্ঞরানীর ন্যায় দেখাচ্ছে! আমার সাধ যে, তোমার ঐ ভুবনমোহিনী মূর্তি নয়ন ভরে দেখি।”

অল্প সময়ের মধ্যেই রানী এবং কল্পিণীর মধ্যে গভীর সদ্ভাব ও আত্মীয়তার সূচনা হইল। রাজ্ঞী তাঁহাকে ধর্মকন্যা বলিয়া ধরিয়া লইলেন। সুলতান আরও তিনদিন আশ্রমে অবস্থান করিলেন। নূরউদ্দীনের বীরত্বে এবং সৌজন্যে সুলতান একান্ত মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ফলতঃ, নবীন তাপস-দম্পতির রাজ সন্তাননির্মিত অপকল্প সৌন্দর্য, বিনয়-নম্র ব্যবহার, মধুর সরল ভাষা এবং উদার ভাবে সকলেই সুখী ও সন্তুষ্ট হইয়াছিল। তাঁহাদের কথাবার্তা, চাল-চলন, এমনকি চোখের দৃষ্টিতেও এক মহান সঙ্কমের ভাব প্রকাশ পাইত। সাধারণ বংশীয় ব্যক্তিদ্বয়ের সে মহত্ব এবং সঙ্কমের ভাব একান্ত দুর্লভ। সুলতান এবং সুলতানা উভয়েই নূরউদ্দীন এবং কল্পিণীর প্রকৃত পরিচয় পাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। নূরউদ্দীন হাত যোড় করিয়া বলিলেন : “জাহাঁপনা! অপরাধ মার্জনা হোক। ফকির কখনও নিজের পরিচয় দিতে পারে না। আর ফকিরের পরিচয় লাভেও কোনও লাভ নেই।” সুতরাং তাপস-দম্পতির পরিচয় সুলতান ও সুলতানার কাছে অব্যক্তই রহিল।

সুলতান কুমারকে নগদ অর্থ এবং বিস্তৃত ভূ-সম্পত্তি জায়গীর দিতে একান্ত আগ্রহ প্রকাশ করিলেন; কিন্তু নূরউদ্দীন তাহা একেবারেই অস্বীকার করিয়া বসিলেন।

সুলতান ও সুলতানা উভয়েই যানবাহন পাঠাইয়া তাঁহাদিগকে একবার রাজপুরীতে লইবার ঐকান্তিক আগ্রহ প্রকাশ করিলেন; কিন্তু তাপস-দম্পতি তাহাও অস্বীকার করিলেন। অগত্যা সুলতান বছর বছর মৃগয়ায় সময় তাঁহাদিগকে দেখিয়া যাইবেন বলিয়া, নূরউদ্দীনের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন; শেষ পর্যন্ত নূরউদ্দীন তাহাতে সন্মতি প্রকাশ করিলেন।

সপ্তম দিবস প্রাতে সুলতান এবং বেগম যথাক্রমে নূরউদ্দীন এবং সখিনাকে আলিঙ্গন ও উভয়ে গভীর স্নেহে মস্তক চুম্বন করিয়া সান্ত্র নয়নে বিদায় গ্রহণ করিলেন। সুলতান এবং সুলতানা যাইবার সময় বেশ অনুভব করিলেন যে, আশ্রমের প্রত্যেকটি ভৃগাঙ্কুর যেন তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করিতেছে। আশ্রমভূমি যেন কত কালের সুপরিচিত এবং প্রিয়ভাবে তাঁহাদের হৃদয়ে ঠাই লাভ করিয়াছে।

যেখানে নিঃস্বার্থ প্রেমের মুক্ত প্রকাশ, সেখানের ভূমি এবং তরুলতা পর্যন্ত মানুষকে ধীরে বন্ধনে এমনি করিয়াই আকর্ষণ করে। সেখানের বাতাস জীবনকে স্নিগ্ধ উল্লাস দান করে। সেখানের রূপ-রসে গন্ধ-স্পর্শে কেবল প্রেমের ধারাই বহিয়া থাকে।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

গুরু সর্বানন্দ স্বামী দৃষ্টান্তে ভয়াতুর হইয়া মুকুন্দ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। সেনাপতি কুমী খাঁ মহাপূজ্য মহামায়ার প্রতিমা ভঙ্গ করায়—যাহা সে জাগ্রত জীবন্ত এবং বরাভয়দাতা বলিয়া মনে করিত—মুকুন্দ একান্তই ক্রুদ্ধ এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া ওঠে।

সর্বানন্দ স্বামী এবং তাঁহার শিষ্যবর্গকে ইসলাম ধর্মের তত্ত্ব, আচার অনুষ্ঠান শিক্ষা দিবার জন্য কুমী খাঁ যখন পত্রসহ গুজরাটের শেখ উল্ ইসলাম বাহাওয়াল-উলুম শাহসুল-ওলামা হোসেনউদ্দীন শিরাজীর নিকট প্রেরণ করেন, তখন পশ্চিমধ্য হইতে মুকুন্দ পলায়ন করিয়া জয়পুরে উপস্থিত হয়। জয়পুরে যাইয়া যুবরাজ অরুণ সিংহের সহিত দেখা করিয়া কুম্বিনী, নূরউদ্দীন ও কুমী খাঁর সমস্ত কাহিনী অতিরঞ্জিত করিয়া বর্ণনা করে। কুমী খাঁই যে শিপ্রাতটে জলপ্রাবনের দিবস সঙ্গীয় লোকজনের সাহায্যে কুম্বিনীকে কৌশলক্রমে সরাইয়া ফেলিয়া, পরে নূরউদ্দীনের সহিত চাহাকে সম্বলিত করিয়া দিয়াছেন, সেই কথাই দৃঢ়তা

সহকারে নানা বর্ণে রঞ্জিত করিয়া বর্ণনা করে।

মুকুন্দ কয়েকদিন সঙ্গে থাকিয়া নূরউদ্দীন, কুম্বী খাঁ এবং কুম্বীগীর কথোপকথন হইতে কুম্বীগী যে জয়পুর যুবরাজ অরুণ সিংহের পত্নী এই সমস্ত কথা বুঝিতে পারিয়াছিল।

অরুণ সিংহ, মুকুন্দের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। মুকুন্দের কথা বর্ণে বর্ণে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিলেন। সর্বোপরি নূরউদ্দীন এবং কুম্বীগীর সম্মিলনই তাঁহার মর্মে মর্মে সহস্র বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা ঢালিয়া দিল। অরুণ সিংহ মনে মনে ভাবিলেন, “কি ভয়ানক এবং অসহ্য ব্যাপার! আমার বিবাহিতা পত্নী হইয়া আমাকে পায়ে ঠেলিয়া পরপুরুষের সহিত পীরিতি ভুক্তিতে নিবিড় বনে বাসস্থান নির্ধারণ করিয়াছে! এমন কুলটাকে তুবানলে দহ করিলেও মনের ক্ষোভ মিটিতে পারে না!”

কুম্বী খাঁ এই কার্যের সহায়ক বলিয়া তাঁহার প্রতিও হিংসার আগুন বারুদের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল। আর নূরউদ্দীন তাঁহার পত্নীকে ভুলাইয়া যে রস বিলাসে প্রেমোচ্ছ্বাসে বিজনবাসে যৌবনের মজা লুটিতেছে, তাহাকে তো কাঁচা চিবাইয়া খাইলেও মনের জ্বালা নিবারণ হয় না।

অরুণ সিংহ অনুতাপে এবং প্রতিহিংসায় উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। নিজ রাজ্যের এলাকা হইলে—সেই মুহূর্তেই উড়িয়া যাইয়া তাহার পরম শত্রু, প্রেম পথের কষ্টক, নূরউদ্দীন এবং কুম্বীগীকে ধরিয়া আনিয়া তিল তিল করিয়া আগুনে পোড়াইয়া মারিতেন।

যে বিলাসপুরের বনে তাহার বাস করিতেছে, তাহা গুজরাটের এলাকায় অবস্থিত, সুতরাং সেখানে প্রকাশ্যে অভিযান চলিবে না।

অরুণ সিংহ অনুচর, বয়স্য এবং সেনাপতি লহমন্ সিংহের সহিত অনেক পরামর্শ করিয়া ঠিক করিলেন যে, গুপ্তভাবে যাইয়া হঠাৎ আক্রমণপূর্বক পাণিষ্ঠ ব্যভিচারীদিগকে উপযুক্ত প্রতিফল দিতে হইবে। প্রকাশ্যে আক্রমণ করিতে গেলে গুজরাট এবং মালবপতির ক্রোধভাজন হইতে হইবে। সুতরাং গুপ্ত আক্রমণের আয়োজন হইতে লাগিল। প্রসিদ্ধ পঞ্চাশজন রাজপুত্র যোদ্ধা সহ ছদ্মবেশে ভ্রমণকারী ব্যবসায়ী-রূপে যাইবার প্রস্তাব নির্ধারিত হইল।

ঊবিংশ পরিচ্ছেদ

চৈত্র মাসের সন্ধ্যা। বেলা ডুবু ডুবু প্রায়। পশ্চিমাকাশে অরুণরূপে রঞ্জিত নানা বর্ণ হালকা মেঘের মেলা বসিয়াছে। মেঘগুলি মুহূর্তে আকৃতি পরিবর্তন করিয়া

নূতন নূতন শোভার সৃষ্টি ও দৃশ্যের অবতারণা করিতেছে ।

বিলাসপুরের কানন-আশ্রমে সন্ধ্যার বাতাস ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে । সে ফুরফুরে হাওয়ায় কামিনী ও বকুলের ফুলগুলি ঝুঝুঝু করিয়া ঝসিয়া পড়িতেছে । অশ্রুবৃক্ষ হইতে ছোট ছোট আমগুলি টপ টপ করিয়া পড়িতেছে । কোকিল-কোকিলা ঝঙ্কার দিয়া স্মৃতিভরে ডাকিয়া ডাকিয়া বনভূমি ঝঙ্কত করিয়া ভুলিয়াছে । কল্পিণী এহেন সময়ে আশ্রমের সম্মুখস্থ বাগিচার মধ্যে বহুস্তরোপিত বৃক্ষ-লতাগুলির প্রতি মমতাপূর্ণ চক্ষু ফিরাইয়া এবং স্নেহকোমল হাত বুলাইয়া বেড়াইতেছিলেন । আর আবশ্যকবোধে কাহারও কাহারও মূলে স্নেহধারাক্রপ শীতল সলিলধারা ঢালিয়া দিতেছিলেন । অন্তর্যাম রবির কিরণজ্বাল মেঘের গায়ে ঠেকিয়া তাহার লাল বর্ণ আভা পৃথিবীর গায়ে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল । কল্পিণীর ফুটন্ত কমল-নিদ্ভিত কমলীয় কান্তিময় রমণীয় মুখমণ্ডলের উপর সে নীলিমা পড়িয়া মণিজনমনোহর শোভা হইয়াছিল । চতুর্দিকে দূরে শ্যাম শোভাসম্পন্ন সমুদ্রত তরুশ্রেণীর বিনোদ দৃশ্য । মধ্যে স্বচ্ছ সলিল পরিপূর্ণ সরোবরের ঢল ঢল শোভা ! তাহার ভেঁটে সবুজ তৃণক্ষেত্রের মধ্যে ফুল-ফুল-কুল-সমাকুল মনোহর কুঞ্জ-বীথিকা ! আর তাহার মধ্যে উদ্ভিন্নযৌবনা সমুজ্জ্বলকান্তি ভুবন-মোহিনী সুন্দরী কল্পিণীর রূপের ছটা ! মরি ! মরি ! কি চমৎকার চিত্তবিনোদন দৃশ্য ! মনোহারিণী শোভার বাহার !

অরুণসিংহ নিবিড় অন্তরালে থাকিয়া তীক্ষ্ণ এবং তীব্র দৃষ্টিতে সুন্দরীকুল-ললামভূতা কল্পিণীর সৌন্দর্য দেখিয়া দেখিয়া জ্বলিতে লাগিলেন । হায় ! এমন নিকরপমা রূপসী তরুণীর যৌবনের তরুণ প্রেমসম্ভোগ তাহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না ! ইচ্ছা হইতেছিল, এই নির্মম সৌন্দর্যের বিমল প্রতিমার চরণতলে আছড়াইয়া পড়িয়া একবার তাহার কৃপা ভিক্ষা করিয়া দেখে । কিন্তু হায় ! সে চেঁচা তো অনেকবার হইয়াছে । সে যে কিছুতেই ভুলিবার পাত্রী নহে । সে যে প্রাণান্তেও তাহাকে চাহে না ! সে যে নূরউদ্দীন গতপ্রাণা ! সে যে নূরউদ্দীনের নেশায় যাভোয়ারা, তাহার সেবায় আত্মহারা—তাহার প্রেমে বিবশা ! তাহার চিন্তায় সরসা । তবে—তবে আর কিসের সাধনা ? এইবার প্রতিহিংসার সাধনা ! বিষদিশ্চ শাপিত ছুরিকার সাধনা ! বিশ্বের জ্বালায় দগ্ধ করিয়া করিয়া ঐ পাপ হৃদয় ভস্ম করিতে হইবে । কঠোর দণ্ডে এই মোহ ও কামবিকারের নেশা চূর্ণ করিতে হইবে । এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে অরুণ সিংহ উদ্দীণ হইয়া উঠিলেন । মুহূর্তের মধ্যে শার্দূলের ন্যায় বেগে কল্পিণীর প্রতি ধাবিত হইলেন । কল্পিণী একটি গাছের মূলে পানি দিতেছিলেন । সহসা পদ-শব্দে চকিত হইয়া দেখিলেন অরুণ সিংহ তাঁহার দিকে ক্রুদ্ধ মূর্তিতে ছুটিয়া আসিতেছে । ব্যস্ত-দর্শনে মৃগী যেমন চকিত এবং

কম্পিত হইয়া উঠে, কল্পিনীও ভেমনি ভীত ও কম্পিত হইয়া পড়িলেন; মুহূর্ত মধ্যে সুখিতে পারিলেন যে, অক্ষয় সিংহ আজ প্রতিহিংসা-পরায়ণ। অক্ষয় সিংহের চোখ মুখ হইতে ভীষণ জিহাংসার জ্বরতা প্রকাশ পাইতেছে।

সখিনা মুহূর্তের মধ্যে আত্মসংযম করিয়া দৃঢ় হইয়া দাঁড়াইলেন। পুরুষকণ্ঠে বলিলেন, “অক্ষয় সিংহ, সাবধান! আর এক পদ অগ্রসর হলে, এই প্রস্তরখণ্ডে মস্তক চূর্ণ করব।”—এই বলিয়া উদ্যানভল হইতে একটি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড হস্তে উত্তোলন করিলেন। এমন সময় অক্ষয় সিংহের সহচরগণ চতুর্দিক হইতে সুবতীকে ঘিরিয়া লইয়া বন্দী করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কল্পিনী তখন ভূমিভল হইতে প্রস্তরখণ্ড তুলিয়া বেগে আততায়ীদিগের মস্তক লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িতে লাগিলেন। ভীষণ প্রস্তরাঘাতে দুইজন রাজপুত্র চূর্ণমস্তক হইয়া ভূপতিত হইল। এদিকে অক্ষয়সিংহ যাইয়া কল্পিনীর কেশাকর্ষণ করিয়া ভূপতিত-প্রায় করিলেন। এমন সময় নূরউদ্দীন একটি ভীল যুবকসহ যুগয়া হইতে আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন। দস্যুগণ কর্তৃক কল্পিনীকে আক্রান্ত দেখিয়া বীর কুমার ভীষণ গর্জন করিয়া তরবারি হস্তে দস্যুদলের প্রতি বিদ্যুৎবেগে ধাবমান হইলেন।

দস্যুগণও ভীষণভাবে কুমারকে আক্রমণ করিয়া বসিল। অক্ষয় সিংহ যুবতীকে বধ করিবার জন্য তরবারি প্রহারে উদ্যত হইলে ভীল যুবক পশ্চাদ্বেশ হইতে ভীষণ লাঠি প্রহারে তাহাকে কাবু করিয়া ফেলিল। নূরউদ্দীন চীৎকার করিয়া বলিলেন, “বেইমান কাকের! নারীর প্রতি আক্রমণ কেন? পুরুষ হও তো এস, আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর।”—এই বলিয়া অক্ষয় সিংহের সমীপবর্তী হইলেন। অক্ষয় সিংহ আসন্ন বিপদ দেখিয়া কল্পিনীর কেশপাশ ত্যাগ করিয়া শাহজাদার সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। শাহজাদা ভীষণভাবে মরিয়া হইয়া অক্ষয় সিংহকে প্রতি-আক্রমণ করিলেন। শাহজাদার প্রচণ্ড প্রতাপে রাজকুমার কিছু বিপন্ন হওয়া মাত্রই রাজপুত্রগণ আসিয়া নূরউদ্দীনকে চতুর্দিক হইতে আক্রমণ করিতে লাগিল। নূরউদ্দীন হস্তিযুগ-আক্রান্ত সিংহের ন্যায়, সত্তরধিবেষ্টিত অভিমন্যুর ন্যায়, দৈত্যবেষ্টিত রোস্তমের ন্যায় চরম বিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এদিকে একদল দস্যু কল্পিনীকে বাঁধিয়া লইয়া চলিল। মস্তকে সহস্র বজ্রাঘাত অপেক্ষাও কল্পিনীর বন্ধন এবং অপহরণ শাহজাদার নিকট যার পর নাই কঠিনতম এবং ভীষণতম বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ভীল ভৃত্যবৃন্দ কুমারের জন্য যুদ্ধ করিয়া আহত হইয়া পূর্বেই ভূপতিত হইয়াছিল; সুতরাং তাঁহাকে একখানি তরবারি দিবারও লোক ছিল না। নূরউদ্দীন নিতান্ত নিরুপায় হইয়া “আস্তাহ আকবর” রবে বনভূমি কম্পিত করতঃ সেই ভগ্ন তরবারি সাহায্যে অক্ষয় সিংহকে হামলা করিলেন। অক্ষয় সিংহ কৌশলে নূরউদ্দীনের আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া দিয়া

মহাতেজে তাঁহাকে তরবারি প্রহার করিলেন। নূরউদ্দীন ক্রমশঃই শক্রদিগের আক্রমণে আহত হইতে লাগিলেন। তাঁহার শুণু তরবারি আক্রমণের পক্ষে একেবারেই অকর্মণ্য হইয়াছিল। অস্ত্রহীন অবস্থায় কাকেরের হাতে শূগাল-কুঙ্করের ন্যায় নিহত হইতে হইবে, এই অনুতাপে তাঁহার শরীরের শিরা অগুণিরাগুলির মধ্যে আঙন জ্বলিতেছিল। এমন সময়ে দূরে “আল্লাহ্ আকবর” রব গভীর গর্জনে ধ্বনিত হইল। তৎসঙ্গে পাষণ পৃষ্ঠে অশ্বের পদাঘাত শব্দ শ্রুত হইল। রাজপুত্রগণ চকিত ও ভীত হইয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে এক প্রকাণ্ডবপুঃ তেজস্বী মুসলিম বীর বজ্রবেগে আসিয়া অরুণ সিংহের উপর আপতিত হইলেন। একই আঘাতে তিনি রাজকুমারকে সাংঘাতিকরূপে আহত করিয়া ভূপাতিত করিয়া বন্দী করিলেন।

অপরূপ রাজপুত্র ব্যাঘ্রভাঙিত জ্বুকবৎ প্রাণভয়ে উর্ধ্বশ্বাসে দিক্বিদিকে পলায়ন করিল। অতঃপর সেনাপতি কুমী খাঁ শাহজাদা নূরউদ্দীনকে আলিসন দানে আন্বত করিয়া বলিলেন, ‘শাহজাদা! খোদাতালাকে ধন্যবাদ দিন। কোনও ভয় নেই! কস্মিনীকে উদ্ধার করেছি। আমার লোকেরা তাকে নিয়ে আসছে। আমি আপনাদের তস্ব নিবার উদ্দেশ্যে আসছিলাম। পথে দস্যুদিগের সহিত হঠাৎ দেখা হয়। কস্মিনীকে মুক্ত করেই তার মুখে আপনার বিপদের কথা শুনে দ্রুত অশ্ব চালিয়ে এসেছি। খোদাতালা হাজার শোকর যে, তিনি আমাকে আপনার রক্ষায় জয়যুক্ত করেছেন।’

অতঃপর সেনাপতি নূরউদ্দীনের কতস্থানগুলি আপনার বসন ছিড়িয়া বাঁধিয়া দিলেন। কিছুকণের মধ্যেই সেনাপতি সাহেবের লোকজন কস্মিনী এবং বন্দী দস্যুগণকে লইয়া তথায় হাজির হইল। আগত এবং অচৈতন্য অরুণ সিংহেরও যথারীতি সেবা-সুশ্রুধা চলিতে লাগিল। নূরউদ্দীন নিজে আহত হইয়াও জয়পুর-রাজকুমারের চিকিৎসা এবং সেবায় যথেষ্ট যত্ন লইতে লাগিলেন। রাজকুমার নূরউদ্দীনের মহানুভবতা দেখিয়া বিস্মিত এবং লজ্জিত হইলেন।

কুমী খাঁর আগমনের দুই দিবস পরে প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থ সুলতান আহমদ শাহ ও বেগম কয়সরজাহাঁ আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের আগমনে আশ্রমে এক মহা আনন্দ-স্রোত প্রবাহিত হইল। সুলতান, চিতোর সেনাপতি কুমী খাঁকে তথায় উপস্থিত দেখিয়া বিস্মিত এবং জয়পুর-রাজকুমার ও নূরউদ্দীনকে আহত দেখিয়া দুঃখিত ও চমৎকৃত হইলেন। সুলতানের কৌতূহল দেখিয়া কুমী খাঁ সমস্ত বৃত্তান্ত বিশদরূপে ব্যাখ্যান করিলেন।

সুলতান ও সুলতানা নূরউদ্দীন এবং কস্মিনীর পরিচয় পাইয়া সুখসাগরে ভাসমান হইলেন। অতঃপর সুলতান সকলকে সঙ্গে লইয়া রাজধানী

আহমদনগরে প্রত্যাবর্তন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। কাননাশ্রম ত্যাগ করিতে ডাপস-দম্পতি ঘোরতর আপত্তি করিলেও সুলতান তাহাকে কর্ণপাত করিলেন না। কুম্বী খাঁও সুলতানের মতই দৃঢ়তার সহিত সমর্থন করিলেন।

অতঃপর সুলতান বিজে দাখিলু স্বীকার করায় শ্রেমিক-শ্রেমিকা আহমদনগরে যাইতে সম্মত হইলেন। নূরউদ্দীন মহম্মদ প্রকাশপূর্বক অরুণ সিংহকে ক্ষমা করিয়া দেশে যাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। অনন্তর যথাসময়ে সুলতান আহমদনগরে প্রত্যাবর্তন করিলেন। সুলতানের আদেশে দম্পতিযুগলের অভ্যর্থনার জন্য বিপুল আলোক, পুষ্প পদ্মবসন্তা ও বাদ্যোদ্যমে রাজধানী সজ্জিত, শোভিত ও মুখরিত হইল। মন্ত্রী ও শাহজাদাগণ আসিয়া দম্পতিকে অভ্যর্থনা করিলেন। অতঃপর নির্দিষ্ট দিবসে এক বিশেষ দরবারের অনুষ্ঠান হইতে লাগিল। সুলতান এই দরবারে মালবের সুলতান রোকনউদ্দীন এবং চিতোরের রাণা উদয় সিংহ উভয়কেই সত্বীক নিমন্ত্রণ করিয়া আনয়ন করিলেন। নির্দিষ্ট দিনে বিপুল আড়ম্বরে এক মহাদরবারের অনুষ্ঠান হইল। সুলতান আহমদ শাহ এই দরবার রত্নখচিত সমুজ্জ্বল পোশাকে সজ্জিত করতঃ নূরউদ্দীন এবং সখিনাকে আনয়ন করিয়া তাহাদিগের পরিচয়ও একনিষ্ঠ প্রেমের ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা কীর্তনপূর্বক নূরউদ্দীন বেক্রপভাবে তাহাকে ব্যাঘ্রের হস্ত হইতে বীরত্ব ও সাহসের সহিত রক্ষা করিয়া সেবা-তপস্বায় মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা সবিস্তার বর্ণনা করিলেন। বিরাট সভায় 'ধন্য ধন্য' এবং 'সাবাস' 'সাবাস' রব পড়িয়া গেল।

অতঃপর রাজকবি মীর্জা ফররোখ, আহমদ মুলতানী, কুমার ও কুমারীর একনিষ্ঠ জুলন্ত প্রেমের মহিমা বর্ণনা করিয়া একটি সুন্দরিত ও সারগর্ভ কবিতা পাঠে সকলকে পুলকিত করিলেন। অনন্তর রাজকীয় প্রসিদ্ধ বক্তা আবদুল গফুর শিব্তানী অতুলনীয় বাগ্মিতা ও অলঙ্কারঘটাপূর্ণ এক সুন্দরিত বক্তৃতায় কুমার ও কুমারীর একনিষ্ঠ প্রেম (এশকে সাদেকী), মহানুভবতা ও উদারতার সরস বর্ণনায় সকলের শ্রীতি বিধান করিলেন। অতঃপর শেখ উল ইসলাম হোসেন উদ্দীন শিরাজী দম্পতি-যুগলের দীর্ঘজীবন কামনা করিলেন! সর্বশেষে সুলতান আহমদ শাহ সন্তানহলে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, "সন্মানিত নবাব, রাজন্যবৃন্দ ও সত্যগণ! শাহজাদা নূরউদ্দীন এবং রাজকুমারী কর্ণিনী আমাকে বেক্রপভাবে রক্ষা করে পরম যত্নে সেবা করেছিলেন, তার জন্য এবং তাদের নির্মল প্রেম ও আত্ম-চরিত্রের জন্য চিতোরেশ্বরের যে অর্ধরাজ্য আমি পঞ্চদশ বৎসর পূর্বে জয় করে নিয়েছিলাম, তা এক্ষণে চিতোরেশ্বরের কন্যা সখিনা বেগম ও তাঁর জামাতা নূরউদ্দীনকে উপহার-স্বরূপ পদান করলাম।"

মহানুভব সুলতান আব্দুসসাদ শাহের এই বিশ্বয়কর দানবার্তা শ্রবণে সভাস্থলে মহা-আনন্দ কলরোল উঠিত হইল। পনের মিনিট পর্যন্ত 'মারহাবা' 'মারহাবা', 'সাবাস' 'সাবাস' ধ্বনিতে সভাস্থল আলোড়িত হইতে লাগিল। অতঃপর বিপুল জনতা সুলতান আব্দুসসাদ শাহের দীর্ঘজীবন কানা করিয়া পুনঃ পুনঃ জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। সমস্ত ভারতভূমি সুলতানের অতুল দান এবং মহত্বের আলোচনায় পূর্ণ হইয়া উঠিল।

উপসংহার

যথাসময়ে নূরউদ্দীন সুলতান নূরউদ্দীন উপাধি ধারণ করিয়া নবরাজ্য নূরগড়ের সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। সুলতান শাহ্ ধুমধামে অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। সেনাপতি কুম্বী খাঁ চিতোরের সেনাপতিত্ব ত্যাগ করিয়া নূরউদ্দীনের অগ্রাহে তাঁহার মন্ত্রীপদ গ্রহণ করিলেন। সুলতান রোকনউদ্দীন মালবের সাতটি পরগণাও পুত্রকে দান করিয়া নূরগড়ের বিস্তার সাধন করিলেন। রাণা উদয় সিংহ জামাতাকে কুড়ি লক্ষ টাকার জওয়ারহেরাত, সিংহাসন এবং আসবাবপত্র দান করিলেন। সুলতান নূরউদ্দীন নিতান্ত ন্যায়-পরায়ণতার সহিত প্রজাপালন করিয়া অল্প সময়েই প্রজামণ্ডলী কর্তৃক 'সালেহ' উপাধি-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

শিক্ষার জন্য সমস্ত রাজ্যে ১৮০টি সাধারণ বিদ্যালয় এবং একটি আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করিলেন। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া অল্প সময় মধ্যে ধন-সম্পদ এবং সুখ-শান্তিতে পার্শ্ববর্তী রাজ্যসমূহের আদর্শ স্থান লাভ করিলেন। সুবিচার, দয়া, দাক্ষিণ্য এবং সুশাসনে প্রজাকুল এমনি অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাহারা প্রাতঃসেহ্মা মঙ্গলময় আশ্রাহতালার দরবারে নূরউদ্দীন ও সখিনার মঙ্গল কামনা করিতে ভুলিত না।

বঙ্গ ও বিহার বিজয়

[সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী ১২৮৬ বঙ্গাব্দের ২০শে শ্রাবণ সিরাজগঞ্জে অনুপ্রবেশ করেন। তিনি ১৩০৫ বঙ্গাব্দে মাত্র ঊনবিংশ বর্ষ বয়স্ককালে দুইশী মোহাম্মদ রেওয়াজ উদ্দীন আহমদের সম্পাদিত মাসিক 'ইসলাম-প্রচারক' পত্রিকায় তাঁহার প্রথম ঐতিহাসিক কাহিনী-কথা 'বঙ্গ ও বিহার বিজয়' ধারাবাহিকরূপে লিখিতে শুরু করেন।

"৩য় বর্ষ ইসলাম-প্রচারকের সূচীপত্রে" দেখা যায় যে, সেই বর্ষের পত্রিকায় ৫৫ পৃষ্ঠা হইতে উপন্যাসখানির প্রথম অংশ ও ৬৮ পৃষ্ঠা হইতে তাহার দ্বিতীয় অংশ প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী, মুতাবিক ১৩০৬ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে ৩য় বর্ষের ৭ম-৮ম সংখ্যার 'ইসলাম-প্রচারকে' উপন্যাসখানির তৃতীয় অংশ প্রকাশিত হয়। তাহার নীচে 'ক্রমশঃ' কথাটি মুদ্রিত আছে। ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ-এপ্রিল মাসে ৩য় বর্ষের ৯ম-১০ম সংখ্যার 'ইসলাম-প্রচারকে' শিরাজী সাহেবের লেখা 'মালাবারে ইসলাম-প্রচার' (প্রসিদ্ধ পারস্য ইতিহাস 'তারিখ-ই-ফিরিশতা' হইতে অনূদিত) প্রবন্ধের প্রথমাংশ এবং 'উদ্‌গাথা' শীর্ষক সুদীর্ঘ কবিতা প্রকাশিত হয়; কিন্তু 'বঙ্গ ও বিহার বিজয়' কাহিনীর পরবর্তী পরিচ্ছেদ তাহাতে ছিল না। ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দের ১২ই মে, মুতাবিক ১৩০৭ বঙ্গাব্দের ৩০শে বৈশাখ তারিখের ৩য় বর্ষ ১১শ-১২শ সংখ্যার 'ইসলাম-প্রচারকে' শিরাজী সাহেবের লেখা 'শোক-লহরী' শীর্ষক মহারানী স্টিটোরিয়ার পরলোকগমন উপলক্ষে রচিত সুদীর্ঘ কবিতা এবং 'মালাবারে ইসলাম প্রচার' প্রবন্ধের অবশিষ্টাংশ প্রকাশিত হয়। তাহাতেও 'বঙ্গ ও বিহার বিজয়' কাহিনীর কোনো অধ্যায় ছিল না। তিনি এই ঐতিহাসিক কাহিনী আদৌ সমাপ্ত করিয়াছিলেন কিনা, তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখা যাইতে পারে। এই রচনাটির সংক্ৰান্তকল্প পদ-বিন্যাস ও বলিষ্ঠ ভাষার ধ্বনিগাঠীর্ষ আমাদের বিশ্বয় উৎপাদন করে। ইহার তৃতীয় অংশের নীচে 'ক্রমশঃ' শব্দটি মুদ্রিত দেখিয়া সন্দেহ হয় যে, তিনি হয়ত এই রচনাটিকে ঐতিহাসিক উপন্যাসের রূপ দানের পরিকল্পনাই প্রথমে করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে, তাঁহার 'রায়-নন্দিনী', 'ভায়াবায়', 'ফিরোজা বেগম', 'নূরউদ্দীন' প্রভৃতিও ঐতিহাসিক উপন্যাস।—সম্পাদক]

১১১

দ্বিতীয় খলিফা মহাম্মদ হজরত ওমর ফারুকের (রাঃ) রাজত্বকালে ইসলামের পূর্ণ প্রভাব। অমিততেজাঃ সিংহ-বিক্রান্ত, ধর্মপ্রাণ, সচ্চিচারক মহাম্মদ ওমর ফারুক (রাঃ) খলিফিয় সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া, যেরূপ প্রচণ্ড ইরশাদবেগে রাজ্য-জয় এবং ইসলাম-প্রচার করিয়াছিলেন, তাঁহার পর আর কোনও বীরপুরুষ তাদৃশ রাজ্য-জয় এবং ইসলাম-প্রচার করিতে অদ্যাপি সক্ষম হন নাই। তাঁহার রাজত্বের দশ বৎসর তিন মাস মধোই তদীয় বিক্রান্ত সেনাপতিগণ কর্তৃক এরাব, সিরিয়া, এশিয়া মাইনর, কুর্দিস্তান, পারস্য, খোরাসান, আফগানিস্তান, বেলুচিস্তান, মিসর

প্রভৃতি রাজ্য। বিজিত এবং অধিযাসিগণ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। খলিফা ওমরের রাজত্ব বেতন ইসলাম-আলোকে সমুদ্রাসিত, একদণ্ড আর কোন রাজত্বই নহে। বীরত্ব-যশমণ্ডিত ধর্মগতপ্রাণ খলিফা হজরত ওমর একদিন দৃঢ়-প্রতিজ্ঞাসহকারে সগর্বে বলিরাছিলেন : “জগতের যাবতীয় অলীক ধর্ম বিলুপ্ত হইবে, একমাত্র সত্য সনাতন আদ্বাহর নির্দিষ্ট ইসলাম ধর্মই অক্ষত থাকিবে।” বাস্তবিকপক্ষে তিনি আর কিছুদিন জীবিত থাকিলেই এই বাক্য অক্ষরে অক্ষরে কার্যে পরিণত হইত। এই খলিফা ওমরের রাজত্বকালে, ৭ম শতাব্দীর প্রারম্ভে মুহাম্মদ-বিন-আবিহৌফ (রাঃ) নামক একজন আরব্য সেনাপতি সর্বপ্রথম ভারতবর্ষের অন্তর্গত সিদ্ধ প্রদেশ আক্রমণ করতঃ, ভারত-গগনে সুনির্মল অর্ধচন্দ্র এবং পূর্ণ-তারকা লঙ্ঘিত বিজয় পতাকা উড্ডীন করেন। হিন্দুগণ প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া পরাজিত হয় এবং অবশেষে বশ্যতা স্বীকার করে। কিন্তু এই অধিকার দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল না। খলিফা ওমরের মৃত্যুর পরেই ইহা আরবের অধীনতা পাশছোদন করে। অতঃপর দামেস্কের উম্মিয়া বংশীয় খলিফা ওলীদের রাজত্বকালে, ৭১২ খ্রিষ্টাব্দে মোহাম্মদ বিন কাসেমের নেতৃত্বে উক্ত প্রদেশ পুনরায় আক্রান্ত এবং আরবদিগের অধিকৃত হয়। তদন্তর গজনীপতি সুবক্তগীন এবং তৎপুত্র প্রখ্যাতনামা বিদ্যোৎসাহী দিবিজয়ী সম্রাট সুলতান মাহমুদ পুনঃপুনঃ ভারতবর্ষ আক্রমণ করতঃ সমগ্র পাঞ্জাব এবং সিদ্ধ প্রদেশ অধিকার করিয়া ইসলাম ধর্মের বিমল প্রভা বিকীর্ণ করেন। সুলতান মাহমুদের মৃত্যুর পর তদীয় আর কোনও উত্তরাধিকারী ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে অবসর পান নাই। কিছুকাল পর ‘ঘোর’ রাজ্যের সহিত গজনী রাজ্যের বিবাদ উপস্থিত হওয়ার গজনীর প্রভাব চূর্ণীকৃত হয় এবং ‘ঘোর’ রাজ্য ক্রমশঃ পরাক্রান্ত হইয়া ওঠে। এই ঘোর-রাজ্যেশ্বর সুলতান সিয়াস-উদ্দীনের রাজত্বকালে তদীয় ভ্রাতা মহাবীর সুলতান মাহমুদ উদ্দীন বিন বাহাউদ্দীন মোহাম্মদ হাম (প্রকাশ্য—শাহাব উদ্দীন ঘোরী) ১১৯৩ খ্রিষ্টাব্দে তিরোহী ক্ষেত্রে, হিন্দুস্থানের যাবতীয় হিন্দু নৃপতির সম্মিলিত প্রচণ্ড বাহিনীকে ভীষণ প্রতাপে পরাজিত, নিহত এবং বিভাঙিত করতঃ সমগ্র পাঞ্জাব এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ জয় করিয়া, দিল্লী নগরে বীর রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন, এবং সুলতান কুতুবউদ্দীন আইবককে স্বকীয় প্রতিনিধি স্বরূপ রাখিয়া যান। কিন্তু একাল পরন্তু কোনও মুসলমান সেনাপতি বঙ্গ বা বিহার প্রদেশ আক্রমণ বা অধিকার করেন নাই। ইহা সর্বপ্রথমে মহাবীর মোহাম্মদ বক্তিরার খিলিজী কর্তৃক বিজিত হয়। ইহা বেতনপভাবে অধিকৃত হয়, তাহার বখাযখ বৃত্তান্ত আমরা সুপ্রসিদ্ধ পারস্য-ইতিহাস “তারিখ ই-কিরিশতা” অবলম্বনে নিম্নে প্রকটিত করিলাম।

মোহাম্মদ বখতিয়ার খিলিজী “ঘোর এবং গ্রাম সায়াব” রাজ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। সুলতান গিয়াস উদ্দীন মোহাম্মদ ছামের রাজত্বকালে তিনি গজনিতে আগমন করেন। ইহার কিয়ৎকাল পরে তিনি হিন্দুস্থানে উপস্থিত হন, এবং দিল্লী দরবারের অন্যতম প্রধান ওমরাহ মলক মাছুম হিশাম উদ্দীন বলবকের সহিত সাক্ষাৎ করেন। এই হিশামউদ্দীন বলবকের চেষ্টা ও যত্নে মোহাম্মদ বখতিয়ার গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী এবং গঙ্গার অপর তীরস্থ কতিপয় পরগণা জায়গীরস্বরূপ প্রাপ্ত হন। তৎপর ক্রমশঃ যখন তাঁহার শৌর্য-বীর্যের যশঃপ্রভা বিকীর্ণ হইতে লাগিল, তখন ‘কাঙ্গলা’ এবং ‘বেতারি’ নামক প্রদেশদ্বয়ও তাঁহাকে প্রদত্ত হইল।

মোহাম্মদ বখতিয়ার খিলিজীর কলেবর অসাধারণত্ব হইতে বঞ্চিত ছিল না। তাঁহার ভূজদণ্ড আজানুলম্বিত ছিল। তিনি বিহার এবং ‘মনেয়ার’ প্রদেশের অধিবাসীদিগকে বশ্যতা স্বীকার করাইতে দ্রুত আক্রমণের সংকল্প করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই প্রচুর সৈন্য এবং যুদ্ধের উপকরণ সংগ্রহ করিলেন। ঘোর, গজনি এবং খোরাসান হইতে যে-সমস্ত মুসলমান হিন্দুস্থানে আগমন করতঃ বসবাস করিতেছিলেন, তাঁহারা বখতিয়ার খিলিজীর ঔদার্যে অতিমাত্র মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন। দিল্লীস্থর কুতবউদ্দীন আইবক বখতিয়ার খিলিজীর বিহার আক্রমণের উদ্যোগ-বার্তা লোকপরম্পরায় শ্রুত হইয়া তাঁহাকে যথোচিত সম্মানের সহিত উপহারাদি প্রেরণ করতঃ অধিকতর উৎসাহিত করিলেন। অতঃপর বখতিয়ার স্বকীয় দলবলসহ বিহার প্রদেশ আক্রমণ এবং লুণ্ঠন করিয়া শীত ঋতুতে হিমালী-বায়ু সংস্পর্শে পত্র-পল্লব-শূন্য ফল-মূল-বিহীন উদ্যানের ন্যায়, নির্জনতার শাস্তশীল ক্রীড়া-ক্ষেত্র করিয়া তুলিলেন। বখতিয়ার বিহারের দুর্গ সমভূমি করিয়া ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃত গৌড় শাস্ত্র শূন্য মুণ্ডিত-মস্তক, আর্ক ফলাধারী অধিবাসীবর্গ ও তাহাদের ধর্মযাজক স্বরূপ বহু-সংখ্যক ব্রাহ্মণকে শমন-সদনে প্রেরণ করিয়া ধর্মতীর ভার হ্রাস করেন। বখতিয়ার এই স্থলে হিন্দুদিগের হস্তলিখিত ভূজপত্রের বহুসংখ্যক গ্রন্থ প্রাপ্ত হন, কিন্তু অধিবাসীদিগের মধ্যে এমন কেহই ছিল না, যে ইহা পাঠ করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিতে পারে। বখতিয়ার অধিবাসীদিগের কথায় বুঝিতে পারিলেন যে, এ প্রদেশের অধিবাসিগণ শিষ্য এবং দুর্গ-বেষ্টিত নগরের অধিবাসীরা তাহাদের শিক্ষক ছিল। “বেহার” শব্দের অর্থ বিদ্যালয়। এ জন্য এই স্থান বিদ্যালিকার কেন্দ্রভূমি থাকায় বেহার নামে অভিহিত হইত। যাহা হউক, মোহাম্মদ বখতিয়ার এইরূপে বেহার প্রদেশে ইসলামের বিজয়-বৈজয়ন্ত্রী উড্ডীন করতঃ প্রচুর ধনৈশ্বর্য সহকারে আনন্দোন্মাদসিদ্ধ হৃদয়ে স্মরাট কুতবউদ্দীনের সাক্ষাৎকার মানসে দিল্লীতে

উপস্থিত হইলেন। সুলতান কুতবউদ্দীন তাঁহার বেহার বিজয়ে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে রাজকীয় সম্মানে সম্মানিত এবং উচ্চপদে অধিষ্ঠিত করিলেন।

বখতিয়ারের ইদৃশ পদোন্নতি দেখিয়া তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী এবং সহযোগী ওমরাহমণী তৎপ্রতি অস্বাভাবিক বিবেচনা-পরতন্ত্র হইয়া সর্বদাই রাজসভায় বখতিয়ারের বিরুদ্ধে এমন সমস্ত কথার উত্থাপন করিতেন, যাহাতে সম্রাট তৎপ্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার পদগৌরব হ্রাস করিয়া দেন। কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হইতে না পারিয়া, অবশেষে একদিন সকলে মিলিয়া সম্রাটকে বিজ্ঞাপিত করিল যে, রাজকীয় শ্বেতবর্ণ-মাতঙ্গের সহিত যুদ্ধ করিতে বখতিয়ার একান্ত উৎসুক। কিন্তু সম্রাট কুতবউদ্দীন বখতিয়ারের প্রাণহানি ভয়ে প্রথমতঃ এই প্রস্তাবে কিছুতেই সন্মত হইলেন না। সভাসদগণ পুনঃ পুনঃ এই বিষয়ে অনুরোধ এবং উত্তেজিত ক্রমায় অবশেষে সম্রাট এই প্রস্তাবে সন্মত হইলেন। অতঃপর এক দিবস প্রকাশ্য রাজ-দরবারে দুর্মদ মন্ত মাতঙ্গের আনীত হইলে, সম্রাট বলিলেন, “সমস্ত হিন্দুস্থানে এমন কোন হস্তী নাই যে এই হস্তীর সম্মুখে যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান হইতে পারে।” তৎপর বখতিয়ারকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “ঐ দেখ, সম্মুখে গোলক (বল) এবং সুপ্রশস্ত মাঠ রহিয়াছে; যদি ক্রীড়া করিবার বাসনা থাকে, তবে স্বচ্ছন্দে খেলিতে পার।” বীর বখতিয়ার সেই গিরিচূড়াসদৃশ অমিত-বিক্রম মন্ত মাতঙ্গ দর্শনে কিছুমাত্র ভীত বা বিচলিত না হইয়া তনুহুর্থে সভা হইতে গাত্রোথান করতঃ ভীম গদা হস্তে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন।

। ২ ।

বখতিয়ার অসীম বিক্রমে ধীত প্রকৃষ্ট মুখে হস্তীর সম্মুখীন হইয়া দণ্ডীবরের দন্তবৃগলের মধ্যস্থান লক্ষ্য করতঃ তৎের উপরিভাগে তৎপরতা-সহ বীর সমগ্র শক্তির সহিত এমন ভীষণবেগে মুদার প্রহার করিলেন যে, মাতঙ্গ প্রবর দন্তমূলে নিদারুণ আঘাত-প্রাপ্ত হইয়া ভীষণ নিনাদে দিহ্মণ্ডল প্রকম্পিত করতঃ বখতিয়ারের দ্বিতীয়বার আক্রমণের পূর্বেই রণভূমি হইতে পলায়ন করিল। এইরূপে বখতিয়ারকে মহাকায় দুর্ধর্ব-বিক্রম প্রমত্ত কুত্তর-যুদ্ধে অচিন্ত্যরূপে জয়লাভ করিতে দেখিয়া সমস্ত দর্শকমণ্ডলী অধিকন্তু তাঁহার শত্রুপণ্ড বিন্দরে করাসুল দংশন এবং সোক্তাসে বখতিয়ারকে প্রশংসাপূর্ণ জয়ধ্বনিতে দশদিক মুখরিত করিয়া তুলিল। বখতিয়ারের ইদৃশ অসাধারণ বীরবত্তা এবং সাহসিকতা দর্শনে সম্রাট কুতবউদ্দীন অতি মাত্র সন্তুষ্ট হইয়া সেই প্রকাশ্য রাজ-দরবারেই সর্বজন সমক্ষে বর্ণনাশীত রক্ত-কাঞ্চন এবং মণি-মুক্তা উপহার প্রদান করিলেন।

উন্নতমনা বীরবর বখতিয়ার তৎসমতই রাজসভায় উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বিতরণ করিয়া বীর মহেশ্বের পরিচয় প্রদানে অশেষ প্রশংসাতাজন ও যশের অধিকারী হইলেন। ফলতঃ, মোহাম্মদ বখতিয়ারের এই বদান্যতায় শ্রদ্ধাশ্রদ্ধা মৃত্ত এবং মিত্রকুল অধিকতর অনুরক্ত হইয়া পড়িল।

পরদিবস দিল্লীর রাজ-দরবার হইতে একটা লোহিতবর্ণ তালু, একটি বণটকা এবং একটি সামরিক পতাকা-সহ বেহার এবং লক্ষণাবতী প্রদেশে আধিপত্য স্থাপনের জর মোহাম্মদ বখতিয়ারকে প্রদত্ত হইল। কেহ কেহ বলেন, সমুদ্রকূল পর্যন্ত বিস্তৃত গৌড় এবং বঙ্গদেশের নামই লক্ষণাবতী, আবার কেহ কেহ বলেন, গৌড় হইতে বেহারের সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত প্রদেশকে লক্ষণাবতী এবং গৌড়ের অপর প্রান্ত হইতে বেনারস এবং সমুদ্রকূল পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল ভূ-ভাগকে 'বঙ্গলা' বলে। প্রকৃতপক্ষে, শেষোক্ত বিভাগই তৎকালে বঙ্গলা বলিয়া কথিত হইত। যাহা হউক, এই বঙ্গলা এবং লক্ষণাবতী প্রদেশ রাজা লক্ষণরায়ের পুত্র লাক্ষণেয়ের রাজ্য ছিল। বিস্তৃত ঐতিহাসিকগণ লিখিয়া গিয়াছেন যে, নদীয়ার লক্ষণ রায়ের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল।

রাজা লক্ষণের স্ত্রী অত্যন্ত শুদ্ধমতী ছিলেন। ইনি প্রসবকাল উপস্থিত-প্রায় হইলে, রাজ্যের খ্যাতিনামা জ্যোতিষী পণ্ডিতগণকে আহ্বান করতঃ প্রসব-সময়ের ফলাফল জিজ্ঞাসা করেন। জ্যোতির্বিদেয়া গণনা-পূর্বক রানীকে অবগত করান, "যদি সন্তান এক্ষণে ভূমিষ্ঠ হয়, তা হলে নানারূপ কষ্ট এবং বিপদে পতিত হবে। আর যদি দু'দণ্ড পরে জন্মগ্রহণ করে, তা হলে পরম সুখে চিরদিন সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকবে।" রানী এতদ্ব্যবধি দাসীদিগকে আদেশ করিলেন, "যে-পর্যন্ত জ্যোতিষীদিগের কথিত শুভলগ্ন উপস্থিত না হয়, সে পর্যন্ত আমার পদযুগল উত্তমরূপে বন্ধনকরতঃ আমাকে অধোমুখ করে রাখ।"

দাসীরা তৎক্ষণাৎ আদেশানুযায়ী কার্য করিল। ক্রমে জ্যোতিষীদিগের কথিত শুভলগ্ন উপস্থিত হইল। রানী বন্ধন-মুক্ত হইলেন, এবং সন্তানও তৎক্ষণাৎ ভূমিষ্ঠ হইল। কিন্তু রানী প্রাকৃতিক নিয়ম ভঙ্গ করতঃ অধোমুখে প্রসবোপযোগী সন্তানকে উদরে বন্ধা করার যত্নপ্রায় তৎক্ষণাৎ কালগ্রাসে পতিত হইলেন। রাজা লক্ষণ এবং তদীয় সচিববৃন্দ নবপ্রসূত সন্তানের নাম পিতার নামানুসারে লাক্ষণেয় রাখিয়া প্রতিপালনার্থ জনৈক ধাত্রীর নিকট সমর্পণ করিলেন। লাক্ষণেয় ধাত্রী প্রথমে দিন দিন পরিবর্ধিত হইতে লাগিলেন, এবং যথাসময়ে বিদ্যালিকার শ্রবণ হইলেন। অন্তঃপর রাজা লক্ষণ রায়ের মৃত্যুর পর, বয়ঃপ্রাপ্ত অবস্থায় লাক্ষণেয় সিংহাসনে অধিরোধন করিলেন।

রাজা লাক্ষণেয় অশীতি বৎসরকাল রাজ্যাশাসন করেন। তিনি অত্যন্ত

প্রজাসংসল এবং উদার চরিত্র নরপতি ছিলেন। তিনি ইদৃশ্য বদান্য ছিলেন যে, লক্ষ টাকার ন্যূনে কাহাকেও পুরস্কার প্রদান করিডেন না। বিজ্ঞ ঐতিহাসিক কাজী মিনহাজ-উস-সিরাজ জব্বারী বলেন যে, একদা রাজ্যের প্রধান প্রধান জ্যোতিষী, পণ্ডিত এবং ব্রাহ্মণগণ রাজা লাম্বণেকে রাজসভায় অবগত করান যে, প্রাচীন গ্রন্থ সকলে বর্ণিত আছে, কোনও নির্দিষ্ট সময়ে এই রাজ্য মুসলমান ধর্মাবলম্বী হইয়া তুর্কীদিগের হস্তে পতিত হইবে। রাজন। ঐ সময় উপস্থিত হইলে, নৃপতি আমাদিগের সহিত এক মতাবলম্বী হইয়া তুর্কীদিগের অত্যাচার হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য এই রাজ্য ত্যাগ করতঃ অন্যত্র গমন করিবেন। রাজা লাম্বণেয় এই বিবরণ শ্রবণান্তর জিজ্ঞাসা করিলেন : “মিনি সেই আক্রমণকারী মুসলমানদিগের সেনাপতি হবেন, শাস্ত্রে কি তাঁর কোন বিশেষত্ব বর্ণিত আছে, যদ্বারা তাঁকে চিনতে পারা যাবে?”

১৩১

পণ্ডিতবর্গ তদুত্তরে রাজাকে নিবেদন করিল : “হাঁ, শাস্ত্রে কথিত আছে, তিনি যখন দণ্ডীয়মান হবেন, তখন তাঁর কব্জালি জানুদেশের নিম্ন পর্যন্ত বিস্তৃত হবে।” রাজা লাম্বণেয় এতদ্ব্যবধে বিশ্বস্ত অনুসন্ধাননিপুণ গুণচরদিগকে রাজ্যের চতুর্দিকে তাদৃশ কথিত লক্ষণাক্রান্ত বীরপুরুষের আবেশে প্রেরণ করিলেন। চরবৃন্দ বহু অনুসন্ধানের পর, বিহার-বিজয়ী মোহাম্মদ বখতিয়ারকে তৎলক্ষণ বিশিষ্ট দেখিতে পাইয়া সত্বর রাজা লাম্বণেয়কে অবগত করাইল। রাজ্যমধ্যে এই সংবাদ প্রচারিত হইলে, পণ্ডিতকুল এবং প্রধানবর্গের মধ্যে এক বিষম তীতিসঙ্কুল মহা-হলস্থল ঝড়িয়া গেল। সভাসদ ব্রাহ্মণগণ অতীব সত্বরতা-সহকারে জন্মভূমি পরিহার পূর্বক, স্ব স্ব ধন-সম্পত্তি এবং পরিবার-পরিজন লইয়া কামরূপ, জগন্নাথ ও পূর্ববঙ্গের দূরবর্তী স্থানসমূহে অশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু বৃদ্ধ রাজা লাম্বণেয়, দিগন্ত-বিস্তৃত সমৃদ্ধিশালী পৈতৃক-রাজ্য এবং প্রিয়তম জন্মভূমির মমতা পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে সম্মত হইলেন না। তিনি স্বীয় অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া, স্বকীয় দাস-দাসী, কতিপয় খাত্র নিম্নশ্রেণীর কর্মচারী এবং সৈনিকবৃন্দসহ রাজধানীতেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

ইহার কিয়দ্দিন পরেই মহাসামন্ত বখতিয়ার, বিহার প্রদেশের প্রান্তসীমা হইতে সপ্তদশ জন খাত্র অশ্বসাদী-সহ, বাঙ্গলার রাজধানী নদীয়া অভিমুখে অশ্ব সজ্জালিত করিলেন। বীরবর বখতিয়ার এক্ষণ তীষণ বিক্রম এবং তীষণ বেগে বঙ্গরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন যে, প্রান্তপাল সৈনিকবৃন্দ তাঁহার প্রতিবেশন-

সংবাদ রাজধানীতে উপস্থিত করিতে কিঙ্কিন্দায় সময় পাইয়াছিল না। বেলা ত্রিপ্রহরের সময় বখতিয়ার নদীয়ায় প্রবেশ করিলেন। অশ্বপদ-শব্দে নাগরিকগণ চমকিত চিত্তে রাজপথে বাহির হইয়া দেখিল যে, তৎ কাকনসন্নিহিত সমুদ্রকুল কান্তি-বিশিষ্ট বীর-বপুঃশালী অষ্টাদশ সংখ্যক পাঠান, রবি-কর-প্রদ্যোতিত সুশাণিত ভরাবহ উলঙ্গ করবাল করে, একাও অশ্বপৃষ্ঠে সমাসীন হইয়া, ঋণ্ণাবেগে রাজপুরী অভিমুখে ধাবমান হইয়াছেন। নগরবাসিগণ পলাকে প্রলয় গণিয়া চকু মুদ্রিত করিল, কিন্তু পুনঃ চকু উন্মীলন করিয়া তাহাদিগকে আর দৃষ্টি-রেখার ভিতরে দেখিতে পাইল না। মুহূর্ত মধ্যে বীরেন্দ্রবর্গ রাজপুরীর তোরণ-দ্বারে উপনীত হইলেন। দ্বার-রক্ষকগণ অতর্কিত অবস্থায় অবস্থান করিতেছিল। তাহারা অস্ত্র-বিন্যাস করিবার উপক্রমেই শূরেন্দ্রকূলের নিশিত অসি তাহাদের শিরচ্ছেদন-পূর্বক ভূ-চূষন করিল। সিংহদ্বারে এই ভীষণ প্রলয়পাতে অস্তঃপুরস্থ দাস-দাসিগণ ভয়ে চিৎকার করিয়া উঠিল। মুহূর্তে যেন সমস্ত পুরী প্রলয়ে প্রকম্পনে কম্পিত হইল। পলিতকেশ হতভাগ্য বৃদ্ধ রাজা মাধ্যাহ্নিক আহারে কেবলমাত্র উপবেশন করিতেছিলেন, এমন সময়ে শ্রবণ-বিদারী ভীতি-বিহ্বল আর্তনাদ রাজার কর্ণকূহরে প্রবিষ্ট হইল। ভয়ে রাজার মুখমণ্ডল পাতুবর্ণ ধারণ করিল। অস্তঃপুরের ভীষণ কোলাহল এবং পুরবাসীদিগের ইতস্ততঃ সঙ্কল্প-পলায়ন দর্শনে বৃদ্ধ রাজা প্রাণভরে প্রাবৃটের গ্রাবন-স্রোত-প্রকৃত বেতস-লতিকার ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিলেন। ভূমিতে পতিত হইবেন, এমন সময় পতিপ্রাণা রাজ্ঞী আসিয়া ত্রস্ততার সহিত রাজার হস্ত ধারণ করিলেন। বলিলেন, “ভয় কি মহারাজ! চিন্তা দূর করুন, তরী প্রস্তুত, শীঘ্র আসুন”। এই বলিয়া রানী স্বামীর হস্ত ধারণ করতঃ খিড়কি-দ্বার দিয়া পলায়ন পূর্বক নৌকায় আরোহণ করিলেন।

তরী পূর্ব হইতে প্রস্তুত ছিল। বাহকগণ প্রাণপণ যত্নে যথাসাধ্য বেগে তরী চালাইয়া স্বল্পক্ষণ মধ্যেই অনেক দূরে চলিয়া গেল। কয়েক দিবস গমনের পরে রাজা লাম্বণেয় জগন্নাথ ক্ষেত্রে যাইয়া উপনীত হইলেন এবং তথায় মৃত্তিকার নিম্নে গুপ্ত প্রকোষ্ঠ নির্মাণ করিয়া, হতাশ জীবনের অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

এদিকে কৃতকর্মা বখতিয়ার রাজধানী অধিকার করণান্তর উহা সম্পূর্ণরূপে ভূমিস্বাং করিয়া ফেলিলেন। তৎপর লাম্বণাবতী এবং বঙ্গের বহু পরগণা হস্তগত করিয়া “খোংবা” পাঠের অনুজ্ঞা এবং জাজনগর, বেহার, দেবকোট ও নবাধিকৃত প্রদেশে স্বনামে মুদ্রা প্রচার করিলেন। বখতিয়ার নদীয়ার পরিবর্তে বংপুরে স্বীয় রাজধানী স্থাপন করতঃ, বিধর্মিদিগের ঘৃণিত প্রতিমূর্তি পূর্ণ মন্দিরের স্থানে, পবিত্রতম একেশ্বরোপাসনার বহুসংখ্যক মনোহর মসজিদ, অস্ত্র-ভেদী বিজয়-স্তম্ভ,

সুদৃঢ় দুৰ্গ, বহুল বিদ্যালয়, পাঠশালা এবং আবশ্যকীয় অন্যান্য রাজকীয় অট্টালিকাদি নিৰ্মাণপূৰ্বক, রাজধানী এবং রাজ্য সুশোভিত কৰিলেন। অনন্তৰ বিজয়ী বখতিয়ার, বঙ্গ রাজ্য অধিকাৰ কালে যে সমস্ত বহুমূল্য দ্রব্যাদি প্ৰাপ্ত হইয়াছিলে, তৎসমুদয় স্বীয় প্ৰভু দিল্লীস্থ কুতুব উদ্দীন আইবককে উপঢৌকন প্ৰেৰণে, আপনাকে অধিকতৰ বিশ্বস্ত এবং ধীতিভাজন কৰিয়া তুলিলেন। মোহাম্মদ বখতিয়ার স্বীয় ভুক্ত-বিত্ৰমে এবং শাসন-দক্ষতা-বলে কতিপয় বৎসর মধ্যে রাজ্যের দাবতীয় প্ৰজা, জমিদার এবং প্ৰধানবৰ্গকে সম্পূৰ্ণৰূপে স্বীয় বাধ্য ও অনুগত কৰিয়া তুলিলেন।

[অসমাপ্ত]

জাহানারা

| শিরাঙ্গী সাহেবের 'বাণীকুঞ্জ' নানা ক'গজ-পত্রের ভূপের মধ্যে একটি বাতায় তাঁহার হাতে লেখা এই রচনাটি পাওয়া গিয়াছে। মনে হয়, শেষ বয়সে তিনি এই উপন্যাসখানি রচনার হাত দিয়াছিলেন, কিন্তু প্রথম পরিচ্ছেদের পর আর অগ্রসর হন নাই।—সম্পাদক।

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভরা বর্ষা। বিপুল জল-প্রবাহে উজ্জ্বলিত গঙ্গা দুইকূল বিপ্রাবিত করিয়া সর্ববিঘ্ন বিমর্দিনী গতিতে কলকলনাদে বায়ুপ্রবাহে বন্ধে রাশি রাশি বিচিমালা ধারণ করিয়া অবিশ্রান্ত গতিতে বহিয়া যাইতেছে।

তখন সন্ধ্যাকাল। পশ্চিমাকাশে নানা বর্ণানুরঞ্জিত জলদমালা বায়ু-সাগরে সম্ভরণ করিয়া চিস্ত-বিমোহন নানা দৃশ্যের অবতারণা করিতেছিল। অন্তমান অংগমালীর রক্তিমচ্ছটায় বহু দূর পর্যন্ত গগনমণ্ডল আরক্ত হইয়াছিল। রক্তিমার প্রান্তে একপার্শ্বে উজ্জ্বল নীলিমায় এবং অন্যদিকে পিঙ্গলবর্ণের বিচিত্র বিন্যাসে অপূর্ব শোভা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। আকাশের শোভা ধরণী-বন্ধে প্রতিফলিত হইয়া গঙ্গাকেও বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত করিয়াছিল। এমনি মনোহর মধুর সন্ধ্যায় বর্ষার বিপুল জল-প্রবাহে গঙ্গাবন্ধে একখানি পিনিষ নৌকা তরঙ্গ-তালে দুলিতে দুলিতে মুর্শিদাবাদের নীচ দিয়া যাইতেছিল। প্রকৃতির মনোমোহন দৃশ্য দর্শনে নৌকারোহী শওকত আলী চৌধুরীর মনে সঙ্গীতানুরাগ জাগিয়া উঠিল। তিনি এস্রাজের বাক্স খুলিয়া মৃদুমন্দ বাদন আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সঙ্গী তবলাচি ওসমান গনি এস্রাজের সঙ্গে তবলের তাল দিতে লাগিলেন। সেই মধুর সন্ধ্যায় গাল-বাহিত নৌকার স্বচ্ছন্দ অবাধগতির সঙ্গে সঙ্গে হঠমনে শওকত আলী তাঁহার বীণা-বিনিম্বিত কণ্ঠে গান গাহিতে লাগিলেন।

গান শুনিয়া সকলেই বিস্ময় আনন্দ ও নির্মল ভক্তিরসে আপ্ত হইতে লাগিলেন। গান ধামিলে পক্কেশ খোন্দকার যোদ্ধা আফসার উদ্দীন বলিয়া উঠিলেন, “জনার শওকত আলী সাহেব! আপনি আলেম মানুষ এবং ‘ফখরুল মুহাম্মদী’ উপাধি পেয়েও এস্রাজ বাজিয়ে গান গাহেন, এটা একান্তই দুঃখ ও আফসোসের বিষয়। আপনার পক্ষে এটা নিতান্ত অন্যায়।”

শওকত আলী : কেম, খোন্দকার সাহেব! কি অপরাধ হল?

- খোন্দকার : পান কি ইসলামে হারাম নহে?
- শওকত আলী : মোটেই নয়। কখনও না। সঙ্গীতই বিশ্বের প্রাণ, সঙ্গীত ভক্তিশাস্ত্রের প্রধানতম উপায়। ওসী-আচ্চাহ এবং সুফীদিগের সাধনার চরম সহায় হচ্ছে সঙ্গীত। ইসলাম সঙ্গীতকে সর্ববিধরেই প্রাধান্য দিয়েছে। রুদ, সরোদ, এস্‌রাজ, সারঙ্গ, সেতার, ভাঙ্করা, তবল, প্রভৃতি অসংখ্য প্রকারের বাদ্যযন্ত্র এবং অসংখ্য সঙ্গীতের রাগ-রাগিণীর অধিকাংশই মুসলমানদের সৃষ্ট।
- খোন্দকার : সৃষ্ট হলেই যে বিধিসঙ্গত হবে, তার তো কোন অর্থ নাই।
- শওকত : শুধু সৃষ্টই নয়। সঙ্গীতের প্রশংসা ও সমর্থনসূচক চল্লিশটি হাদিস মৌজুদ আছে। ইসলামের গোড়াতেই সঙ্গীত। কোরআন শরীফের কেব্রাত শুনেছেন তো? এটা সঙ্গীত ব্যতীত আর কি? সঙ্গীত নিষিদ্ধ বা হারাম হলে কেব্রাত করে কোরআন শরীফ পড়াও হারাম হতো। আজানও দীর্ঘ ও পুত কন্ঠে দিতে হয়। এতে যতটা রাগিণী টানতে হয়, কোনো সঙ্গীতে ততটা রাগিণী টানতে হয় না।
- খোন্দকার : মোস্তাফা বলেন, আজান ও কোরআন পাঠের জন্যে উহা জায়েজ, অন্যত্র নহে।
- শওকত : তাঁরা মিথ্যা বলেন। তাঁরা সুর করে দরুদপাঠ করেন কেন? মোস্তাফা তো ওয়াজ-নসিহত করতেও সুর ধরে করেন। গজল তো সর্বদাই তাদের মুখে লেগেই আছে।
- খোন্দকার : গজল পাওয়ার দোষ নাই।
- শওকত : চমৎকার বুদ্ধি! ফার্সীতে বাক্যে 'গজল' বলে, বাঙ্গলার তাকেই 'পান' বলে। যার নাম 'তল' তারই নাম 'কুল'। নাম লয়ে মারামারি করা চরম মূর্খতার পরিচায়ক।
- খোন্দকার : আমার মনে হয়, পান না করাই ভালো। গজল অনেকেই বোঝে না। পান সকলেই বোঝে।
- শওকত : তবে আপনি না-বোঝাটাই ভালো মনে করেন! বোঝাটাই দোষ? সঙ্গীতের অর্থ না বুঝলে সে-সঙ্গীত শুনে কোন লাভ নাই। আপনার বুদ্ধির বালাই লয়ে যদি! না বুঝলে তাব জাপবে কিসে? আর তাব না জাপলে ভক্তিনিষ্ঠা বা ধেম

আসবে কোথা হতে? যে মানুষের প্রাণে সঙ্গীত-রাগিনী সর্বদা
 বাজে না, সে কখনও শোদা-শ্রেণিক হতে পারে না। মানুষের
 প্রাণ-বীণায় ভাবের কন্ডার জ্বলিয়ে তুলবার জন্যই সৃষ্টিকর্তা
 আত্মাহুতলা প্রকৃতির মর্মে মর্মে সঙ্গীতের সুধাধারা ঢেলে
 দিয়েছেন। নদীর জল-প্রবাহে মধুর কন্ডোল! সমীরণের পতি-
 প্রবাহে স্বন স্বন স্বন! পাখীর মধুরকণ্ঠে সুললিত তান।
 ভ্রমরের পক্ষসঙ্কালনে মধুর গুঞ্জন! ঝিঝি পোকায় তালে
 সর্বদা তানপুরা বাজছে। অগ্নির প্রজ্বলনেও শৌ শৌ সুরে সুর
 বাজছে। তারায় তারায় চাঁদের জ্যোৎস্নায়—উষার হাসিতেও
 সুরের মেলা। এই বিশ্বের অণু-পরমাণু প্রতি পদার্থ সুরে
 পাঁখা, সুরে বাঁধা এবং সুরেই জীবন। এ জন্যই কোরআন
 শরীফ বলেছে, ‘সক্বাহা লিল্লাহে মাফিসু সমাওরাতি ওরামা
 ফিল্ আরদি ওয়া হুয়াল্ আক্বীজুল হাকীম’ অর্থাৎ আকাশ ও
 ধরিত্রীর প্রতি পদার্থ পরমেশ্বরের সর্বোপরি ক্ষমতাশালী
 শাসক এবং সৃষ্টির চরম ও পরম বহু বলে তাঁর গুণকীর্তন
 করছে। এই যে সৃষ্টির গুণকীর্তন, এটা বিশ্বব্যাপী এক
 মহাসঙ্গীতের মহাতান ব্যতীত আর কিছুই নহে। সাধকের
 কাছে এটাই ‘জেকরে আস্মী’। এটাই হিন্দু-শাস্ত্রের ‘প্রণব’
 বা ‘গুঙ্কার’। এটাই বাবা নানক সাহেবের “অনাতুত শব্দ
 বাজন্ত ভেরি।” সাধনার সিদ্ধিলাভের পরে গুলী-আল্লারা এই
 জেকরে আস্মী সর্বদা গুনতে পান। এটা আমাদের
 অন্তঃকরণেও সর্বদা উদ্গাত হচ্ছে। আপনারা যাকে palpi-
 tation of hearts বলেন, সাধকের কাছে তাই palpitation of
 thoughts নামে অভিহিত এবং vibration মূলতঃ একই
 জিনিস। পৃথিবীর প্রতি পদার্থেরই এই vibration আছে।
 এই vibration-এর সাহায্যে নিম্নলিখিত বিশ্ব জুড়ে মহাসঙ্গীতের
 সৃষ্টি করছে। বিজ্ঞান এখনও অত দূরে পৌঁছতে পারে নাই।
 কিন্তু সাধকেরা এটা প্রত্যক্ষ করেন। সুতরাং বুঝছেন সঙ্গীত
 হারাম বললে, সমস্ত বিশ্বই হারাম হয়ে যায়। তবে
 হিংসামূলক বা ব্যভিচারমূলক সঙ্গীত, যা বর্বরমুগে আরবেয়া
 কীর্তন করতে ভালোবাসতো, তাই শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হয়েছে।

- কিন্তু যুদ্ধকালে হিংসামূলক সঙ্গীত কীর্তন আয়েজ ।
- খোন্দকার : তা হলেই তো বোঝা গেল যে, সমস্ত সঙ্গীতই আয়েজ নহে ।
সঙ্গীতেও হারাম আছে ।
- শওকত : হারাম তো প্রত্যেক বিষয়েই আছে । নমাজে পর্যন্ত আছে ।
- খোন্দকার : নমাজে হারাম?
- শওকত : লোক দেখান বা অন্য প্রকারের প্রার্থনা বা ধ্যান-ধারণা, কোন লোকের অনিষ্টের জন্য নমাজ পড়া বা বন্দেগী করাও হারাম ।
একুপ নমাজিদিগের জন্য, একুপ শ্রেণীর আবেদদিগের জন্য
আম্মাহুতলা "ওরাইল" নামক মহাদোজখের সৃষ্টি করেছেন ।
- খোন্দকার : বিষয় সমস্যা । তা হলে অন্তর্ভুক্ত বা অসাধকের জন্য সঙ্গীত
চর্চাও তো হারাম । তাকেও দোজখগামী হতে হবে?
- শওকত : নিশ্চয়ই নহে । সঙ্গীত গাইতে গেলেই অন্তর্ভুক্ত অসাধককেও
অনেকটা অভিত্ত হতে পড়তে হয় । যারা শ্রবণ করে, তারা
অশিক্ষিত অভাবুক হলেও সঙ্গীতের মোহন সুরে অল্পাধিক
পরিমাণে অভিত্ত হতে পড়বেই পড়বে । কাজেই সঙ্গীত
জিনিসটা শুধু লোকদেখান হতে পারে না । তাবের সঙ্গে
সর্বদাই তার কিছু না কিছু যোগ আছে । কিন্তু নমাজের
বেলায় সর্বদা তা ঘটে না । সেখানে শুগামির আশুভা আছে ।
কাজেই ওরাইল দোজখের দুরার লোক-দেখান বা
হিংসাপরায়ণ মানুষদিগের জন্য খোলা রয়েছে ।
- খোন্দকার : তা হলে সঙ্গীত ধর্ম-সাধনার চরম ও পরম সহায় এবং
বিধাতার শ্রেষ্ঠতম দান ।
- শওকত : নিশ্চয়ই । আজমীর শরীফে যেয়ে দেখুন, মগরেব এবং এশার
নমাজ বাদে সঙ্গীতের কি মহাধুম! তাবে বিস্তার হয়ে কত
পাখও ব্যক্তি সেখানে গড়াপড়ি যাচ্ছে । মানব-হৃদয়ের উপরে
সঙ্গীতের মত কোন পদার্থই কার্যকরী নহে ।
- খোন্দকার : তবে মোস্তাফা সঙ্গীতের বিরুদ্ধে মত পোষণ করে কেন?
- শওকত : মূর্খতা ব্যতীত আর কিছুই নহে । বর্তমান মোস্তা-
ফা-মৌলবীদিগের মধ্যে ইসলামের খবর খুব কম লোকই
রাখেন ।
- খোন্দকার : অনেকে বলেন, সঙ্গীত হারাম নহে, বাজনাটাই হারাম ।

- শওকত : বাজনা সঙ্গীতের এবং গায়কের সহায়ক। সঙ্গীত জায়েজ হলে বাজনাও জায়েজ।
- খোন্দকার : মোস্তাফা বলে, একতারা দফ বাজান জায়েজ।
- শওকত : দফ প্রাচীন বর্বরযুগের বাজনা। এটা দফ দফ শব্দে বাজে বলেই এর নাম দফ হয়েছে। দফের মত নিব্বাস বাজনা জায়েজ হলে, হারমনিয়াম, ফ্লুট ববাব, সেতার, সাবেস, সরোদ, ব্যাঞ্জো প্রভৃতি যে মহাজায়েজ সে-বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই।
- খোন্দকার : তবে মোস্তাফা সমর্থন করে না কেন? ঐ সমস্ত বাদ্যযন্ত্র পরে সৃষ্ট হয়েছে বলে মোস্তাফা নাজায়েজ বলে থাকে। তবে উহা কি জায়েজ হবে?
- শওকত : নিশ্চয়ই। মোটা ভাত জায়েজ হলে সরু ভাত জায়েজ হবে না কেন? অপারগপক্ষে পাস্তাভাত যেখানে জায়েজ, পারগপক্ষে পোলাও সেখানে জায়েজ হবে না কেন?
- খোন্দকার : বুঝলাম। অনেক আলোক পেলাম। এত দিন তো এ-সব মহাপাপ বলে মনে করতাম।
- শওকত : আরে মিঞা! পাপ ও পুণ্যের সংজ্ঞা কি, তাই তো মোস্তাফা অবগত নয়। তাদের আবার কতোয়া দিবার অধিকার কি?
- খোন্দকার : সে কি বুকম?
- শওকত : বল দেখি পাপ কাকে বলে? আর পুণ্য কাকে বলে?
- খোন্দকার : আত্মা যা নিষেধ করেছেন, তাই পাপ; আর যা করতে বলেছেন, তাই পুণ্য।
- শওকত : আত্মা তো সব বিষয় বলে দেন নাই। নূতন নূতন বিষয়ে তবে পাপ পুণ্য বুঝবে কি করে?
- খোন্দকার : আপনি বলুন। আপনি বিদ্যার দরিয়া। মোস্তাফা এসব বলতে পারেন না।
- শওকত : যে-সব কাজের দ্বারা নিজের বা পরের শারীরিক, মানসিক অথবা আধ্যাত্মিক কোন প্রকার লাভ হয়, তারই নাম পুণ্য। তাই করা কর্তব্য। আর যে কাজের দ্বারা নিজের বা পরের কোন প্রকারের শারীরিক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক ক্ষতি হয়, তার নাম পাপ। তা করা অকর্তব্য।

বোম্বকাৰ : হৃদয় ঠিক যেনেহে। ওঃ! কি গভীৰ তন্তুকথা। এ ডো কোন
আলোম্বের কাছে তুমি নাই। এতদিনে আসল বুক পেলাম।
এইত্বপ জ্ঞানগৰ্ভ কথোপকথন কৰিতে কৰিতে মগয়েবের
নমাংগের ওয়াস্ত সযাপ্ত দেখিয়া সকলে সাহ্যোপসনার
শিৱত হইলেন।

পরিশিষ্ট

সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী

[জীবন-কথা ও সাহিত্য-কীর্তি]

[১৮৭৯—১৯৩১]

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলার নব-জাগরণ এই উপ-মহাদেশের ইতিহাসে এক পৌরবসর অধ্যায়। কিন্তু বিশ্বের বিষয় যে, বাঙলার সে-দিনের সত্যানুসন্ধান, ভাবোন্মত্ততা ও কর্মচাক্ষুণ্য সমসাময়িক বাঙালী মুসলমানদের জীবনে বিশেষ রেখাপাত করতে পারেনি।

মধুসূদনের সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য 'মেঘনাদবধ' ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দে, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশ-বন্দিনী' ১৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দে এবং হেমচন্দ্রের শেষ কাব্য 'দশমহাবিদ্যা' ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই সময়ে বাঙালী মুসলমানের মধ্যে কেউ কোন উল্লেখযোগ্য কাব্য বা উপন্যাস রচনা করেছেন কি না আমাদের জ্ঞান নেই। বঙ্কিমচন্দ্র দেহত্যাগ করেন ১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দে। তার ১০ বৎসর আগে অর্থাৎ ১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দে (বাংলা ১২৯১ সালে) মীর মশাররফ হোসেনের সুপ্রসিদ্ধ 'বিষাদ-সিঁদু'র 'মহরম পর্ব' প্রকাশিত হয়। 'বিষাদ-সিঁদু' ঐতিহাসিক উপন্যাস; এই 'বিষাদ-সিঁদু' থেকেই একালের বাঙালী মুসলমানের সাহিত্য-সাধনার সত্যিকার সূত্রপাত। যে উগ্র জাতীয়তা বঙ্কিম-সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য, বাঙালী মুসলমানদের রচনার তার প্রথম সূত্র দেখা যায় ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে—ইসমাইল হোসেন শিরাজীর প্রথম কাব্য 'অনল-প্রবাহে'। হেমচন্দ্রের যেমন 'ভারত-সঙ্গীত', শিরাজীর তেমনই 'অনল-প্রবাহ'। উভয়েই চারপের মত নির্জীব জাতির কানে ধুম-ভঙ্গনিদ্রা মগ্ন উচ্চারণ করেছেন। সেকালে কারকোবাদ ও মোজাম্মেল হক প্রায় একই সুরে জাগরণী-গান গেয়েছেন বটে, কিন্তু শিরাজীর কণ্ঠ দূর-পল্লীর আপামর-সাধারণের কানে গিরে পৌঁছেছে।

কাজী নজরুল ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে ইসমাইল হোসেন শিরাজীর উদাত্ত আহ্বানে বাঙালী মুসলমানের জীবনে জেগেছে সাড়া। বিশ শতাব্দীর তীত সম্ভ্রুত বাঙালী মুসলমানের কানে তিনি গুনিয়েছেন অত্যন্ত জীবন-মগ্ন। অজ্ঞানতা ও নৈরাশোর অন্ধকারে জ্বলিয়েছেন আশার অগ্নি আলোকবর্তিকা। আত্মা যে অজ্ঞেয়, জীবন যে চিরজয়ী, এই প্রাণপ্রদ বাণী বিঘোবিত্ত হয় তাঁর অনলবর্ষী লেখনীতে। বাঙলার প্রতি পল্লী ও নগরীতে তাঁর উদ্দীপনাময়ী বাণীর প্রভাব অনুভূত হয়। এদেশের মুসলমানকে সকল মনুষ্যত্বের ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি নানা সদনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। তাঁর সম্পাদিত মাসিক 'নূর' ও সাপ্তাহিক 'ছোলতান' পত্রিকায় সাহিত্য-প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-জীবনের পুনর্গঠনের স্বপ্ন রূপ লাভ করে। তাঁর অপূর্ব ব্যক্তিগত-ওপে আপামর-সাধারণের মনে হীনকৃত্যতা-বোধ দূরীভূত হয়ে প্রবল কর্মস্বপ্নের সৃষ্টি হয়।

মহাকবি, উপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, পর্বটক, সাংবাদিক, সাধক ও বাণী সৈন্য ইসমাইল হোসেন শিরাজী ১৮২৬ বঙ্গাব্দের ২০ শে শ্রাবণ মৃত্যুতাবিক ১৮৭৯

খ্রিষ্টাব্দের ৫ই আগস্ট সিরাজগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মাতামহ বাবু খান ও মাতামহী গোলাপ বানু নবজাত শিশুর নামকরণ করেন যথাক্রমে 'কৃত্তম' ও 'সেরাজুদ্দীন'; কিন্তু তাঁর মাতা নূরজাহান খানমের হৃদয় 'ইসমাইল হোসেন' নামেই তিনি অভিহিত হন। ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রায় ৮য় বৎসর বয়স্ককালে মাতামহের বাটীর অদূরস্থিত সাহেবউদ্দীন পণ্ডিতের পাঠশালায় তাঁর হাতে-বঁড়ি হয়। তিনি যখন স্থানীয় জ্ঞানদায়িনী মধ্য ইংরেজী স্কুলের ছাত্র, তখনই তাঁর মধ্যে কবিত্ব-শক্তি ও বাগ্মিত্যের প্রাথমিক স্করণ দেখা যায়। স্কুলের জ্ঞানদায়িনী ছাত্র-সমিতির বিতর্ক-সভায় ও রচনা-প্রতিযোগিতায়, তিনি যে কৃতিত্বের পরিচয় দেন, তাতেই তাঁর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার চিত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মাইনর স্কুলের শিক্ষা সমাপনের পর তিনি সিরাজগঞ্জ বনোয়ারীলাল হাই স্কুলের সপ্তম শ্রেণীতে (Class VII-এ) ভর্তি হন। সে-সময় পণ্ডিত রেয়াজউদ্দীন আহমদ মশহাদীর 'সমাজ ও সংস্কারক' পুস্তকখানি তাঁর হস্তগত হয়; তাতে প্রাচ্যের অগ্নিপুরুষ সৈয়দ জামাল উদ্দীন আফগানীর ঘটনা-বহুল অসামান্য জীবন ও স্বাধীন 'সর্বভ্রূ-বাদের' আদর্শ বেদনপ বলিষ্ঠ ও অগ্নিময়ী ভাষায় বিবৃত হয়েছে, তা কিশোর শিরাজীর মনে অপরিমাণ উন্মাদনার সৃষ্টি করে। তাঁর ধারণা হয় যে, এদেশে শিক্ষালাভ করে প্রকৃত জ্ঞান ও মনুষ্যত্বের অধিকারী হওয়া বাবে না; তাই তিনি তুরস্ক গমনের সংকল্প করেন। ১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দের আগস্ট মাসে গোপনে গৃহত্যাগ করে একজন বন্ধু-সহ তিনি কলকাতার ৯ নং কড়েরা গোরস্থান গেনে 'ইসলাম-প্রচারক'^১ অফিসে গিয়ে উপস্থিত হন। মাসিক 'ইসলাম প্রচারক' পত্রিকার সম্পাদক মুন্সী মোহাম্মদ রেয়াজ উদ্দীন আহমদ কিশোর শিরাজীর সংকল্প দেখে বিশ্বয়বোধ করেন; কিন্তু তাঁদের ত্বরকে প্রেরণ তাঁর সাধ্যায়ত্ত্ব ছিল না। অতঃপর শিরাজী কয়েকস্থানে সাহায্য লাভের চেষ্টা করে বিফল-মনোরথ হয়ে ৪২ দিন পরে গৃহে ফিরে আসেন, এবং পুনরায় পড়া শোনার মনোনিবেশ করেন।

১. 'সমাজ ও সংস্কারক' ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এছের 'বক্তব্য ও উদ্দেশ্য' শীর্ষক কৃষিকার ১২৯৬ বঙ্গাব্দের ২৯শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে প্রকাশক বলেন : "এই প্রবন্ধ ইতিপূর্বে 'সঙ্গীতনী'তে প্রকাশিত হইয়া সর্বত্র পাঠকবর্গের নিকট স্নেহ-মসৃণ দৃষ্টিলাভ করিয়াছিল।" প্রকাশিত হলে পর তৎকালীন বঙ্গীয় সরকার 'সমাজ ও সংস্কারক' বাজেয়াপ্ত করেন।

২. ১২৯৮ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে 'ইসলাম-প্রচারক' প্রথম বের হয়। সে-বছর আশ্বিন, কার্তিক ও অশ্বিন-মাসে ১ম বর্ষের আর মাত্র তিন সংখ্যা এবং ১২৯৯ সালের বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আশ্বিনে ২য় বর্ষের তিন সংখ্যা বের হয়। তারপর প্রায় সাত বছর বন্ধ থেকে ১৩০৬ সালের শ্রাবণ মাসে তার ৩য় বর্ষ আরম্ভ হয়। ৩য় বর্ষের প্রথম চার সংখ্যা মাসিক রূপে ও পরিবর্তী সংখ্যাতমি দ্বি-মাসিক রূপে আত্মপ্রকাশ করে। পত্রিকাখানি অনির্বাহিতভাবে ১৩১০ সাল পর্যন্ত চলিয়াছিল।

তিনি যখন বনোয়ারীলাল হাই স্কুলে মধ্য শ্রেণীর (Class IX-এর) ছাত্র, সে-সময় যশোর ছাতিয়ানভলার বনামখাত ধর্মবক্তা মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ সিরাজুলজ্ঞেয় বড়ইতলী মাঠে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা করেন; সে সভায় তরুণ শিরাজী পাঠ করেন 'অনল-প্রবাহ' নামে একটি উদ্দীপনাময়ী কবিতা। কবিতাটি শুনে মুন্সী মেহেরউল্লাহ এতই মুগ্ধ হন যে, তিনি নিজ ব্যয়ে ১৩০৬ সালে তা পুস্তিকাকারে প্রকাশ করেন। ১৩০৬ সালে ৩য় বর্ষের 'ইসলাম-প্রচারকে' শিরাজীর 'বঙ্গ ও বিহার বিজয়' প্রকাশিত হয়; তাঁর প্রথম জীবনের এই রচনাটির সংস্কৃতবহুল পদবিন্যাস ও বলিষ্ঠ ভাষার ধ্বনিগাভীর্য আমাদের বিশ্বয় উৎপাদন করে। ১৩০৬-০৭ সালে তাঁর 'কাজীর বিচার', 'মালাবারে ইসলাম-প্রচার', 'আইয়ুব নবীর স্ত্রী', 'সুলতান মাহমুদ' প্রভৃতি গদ্য রচনা এবং 'শোকোচ্ছ্বাস', 'অতীত-কাহিনী', 'উদ্গাথা', 'শোক-লহরী', 'আরব', 'আত্তরা', 'চোখ পেল' প্রভৃতি কবিতা 'ইসলাম-প্রচারকে' এবং সুফী মধুমিরা-সম্পাদিত 'প্রচারকে' প্রকাশিত হয়েছিল। এ-সকল রচনার চিন্তাদর্শ ও ভাবৈশ্বর্য দেখে দেশবাসী তাঁর প্রতিভার শক্তি ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আশাবিত্ত হয়ে ওঠে। ১৩০৭ সালে (১) অনল-প্রবাহ, (২) তূর্ষধ্বনি, (৩) মূর্ছনা, (৪) বীরপূজা, (৫) অভিসম্বন : ছত্রগণের প্রতি, (৬) মরক্কো-সঙ্কটে, (৭) আমীর-আগমনে, (৮) দীপনা ও (৯) আমীর-অভ্যর্থনা, এই ৯টি কবিতা নিয়ে 'অনল-প্রবাহ' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। শিরাজী দেশের নব্য যুবকগণকে লক্ষ্য করে বলেন :

আবার উত্থান-লক্ষ্যে

বহাও জগৎ-বন্ধে

নব-জীবনের খর প্রবাহ-প্রাবন।

আবার জাতীয় কেতু

উড়াও মুক্তির হেতু,

উঠুক গগনে পুনঃ রক্তিম তপন।

'অনল-প্রবাহ' কাব্যের এই অগ্নিবাহী ভাবের তীব্রতা ও ভাষার ওজস্বিতাওনে সমাজের সর্বত্র এক অতৃতপূর্ব আলোড়নের সৃষ্টি করে।

৩. ১৩০৭ সালের ৩০শে বৈশাখ তারিখের (৩য় বর্ষ, ১১৭-১২৭ সংখ্যা) 'ইসলাম-প্রচারকে' কাব্যখানির নিম্নোক্ত 'সমালোচনা' প্রকাশিত হয় :

অনল-প্রবাহ—মুন্সী মোহাম্মদ এন্সমাইল হোসেন সিরাজী প্রণীত। ইসলাম-প্রচারকের পাঠকগণের নিকট গ্রন্থকারের কবিতামালা অপরিচিত নহে; সমালোচ্য কবিতা-পুস্তকখানি তাঁহারই কল্পনা-নির্মিত। কবিতাগুলি মহা-ওজস্বিনী ভাষায় লিখিত। মুসলমানদিগের অতীত গৌরব-কাহিনী কল্পিত ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। কবিতাগুলি বড়ই লালিত্যময়ী, পাঠ করিলে বিমুগ্ধ হইতে হয়। পুস্তকখানির আকার ডিমাই ১২ পেন্সী ৩৯ পৃষ্ঠা। কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। মূল্য ১০ আনা মাত্র। প্রত্যেক মুসলমানের এই পুস্তক এক একখানি গ্রহণ করা উচিত।

কবিতার ভাবরসে জাতিকে উজ্জীবিত করে তোলা হতো আদিযুগে। সেই যুগ-শ্রেণী অন্তর্হিত হতে চলেছে। অধুনা মহাকাব্যের স্থান নিয়েছে উপন্যাস। বিপ্রদাস পিপলাইর 'মনসা-মঙ্গল', মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চঞ্জীমঙ্গল', ধনরাম চক্রবর্তীর 'ধর্মমঙ্গল' বা ভারতচন্দ্র রায়ের 'অন্নদা-মঙ্গল,' এরূপ বৃহদাকার কাব্যও এ-যুগে বিরচিত হয় না। একটা যুগের সমাজ-মানস ও জীবন-ধারার সামগ্রিক পরিচয় মধ্যযুগের এ-সকল কাহিনী-কাব্যে বিধৃত রয়েছে। কিন্তু মধুসূদন হতে বাংলা কাব্যে যে নূতন ধারার সূত্রপাত হলো, তাতে প্রাচীন কালের এপিকের সকল লক্ষণ সম্যক পরিব্যক্ত নয়। শাহ মোহাম্মদ সগীরের 'ইসফ-জলিখা' বা আলাওলের 'পদ্মাবতী' একটা যুগের সুবিশাল চিত্র মেলে ধরে; কিন্তু নবীনচন্দ্র সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ' বা যোগীন্দ্রনাথ বসুর 'পৃথ্বীরাজ' কাব্য পাঠকের সেই বিশাল সৌন্দর্য-সুধা তৃপ্ত করতে পারে কৈ? এ-সকল কাব্যের সঙ্গে মহাকাব্যের ততখানি পার্থক্য, একটি বড় গল্পের সঙ্গে একটি উপন্যাসের যতখানি পার্থক্য। এটি লক্ষ্য করেই সে-সময় কায়কোবাদ ও শিরাঙ্গী মহাকাব্য রচনার আগ্রহ হ্রাস হন। কায়কোবাদের 'মহাশুলান' কাব্যের প্রথমার্শ ১৩০৫ সালের শ্রাবণ মাস (১ম বর্ষের ২য় সংখ্যা) থেকে 'কোহিনূর' পত্রিকায় ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হয়। আর ১৩১১ সালের বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে ৬ষ্ঠ বর্ষের ১ম-২য় সংখ্যক 'ইসলাম-প্রচারকে' শিরাঙ্গীর 'মহাশিক্ষা' কাব্যের 'বন্দনা'-অংশ ও 'ময়ূপা' নামক প্রথম সর্গ প্রকাশিত হয়। 'বন্দনা'-র কিয়দংশ নিয়ে উদ্ধৃত হলো :

বীরেন্দ্র-কুলকেশরী রাজর্ষি হোসেন
(মহানবী মোস্তফার নন্দিনী-নন্দন,
বীরেন্দ্র-কুলের ত্রাস আলীর অঙ্গজ)
ধর্মের মর্বাদা আর স্বাধীনতা-হেতু
সেখাইলা বেই দৃশ্য, যেই আত্মত্যাগ,
যে তীব্র বীরধর্ম, কঠোর প্রতিজ্ঞা,
সত্যে অবিচল নিষ্ঠা, ন্যায়ের গৌরব,
বিশ্বাসের মহাতেজঃ, অতুল সাধনা,
অক্রান্ত অসীম খৈর, তীব্র উন্মাদনা
অতুল অক্ষয় তাহা—কবীন্দ্র-কুলের
চিত্র-অভিরাম ধন। চিরকাল তাহা
গাইবে ত্রিদিবে সুর, নয়লোকে নয়
ভক্তিরসাপুত কণ্ঠে তাসি' নেত্র-নীরে।
শত শত বর্ষ হতে যে পবিত্র নীতি
করিয়াছে উন্মাদিনী মোসলেম-জগতে,

হায়! যে করুণ দৃশ্য, দৃষ্ট বীর-মূর্তি
 মুহূর্তে মুহূর্তে জাগে মোসলেম-অস্তরে—
 হে বিভো! সে গাথা আজি গাহিতে বাসনা
 গঞ্জিরে জীমূও-মস্ত্রে, সে বীর-মূর্তি
 আঁকিতে বাসনা আজি কর-তুলিকায় ।

* * *

হে এলাহি! দয়া-বারি করি' বরিষণ
 মানস-উদ্যান-জ্বাত কবিত্ব-তরুরে
 করহ সরস এবে শ্যামল শোভন,
 পত্র পুষ্প সমাবৃত । বড় সাধ মনে
 সে কবিত্ব-তরু হতে চাক ফুলদল
 অবচরি গাঁধিবারে কাব্যের মালিকা
 কল্পনার সূত্র-সূত্রে মনের মতন ।

যেখানে মহাকবি হোমার তাঁর ILIAD-কাব্যের প্রারম্ভে বলেছেন : 'heavenly goddess, sing!' এবং মধুসূদন তাঁর মেঘনাদবধ-কাব্যের প্রারম্ভে বলেছেন : "কহ হে দেবী অমৃতভাষিনী!" সেখানে শিরাজী সর্বশক্তিদাতা আন্তাহুতায়ালার সমীপে ভাব-প্রকাশের ছন্দোময় কবি-ভাষা যাচুয়া করছেন । কিন্তু তাঁর কাব্যের ভাষা সাতিশয় পদ্যবিত, তার গাঁধুনি সর্বত্র আশানুরূপ আঁটসাঁট নয়, ফলে বর্ণনা অনেক স্থানেই আবেগ-উচ্ছল ও আড়ম্বর-বহুল হয়েছে ।

১৩১৪ সালে (১) বোধন-গীতি, (২) এই কি সেই দেশ, (৩) কল্যাণ ও অদ্যা, (৪) অতীত-কাহিনী, (৫) বিলাপ, (৬) স্বাধীনতা-বন্দনা, (৭) চাঁদ সুলতানা, (৮) মিসরের অভ্যুত্থান, (৯) উন্মেষণা, (১০) স্পেনের প্রতি, (১১) বহুধনি ও (১২) আরব, এই ১২টি কবিতা নিয়ে তাঁর 'উদ্বোধন' কাব্য প্রকাশিত হয় । তিনি 'বোধন-গীতি'তে বলেন :

জাতীয় উন্নতি-হেতু সহিবারে দুঃখ-তাপ
 বিমুখ যে, পত সেই, তারে শত অভিশাপ ।

সুদানের মহাবীর মোহাম্মদ আহমদ মেহদী যে আরবী 'কাফিয়া'র উদ্দীপন-রসে জাতীয় জীবনের উদ্বোধন করেছিলেন, 'স্বাধীনতা-বন্দনা' কবিতাটি তারই মর্মানুবাদ । কিন্তু সেদিন এই উপ-মহাদেশের অন্যও এই মুক্তির আহ্বান ছিল অপরিমাপ প্রেরণাময়—

পতিত জাতির উদ্ধার-হেতু
 উড়াও আকাশে রক্তিম কেতু,

জাণ্ডক্ মাতৃক্ ছুটুক দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বর্নিতা ।

জয় জয় জয় স্বাধীনতা!!

সে-বছরেই জ্যৈষ্ঠ মাসে তাঁর 'নব-উদ্দীপনা' প্রকাশিত হয় । তাতে 'হিন্দুর প্রতি', 'মুসলমানের প্রতি', 'দুর্ভিক্ষের ভিক্ষা', 'আহ্বান', 'বন্দনা' প্রকৃতি কবিতা স্থান লাভ করে । এই কাব্যখানির প্রধান কথা দেশাত্তবোধ ও মানবিকতা । জনগণের জাগরণ ভিন্ন যে দেশ-মুক্তি সম্ভব নয়, এই মূল্যবান কথাটি ব্যক্ত করেন এরূপ তীর্থক ভাষায় :

কিছুতেই হবে না সাধন,
যতই কেন বল না ডাই 'বন্দে মাতরম্'!
কামার কুমার চাষী তাঁতি
যতদিন না ওঠে মাতি',
যতদিন না করে তারা নেত্র উন্মীলন!
ও ভাই! যতদিন না উঠে জ্বলে,
মাকু হাতুড়ি লাঙ্গলের ফালে
ভ্রাতৃপ্রেম আর দেশভক্তির অনল ভীষণ!

তাঁর 'উদ্দীপনা' (১৩১৪) ৮ সর্গে সমাপ্ত । এটি 'মুসাদাসে-হালী'র ধরনে রচিত জাতীয় কাব্য । তিনি জাভিকে তার অতীত ইতিহাস ও ঐতিহ্যের মহিমার মধ্যে জাগরিত হতে আহ্বান করেন । তিনি উপদেশ দেন জ্ঞানকে করতে পথের শ্রেষ্ঠ পাথের :

জ্ঞানই শক্তি, জ্ঞানই ধরম,
জ্ঞানই বিশ্বাস, জ্ঞানই মরম,
জ্ঞান ভক্তি মুক্তি, জ্ঞানই করম,
এই মহামন্ত্র করহ সার ।

—[অষ্টম সর্গ]

১৩১৫ সালে (১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দের শেষার্শে) 'অনল-প্রবাহ' পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত আকারে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় । ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তৎকালীন বাংলা সরকার 'অনল-প্রবাহ' বাজেয়াফ্ত করেন ১২৪(ক), ১৫৩ ও ১১৭ ধারা-অনুসারে গ্রন্থকারের প্রতি গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করেন । শিরাজী তখন 'ছোলতান'—সম্পাদক মওলানা মোহাম্মদ মনিকুজ্জামান ইসলামাবাদীর সঙ্গে উত্তর-বঙ্গে প্রচার-কার্যে লিপ্ত ছিলেন; সংবাদপত্রে পরোয়ানার খবর পেয়ে তিনি অবিলম্বে কলকাতা রওয়ানা হন । তাঁর সাধের 'মহাশিক্ষা-কাব্য' ততদিনে অর্ধেক মাত্র বিরচিত হয়েছে; এই অবস্থায় কারাগারে গেলে কাব্যখানির অবশিষ্টাংশ রচনার মেজাজ (mood) হয়ত জীবনে আর পাওয়া যাবে না । তাই তিনি কিছুকাল অজ্ঞাতবাসে থেকে কাব্যখানি সমাপ্ত করাই

সমীচীন মনে করলেন। তিনি বৃটিশ-এলাকার বাহিরে ফরাসী-অধিকৃত চন্দননগরে গিয়ে দীর্ঘ আট মাস আত্মগোপন করলেন। তাঁকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য তৎকালীন বাংলা সরকার ৫০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেন; কিন্তু গোয়েন্দাদের সকল কারসাজি ব্যর্থ করে শিরাজী ১৩১৭ সালের ২১শে আষাঢ় তারিখে মহাশিক্ষ-কাব্য সমাপ্ত করেন। তিনি কাব্যখানির 'উপসংহার' করেন এভাবে—

এজিদের মহাবল ঋন্ত ব্যস্ত হয়ে
 পলাইল প্রাণ-ভয়ে ছুটিয়া চৌদিকে;
 হায়! বনে বৃধপতি বিনষ্ট হেরিয়া
 পলার মাতঙ্গ-কুল সিংহ-ভয়ে যথা।
 রক্ত জন অসি-সহ বাঁধিয়া স্বকর
 কৈল আত্মসমর্পণ হানিকার পদে।
 অনন্তর মহাপুর বিজয়ী হানিকা
 বিজয়-রাগ-প্রদীপ্ত বদন-মণ্ডলে,
 দ্রুত অশ্ব ধাওয়াইয়া, রক্ত অসি করে
 মহাহর্ষে পুনঃ পুনঃ ঘোষিয়া তক্বীর
 পশিলা তোরণ-পথে রাজধানী মাঝে।
 লক্ষ লক্ষ নাগরিক লয়ে নানা ভেট
 অভ্যর্থিলা হানিকারে জয়ধ্বনি করি'।
 মিষ্ট বাক্যে সকলেরে অভয় প্রদানি'
 নগরীর শান্তিরক্ষা—ব্যবস্থা করিয়া,
 সর্বাত্মে কারায় পশি' বন্দিনী-নিচয়ে
 বিমুক্তিলা আলীজাদা। পুনঃ অশ্রুধারা
 প্রবাহিল সকলের নেত্র-নীলোৎপলে!

* * *

দামেস্কের সিংহাসনে জয়নাল-আবদিনে
 করি' সুখে অভিষিক্ত, দরিদ্র বিধবা
 অনাথ পীড়িত আর আহত সৈনিকে
 মুক্ত হস্তে বহু অর্থ করিলা প্রদান।

* * *

অনন্তর আলী-জাদা সুলভল করি'
 বিশৃঙ্খল সাম্রাজ্যের, বিপুল ঘটায়

জয়নাল নগিনা দৌড়ে আনন্দ-উল্লাসে
বাঁধি' পরিণয়-পাশে, ফিরিলা স্বরাষ্ট্রে
শাসিয়া আঁখির নীরে 'হা হোসেন' বলি ।

অভাগা বঙ্গের কবি শোকার্ভ শিরাজী
অনাহারে অনিদায় সহি' নানা ক্লেশ
সুদীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষে, বিধি-কৃপাবশে
এই খানে মহাশিক্ষা করিলেক শেষ ।

অতঃপর তিনি কলকাতায় গিয়ে চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ সুইন হো-র আদালতে আত্মসমর্পণ করেন। আদালতে তাঁর পক্ষে মামলা পরিচালনা করেছিলেন ব্যারিষ্টার মিঃ বি. সি. চ্যাটার্জি। কিন্তু বিচারে বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিশেষ প্রচারের অভিযোগে তাঁর প্রতি দু'বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, অর্থাভাবে হাইকোর্টে আপীল দায়ের করা সম্ভবপর হয়নি। ফলে, দীর্ঘ দণ্ডভোগের পর ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ই মে তারিখে তিনি কারামুক্ত হন। তাঁর 'কারা-কাহিনী' পরবর্তী কালে মাসিক 'সাধনা'র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল।

১৯১২ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ই অক্টোবর বঙ্গানের ক্ষুদ্র শক্তি-চতুষ্টয় রাশিয়া ও বৃটেনের ধরোচনায় তুরস্ক আক্রমণ করে। তুরস্কের সেই বিপদে ডাক্তার মোখতার আহমদ আনসারীর নেতৃত্বে ইতিয়ান রেড ক্রিসেন্ট গঠিত হয় এবং তুরস্কে 'অল ইতিয়া মেডিক্যাল মিশন' প্রেরণের সিদ্ধান্ত হয়। সেই মিশনের বঙ্গীয় প্রতিনিধি-রূপে শিরাজী ২রা ডিসেম্বর সিরাজগঞ্জ হতে রওনা হন। বোম্বাই হতে আহাজ-যোগে যাত্রা করেন। যাত্রাপথে সমুদ্র দর্শন করে তিনি যে ক্ষুদ্র কবিতাটি রচনা করেছিলেন, তা উপভোগ্য। সেই সমুদ্র-স্তোত্র থেকে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করছি :

হে অসীম নীল সিদ্ধু! হে অনন্ত নীলার আকর!
কার-প্রেম আকর্ষণে উজ্জ্বলিত তোমার অন্তর!
অসীম নীলাধু মাঝে তরঙ্গের মরি কী নর্তন!
কী মহা বিচিত্র নীলা, মরি! কিবা ভীম আক্ষালন!
কতকাল হতে জুটি' গাহিতেছ সঙ্গীত মহান,
কী গভীর ভাবপূর্ণ, মুগ্ধ যাহে কবির পরাগ।

(তুরস্ক-ভ্রমণ, প্রথম খণ্ড, ২৫ পৃঃ)

আহাজ ২৭শে ডিসেম্বর আলেকজান্দ্রিয়া হয়ে ৩১শে ডিসেম্বর কনস্টান্টিনোপল পৌঁছে। তাঁর 'তুরস্ক-ভ্রমণ (১৯১৩) পুস্তকে তিনি সেই সফর কাহিনী সরস ভাষায় বর্ণনা করেছেন। বঙ্গান শক্তিপুঞ্জের অত্যাচার, তুর্ক বাহিনীর বিপর্যয়,

যশস্কেন্দ্রের অবস্থা, নব্য তুর্কীদের জয়লাভ প্রভৃতি প্রসঙ্গের অবতারণা করে তিনি বলেন :

“মুসলমানের জাতীয়তা (Nationality) ‘মুসলমান’ ব্যতীত আর কিছুই হইবে না ; সমস্ত জগতের মুসলমান এক, ধর্ম এক, স্বার্থ এক, চিন্তা এক, কর্ম এক, ইসলামের এই মহা-ঐক্যের বন্ধনে সমস্ত নবীন যুবককে প্রমত্ত করিতে হইবে।”

১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ই জুলাই তিনি ভূমধ্যসাগরের পথে স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হন। দেশে ফিরে তিনি পূর্বোদ্যমে সমাজের ও সাহিত্যের সেবায় সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তাঁর ‘স্পেন-বিজয় কাব্য’ প্রকাশিত হয়। তাঁর কাব্যে রয়েছে তাঁর বিশাল হৃদয়ের ছায়াপাত। তাঁর কল্পনার প্রসার প্রশংসনীয়, প্রকৃতির রূপ-বর্ণনা হৃদয়স্পর্শী। তাঁর কাব্যের ভাষা তুখু বলিষ্ঠ নয়, স্থানে স্থানে ভেজোব্যঞ্জকও বটে। তিনি ‘স্পেন-বিজয়’ কাব্যের ‘বন্দনা’য় বলেছেন—

গাবো সে অতীত কথা, গৌরব-কাহিনী,
নাচাইতে মোসলেমের নিস্পন্দ ধমনী।
গাবো সে দুর্মদ বীর দীও উন্মাদনা,
কৃপা করি’ অগ্নিস্রী করো এ বসনা!

বাস্তবিকই তাঁর বীরবাহী শ্রবণ করে বাঙলার সন্ধিহারা মুসলমানের স্নায়ুতে জেপেছিল বিদ্যুৎ-চাকল্য। তাঁর ‘স্পেন-বিজয়’ ঐতিহাসিক কাব্য; কিন্তু ইতিহাস-উদ্যানের ‘ঘটনা-কুসুম’ কল্পনার হেমসূত্রে প্রথিত করতে গিয়ে তিনি ব্যর্থকাম হননি। তাঁর ভাষা যথেষ্ট অলঙ্কার-ভারাক্রম হলেও তার পতি অস্বাভাবিকভাবে মন্থর হয়নি। কাব্যের আরও আছে—

এস গো কল্পনে সখি অমিত্তভাবিনী!
কুসুম-ভূষণা দেবী হসিত-আননা,
লয়ে সঙ্গে মনোরঞ্জে বিজলী-পঙ্কিনী
অপার সৌন্দর্যময়ী কবিত্ব-ললনা;
দু’জনে মিলিয়া আঁজি গাঁবি’ চাকর্য—
পর্যায় দেই গলে বাঙলা ভাষার।

এই ‘স্পেন-বিজয়’ কাব্যখানি যখুসূদনের ‘সেখনাদবধ’ কাব্যের অনুসরণে রচিত, এ-কথা বললে ভুল বলা হয় না। স্পেন-রাজ রডারিকের অন্তঃপুরে ধর্ষিতা ক্রোরিজর বন্দিনী-দশা, সমুদ্র পার হয়ে ভারতের স্পেন অভিযান, জুলিয়াসের মূর-দলে যোগদান, যুদ্ধে যুবরাজ মহীলকের পতন, রাজসভার সাম্রাজ্যী স্বধিকার ভর্ৎসনা, পুত্রশোকে রডারিকের বিলাপ, সুন্দরী সোফিয়ার খেদোক্তি, মহীলকের সমাধি, পুত্রশোকোন্মত্ত রডারিকের রণযাত্রা, এ-সমস্ত ঘটনা কথাক্রমে অপকৃত্য সীতার লঙ্কার অবস্থান, সমুদ্র পার হয়ে শ্রীরামের সিংহল আক্রমণ, বিজয়ধ্বজ

কপি-দলে যোগদান, যুদ্ধে বীরবাহুর পতন, রানী মন্দোদরীর গল্পনা, পুত্রশোকে রাবণের বিলাপ, শ্রমীলার বেদ, মেঘনাদের চিত্তারোহণ, পুত্রশোকাতুর রাবণের যুদ্ধবাত্মা প্রভৃতি প্রসঙ্গে স্মরণ করিয়ে দেয়। করেকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

(১) হা পিতঃ! দেখ হে আসি, ক্লোরিণ তোমার
কি শোক-সাগরে আজি ভাসে একাকিনী!
কে আছে এ পাপ-পুরে রক্ষিতে আমার
দানবের হস্ত হতে! —(২৬ পৃঃ)

(২) ছিল আশা সিংহাসনে বসাইয়া তোমা
জুড়াব এ পোড়া আঁখি। নিষ্ঠুর বিধাতা
সে আশা-তরুর মূলে ভীষণ কুঠার
হানিল অকালে, হায়! মম ভাগ্যদোষে
তোমা হেন পুত্ররক্তে হারাইনু আমি।
—(১২২ পৃঃ)

(৩) পূর্বাশার দ্বার খুলি' উষা-সুমোহিনী
চাহিলী মহীর পানে প্রসন্ন নয়নে।
—(১২৩ পৃঃ)

মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও প্রকাশ-ভঙ্গীর সুস্পষ্ট অনুসরণ সত্ত্বেও শিরাঙ্গীর হাতে স্থানে স্থানে চমৎকার কবিত্ব প্রকাশ পেয়েছে :

এ দেহ-মৃগাল হতে পাষণ্ড পিশাচ
সতীত্ব-কমল যদি কৈল উৎপাটন,
কি ফল জীবনে তবে? এ দেহ-মৃগালে
নিচয় ডুবা তবেব কাল-সিদ্ধ-নীরে।

শিরাঙ্গী মহাকাব্য রচনার হস্তক্ষেপ করেছিলেন; কিন্তু কায়কোবাদের মত উত্থানি সফলতাও কেন অর্জন করতে পারলেন না তা ভাববার বিষয়। সৌন্দর্য-কল্পনা ও ভাব-প্রকাশের কিছু দৈন্য ছিল বটে; কিন্তু মনে হয়, ধ্যানীর প্রসন্ন নিরাসক্তি ও স্থিরচিত্ততা তাঁর উত্থানি ছিল না এবং প্রধানতঃ ধর্ম-বুদ্ধির দ্বারা চালিত হয়ে তিনি কাব্যচর্চার অগ্রসর হয়েছিলেন, তাই চরম সাফল্যলাভ তাঁর ভাষ্যে ঘটেনি। অবশ্য উদার ধর্মভাব কোনোদিনই কবি-প্রতিভার প্রতিবন্ধক নয়। কবি-কল্পনার পশ্চাতে রয়েছে বিশাল ভাব ও সৌন্দর্যের প্রগাঢ় অনুভূতি; সেজন্যই শিক্ষামূলক কাব্য তও হৃদয়গ্রাহী হয় না।

শিরাঙ্গীর মহাশিক্ষা কাব্যকে শৈলীর ভাষায় বলা যেতে পারে didactic poetry; ইসলামের পন্থাতাত্ত্বিক নীতি কাব্যের যজ্ঞঘর পরিবেশন করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। তিনি মনে করেছেন ইসলামের তৌহিদের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ স্বাধীনতা ও পন্থত্ব—

হারাইয়া স্বাধীনতা অপার্থিব ধন,
হারাইয়া সুন্দরী প্রজাতন্ত্র-প্রথা
বাঁচে যে—নারকী সেই নরকুলাধম ।

—[মহাশিকা-কাব্য, পঞ্চম সর্গ]

অবশ্য এই মহাশিকা-কাব্যেও মধুসূদনের প্রভাব লক্ষ্যণীয়। কারবালার কাহিনীর পটভূমিকায় এই কাব্যখানি বিরচিত; ইসলামের সাম্য ও গণতন্ত্রের আনন্দ প্রচার উদ্দেশ্য হলেও স্থানে স্থানে কবিত্বের স্করণ বেশ মনোজ্ঞ হয়ে ওঠেছে। মনে হয়, যে-সব স্তবকে মধুসূদনের অনুকরণ করেছেন, সেখানেই বর্ণনা অধিকতর চিত্তহারী হয়েছে। 'মহাশিকা' নামক প্রথম সর্গ থেকে একটু দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

কিংবা যদি আজ্ঞা হয় মদীনা নগরী
লোহিত সাগর জলে পারি ভাসাইতে ।
কিবা শঙ্কা, হে রাজেন্দ্র! মৃগেন্দ্র কখন
ডরে কি কুরসে বিষে? দাবানল-শিখা
পরাজ্বল পুড়াইতে কবে শুভ তরু?

বাঙলা পয়ার জাতীয় ছন্দের বিস্তৃত ভঙ্গী শিরাজীর কাব্যে আঁটসাঁট রূপ গ্রহণ করেছে। কিন্তু মাত্রাবৃত্ত ও বরবৃত্ত ছন্দের কবিতায় তিনি অনুরূপ দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেননি। তাঁর 'সঙ্গীত-সঙ্গীবনী', 'শ্রেয়াজলি', 'পুষ্পাজলি', 'কুসুমাজলি' প্রভৃতি পুস্তকের গীতিকবিতাগুলি পড়লেই এর প্রমাণ পাওয়া যাবে।

১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর 'সঙ্গীত-সঙ্গীবনী' প্রকাশিত হয়। তাতে ৩৩টি গান স্থান পেয়েছে। তার 'মুখবন্ধ'—

চাহ যদি সবে জাতীয় কল্যাণ,
জাতীয় সঙ্গীত করো তবে গান ।
চিত্ত-উন্মাদিনী সঙ্গীত-রাগিনী
ঢালিবে হৃদয়ে মৃতসঙ্গীবনী ।।

১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় 'শ্রেয়াজলি'; তাতে ১২৮টি গীতিকবিতা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'গীতাজলি'র অনুসরণে তিনি 'শ্রেয়াজলি' প্রণয়ন করেছিলেন; কিন্তু নিঃসঙ্গতা-রসিক রবীন্দ্রনাথের অতুলন বানী-রূপ ও সুর-সম্পদ তাঁর সঙ্গীতে নেই। রবীন্দ্রনাথের তীক্ষ্ণ স্বানুভূতি ও আনন্দময় সমর্পিতচিত্ততা শিরাজীর গানের প্রধান উপজীব্য। সেজন্যই গীতিকবিতা হিসাবে সেগুলি বিশেষ সফল হয়নি। রবীন্দ্রনাথের 'গীতাজলি'র প্রতিযোগী হিসাবে তিনি 'শ্রেয়াজলি' প্রণয়ন করেছিলেন; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রভাব যে তিনি কাটিয়ে উঠতে পারেননি

সে-প্রমাণ প্রচুর জড়ো করা যেতে পারে । 'স্রেমাজলি'তে আছে --

তোমার রাগিণী উঠেছে বাজিয়া

আজি গো জীবন-কুঞ্জে ।

মলয় সমীর বহিছে কুটিরে

লুটায়ে কুসুম-পুঞ্জে ।

—(১১৪ পৃষ্ঠা)

এই ভক্তিভাব ও বাণীবিন্যাস যে রবীন্দ্রনাথের, তা বাঙালী পাঠকের অবিদিত নেই ।

ওধু ইসমাইল হোসেন শিরাজী নন, কায়কোবাদ, মোজায়েল হক প্রভৃতিও রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক হয়েও রবীন্দ্র-কাব্যের ভাব-কল্পনা ও রূপকর্মের বৈশিষ্ট্য বুঝতে পারেননি । অগত্যা কায়কোবাদ বিশেষতঃ নবীনচন্দ্রের, মোজায়েল হক প্রধানতঃ হেমচন্দ্রের এবং শিরাজী প্রত্যক্ষতঃ মধুসূদনের অনুসারী হয়ে আত্মবিকাশের পথ খুঁজেছিলেন । তবে শিরাজীর বিশেষ মর্যাদা এ-জন্য যে, তিনি বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম বঙ্গিমচন্দ্রের প্রতিক্রিয়ায় সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় হস্তক্ষেপ করেন । বঙ্গিমচন্দ্রের 'দুর্গেশ নন্দিনী'র পাঁচটা হিসাবে তিনি 'রায়-নন্দিনী' লিখেছিলেন । 'তারাবাদ', 'ফিরোজা বেগম' ও 'নূরুদ্দীন' উপন্যাসেও তাঁর স্বসমাজ-প্রীতি সুপ্রকট । উপন্যাস রচনা করতে গিয়ে তিনি কেন 'বঙ্গমুখ লেখনী ধারণ' করেন, তার কৈকিরং স্বরূপ 'রায়-নন্দিনী'র উপক্রমণিকা পঠিতব্য ।

বারো-ভূঞার আমলের বাঙালার সামাজিক ছবি 'রায়-নন্দিনী'তে বেশ ফুটেছে । চাঁদ রায়, কেদার রায়, স্বর্ণমণি ও ঈশা খাঁর চরিত্র এমন বলিষ্ঠ হাতে অঙ্কিত হয়েছে যে, বাস্তবপ্রয়ী ইতিহাস হয়েছে রসপ্রয়ী উপাখ্যান । তবে চরিত্র-চিত্রণ অপেক্ষা সেই সামন্ততান্ত্রিক যুগের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ ফুটিয়ে তুলতেই তিনি সমধিক তৎপর হয়েছেন; ফলে শিল্পশ্রীর হয়ত কিঞ্চিৎ অপহৃত ঘটেছে ।

তাঁর 'তারাবাদ' উপন্যাসে মালেকা আমিনা বানু ও আফজাল খাঁর বীরত্ব, 'ফিরোজা বেগম' উপন্যাসে মারাঠা সর্দার সদাশিব রাও ও ভাস্কর পণ্ডিতের অভ্যুত্থান-কাহিনী এবং 'নূরুদ্দীন' উপন্যাসে মালবের সুলতানের সাথে চিতোরের রাণার যুদ্ধ-বিগ্রহের বর্ণনা দীর্ঘস্থান অধিকার করেছে । তাঁর এ-সব উপন্যাসে পরোক্ষ প্রেরণা জুগিয়েছে স্বাভাভ্যাভিমান ও স্বধর্মপ্রীতি, কুসংস্কার ও প্রধানুগত্যের উর্ধ্বে স্থান পেয়েছে মনুষ্যত্ববোধ ও প্রেমনিষ্ঠা । ভাষার ওজস্ব ও বর্ণনার মনোহারিতা তাঁর সব উপন্যাসেই স্বকীয়তার ছেঁড় হয়েছে ।

তাঁর গদ্যের ভঙ্গী বাস্তবিকই সাবলীল । তাঁর 'শ্রী-শিক্ষা', 'ভূরত্ব-ভ্রমণ', 'ভূকী নারী-জীবন', 'আদব-কায়দা শিক্ষা', 'সুচিন্তা', 'স্পেনীয় মুসলমান সভ্যতা'

প্রভৃতি পুস্তকে গদ্যের ধরন বেশ প্রাঞ্জল অথচ প্রাণবন্ত। তার রাচত সাহিত্যে নিরপেক্ষ রসবিচারে ক্রটি ও অসম্পূর্ণতা হয়ত ধরা পড়বে; কিন্তু তাঁর রচনার শক্তির জন্যই তিনি দীর্ঘদিন স্বরধীর হয়ে থাকবেন। শুধু সাহিত্যের ইতিবৃত্তেই তাঁর পৌরবাবিভ আসন লাভ হবে না, দেশের আগরণের ইতিহাসেও তাঁর উল্লেখ হবে সম্ভবময়। স্বদেশের ও স্বসমাজের কল্যাণের জন্য তিনি সর্বশক্তি নিয়োজিত করেছিলেন; সেই দুর্ভাগ শক্তির আবেগ-দীপ্ত প্রকাশ রয়েছে তাঁর বিপুল সাহিত্যে। সেই বীরবান পুরুষের জীবনবাণী মূর্ত রয়েছে বলেই তাঁর সাহিত্য কালস্রোতে বহুদিন স্থান হবে না।

তিনি তাঁর 'স্ত্রী-শিক্ষা' পুস্তকের চতুর্থ সংস্করণের 'ভূমিকা'য় বলেছিলেন : "চিন্তার বিক্ষুব্ধকারিণী শিক্ষা এবং স্বাধীনতাই হইতেছে মনুষ্যত্ব-লাভের একমাত্র উপায়।" এই শিক্ষা এবং স্বাধীনতা দেশের সকল শ্রেণীর নারী লাভ না করলে সমাজের ও সংসারের অসীমিত উন্নতি ও কল্যাণ নাই, এ-কথা তিনি বহু অকাটা যুক্তি ও প্রামাণ্য নজির দিয়ে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় মুসলমান শিক্ষা-সমিতির তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে প্রদত্ত বক্তৃতায় আবেগপূর্ণ ভাষায় বলেন। তাঁর সেই সারগঠ ভাষণ ১৯০৪ খ্রিষ্টাব্দে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত আকারে 'স্ত্রী-শিক্ষা' নামে প্রকাশিত হয়। বাঙলার মুসলমান সমাজে শিরাজী হচ্ছেন 'স্ত্রীশিক্ষা' ও 'স্ত্রীজাতীয় স্বাধীনতা' আন্দোলনের সম্বানিত পুরোধা।

১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে (১) 'ইসলামের মূল শক্তি', (২) 'সাহিত্য-শক্তি ও জাতি-সংগঠন', (৩) 'মাতৃভাষা ও জাতীয় উন্নতি', (৪) 'অভিভাষণ', (৫) 'স্বাধীন চিন্তাশীলতা', (৬) 'ইসলামের ভবিষ্যৎ', (৭) 'সাহিত্য ও জাতীয় জীবন', (৮) 'আত্মশক্তি ও প্রতিষ্ঠা', এই ৮টি সুনির্বাচিত নিবন্ধ নিয়ে তাঁর 'সূচিন্তা' প্রকাশিত হয়। প্রথম নিবন্ধে বলা হয় যে, "ইসলামের একত্ববাদ ও সাম্যতাব হইয়াছে শক্তির উৎস।" দ্বিতীয় নিবন্ধে তিনি ষাট ভাবান্তেই বলেন যে, "বঙ্গসাহিত্যকে জাতীয় সাহিত্যে পরিণত" করতে হলে "ইসলামের পবিত্রতা ও নীতির প্রাচীরের" ভিতরে থেকে সাহিত্য-সেবা করতে হবে। তৃতীয় নিবন্ধে তিনি বলেন :

"মাতৃভাষা ব্যতীত কোনো জাতিই উন্নতিলাভ করতে পারে নাই। ... বাঙলা না জানায় শুধু আরবী-পারসী-পড়া মৌলবী সাহেবদিগের সমাজের উপকার হওয়া দূরে থাকুক, অনুদিন কর্তি ও অবনতির মাত্রা বর্ধিয়া চলিয়াছে। ... বঙ্গজাতকে হিন্দুর জাতি মনে করিও না। ... যে যাদ্রাসার ভাষেব-এলেমগণ! মাতৃভাষা স্বদেশকে সম্পূর্ণরূপে জয়ত করিতে সমর্থ হও।"

তিনি 'স্বাধীন চিন্তাশীলতা' নিবন্ধে দুঃখ-সহকারে বলেন :

"সমাজে স্বাধীন চিন্তাশীল ব্যক্তি নাই; তাই জাতি বঙ্গীয় মুসলমানদের এখন দুর্ভাগ্য মশয় করিতেছে।"

তিনি 'আত্মশক্তি ও প্রতিষ্ঠা' নিবন্ধে নির্দেশ দেন যে, "অতীতের আলোক ধরিয়া ভবিষ্যতের অন্ধকারাচ্ছন্ন পথবাণথকে আলোকিত করিতে হইবে।" কিন্তু

অতীতের আলোক” বলতে তিনি প্রকৃতপক্ষে অতীতের মুসলমানদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনাই বুঝিয়েছেন। ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর ‘শৈন্যীয় মুসলমান সভ্যতা’ পুস্তকে বলেছেন :

“বিজ্ঞান যে মানব-জীবনের সর্বাঙ্গকে আলোচ্য ও আবশ্যকীয় বিষয়, বিজ্ঞানই যে অজ্ঞান মানবের উন্নতি-পথ-প্রদর্শক, শৈন্যীয় মোসলেমানই এই সভ্যতা বর্ষের ইউরোপীয় মস্তিষ্কে প্রতিষ্ঠা করাইয়া দিয়াছিলেন। হায় মুসলমান! কবে আবার তোমার মনে বিজ্ঞানের প্রতি গভীর অনুরাগ ফুটিয়া উঠিবে? কবে আবার তোমার হীনতার অন্ধকার দূরীভূত হইবে?”

- (৮৮ পৃঃ)

১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মাসিক ‘নূর’ বের করেন। তাতে বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের প্রথম জীবনে রচিত ছোট-গল্প ‘মেহের-নেগার’, ‘ঘুমের ঘোরে’ ও ‘রিজেক্ট বেদন’ প্রকাশিত হয়েছিল। ‘নূর’ পত্রিকায় মহাশিক্ষা-কাব্যের কয়েকটি সর্গ ধারাবাহিকভাবে মুদ্রিত হয়েছিল। ‘মহাশিক্ষা’ এক বিপুলকায় মহাকাব্য; বাঙলা ভাষায় এত বড় কাহিনী-কাব্য এ-যুগে বিরচিত হয়নি। এই মহামূল্য কাব্যটি গ্রন্থবদ্ধ হলে বাঙলা সাহিত্যের ভাণ্ডার যেমন পরিপুষ্ট হবে, তেমনি বাঙলা সাহিত্যে শিরাজীর বিপুল অবদানের সম্যক মূল্যায়নও সম্ভবপর হবে।

১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে মওলানা মোহাম্মদ মনিরুল্লাহমান ইসলামাবাদী ও সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজীর যুগ্ম-সম্পাদনায় নব-পর্যায় সাপ্তাহিক ‘ছোলতান’ প্রকাশিত হয়। তাতে শিরাজী ‘আত্মত্যাগ ও জাতীয় উন্নতি,’ ‘জাতীয় জীবনে স্বাধীনতার প্রয়োজন,’ ‘ভারতের বর্তমান অবস্থা ও মুসলমানের কর্তব্য,’ ‘ইসলাম ও আত্মোৎসর্গ,’ ‘স্বজাতি-প্রেম,’ ‘বঙ্গালী মুসলমানের আত্মপরিচয়,’ ‘শিল্প-সংগঠন ও জাতীয় জীবন,’ ‘নারীশক্তির উদ্বোধন ও জাতীয় জীবন,’ ‘ইতিহাস-চর্চার আবশ্যিকতা,’ ‘প্রাণের মূর্ছনা’ প্রভৃতি বহু মূল্যবান প্রবন্ধ লেখেন। এ-সকল সন্দর্ভে তাঁর সামাজিক সাম্য, আর্থনীতিক উন্নয়ন ও রাজনীতিক অধিকারের আদর্শ প্রত্যয়ের আওনে দীপ্তিমান। ‘জাতীয় জীবনে স্বাধীনতার প্রয়োজন’ প্রসঙ্গে তিনি বলেন :

“স্বাধীনতা লাভ করিতে না পারিলে মন কখনও সুস্থ ও সবল হইতে পারে না। জাতি স্বাধীন না হইলে তাহার চিন্তাশক্তিও স্বাধীন এবং বলবতী হইতে পারে না।”

—(ছোলতান, ১৪ই ভাদ্র, ১৩৩০)

কিন্তু এই পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা চাই যেহেতু মানুষের জীবন-বিকাশের প্রয়োজনে—কায়েমী স্বার্থের পরিপোষকদের ভোগের ক্ষেত্র প্রসারের জন্য নয়। তিনি ‘প্রাণের মূর্ছনা’ প্রবন্ধে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন :

“স্বাধীনতা ও স্বাধীনতার আমি ঘোর পক্ষপাতী। ...কিন্তু সেই সঙ্গে আমি ইহাও স্পষ্টই ব্যক্ত করিতেছি যে, স্বাধীনতার জন্য আমার মুসলমান ভাইকে, আমার চাষী ভাইকে আমি কিছুতেই জবাই করিতে পারিব না। স্বাধীনতার জন্যই আমার চাষী ভাইকে বাঁচাইতে হইবে। চাষাই এসেশের জীবন ও বৌবন। চাষার বস্তুশোষণ করিয়াই জমিদার, মহাজন ও উকিল-মোক্তারদিগের বড়বাড়ি ও ছড়ামুর্ছা। চাষার টাকাত্তে তাঁহাদের দালান-কোঠা ও মোটর-

গাড়ি । ... সুভাষা চাষাকে বাচানো এবং চাষীকে ... পানই হইতেছে স্বরাজের প্রধানতম সাধনা ।”
—(ছোলতান, ৬ই চৈত্র, ১৩৩০)

১৩০৯ সালের ১২ই আশ্বিন তারিখের সাপ্তাহিক 'মিহির ও সুধাকর'-এ শিরাজী 'জাতীয় মহাসমিতি' স্থাপনার আহ্বান তার্বরে প্রচার করেছিলেন । তার প্রায় দুই দশক পরে ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে সিরাজগঞ্জে বঙ্গীয় মোসলেম মহাসভার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভষণে তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বলেন :

“মুসলমানদিগকে স্বরাজ-সম্মানে দ্রুত অগ্রসর করিবার জন্যই স্বতন্ত্র জাতীয় সভা ও জাতীয় রাজনৈতিক দল গঠন করা কর্তব্য । ... আমাদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করা একান্ত আবশ্যিক ।”
(ইসলাম দর্শন, শ্রাবণ ও ভাদ্র, ১৩৩১)

এই উপ-মহাদেশের মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণ-অধিকার লাভের জন্য সেদিন শিরাজী সে-পথনির্দেশ করেছিলেন, সে-পথই প্রশস্ত বলে তাঁর স্বসমাজের লোকেরা কালক্রমে বুঝতে পারে এবং সে-পথে অগ্রসর হয়েই তারা ইতিহাসের স্বাভাবিক নিয়মেই জাতীয় আবাসভূমির প্রতিষ্ঠা করেছে । কিন্তু শিরাজী চেয়েছিলেন ইসলাম-সম্বৃত প্রজাতন্ত্র-প্রথা এবং জ্ঞানালোকিত মুক্ত চিন্তা; তিনি তাতেই দেখেছিলেন মুক্তির পূর্ণতা ও মনুষ্যত্বের মহিমার স্বপ্ন । ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের ১লা শ্রাবণ যুতাবিক ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ই জুলাই এই বীরকণ্ঠ চিরতরে শুক্ন হয়ে গেছে; কিন্তু তাঁর স্বপ্ন তাঁর অমর সাহিত্য-কীর্তির মাধ্যমে দেশবাসীকে চিরদিন দিবে আনন্দ ও অনুপ্রেরণা ।

— — —

